বর্ধমান রাজইতিবৃত্ত

শ্রী নীরদবরণ সরকার, সাহিত্য বিনোদ

প্রথম প্রকাশ ঃ

ইং- ১৯ শে জুন, ১৯৯৯

প্রকাশিকা ঃ
শ্রীমতী সুজাতা সরকার
৮০, দুর্গাদাস তেওয়ারী রোড্,
কোটালহাট, বর্ধমান - ৭১৩১০২
ফোন নং - (০৩৪২) ২৫৩১২৪৪
মোবাইল নং - ৯৪৩৪০১৮৯১৪

মুদ্রক ঃ
সুদীপ দাস
চামেলী ডি.টি.পি. সেন্টার, (লেজার প্রিন্টিং ডিভিশন)
বাদশাহী রোড (সিটি হোটেল), বর্ধমান।
ফোন নং - (০৩৪২) ২৫৫৯৯৩৭

প্রাপ্তিস্থান ঃ
বি. কে. প্রকাশনী
প্রযত্নে শিশুতীর্থ
৬৫/৩এ কলেজ স্ট্রীট
কলকাতা।

উৎসর্গ

আমার প্রপিতামহ হরলাল সরকার
যাঁকে আমি দেখি নাই
রাজখাসমহলের দেওয়ান
থাকাকালীন যে সব
বহু তথ্য রেখে
গিয়েছিলেন,
আমার পিতামহ করুণাময় সরকার
রাজখাসমহলে একই পদে
অধিষ্ঠিত থেকে
কিছু তথ্য
রেখে গেছেন
যাঁদের দেখার সৌভাগ্য
আমার হয় নাই

এবং
পিতৃদেব নীহার রঞ্জন সরকার,
যাঁর কাছে রাজ কাহিনীর
অনেক কিছুই জেনেছি
তাঁদের সকলের পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশে
ভক্তি ও শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ
'বর্ধমান রাজ ইতিবৃত্ত'
গ্রন্থখানি
উৎসর্গ করিলাম।

আশীর্বাদ ধন্য

নীরদবরণ সরকার

লেখকের অন্যান্য গবেষণামূলকগ্রন্থ ঃ

১। নগর বর্ধমানের দেবদেবী (চতুর্থ সংস্করণ)।

২। প্রাচীন বর্ধমানের সংস্কৃতি ও ধর্মীয় চেতনা (দ্বিতীয় সংস্করণ)।

৩। বিস্মৃত রাঢ়ের বিলুপ্ত কথন (দ্বিতীয় সংস্করণ)।

৪। সর্ব্বব্যাপী চরাচর দেবী সর্ব্বমঙ্গলা উপাখ্যান।

৫। বর্ধমান ১০৮ শিবমন্দির।

৬। আপন অন্তর্লোকে ঃ রাঢ়ের প্রাসঙ্গিকতা।

৭। রাঢ় বর্ধমানের সাধক কবি কমলাকান্ত।

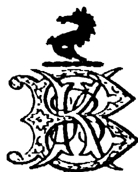
মুখবন্ধ

'বর্ধমান রাজ ইতিবৃত্তের' মুখবন্ধ লেখার পূর্বেই উল্লেখ করি, দীর্ঘদিন যাবৎ আমার ইচ্ছা ছিল একটি পূর্ণাঙ্গ রাজ ইতিবৃত্ত প্রণয়ণ করার। অবশ্য অনেকে মনে করতে পারেন, রাজ বা জমিদারী প্রথা যেখানে বিলুপ্ত হয়েছে সেখানে আর জমিদার বা রাজ ইতিহাস রচনার কী প্রয়োজন? যুগ প্রবাহে কোন বিশেষ বংশ, উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনাবলী ধীরে ধীরে তলিয়ে যায়; এই হলো যুগ ধর্ম। কোন কিছুই স্থায়ী নয়। সেই নিয়মে এক এক সময় এক এক জাতি গোষ্ঠীর উত্থান হয় আবার পতনও হয়। যখন যে শক্তি দেশ শাসন করে, তার অধীনস্থ প্রদেশ, চাকলা প্রভৃতি আঞ্চলিক প্রধানরাও তাঁদের প্রভাব প্রতিপত্তিকেও বৃদ্ধি করতে থাকেন ঐ শাসকশক্তিকেই অবলম্বন করে। ইতিহাস রচিত হয় ওইসব প্রাদেশিক বা রাষ্ট্রিক শক্তিদের নিয়ে, কিন্তু তাঁদের অধীনস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদার, যাঁদের সঙ্গে সাধারণ জনগণের সুখ-দুঃখ হিত-অহিত, উন্নয়ণ-অধঃপতন প্রত্যক্ষভাবে জড়িত তাঁদের ইতিহাস বড় একটা লেখা হয় না। আমি এখানে সেইরূপ জেলা বা চাকলার বর্ধমান রাজার ইতিহাস রচনায় প্রয়াসী হয়েছি কারণ হিসাবে বলি, এই রাজবংশ আমার মতে জনদরদী। তাছাড়া আমার প্রপিতামহ হরলাল সরকার, পিতামহ করুময় সরকার যাঁরা ছিলেন রাজার খাস মহলের দেওয়ান এবং আমার পিতৃদেব নীহাররঞ্জন সরকার বিশিষ্ট রাজ কর্মচারী যাঁরা রাজবংশের বহু তথ্য লিপিবদ্ধ করে গেছেন সেই সব তথ্যই আমাকে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে এই রচনায়।

বর্ধমান রাজের দেওয়ান-ই-রাজ রাজা বনবিহারী কপূর আমার প্রপিতামহ হরলাল সরকারের মধ্যম পুত্র জ্যোতির্ময় সরকার, এম-এ. বি. এল-কে হুগলী কোর্টের মুন্সেফ হিসাবে নিয়োগ করার যে সুপারিশ পত্র দিয়েছিলেন তার প্রতিলিপি এবং আমার পিতৃদেব নীহাররঞ্জন সরকারকে রাজপ্রথা বিলুপ্তির পর মহারাজাধিরাজ উদয়চাঁদ মহ্‌তাব যে পত্র দিয়েছিলেন তারও প্রতিলিপি মুদ্রিত হল।

ভারতবর্ষে মোগল সাম্রাজ্যের বীজ বপন করেন জহিরউদ্দিন বাবর ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে। আর সেই সাম্রাজ্য সমৃদ্ধশালী হয়ে ওঠে ষোড়শ শতকের শেষ হতে সপ্তদশ শতকের প্রথম (১৫৫৬-১৬০৫ খ্রীঃ) সম্রাট জালালউদ্দিন আকবরের সময়। তৎকালেই পঞ্জাবের, লাহোরের অন্তর্গত কোটলি মহল্লার প্রখ্যাত বস্ত্র ব্যবসায়ী সঙ্গমরায়, শ্রীশ্রী জগন্নাথ দর্শন করে পুরী হতে সপরিবারে প্রত্যাবর্তনের পথে বর্ধমানের নিকট বৈকুণ্ঠপুর গ্রামে, তাঁর ব্যবসা ও তেজারতি কারবারের সুযোগ-সুবিধা থাকায় উক্ত গ্রামে আবাসস্থল নির্মাণ করে বসবাস করতে থাকেন। Bengal District Gazetter-এ উল্লেখ আছে ঃ—

According to tradition the original founder of the house, was one Sangam Rai, a Khattri Kapur of Kotli in Lahore, who, on his way back from a Pilgrimage to Puri,



Ban Abash.
Burdwan.

20.11.1905

Certified that Babu Jyotirmoy Sarkar belongs to a respectable family; his father late Babu Hara Lal Sarkar was the Dewan of khas mahals belonging to the Burdwan Raj; that he after passing the M.A. and B.L. examinations of the Calcutta University has been practising as a pleader in the District Court of Hooghly for the last two and half years; that he is a clear minded, intelligent young man having sound knowledge of the law and I believe he is fully competent to discharge the duties of a munsif. He has very good moral character.

Bun Behari Kapur
Raja Bahadur C.S.I.

Dated "Banabas"
Burdwan
The 20th Nov., 1905



UDAY MAHAL
ROSE BANK
DARJEELING

To

Shri Nihar Ranjan Sarkar,
Sadar Khas Mahal Office, Burdwan Raj Estate,
Burdwan.

Dear Sir,

As my zemindaries have been acquired by Government under the provisions of the West-Bangal Estates Acquisition Act, 1953, I am sorry to inform you that with the expiry of the month of Ashar, 1362 B.S. and on and from the 1st of Sravan, 1362 B.S., your services as an employee of the Burdwan Raj will not be required and as such please take notice that from the aforesaid 1st of Sravan your services under the Burdwan Raj are terminated.

Yours faithfully,

Maharajadhiraja Bahadur of Burdwan.

being much taken with the advantages of Baikunthapur, a village near the town, settled there and devoted himself to commerce and money lending (J.C.K. Petterson Page-26).
তাছাড়া সম্রাটের সঙ্গে সহযোগিতা মূলক আচরণের জন্য সঙ্গমরায়, আকবরের বিশেষ অনুগ্রহ লাভ করেন এবং মনসবদারী লাভ করেন। সঙ্গম রায়ের পর তাঁর পুত্র বঙ্কু বিহারী রায় পিতৃ ব্যবসায় লিপ্ত হন সপ্তদশ শতকের একেবারে প্রথমের দিকে, তখন দিল্লীর বাদশাহ, সম্রাট আকবর পুত্র জাহাঙ্গীর (১৬০৫-২৭ খ্রীঃ)। তিনিও সম্রাটের নিকট মনসবদারী পেয়েছিলেন।

১৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দ, সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগ। বর্ধমানে সঙ্গম রায়ের তৃতীয় পুরুষ আবুরায় পিতার ব্যবসায় যুক্ত হন। সম্রাট শাহ্জাহান তখন দিল্লীর মস্নদে আসীন (১৬২৭-৫৯)। আবুরায় জমিদার হিসাবে স্বীকৃতি পান সম্রাট শাহ্জাহানের নিকট হতে। প্রকৃতপক্ষে পঞ্জাবের এই ক্ষত্রিয় পরিবার 'রাজ' বংশ হিসাবে পরিগণিত হয় এই সময় থেকে। মহারাজকুমার ডঃ প্রণয়চাঁদ মহাতাব স্বস্বাক্ষরিত রাজবংশের যে বংশকুঞ্চিকা 'BURDWAN RAJ FAMILY' দিয়েছেন পৃথকভাবে তার প্রতিলিপি সংযোজিত হলো। এই প্রসঙ্গে Bengal District Gazetteer-এ উল্লিখিত হয়েছে, "Abu Rai who was appointed Choudhuri and Kotwal of Rekhabi Bagar in the town in 1657 under the Faujdar of Chakla Burdwan is said to have been his grand-son and he is the first member of the house of whom there is any historical record. He owed his appointment to the good service rendered by him in supplying the troops of the Foujdar with provisions at a critical time. (J.C.K. Peterson. Page 27)। আবুরায়-ই কাঞ্চননগরে স্থায়ীভাবে আবাসন নির্মাণ করেন।

আবুরায়ের পর তাঁর পুত্র বাবুরায় পিতার জায়গীর লাভ করেন। তিনি বর্ধমান ছাড়া আরও তিনটি পরগণার অধিকারী হন। এই সময়ও দিল্লীর সম্রাট ছিলেন শাহ্জাহান। পরে শাহ্জাহানকে বন্দী করে তাঁর তৃতীয় পুত্র ঔরঙ্গজেব ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন।

বাবুরাম রায়ের পরলোক গমনের পর তাঁর পুত্র ঘনশ্যাম রায় যখন বর্ধমান পবগণার অধিকারী হন তখন ঔরঙ্গজেব দিল্লীর সম্রাট। বাবুরাম রায়-ই দিল্লী বাদশার নিকট হতে প্রথম সনদ পান। সম্রাট ঔরঙ্গজেব ১৭০৭ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত দিল্লীর মসনদে আসীন ছিলেন। ঔরঙ্গজেবের শাসন সময়ে বর্ধমান পরগণার জমিদার ও চৌধুরাই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন বাবুরাম রায়ের অধঃস্তন তিনপুরুষ ঘনশ্যাম রায়, পুত্র কৃষ্ণরাম রায় (১৬৭৫-১৬৯৬ খ্রীঃ) ও তৎপুত্র জগৎরাম রায় (১৬৯৯-১৭০২ খ্রীঃ)। ১৬৯৬ খ্রীঃ থেকে তিন বছর যাবৎ পাঠান মারাঠাদের উপদ্রব এবং সেই সঙ্গে বিষ্ণুপুরের রাজা ও বর্ধমান রাজের পূর্ণ বিরোধিতা করায় জগৎরাম রায়কে আত্মরক্ষার জন্য বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়াতে হয়েছিল।

তৎপরে ১৭০২ খ্রীষ্টাব্দে জগৎরাম রায়ের মৃত্যুতে বর্ধমান পরগণার জমিদারী লাভ করেন কীর্তিচাঁদ রায়। তখনও দিল্লীর সম্রাট ছিলেন ঔরঙ্গজেব। কীর্তিচাঁদ রায়ের ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি বহুকীর্তির স্বাক্ষর রেখে যান। তাঁর সময়ের মধ্যে দিল্লীর সিংহাসনের বহু রদবদল হয়েছে। ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম শাহ আলম দিল্লীর মসনদে। তিনি ১৭১২ খ্রীঃ পর্যন্ত সিংহাসনে আসীন ছিলেন। তাঁর পরে দিল্লীর সিংহাসনে বসেন জাহান্দার শাহ্ অল্প সময়ের জন্য ১৭১৩ খ্রীষ্টাব্দের কয়েক মাস, তারপর আজিম-উস-শান তারপর ঐ বছরেই অর্থাৎ ১৭১৩ খ্রীষ্টাব্দেই ফারুক শিয়ার দিল্লীর মসনদে বসেন; ১৭১৯ খ্রীঃ পর্যন্ত সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তারপর মহম্মদ শাহ (রোশন আখ্‌তার) ১৭৪৮ খ্রীঃ পর্যন্ত সম্রাট ছিলেন।

চিত্রসেন রায়, ১৭৪০ খ্রীঃ বর্ধমানের জমিদারী প্রাপ্ত হন। এবং তিনিই প্রথম দিল্লীর বাদশাহ্ মহম্মদ শাহ'র কাছ হতে সম্মান সূচক 'রাজা' উপাধিযুক্ত সনদ পান। রাজা চিত্রসেনের মৃত্যুর পর তাঁর পিতৃব্য পুত্র তিলকচাঁদ রায় বর্ধমানের রাজা হন ১৭৪৪ খ্রীঃ। ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ শাহ্'র মৃত্যুর পর দিল্লীর সিংহাসনে আরোহন করেন আহম্মদ শাহ্ ; তিনি ১৭৫৪ খ্রীঃ পর্যন্ত সিংহাসনারূঢ় ছিলেন। আহম্মদ শাহ-এর নিকট হতে 'তিলকচাঁদ রায় বংশানুক্রমিক 'মহারাজাধিরাজ ' খেতাব যুক্ত সনদ প্রাপ্ত হন ১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে। তিনি ১৭৭০ খ্রীঃ পর্যন্ত বর্ধমান রাজ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইতিমধ্যে ১৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দে আহম্মদ শাহের মৃত্যুর পর দিল্লীর মসনদের বহু পট-পরিবর্তন হয়। ১৭৫৪ খ্রীঃ আজিজউদ্দিন (দ্বিতীয় আলমগীর) সিংহাসনে বসেন, ১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় শাহ্‌আলম সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং তিনি ১৮০৬ খ্রীঃ পর্যন্ত আসীন ছিলেন। এই সময় বাংলার তথা ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের সূচনা হয় নতুন অধ্যায়। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশী যুদ্ধের পর ইংরেজ আধিপত্য শুরু হয়। ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমান পরগণা ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির হাতে চলে যায়। মহারাজাধিরাজ তিলকচাঁদ ১৭৬০-১৭৬১-র রাজস্ব কোম্পানীকে দেন। ১৭৬২-১৭৭৬ খ্রীঃ অব্দ পর্যন্ত বর্ধমান চাকলা, কোম্পানি নিজ খাস দখলে রেখে বর্ধমান রাজকে মালিকানা দেন।

১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে তিলকচাঁদ রায়ের পরলোক গমণের পর তাঁর পুত্র তেজচাঁদ বর্ধমানের রাজসিংহাসনে বসেন। তিনি ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকলেও দেওয়ান পরাণচাঁদ কপূরের হাতের পুতুল ছিলেন। অবশ্য মহারাজা তেজচাঁদ একাধিকক্রমে ১৮৩২ খ্রীঃ পর্যন্ত রাজত্ব করতে পারেন নাই। তাঁর দুর্বলতার জন্য ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর পুত্র প্রতাপচাঁদ জমিদারী পরিচালনভার নিজ হাতে গ্রহণ করেন। তিনি জমিদারীর দায়িত্ব নিয়ে দেখেন লর্ড কর্ণওয়ালিশ যে চিরস্থায়ী বন্দোব্যস্ত আইন প্রচলন করেন তাতে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে যা জমিদারদের স্বার্থের পরিপন্থী। তখন তিনি ত্রুটি বিচ্যুতির কথাগুলি উত্থাপন করে আবেদন জানান তাঁর আবেদন পর্যালোচনা করে গভর্ণমেন্ট ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে অষ্টম আইন (Regulation act VIII of 1819) প্রণয়ন করেন। ইতিমধ্যে বর্ধমান রাজকে সমগ্রবঙ্গের জমিদারদের অপেক্ষা অধিক পরিমাণ রাজস্ব দিতে হওয়ায় পত্তনিপ্রথার

প্রচলন করেছিলেন। এই অষ্টম আইন প্রবর্তিত হওয়ায়, ছোট বড় সকল জমিদারদের বিশেষ সুবিদা হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় দুষ্টচক্রীদের চক্রান্তে প্রতাপচাঁদ ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে সুকৌশলে অন্তর্হিত হন। অতঃপর তেজচাঁদ পুনরায় সিংহাসনে বসেন। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে তেজচাঁদ পরলোক গমন করার পর তাঁর নাবালক দত্তক পুত্র মহতাবচাঁদ রাজ সিংহাসনে বসেন এবং ১৮৭৯ খ্রীঃ পর্যন্ত রাজত্ব করেন।

এই সময় মোগল আধিপত্য ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয় এবং ইংরাজ শক্তি কায়েম হয়। মহ্তাব্চাঁদের সিংহাসন প্রাপ্তির প্রথম পাঁচ বছর মোগল শাসন থাকলেও তা ইংরাজদের ইচ্ছানুরূপ। ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় শাহ্আলম এরপর দ্বিতীয় আকবর শাহ্ দিল্লীর সিংহাসনে বসেন এবং ১৮৩৭ খ্রীঃ পর্যন্ত ছিলেন তৎপরেই ভারতে মোগল শাসন সম্পূর্ণ তিরোহিত হয়। মহারাজাধিরাজ মহ্তাব্চাঁদের সময় হতেই ইংরাজ আধিপত্য বিস্তার লাভ করে।

মহ্তাব্চাঁদ ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে গভর্ণর জেনারেল লর্ড ডব্লিউ বেণ্টিঙ্ক কর্তৃক 'মহারাজাধিরাজ' খেতাবের স্বীকৃতি পান। তৎকালে বঙ্গের জমিদারদের মধ্যে একমাত্র বর্ধমানের রাজা মহ্তাব্চাঁদ-ই তাঁর নামের পূর্বে His Highness লেখার অনুমতি পান। বর্তমান সময়েও যে 'রাজপ্রতীক' চিহ্নটি দেখতে পাই সেইটিও ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে গভর্ণর জেনারেল কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

মহ্তাবচাঁদের পর তাঁর দত্তক পুত্র, আফ্তাবচাঁদ বর্ধমান রাজ সিংহাসনে বসেন ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে এবং আফ্তাব্চাঁদের দত্তক পুত্র মহারাজাধিরাজ বিজয়চাঁদ রাজসিংহাসনে বসেন, তারপর রাজা হন মহারাজাধিরাজ উদয়চাঁদ ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে। তিনি ভারত স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে জমিদারী প্রথা বিলুপ্তি পর্যন্ত ছিলেন বর্ধমানের মহারাজা। তিনি দেশীয় সরকারের হাতে তাঁর বিশাল প্রাসাদ সহ বহু সম্পদ দান করে দেন। দেশ সেবার জন্য তাঁর ঁলক্ষীনারায়ণ জীউ ঠাকুরবাড়ী সামান্য অংশটুকু সেবাইত হিসাবে জ্যেষ্ঠ পুত্র মহারাজকুমার সদয়চাঁদের সম্মতিক্রমে কনিষ্ঠ পুত্র মহারাজকুমার ডঃ প্রণয়চাঁদ-কে দিয়ে যান। এই হলো বিভিন্ন শাসক গোষ্ঠীর সময় অর্থাৎ মোগল সম্রাট আকবর থেকে ব্রিটিশ শাসক লর্ড মাউণ্টব্যাটেন পর্যন্ত প্রায় ৩৪৭ বছরের রাজ ইতিবৃত্ত।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা বললে হয়তো অত্যুক্তি হবে না যে, ইতিপূর্বে আমি বর্ধমানের উপর গবেষণামূলক গ্রন্থ 'নগর বর্ধমানের দেবদেবী', 'প্রাচীন বর্ধমানের সংস্কৃতি ও ধর্মীয় চেতনা', 'বিস্মৃত রাঢ়ের বিলুপ্ত কথন', 'বিষ্ণুকুমারীর শৈবতীর্থ ১০৮ শিবমন্দির', 'দেবী সর্বমঙ্গলা উপাখ্যান', 'আপন অন্তর্লোকে রাঢ়ের প্রাসঙ্গিকতা' 'রাঢ় বর্ধমানের সাধক কমলাকান্তের জীবনী ও পদাবলী' প্রভৃতি যে পুস্তকগুলি প্রণয়ন করেছি তন্মধ্যেও রাজ ইতিবৃত্তের বহু তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে।

এখানে শ্রদ্ধার সঙ্গে রাজবংশের কনিষ্ঠ সন্তান মহারাজকুমার ডঃ প্রণয়চাঁদ মহাশয়ের নাম উল্লেখ করছি, তিনি বহু তথ্য ও আলোচিত্র দিয়ে রচনাটিকে পূর্ণাঙ্গ করতে সাহায্য করেছেন, তদুপরি ইতিবৃত্তটি ধৈর্য সহকারে পাঠ করে একটি সুচিন্তিত অভিমত দিয়েছেন, তার প্রতিলিপি যথাস্থানে সংযোজিত হলো।

এছাড়া শ্রী যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী মহাশয় সম্পাদিত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অগ্রজ সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় প্রণীত 'জাল প্রতাপচাঁদ', এবং বর্ধমানের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, ডঃ আবদুস সামাদ রচিত 'রাজ সভাশ্রিত বাংলা সাহিত্য এবং শ্রী অলোক মোদক রচিত 'বর্ধমান রাজ বিগত শতাব্দীর এক হারানো অধ্যায়' ও সুশীল সেন মহাশয় লিখিত 'বর্ধমানের কথা পুস্তক থেকে সাহায্য নিয়েছি। তাঁদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই।

এখানে আর একজনের কথা বলা প্রয়োজন, তিনি হলেন প্রেমকুমার মেহেরা যিনি রাজবংশের কতকগুলি দুষ্প্রাপ্য আলোকচিত্র দিয়ে গ্রন্থটির সমৃদ্ধি দান করেছেন। তজ্জন্য তাঁকেও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। তাঁরই প্রদত্ত এই গ্রন্থের প্রচ্ছদ চিত্রটি শতাধিক বর্ষের পুরাতন রাজপ্রাসাদের। লক্ষ্যনীয় বস্তু, তৎকালে বৈদ্যুতিকবাতি ছিল না, তৎপরিবর্তে কেরোসিনবাতির যে প্রচলন ছিল চিত্রে তা-ই পরিদৃশ্যমান।

এখানে উল্লেখ্য, গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে বহু দুষ্প্রাপ্য, রাজসংক্রান্ত আলোকচিত্র। গ্রন্থখানি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রকাশন বিভাগ কর্তৃক রেজিস্ট্রিকৃত। সন্নিবেশিত চিত্রগুলির কোনটি-ই লেখকের অনুমতি ব্যতীত প্রতিলিপি হিসাবে কেউ ব্যবহার করতে পারবেন না।

শুভাকাঙ্খী হিসাবে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ডঃ মিহির চৌধুরী কামিল্যা, এম.এ., পি.এইচ.ডি., ডি.লিট., মহাশয়ের নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন বলে মনে করি। তিনি আমার সাহিত্য কৃতি এবং রাঢ় সংস্কৃতির অপরিজ্ঞাত বস্তু উদঘাটনের জন্য ভূয়সী প্রশংসা করে আমাকে চির-কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন।

আমার প্রাক্তন সহকর্মী শ্রীযুক্ত গোপাল চন্দ্র দাস এই গ্রন্থ রচনায় বিভিন্ন বিষয়ে সাহায্য করেছেন। তাঁর সাহায্য ছাড়া এই কাজ সম্ভব হত না। তাঁকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

প্রুফ সংশোধনের কাজ বন্ধুবর মদনমোহন পালের সহযোগিতায় সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে। তিনি যথেষ্ট আন্তরিকতার সঙ্গে একাজ করেছেন। তাঁকে জানাই কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ।

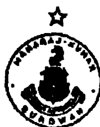
জীবন সায়াহ্নে এই সময়সাপেক্ষ কাজের জন্য আমার পরিবারের সকলেই সংসারের দায়-দায়িত্ব থেকে অব্যহতি দিয়ে আমাকে সফল হতে সাহায্য করেছেন।

শুভাকাঙ্খী শ্রীযুক্ত প্রদীপ কুমার রায় এবং যাঁরা পরোক্ষভাবে এই প্রচেষ্টায় সহযোগিতা করেছেন তাঁদেরও সকলকে জানাই ধন্যবাদ।

সমগ্র গ্রন্থখানি ডি.টি.পি., লেজার প্রিন্ট করে সহযোগিতা করেছে আমার স্নেহভাজন শ্রীমান সুদীপ দাস, চামেলী ডি.টি.পি. সেন্টার। তাকে উত্তম রূপে সহযোগিতা করেছে আমার আর এক স্নেহভাজন শ্রীমান তন্ময় দাস। তাদের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

আমার শক্তি সামান্য, কিন্তু পাঠক বর্গের কাছে যে অনুপ্রেরণা পেয়েছি আশা করি তা থেকে বঞ্চিত হবো না।

নীরদবরণ সরকার



2F Judges Court Road
Alipore
Calcutta 700 027

Mr. N. B. Sarkar
Sahitya Binode
80 Durgadas Tiwari Road
Burdwan.

Dear Mr. Sarkar,

It was a pleasure to read your book "Burdwan Raj Itibritya". A comprehensive history of the erstwhile Burdwan Raj family indeed. Definately an excellent narrative of a micro-history of Bengal through the ages.

My fond regards.

Yours sincerely,
Lalit

Dr. P. C. Mahtab PhD (Lond)

এক নজরে বর্ধমান রাজের কীর্তি

প্রতিষ্ঠাতা	সময়	কীর্তি / অবদান	বর্ধমান
ঘনশ্যাম রায়	১৬৭৪/৭৫	শ্যামসায়র	বর্ধমান
কৃষ্ণরাম রায়	১০৯১ বঙ্গাব্দ	রাধাকান্ত বিগ্রহ	বর্ধমান
	১৬৯১ খ্রীষ্টাব্দ	কৃষ্ণসায়র	বর্ধমান
রাণী ব্রজকিশোরী	১৭০৯খ্রীঃ	রাণীসায়র	বর্ধমান
	১৭২৭খ্রীঃ	ইমলিঘাট	বৃন্দাবনধাম
	১৭৮৪খ্রীঃ	যমুনাতীরে ঘাট২, ও শিব মন্দির	মথুরা
	১৭৪০খ্রীঃ	লালজীর মন্দির	কালনা
	১৭৪৮খ্রীঃ	পবন বিহারী বিগ্রহ,	ব্রজধাম
	ঐ	পবন সরোবর সোপান	ঐ
	১৭৪২খ্রীঃ	মার্কণ্ডেয় পুষ্করিণী সংস্কার ও বাঁধা ঘাট নির্মাণ	জগন্নাথক্ষেত্রপুরী
	১৭৫৫খ্রীঃ	বৈকুণ্ঠনাথ শিব প্রতিষ্ঠা	অম্বিকাকালনা
রাজা কীর্তিচাঁদ	১৭৩৭খ্রীঃ(কিছু পূর্বে)	বারদ্বারী তোরণ ও প্রাসাদ	কাঞ্চননগর, বর্ধমান
	১৬৫৭খ্রীঃ	রঘুনাথজীর মন্দির সংস্কার ও চূড়া নির্মাণ	চন্দ্রকোণা, মেদিনীপুর
	১৬৫৭খ্রীঃ	শ্রী শ্রী বৃন্দাবনবিহারী যুগলমূর্তি	বৃন্দাবন ধাম
	১৭৩০খ্রীঃ-এর পূর্বে	দেবী যুগাদ্দা ও	ক্ষীরগ্রাম, বর্ধমান
	১৭৩৩খ্রীঃ	ক্ষীরখণ্ডক ভৈরব	
	ঐ	হরগৌরী	দাঁইহাটের নিকট বিকিহাট গ্রাম, বর্ধমান
	ঐ	সুবৃহৎ পুষ্করিণী	দীর্ঘনগর, বর্ধমান
	১৭৩৩খ্রীঃ	গোপেশ্বর শিবমন্দির, পুষ্করিণী	বৈকুণ্ঠপুর, বর্ধমান
	ঐ	যাগেশ্বরডি	কাটোয়ার নিকট, বর্ধমান

প্রতিষ্ঠাতা	সময়	কীর্তি / অবদান	বর্ধমান
	সপ্তদশ শতক	মহন্ত অস্থল	রাজগঞ্জ, বর্ধমান
	অষ্টাদশ শতকের প্রথম দিকে	সর্বমঙ্গলা মন্দির	বর্ধমান
	১৭০৯খ্রীঃ	শিব	জৌগ্রাম, বর্ধমান
	১৭১০খ্রীঃ	শিব	কামার পাড়া,বর্ধমান
	১৭২১খ্রীঃ	রাধামাধব	খাঁদড়া,বর্ধমান
	১৭২৬খ্রীঃ	হরগৌরী	জাবুই, বর্ধমান
	১৭২৬খ্রীঃ	লক্ষী জনার্দন	রামগোপালপুর, বর্ধমান
	১৭৩৮খ্রীঃ	বিষ্ণুমন্দির	বড়বৈনান, বর্ধমান
	১৭৪০খ্রীঃ	সীতারাম	উখড়া, বর্ধমান
	ঐ	জগন্নাথবাটার জগন্নাথ	অম্বিকাকালনা, বর্ধমান
রাজরাজেশ্বরীদেবী	—	রাজরাজেশ্বর শিব	খোসবাগান
ঐ	১৭৪৭খ্রীঃ	গোপীনাথ	ভরতপুর
রাজা চিত্র সেন-এর ১মা	১৭৪১খ্রীঃ	সিদ্ধেশ্বরী মন্দিব	কালনা
মহিষী ছঙ্গকুমারী	১৭৪০খ্রীঃ থেকে	চন্দ্রেশ্বব	বর্ধমান
২য় মহিষী ইন্দ্রকুমারী	১৭৪৪খ্রীঃ মধ্যে	ইন্দ্রেশ্বর	বর্ধমান
রাণী ছঙ্গকুমারী	১৬৭৬ শক	রাজরাজেশ্বব শিব	কালনা
ঐ	ঐ	জগন্নাথ	কালনা
বাণী ইন্দ্রকুমারী	১৬৭৬শক	ভুবনেশ্বর	কালনা
রাণী লক্ষীকুমারী	১৭৫২খ্রীঃ	কৃষ্ণচন্দ্র জিউ	কালনা
ঐ	১৭৬৪খ্রীঃ	শিবমন্দির	সিদ্ধেশ্বরীবাটী,কালনা
রাণী রূপকুমারী	১৭৬৫ খ্রীঃ	রূপেশ্বর শিব	কালনা
রাণী বিষণকুমারী	১৭৬৪ খ্রীঃ	মহাবিষ্ণু	কালনা
ঐ	ঐ	বারদ্বারী ঘাট, চাঁদনী	দাঁইহাট গঙ্গাতীরে
রাজা তিলক চাঁদ	১৭৬৪ খ্রীঃ	কিশোর কিশোরী শিব	দাঁইহাট
	ঐ	বর্ধমানেশ্বর শিব	দাঁইহাট
	ঐ	বাজরাজেশ্বর শিব	দাঁইহাট
	ঐ	কর্পূরেশ্বর শিব	দাঁইহাট
	ঐ	ত্রিলোকেশ্বর শিব	দাঁইহাট
অমাত্য রামদেব নাগ	১৭৪৭	শিব	সিদ্ধেশ্বরীবাটী, কালনা
অনুচরী তুলসীদেবী	১৭৬৬	কাশীনাথ মন্দির	কালনা

প্রতিষ্ঠাতা	সময়	কীর্তি / অবদান	বর্ধমান
কৃষ্ণচন্দ্র বর্মণ	১৭৬৭	গোপালজিউ মন্দির	কালনা
অনুচরী রাধিকা	১৭৬৯	শিব	ঐ
তিলকচাঁদ	—	ত্রিমঠ শ্যামরায়, সংস্কার	ঐ
বিষণকুমারী	১৭৮৪	রামেশ্বর শিব	ঐ
ঐ	১৭৮৮	১০৮ শিব মন্দির	বর্ধমান
মহারাজ তেজচাঁদ	১৭৩০ শকাব্দ	বুধকালী ও নাগেশ্বর	তারাবাগ, বর্ধমান
	ঐ	ভূকালী	কৃষ্ণসায়রের পূর্ব, বর্ধমান
	ঐ	তেজগঞ্জের কালী	তেজগঞ্জ, বর্ধমান
		শ্যামসুন্দর	ছোট দেউরী
	১৮০৯/১৮১০ খ্রীঃ	নবকৈলাশ মন্দির	কালনা
	ঐ	সদাব্রত (অন্নসত্র-২টি)	কালনা
	ঐ	রাজকলেজ	বর্ধমান
	১৮২৩ খ্রীঃ	২৩টি রাজপথ ও পান্থশালা	বর্ধমান
	ঐ	প্রেসিডেন্সী কলেজে দান	কলিকাতা
	ঐ	চতুষ্পাঠী স্থাপন	বর্ধমান
	১৭৫৩ শকাব্দ	শিব মন্দির	আটঘরিয়া, বর্ধমান
	ঐ	শিব মন্দির	কুচুট
	ঐ	শিবমন্দির/পুকুর	সাতগাছিয়া
	ঐ	শ্রীকৃষ্ণরাধিকা মন্দির	শ্রীক্ষেত্রধাম, পুরী
	ঐ	তেজেশ্বর শিব	ঐ
	ঐ	শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ	ঐ
	১৮০১ খ্রীঃ	শিবমন্দির	সুন্দর বাগ (দঃ)
	ঐ	শিবমন্দির	ঐ (উঃ)
	ঐ	শিবমন্দির	আনন্দবাগ (পূঃ)
		দেবদেবী সেবায় নিষ্কর ভূসম্পত্তি প্রদান ঃ—	
	ঐ	অট্টহাস (ফুল্লরা বিশ্বেশ ভৈরব)	লাভপুর, বীরভূম
	ঐ	মঙ্গলচণ্ডী ও কপিলাশ্বর ভৈরব	কোগ্রাম, বর্ধমান

প্রতিষ্ঠাতা	সময়	কীর্তি / অবদান	বর্ধমান
	ঐ	বহুলা ও ভীরুক ভৈরব	কেতুগ্রাম
	ঐ	দেবগর্ভা ও রুরুভৈরব	কাঞ্চিদেশ, বীরভূম
	১৮০০ খ্রীঃ	দামোদর নদের বাঁধ নির্মাণ	বর্ধমান
	১৮১২ খ্রীঃ	কমলসায়র (মনিষী কমলকুমারীর নামে)	বর্ধমান
	১৮২১ খ্রীঃ	বাঁকানদীর ওপর রাধা-গঞ্জী সেতু	বর্ধমান
	১৮১০ খ্রীঃ	রাজপ্রাসাদ	কালনা
	১৮৩২ খ্রীঃ	রঘুনাথ জিউ ও লালজিউ	চন্দ্রকোণা
	ঐ	সদরখণ্ডে গৃহ নির্মাণ	ঐ
	১৮৩২ খ্রীঃ	চন্দ্রেশ্বর শিবের নাম পরিবর্তন করে 'মলেশ্বর' প্রদান	মল্লেশ্বরপুর
	ঐ	অসমাপ্ত লক্ষ্মীনারায়ণ জিউ মন্দিরের বেশীর ভাগ অংশ নির্মাণ	বর্ধমান
	১৮২৭ খ্রীঃ	বর্ধমান থেকে কালনা যাওয়ার পথে ১০টি সুবৃহৎ সরোবর খনন ও তীরে শিব প্রতিষ্ঠা	বর্ধমান
	ঐ	শ্রীশ্রী জগন্নাথ দেবের পাকশালা	পুরী
	১৭৪২ শকাব্দে	শ্রীশ্রী রাধাবল্লভ জিউ,	বর্ধমান
	ঐ	অন্নপূর্ণা ও রাজরাজেশ্বর শিব	সর্বমঙ্গলা মন্দিরের নাটমঞ্চের দক্ষিণে
	১৮১৩ খ্রীঃ	মিত্রেশ্বর	বর্ধমান
	ঐ	রামেশ্বর	ঐ
	ঐ	কমলেশ্বর	ঐ
	১৮০৯ খ্রীঃ	কমলাকান্তকালী	কোটালহাট, বর্ধমান
	ঐ	গোলাপবাগ চিড়িয়া-খানা	বর্ধমান

প্রতিষ্ঠাতা	সময়	কীর্তি / অবদান	বর্ধমান
	১৮৩১ খ্রীঃ	এ্যাঙ্গ্লিকান চার্চ জামিদান	বর্ধমান
মহারাজ প্রতাপচাঁদ	১৮১৯ খ্রীঃ	৮ম আইন প্রবর্তন (Regulation Act VIII of 1819)	
	ঐ	বাজেপ্রতাপপুর	বর্ধমান
	ঐ	প্রতাপেশ্বর শিব	ঐ
মহারাজ মহ্‌তাব্‌চাঁদ	১৭৮২শকাব্দ	পুষ্করিণী খনন ও শিব প্রতিষ্ঠা (জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃ বধূ প্যারী কুমারীর নামে)	শক্তিগড়
	ঐ	বহু দেব মন্দির প্রতিষ্ঠা (প্যারীকুমারীর নামে)	বৃন্দাবন ধাম
	১৮৭০খ্রীঃ	দাতব্য চিকিৎসালয় (ম্যালেরিয়া চিকিৎসার্থ)	হুগলী
	ঐ	অবৈতনিক উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়	বর্ধমান
	ঐ	(হিন্দু) বালিকা বিদ্যালয়	ঐ
	ঐ	উচ্চশিক্ষার জন্য কলেজ ভিত্তি স্থাপন	ঐ
	১৮৩৩খ্রীঃ	শিবমন্দির (কমলকুমারী পরিচারিকা গঙ্গাদাসীর নামে)	কালনা
	১৮৪৬খ্রীঃ	শিব মন্দির (সহচরী দেবীকা দেবীর নামে)	কালনা
	১৮৫০খ্রীঃ	দেবদেউল(প্যারীকুমারীর নামে)	ঐ
	১৮০০শকাব্দ শ্রাবণ মাস	সূর্য মন্দির	দার্জিলিং
	১৮০০ শকাব্দ ভাদ্র	যোগমায়া	ঐ
	১৮০০ শকাব্দ কার্তিক	গৌরীশঙ্কর	ঐ
	১৮০০ শকাব্দ কার্তিক	লক্ষীনারায়ণ জিউ	রাজবাটী,বর্ধমান

প্রতিষ্ঠাতা	সময়	কীর্তি / অবদান	বর্ধমান
		মন্দির (অবশিষ্টাংশ)	
	১৮৩৩খ্রীঃ	সমাজবাড়ী প্রতিষ্ঠা	কালনা
মহারাজ আফ্‌তাব্‌চাঁদ	১৮৮১খ্রীঃ	পানীয় জলের পুষ্করিণী	কাঁথি, মেদিনীপুর
	ঐ	দাতব্য চিকিৎসালয়	দার্জিলিং
	ঐ	রাজপাবলিক লাইব্রেরী	বর্ধমান
	ঐ	বিশুদ্ধ পানীয় জল এর জন্য জলকল	লাকুরডি, বর্ধমান
	ঐ	দাতব্য চিকিৎসালয়ে আইওয়ার্ড	ঐ
	ঐ	রাজকলেজ সম্পন্ন	ঐ
মহারাজাধিরাজ বিজয়চাঁদ	১৮৯৯	ভুবনেশ্বরী দেবী ও নারায়নেশ্বর শিব প্রতিষ্ঠা (নারায়ণকুমারীর নামে)	মিঠাপুকুব,বর্ধমান
	১৯০৪	ইণ্ডিয়ানপিপ্‌লফেমিনট্রাষ্ট	ঐ
	ঐ	পয়প্রণালী ও নিকাসি ব্যবস্থার জন্য মিউনিসি-প্যালিটিকে দান	ঐ
	১৮৯৩	কারিগড়ি বিদ্যালয়	ঐ
	১৯০৪	ষ্টার-অব-ইণ্ডিয়া গেট	ঐ
	১৯০৭	ফ্রেজার হসপিটাল	ঐ
		রোনাল্ডসে মেডিক্যাল স্কুল	ঐ
	১৯১৫	৮ম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন	ঐ
	১৯০৫	বিজয়ানন্দ বিহার	ঐ
	১৩৪০বঙ্গাব্দ	খান্নাজী ঠাকুর বাড়ী	ঐ
	১৩৩৭বঙ্গাব্দ	শক্তিবিবি ঠাকুর বাড়ী	ঐ
		বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ	ঐ
	১৯ শতক	ক্ষীরেশ্বর শিব	ক্ষীরগ্রাম, বর্ধমান

সূচীপত্র



BURDWAN RAJ FAMILY

1657—1954

SANGAM RAI

BANKU BEHARI RAI

ABU RAI (KOTWAL CHAUDHURY)

BABU RAI (KOTWAL CHAUDHURY)

GHANASHYAM RAI

KRISHANA RAM RAI (ZAMINDAR)

JAGAT RAM RAI (ZAMINDAR)

- KIRTI CHAND (ZAMINDAR)
  - CHITRA SEN (RAJA
- MITRA SEN
  - TILAK CHAND (MAHARAJADHIRAJ BAHADUR)
    - TEJ CHAND (MAHARAJADHIRAJ BAHADUR)
      - PRATAP CHAND (MAHARAJ BAHADUR)
      - MAHTAB CHAND (HIS HIGHNESS MAHARAJADHIRAJ BAHADUR
        - AFTAB CHAND (MAHARAJADHIRAJ BAHADUR)
          - BIJAY CHAND (MAHARAJADHIRAJ BAHADUR)
            - UDAY CHAND (MAHARAJADHIRAJ BAHADUR)
              - SADAY CHAND (MAHARAJADHIRAJ KUMAR)
              - MALAY CHAND (MAHARAJ KUMAR)
              - PRONOY CHAND (MAHARAJ KUMAR)
            - ABHAY CHAND (MAHARAJ KUMAR)

DR. P.C. MAHTAB Ph. D (Lond)
Maharaj Kumar 22.03.2004

বর্ধমান রাজইতিবৃত্ত

সঙ্গম রায়

১৬শ শতকের শেষের দিকে পাঞ্জাব প্রদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতা চলছিল। সেই সময়ে বস্ত্রব্যবসায়ী সঙ্গম রায় নামে সম্পদশালী এক ব্যক্তি আত্মীয়-স্বজন সহ সপরিবারে বর্ধমানে আসেন। তাঁর আদি বাসস্থান পঞ্জাবের অন্তর্গত কোটলী মহল্লায়। বর্ধমান থেকে সপরিজন পুরী জগন্নাথ দর্শনে যান। জগন্নাথ দর্শন করে তিনি দেশে না ফিরে পুনরায় বর্ধমানেই আসেন। বর্তমান বর্ধমান শহরের ৮/১০ কিলোমিটার পূর্বে বেলেরা গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। ওই স্থানটি তাঁর কাছে অতি মনোরম বোধ হওয়ায় নামকরণ করেন 'বৈকুণ্ঠপুর'। আজও গ্রামটি বেলেরা বৈকুণ্ঠপুর নামে অভিহিত হয়। এখানেই তিনি ব্যবসায় শুরু করেন। তবে এতদঞ্চলে প্রচুর ধান-চাল উৎপাদন হয় এবং তিনি এখানে ধান-চালের ব্যবসায় অধিক লাভজনক হওয়ায় এই ব্যবসা-ই আরম্ভ করেন। সেই সঙ্গে 'সুদী' কারবার বা মহাজনী কারবারও চলতে থাকে।

সঙ্গম রায়ের কৌলিক পদবী 'কপুর'। তখন সম্রাট আকবর দিল্লীর সিংহাসনে আসীন। তাঁর রাজত্বকালের মধ্যভাগে ভাগীরথীর পশ্চিমাঞ্চল মোগল সাম্রাজ্যের অধীনে আসে। মানসিংহ যখন বাংলার সুবাদার তখন এই অঞ্চলটির উপর মোগল আধিপত্য কায়েম হয়। তৎকালীন বাংলা কৃষি-শিল্পে ছিল সমৃদ্ধশালিনী। বাংলার ফসল, মুর্শিদাবাদের রেশম, ঢাকার মসলিন প্রভৃতি শিল্প সম্ভারের জন্য এতদঞ্চল ছিল বিরাট সম্ভাবনাময় ব্যবসা-বাণিজ্যের স্থান। কাজেই সঙ্গম রায় স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেন।

সম্রাট আকবর শের্ আফগানকে বর্ধমানে জায়গীরদার করে পাঠান। শেষ পর্যন্ত শের আফ্‌গান মোগল আনুগত্য অগ্রাহ্য করে একরকম স্বাধীনভাবেই রাজত্ব করতে থাকেন এবং রাজস্ব দিতেন না। ইতিমধ্যে জাহাঙ্গীর দিল্লীর সিংহাসনে বসেন। তিনি শের আফ্‌গানের ঔদ্ধত্য দমনের জন্য সসৈন্যে কুতুবউদ্দীনকে প্রেরণ করেন। বর্ধমানের স্বাধীনপুর (সাধনপুর) অঞ্চলে উভয়পক্ষের যুদ্ধ হয়।

শের আফ্‌গানের সঙ্গে যখন মোগলদের যুদ্ধ হয় তখন সঙ্গম রায় মোগল সৈন্যদের রসদ সরবরাহ করেন। আনুগত্যের নিদর্শন হিসাবে ১৬১০ খ্রীঃ অব্দে দিল্লীর সম্রাট, সঙ্গম রায়কে 'চারহাজারী কোতোয়াল' ও মুনসেফদারীর স্বীকৃতি দেন। মোগল সম্রাটের প্রতি এই আনুগত্য ও আস্থাভাজনের জন্য সামান্য নগর কোতোয়াল ও রাজস্ব আদায়কারী 'চৌধুরাই'

থেকে অল্পকালের মধ্যে সুবেবাংলার অন্যতম প্রধান জমিদার রূপে 'বর্ধমান রাজ বংশের' প্রতিষ্ঠা হয়। এই সম্বন্ধে *Bengal District Gazetteer J.C.K. Peterson (P.26)*-এর উদ্ধৃতি দেওয়া হল ঃ—

"According to tradition the original founder of the house, was one Sangam Rai, a Khattri Kapur of Kotli in Lahore, who, on his way back from a pilgrimage to Puri, being much taken with the advantages of Baikunthapur, a Village near the town, settled there and devoted himself to commerce and money lending."

বঙ্কুবিহারী রায়

সঙ্গম রায়ের পুত্র বঙ্কুবিহারী রায়, পিতার পর তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। তিনিও নগর কোতোয়াল ও রাজস্ব আদায়কারী 'চৌধুরাই' ছিলেন। তিনি বর্ধমান চাকলার মনসবদারী ও 'রায়-রায়ান' উপাধি পান। তাছাড়া তিনি পৈত্রিক ব্যবসায় পরিচালনা করতেন। তাঁর সম্বন্ধে এ ছাড়া অন্য কিছু জানা যায় না।

আবু রায়

বঙ্কুবিহারী রায়ের পুত্র আবু রায় পিতার পর পৈত্রিক ব্যবসায় অধিষ্ঠিত হন এবং ১৬৫৭ খ্রীঃ অব্দে তিনি 'চৌধুরাই' পদ প্রাপ্ত হন। প্রকৃতপক্ষে আবু রায়ের সময় রাজবংশের সমৃদ্ধি, শ্রীবৃদ্ধি হতে থাকে। সেই জন্য তাঁকে রাজবংশের আদি পুরুষ বলা হয়। তিনি ব্যবসা অপেক্ষা জমিদারী বৃদ্ধির দিকে অধিক মনযোগ দেন। জমিদার হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভের পর তিনি বৈকুণ্ঠপুর থেকে ১৬৫৭ খ্রীঃ অব্দ (বাং সন ১০৬৪) কাঞ্চননগরে আবাসন সরিয়ে নিয়ে আসেন। *Bengal District Gazetteer J.C.K. Peterson (P.27)*-এর উদ্ধৃতি দেওয়া হল ঃ—

"Abu Rai, who was appointed Chaudhuri and Kotwal of Rekhabi Bazar in the town in 1657 under the Faujdar of Chakla Burdwan, is said to have been his grandson, and he is the first member of the house of whom there is any historical record. He owed his appointment to the good service rendered by him in supplying the troops of the Faujdar with provisions at a critical time."

তৎকালীন সময়ে 'বঙ্গভূষণ' গ্রন্থের লেখক রাজকৃষ্ণ রায়, রাজপ্রশস্তিতে বলেছেন— 'বর্ধমান রাজবংশাদি পুরুষ আবু রায়' শীর্ষক কবিতায়—

"প্রতিপদে শশী যথা কলা মাত্র করে
বিশদ বরণ ধরে, ক্রমে তিথিচয় ;
অতিক্রমি পূর্ণিমায় পূর্ণরূপ ধরে
উজ্জ্বল আলোকে ব্যাপ্ত ধরণী-নিলয়।
তেমতি, গো আবুরায়! তোমার দ্বারায়
বর্ধমান রাজবংশ স্থাপিত হইয়া
ভূবন- প্রসিদ্ধ এবে এই বাঙ্গালায়,
পূর্ণরূপে যশ ব্যাপ্ত গগন ছাইয়া।
এ রাজকূলের তুমি আদিম পুরুষ,
তুমিই স্থাপিলা এই রাজ্য সুবিশাল
চিরখ্যাত হলে তব রহিল পৌরুষ।
এ গৌড়ে গৌড়ীয়গণ গা'বে চিরকাল
তব যশ: গাহিলেন যথা লব-কুশ
জনক-তনয়াপতি রামগুণ যার।"

এই সময় মোগল বাদশাহের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি হয় এবং সম্রাট কর্তৃক প্রশংসিত হন তাঁর কার্যকলাপের জন্য। সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকালে একদল মোগল সৈন্য ঢাকা যাওয়ার পথে বর্ধমানে অবস্থানের সময় আবুরায় তাদের খাদ্য-রসদ সরবরাহ করেন। মোগল সম্রাটের পুরস্কার হিসাবে বর্ধমান চাকলার অন্তর্গত 'রেকাবী বাজার' ও 'মোগলটুলী'র কোতোয়াল ও চৌধুরী নিযুক্ত হন। এই পুরস্কারের সুপারিশ করেন বাংলার সুবেদার সুলতান সুজা। তখন রেকাবীবাজার ছিল বর্তমানে নূতনগঞ্জ অঞ্চল। তখন নূতনগঞ্জে বড় বড় ব্যবসায়ী ও আড়ৎদারদের বাস ছিল এবং রেকাবী বাজারই ছিল সেই সময়কার প্রধান ক্রয়-বিক্রয় কেন্দ্র, তার পাশেই ছিল 'মোগল টুলি' সম্ভবত পুরাতন চক এলাকা। এখানেই মোগলরা বসবাস করত। আজও নূতনগঞ্জ অঞ্চল বড় ব্যবসায় কেন্দ্র। ওই অঞ্চলে পানীয় জল সরবরাহ করা হতো বর্তমানের 'দিঘীরপুল' অঞ্চলের বিশাল দিঘী থেকে। এই দিঘী এখন প্রায় মজে যাচ্ছে। এই অঞ্চলের মোগল স্থাপত্যের বহু নিদর্শন আজও দেখা যায়। সে যুগের এখনও যে বড় বড় অট্টালিকা বিদ্যমান সেগুলির কড়ি বরগা নাই শুধু খিলানের উপর এবং বাড়ীর প্রতি কক্ষের ছাদ বিভিন্ন খিলানের: কোনটির ছাদ দো-চালা আকারে কোনটি চারচালা আবার কোনটি বা অর্ধচন্দ্রাকার এইসব বাড়ীগুলির দেওয়াল ৪০ ইঞ্চি থেকে ৫০ ইঞ্চি চওড়া। ১৬৫৭ খ্রীঃ অব্দে অর্থাৎ ১০৬৪ বাংলা সনে সম্রাট শাহজাহানের ফরমান মারফৎ

আবু রায় শরিফাবাদের ফৌজদারের অধীনে বাৎসরিক ৫৩২ টাকা (সিক্কা)র বিনিময়ে এই রেকাবী বাজার, মোগল টুলী ও ইব্রাহিমপুরের রাজস্ব আদায়ের চৌধুরাই ও নগরকোতোয়ালের পদ প্রাপ্ত হন পূর্বেই উল্লেখ করেছি। ১৬৫৭ খ্রীঃ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসের আগেই তিনি এই পদের দায়িত্ব পান।

আবুরায়ই কাঞ্চননগরের পশ্চিমে বসৎবাটী স্থাপন করেন। তখন ঐ অঞ্চলটি ছিল *Upland Plateau* অর্থাৎ উচ্চমালভূমি ও দামোদরের তীরবর্তী অঞ্চল।

আবুরায় বড় জমিদার হিসাবেই খ্যাত ছিলেন না। তিনি সারস্বত মনস্ক ছিলেন। শ্রীপাট বাঘনাপাড়ায় কবিরাজ রামচন্দ্র গোস্বামী প্রতিষ্ঠিত প্রখ্যাত বৈষ্ণব সারস্বতকেন্দ্রেও ছিল তাঁর পোষকতা। রামচন্দ্র গোস্বামীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা পদকর্তা শচীনন্দনকে রাধানগর গ্রামখানি দান করেন। তখন এই রাধানগর গ্রাম বর্ধমানের অন্তর্গত ছিল। এই তথ্য জানতে পারা যায় কানন বিহারী গোস্বামী মহাশয়ের লিখিত ''বাঘনাপাড়ার মন্দির বিগ্রহ ও সাহিত্য'' নিবন্ধে।

বাবুরায়

আবুরায়ের পুত্র বাবু রায়। আবু রায় মোগল দরবারে যে মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বাবু রায় তা আরও বৃদ্ধি করেন। বাবু রায় তাঁদের ব্যবসায় সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেন এবং জমিদারী কেনার দিকে মন দেন। বর্ধমান রাজবংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলতে আবু রায়কেই বোঝায়। তিনি তাঁদের বংশকে মোগল দরবারে উপস্থাপিত করেন। তবুও এ৲ ঠিক যে বাবু রায় বর্ধমান পরগণা এবং অপর তিনটি জমিদারি কিনে বর্ধমান রাজবংশের ভিত্তি দৃঢ় করেন। বাবু রায়ের সময় বর্ধমান পরগণার আয় ছিল ১,০০,২৬২ টাকা।

ঘনশ্যাম রায়

বাবু রায়ের পুত্র ঘনশ্যাম রায় রাজস্ব আদায়কারী জমিদারের পদ লাভ করেন। তিনি তাঁর পিতার মহলগুলির চৌধুরাই পদে বহাল ছিলেন। তিনি শহরবাসীর কল্যাণকর কাজে হাত দেন। তাঁর উল্ল্যেখযোগ্য জনহিতকর কাজ হল শহরের মধ্যস্থলে একটি সুবৃহৎ জলাশয় খনন করা। সেই সময় শহরে পানীয় জলের কোন সুযোগ সুবিধা ছিল না। এই সুবৃহৎ জলাশয়টি সাধারণ মানুষের বিশেষ উপকারে আসে। পুষ্করিণীটি খনন করায় একদিকে যেমন পানীয় জল সরবরাহের সুবিধা হয় তেমনি পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে চাষের কাজেরও অনেক সুবিধা হয়। এই সায়রটি স্বনামে পরিচিত করার জন্য নাম দেন 'শ্যামসায়র'। ঐ সায়রের পাবে একটি প্রস্তর ফলকের লেখা থেকে জানা যায়– ঐ জলাশয়ের খনন কাজ সম্পন্ন হয়েছিল ১৬৭৪-৭৫ খৃষ্টাব্দে। বর্তমানে ঐ ফলকটি অবলুপ্ত। তিনি অল্প বয়সে কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোক গমন করেন ১৬৭৫ খ্রীঃ অব্দে, বাংলা সন ১০৮১ সালে।

কৃষ্ণরাম রায়

(১৬৭৫ - ১৬৯৬)

ঘনশ্যাম রায়ের পরলোক প্রাপ্তির পর ১৬৭৫ খ্রীঃ অব্দেই কৃষ্ণরাম রায় জমিদারি পান। ইনিও পিতার মহলগুলির চৌধুরাই পদে বহাল হন। তখন রাজস্ব আদায়ের দায় দায়িত্ব জমিদারদের উপরই ছিল। সেই সময় কৃষ্ণরাম রায়ই ছিলেন সুবে বাংলার সবচেয়ে বড় জমিদার। তাঁর অধীনে ৫০টি পরগণার রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব ছিল। এই সময় সারা ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থা খুব টলায়মান। সম্রাট ঔরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধবিগ্রহ নিয়ে ব্যস্ত। তখন তাঁর রাজত্বের শেষ দিক। মারাঠা শক্তি প্রবল। তিনি রাজধানী থেকে দূরে থাকায় সুবাগুলির কাজকর্ম দেখাশুনা করতে পারছেন না। বাংলার সুবেদার শায়েস্তা খাঁ ১৬৮৮ খ্রীঃ অব্দে বিদায় গ্রহণ করেছেন। তাঁর পরিবর্তে বাংলার মসনদে বসেছেন ইব্রাহিম খাঁ(১৬৮৯ খ্রীঃ অঃ)। *Bengal District Gazetteer J C.K. Peterson (P.27)*-এর উদ্ধৃতি দেওয়া হল ঃ—

"Upon the death of Ghana Shyam Rai, his son Krishna Ram Rai succeeded to the zamindari, and among other new estates acquired the pargana of Senpahari In 1689, he was honoured with a farman from the Emperor Aurangzeb in the 38th year of his reign confirming his title as Zamindar and Chaudhuri of pargana Burdwan "

তিনি অতি বৃদ্ধ হওয়ায় শাসনকার্যে শৃঙ্খলা আনতে পারেন নাই। রাজস্ব আদায়কারী জমিদারগণ প্রায় স্বাধীনভাবে জমিদারি চালাতেন। তখন কোন আঞ্চলিক ফৌজদার ছিলনা। যশহর থেকে বর্ধমান পশ্চিমাঞ্চল পর্যন্ত একজন মাত্র ফৌজদার ছিলেন। এদিকে সুবেদার যেমন দুর্বল, অপদার্থ, অন্যদিকে ফৌজদারও তদ্রূপ। সেই সুযোগে কৃষ্ণরাম রায় পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্য রাখার অনুমতি লাভ করেন। আগেই তিনি সেনপাহাড়ী পরগণা অধিকার করেছিলেন ১৬৮৯ খ্রীঃ অব্দের পূর্বে সম্ভবত সুবেদার শায়েস্তা খাঁর বিদায় গ্রহণের পরেই। এবার তিনি ভুরশুট, মনোহরশাহী, চন্দ্রকোণা ও বলাগড়ের জমিদারী ক্ষমতার জোরে অধিকার করেন। এছাড়া তিনি সুবেদার ও ফৌজদারের অনুমতিতে ছোট ছোট জমিদারগণের কয়েকটি পরগণা অধিকার করেন। তারপর তিনি ফরমান লাভের জন্য সম্রাট ঔরঙ্গজেবকে আবেদন করেন। বর্ধমান জমিদারির রাজস্ব বেশী আদায় হতো বিবেচনা করেই ঔরঙ্গজেব তাঁকে ১১০৫ হিজরী (১৬৯৪ খ্রীঃ অব্দে) সনদ দেন।

মোহর

(আবল জাফর মহাম্মদ মহী অদ্দিন আলমগীর বাদসাহ গাজী)

অতি শুভক্ষণে এই মহামান্য প্রথম ফরমানে প্রচারিত হইল যে — বঙ্গদেশের সুবার এলাকাধীন, পরগণে বৰ্দ্ধমান ওগয়রহার জমিদারি ও চৌধুরাই বাবুর পৌত্র কিষণরামকে প্রদান করিলাম। কৃষিকার্য্যের উৎকর্ষতা সাধন, প্রজাগণের সহিত সদ্ভাব স্থাপন, কোন প্রকার নূতন কর গ্রহণ না করা এবং নিকটবর্তী স্থান সমূহে কোন প্রকার অত্যাচার না হয়, তৎপ্রতি বিশেষরূপে দৃষ্টি রাখাই তাহার কর্তব্য। সরকারের প্রাপ্য দুই লক্ষ টাকা নজরানা, ধাৰ্য্য কিস্তি অনুসারে উল্লিখিত সুবার ধনাগারে প্রদান করে। বৰ্ত্তমান ও ভাবী হাকিম, কারকুন ও মোৎসদ্দিদিগের কৰ্ত্তব্য যে, ইহাকেই পরগণা হায়ের জমিদার ও চৌধুরী বলিয়া মান্য করেন এবং ইহার জন্য প্রতি বৎসর নূতন সনদ দাখিল করিতে না বলেন।

২৪ রবিয়ল আখের, ৩৮ জুলুসে লিখিত হইল। (ইং ১৬৯৪ খৃঃ।)

তপসীল মহল।

সরকার সরিফাবাদ	সেনপাহাড়ি ওগয়রাহা—
এলাকা পরগণে বৰ্দ্ধমান	মতালক সরকার মন্দারণ
ওগয়রহা—	সেনপাহাড়ি।
বাঘা।	মানকুণ্ডি।
সাহাবাদ !	আমিরাবাদ।
সুজাপুর।	সেরগড় ও সলিমপুর
রেকাবিবাজার।	মায় সেরকেন্দা
বাজার এব্রাহিমপুর	আমিরপুর
আজমতসাহি।	গোয়ালাভূম
সুধারপুর	সাহপুর মহাল
হাবিলি ওগয়রহা—	আজমপুর।
সরকার সলিমাবাদ—	হোসেন ফতাহ।
চৌমহা	মানিয়াকুণ্ডি।
হেয়াতপুর।	সুধানগরী।
সাহাপুর	
মাজমপুর	জাঁহাবাদ।

কিসমত হাবেলি–
লক্ষ্মীপুর।
মনসুর
বাগদায়না।

প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণরাম রায় ছিলেন আগ্রাসী মনোভাবাপন্ন। তিনি সনদ লাভের পূর্বেই বাংলার ১০৯০ সালের চৈত্রমাসে চৈতন্য সিংহের অধিকৃত 'নিজবলিয়া' পরগণা আক্রমণ করে নিজ অধিকারভুক্ত করেন। তারপর তিনি রামকৃষ্ণ রায়, কবিচন্দ্র এর জমিদারী 'রসপুর' আক্রমণ করেন। রসপুর, 'নিজবলিয়া' হতে ১৩ কিমি. দূরে অবস্থিত ছিল। রসপুর অধিকার করে তিনি রামকৃষ্ণ রায়ের বাড়ী আক্রমণ করে 'রাধাকান্ত' বিগ্রহ বর্ধমানে এনে প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রসঙ্গে বলি, উক্ত রায় বংশের ইতিহাসে উল্লেখ আছে, রামকৃষ্ণ রায়ের পিতামহ, কাশ্যপ গোত্রীয় যশচন্দ্র রায় পূর্বে বর্ধমান শহরের বাসিন্দা ছিলেন। সপ্তদশ শতকের প্রথমার্ধে তিনি রসপুরে এসে বসতি স্থাপন করেন।

রামকৃষ্ণ রায় বিগ্রহের শোকে পরলোক গমন করেন। তাঁর পুত্ররা কৃষ্ণরাম রায়ের নিকট ঐ বিগ্রহটি ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য প্রার্থনা জানান। কিন্তু কৃষ্ণরাম রায় ঐ রাধাকান্তের মূর্তি ফেরৎ না দিয়ে নতুন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার আদেশ দেন এবং এই দেব সেবার নিমিত্ত রামকৃষ্ণ রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্রকে বাংলা ১০৯১ সালের ১১ই বৈশাখ ৮৫ বিঘা নিষ্কর জমি দানপত্র করে লিখে দেন। দানপত্রটি এইরূপ —

দেব সেবার নিমিত্ত রামকৃষ্ণ রায় কবিচন্দ্র এর জ্যেষ্ঠ পুত্র মুকুন্দপ্রসাদ রায়কে যে ৮৫ বিঘা জমি দিয়েছিলেন তার পত্র ঃ—

"শ্রীশ্রী হরিঃ

স্বাক্ষর — শ্রীযুক্ত কৃষ্ণরাম রায়

ইয়াদকীর্দ্দ শ্রী জগন্নাথ রায় সদুদার চরিতেষু পত্রমিদং সন ১০৯১ এক হাজার একানব্বই সালাব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চা আগে তোমারদিগের ইষ্টদেবতা শ্রীশ্রী ঁ(রাধাকান্ত বিগ্রহ) ছিলেন তাহা আমি সেবা করিতে লইলাম তুমি পুনরায় ঁপ্রকাশ করিয়া শেবা করহ সেবার কারণ মৌজে রষপুর ওগয়রহ মামুলে পরগণে বালিডাঙ্গা মৌজে মজকুর হায়তে খারিজ্জমা বঞ্জর জমি ৮৫ বিঘা দেবোত্তর করিয়া দিলাম গ্রাম ২ জায়মাফিক চিহ্নিত করিয়া জোত আবাদ করিয়া পুত্র পৌত্রাদিক্রমে শ্রীশ্রী ঁসেবা করহ রাজ পরমাইষ ও শীক পরমাইষ ও রাজস্ব সহিত দায় নাস্তা এবং রষপুর গ্রামে তোমাদিগকে খানাবাটী আছে যুদামত জার জে ভোগ আছে সেই মাফিক এখন আমল করিয়া ভোগ করহ নওবদীয়ত না হবেক সভে আপন ভোগ

প্রমাণ আমল করহ এতদর্থে পত্র লিখিয়া দিলাম ইতি ১১ই বৈশাখ

জায় রষপুর	২০
হানুধাড়া	১০
তালসহর	১০
দুর্ব্বাচট	৩২
কলিকাতা	১০
কুমারিয়া	৩
	৮৫ পঁচাষি''

এছাড়া কৃষ্ণরাম রায়, মুকুন্দপ্রসাদ রায়কে পৃথকভাবে ১৪১ বিঘা ভূমি দান করেন, বাংলা সন ১১০০ সাল (১৬৯৩ খ্রীঃ অঃ) ১১ই আষাঢ় তারিখে। এই দানপত্রে উল্লেখ আছে— ''এ জমী তোমাকেই দিলাম ভাই ভায়াদ জ্ঞাতি গোত্র কাহার সহিত এলাকা নাই।'' (রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্রের শিবায়ন ভূমিকা পৃঃ ।।/.)

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ঐ দলিলে জগৎরাম রায়েরও স্বাক্ষর ছিল। 'রসপুর রায় বংশ' গ্রন্থে উল্লেখ আছে (পৃঃ ১৮) ''বর্তমান হাওড়া জেলাস্থ রসপুর, কলিকাতা, কুমারিয়া ও হানুধাড়া গ্রাম বর্ধমান রাজ পরিবারের অধীনস্থ ছিল, তাহা জগৎরামের সম্পাদিত দলিলেও আছে।''

যে প্রসঙ্গের কথা বলছিলাম, কৃষ্ণরাম রায় নিজের জমিদারীকে বড় করার জন্য ছোট ছোট জমিদারগণের জমিদারী তিনি বলপূর্বক অধিকার করেন। তবে কৃষ্ণরাম রায়ের আগ্রাসন নীতি সম্বন্ধে সমকালীন ইতিহাসে উল্লেখ দেখা যায় না। অবশ্য তথ্যগুলি জানা যায়, ''ক্ষিতিশ বংশাবলি চরিতম্'' নামক গ্রন্থে। উক্ত গ্রন্থে লিখিত আছে—''. . . . বৰ্দ্ধমাননৃপবিষয়ান্নত বৰ্ত্তিচেতুয়েতি প্রসিদ্ধ দেশাধিপত্য শোভাসিংহ নৃপস্য পুরং / বর্ধমান নৃপেণ কৃষ্ণরাম রায়েন লুণ্ঠিতং'' অর্থাৎ বর্ধমান রাজ কৃষ্ণরাম রায় কর্তৃক শোভা সিংহের চেতুয়া পরগণা লুণ্ঠিত হয়। আবার দেওয়ান নবকৃষ্ণ মুন্সীর জীবনীতে আছে—''কৃষ্ণরাম রায় বলপূর্বক পূর্বতন জমিদারের নিকট হইতে সেলিমাবাদ পরগণা অধিকার করেন।'' মূলতঃ কৃষ্ণরাম রায়ের লক্ষ্য ছিল তাঁর জমিদারীর বিস্তার লাভ করা। তিনি সম্রাটের সনদ বলে নিজ অধিকৃত অঞ্চল নিয়ে এক বিশাল অঞ্চলের জমিদার রূপে গণ্য হয়েছিলেন। তাঁর সময়ে বর্ধমানে একবার দুর্ভিক্ষ হয়েছিল। তিনি প্রজাদের দুরবস্থা অনুধাবন করে ১৬৯১ খ্রীষ্টাব্দে একটি বিশাল দীর্ঘিকা খনন করাতে মনস্থ করেন এবং এই কাজে যে সব দুস্থ ব্যক্তিরা যোগ দিয়েছিল তাদের তিনি প্রত্যেককে প্রতি ঝুড়ি মাটি কাটার জন্য ১টি করে কড়ি মজুরি দিয়েছিলেন। 'ধর্মপুরাণ' কাব্যে কবি যাদবরাম নাথ তাঁর প্রশস্তি গেয়েছেন—

"শুন হে ভকত ভাই কর অবধান
যখন সমাপ্ত এই শ্রীধর্মপুরাণ।।
খেত্রী বংশেতে জন্ম নাম কৃষ্ণরাম
প্রভাতে উঠিয়া মুখে স্বরে যার নাম।
কৃষ্ণরামের নামে পাপ তাপ বিমোচনে
চিরকাল রাজুতি করেন বর্ধমানে।
মরিল বলরাম রায় অরাজক পুরী
সেইকালে কৃষ্ণরাম নিল বসুন্ধরী।।"

ঐ বিশাল সায়রটির নাম দিয়েছিলেন 'কৃষ্ণসায়র'।

কৃষ্ণরাম রায়ের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও বিদ্রোহ —

কৃষ্ণরাম রায় প্রজা হিতৈষী বড় জমিদার হলেও তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও বিদ্রোহের চক্রান্ত চলছিল। তিনি যে সব ছোট ছোট জমিদারদের জমিদারী বলপূর্বক অধিকার করেছিলেন সেইসব জমিদারগণ ছিলেন এর মূল। ষড়যন্ত্রের সঙ্গে তারকেশ্বরের মহন্তরাও ছিলেন। ভারামল্লের পরবর্তী মহন্তরা নিজদের মধ্যে মতান্তর হওয়ায় তাঁরা বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে যান। তার মধ্যে একটি দল বর্ধমানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। অপর দল তারকেশ্বরেই অবস্থান করেন। কৃষ্ণরাম রায় আশ্রিত মহন্ত বা সন্ন্যাসীদের রক্ষণাবেক্ষণ ও সহায়তা করায় তারকেশ্বরের সন্ন্যাসীরা বিক্ষুব্ধ হয়ে পড়েন। বিক্ষুব্ধ হওয়ার আরও কারণ হলো কৃষ্ণরাম রায় আশ্রিত মহান্তদের পক্ষ অবলম্বন করে তারকেশ্বরের মহান্তদের বিরুদ্ধে সম্রাটকে অবহিত করেন। এই তথ্যটি উল্লিখিত আছে "তারকেশ্বরের শিবতত্ত্ব' পুস্তকে। এখান থেকে আরও জানতে পারা যায়, তারকেশ্বরের মহান্তরা বর্ধমান জমিদারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। উদ্ধৃত ছত্র কয়টি থেকে তা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

"বিষ্ণুপুর রাজ সহ সখ্যতা স্থাপন।
শ্রীগুমন্ সিংহ আর ভবানী চরণ।।
শোভা সিংহ নামে এক বৰ্দ্দা জমিদার।
ইত্যাদি সহিত করে সখ্যতা আচার।।"

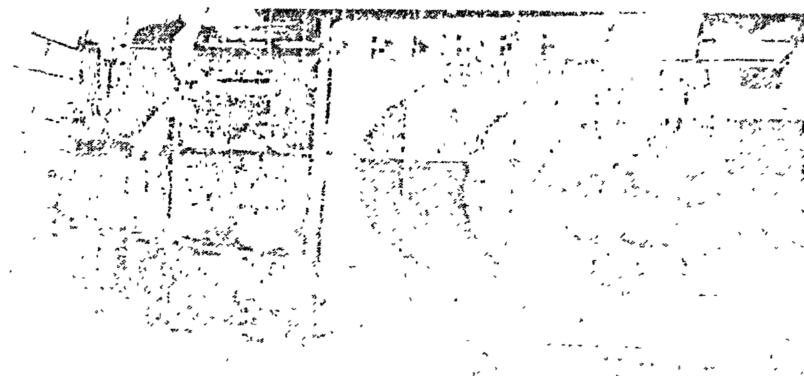
এখানে শ্রীগুমন সিংহ ও ভবানীচরণের পরিচয় পাওয়া যায় না। তবে মনে হয় তাঁরা কোন ছোট তালুকদার হতে পারেন। শোভা সিংহ বিশেষ পরিচিত, তিনি ছিলেন চেতুয়া ও বরদার জমিদার।

বিদ্রোহ ঘোষণা —

বিদ্রোহ ঘোষণা ব্যাপারে একাধিক মতবাদ আছে। তবে বিদ্রোহ ঘোষণার সময়কাল সম্বন্ধে সকলেই একমত। ১৬৯৫ খ্রীঃ অব্দের মাঝামাঝি সময়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন, বিদ্রোহীরা ছিলেন বিষ্ণুপুর রাজা গোপাল সিংহ, চন্দ্রকোণার তালুকদার রঘুনাথ সিংহ, বর্ধমান চাকলার অন্তর্গত চেতুয়া ও বরদার জমিদার শোভা সিংহ ও উড়িষ্যার পাঠান সর্দার রহিম খাঁ একত্রিত হয়ে সসৈন্যে বর্ধমান অভিমুখে যাত্রা করেন। খবব পাওয়া মাত্র কৃষ্ণরাম অল্প কিছু সংখ্যক সৈন্য নিয়ে বাধা দিতে অগ্রসর হন। কয়েকটি ছোট ধরণের সংঘর্ষের পর চন্দ্রকোণার যুদ্ধে কৃষ্ণরাম নিহত হন। এই তথ্য পাওয়া যায় *Calcutta Review-1910, P-123* ও *History of Aurangzib-Vol.5, P-285---by Sir Jadu Nath Sarkar*. আবার আচার্য যদুনাথ সরকার মহাশয়ই তাঁর History of Bengal-Vol.11, P-393 তে বলেছেন—বিদ্রোহীগণ প্রথমে বর্ধমান আক্রমণ করেন নাই। তাঁরা চন্দ্রকোণা,চেতুয়া, বরদা অঞ্চলে সংগঠিত হওয়ার পর ১৬৯৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে অর্থাৎ জুলাই-আগষ্ট মাসে বিদ্রোহী হয়ে বর্ধমানের দক্ষিণ অঞ্চলে লুটতরাজ ও অত্যাচার শুরু করেন। তখন বর্ষাকাল। কাজেই কৃষ্ণরাম বর্ষা শেষে অল্পসংখ্যক সৈন্য নিয়ে বাধা দিতে অগ্রসর হন এবং বিদ্রোহীগণের হস্তে পরাজিত ও নিহত হন। ''ক্ষিতীশ বংশাবলি চরিতম্''-এ বলা হয়েছে ঃ শোভা সিংহ বর্ধমানবাসীগণের অজ্ঞাতসারে বনপথে বর্ধমান শহরের শেষের দিকে দামোদর নদ পার হয়ে বর্ধমান শহরে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং কোন প্রকার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার আগেই কৃষ্ণরাম শত্রু হস্তে নিহত হন। আবার গ্রন্থকার 'গোলাম-হোসেন-সলিম' উল্লেখ করেছেন, ''বর্ধমান শহর হতে দূরে শত্রু সৈন্যকে বাধা প্রদানকালে কৃষ্ণরাম নিহত হন।'' অনেকের ধারণা, গড়মান্দারণে প্রথম যুদ্ধ হয়। ক্রমশঃ চন্দ্রকোণার দিকে অগ্রসর হতে থাকেন এবং সেখানে তুমুল যুদ্ধ হয়, সেখানেই তিনি নিহত হন। নিহত হওয়ার তারিখ সম্বন্ধে সকলেরই এক মত। কৃষ্ণরাম রায় নিহত হয়েছিলেন বাংলা ১১০৩ সাল, পৌষ মাসে অমাবস্যা তিথিতে, ইংরাজী ১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে।

কৃষ্ণরাম রায়ের নিধনের পর বর্ধমানের অবস্থা ও বিদ্রোহীদের তাণ্ডব / শোভা সিংহের মৃত্যু

কৃষ্ণরাম রায়ের নিহত হওয়ার সংবাদে পুত্র জগৎরাম রায় স্ত্রীলোকের ছদ্মবেশে শহর ছেড়ে নদীয়ার রাজা রামকৃষ্ণের আশ্রয় লাভের জন্য মাটিয়ারীতে গিয়ে পৌঁছান এবং সেখান থেকে তিনি জাহাঙ্গীরনগর (বর্তমান নাম ঢাকা) উপস্থিত হন। সম্ভবতঃ সঙ্গে স্ত্রী ব্রজকিশোরী







শের আফগান সমাধি

ও দুই পুত্র কীর্তিচাঁদ ও মিত্র সেন ও পরিচারিকাসহ থাকতে পারেন। বিদ্রোহীদের বর্ধমান শহরে প্রবেশের সময় তাঁরা ছিলেন না। সেই সময় বাংলার সুবেদার ইব্রাহিম খাঁ ঢাকায় থাকতেন। জগৎরাম তাঁকে শোভা সিংহের বিদ্রোহের আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা জানান। বার্ধক্য-জনিত ইব্রাহিম খাঁর এমনিতেই রাজকার্যে শৈথিল্য ছিল, কাজেই এই বিদ্রোহের ঘটনাটিকে বিশেষ কোন গুরুত্ব দেন নাই। এদিকে শোভা সিংহের নেতৃত্বে বিদ্রোহীগণ, মেদিনীপুর, হুগলী ও বর্ধমানের বিভিন্ন অঞ্চল সাত দিন ধরে লুণ্ঠন করে বর্ধমান শহরে প্রবেশ করেন এবং কৃষ্ণরাম রায়ের পরিবারের ২৫ জনকে হত্যা করেন। বিদ্রোহীরা অন্দরমহলে প্রবেশ করার পূর্বেই কৃষ্ণরাম রায়ের ৬ জন স্ত্রী সহ ১৩ জন অন্তঃপুর নারী জহরব্রত অবলম্বন করে বিষ পানে আত্মাহুতি দেন। জিতু দেবী, মুলুক দেবী, লাজো দেবী, পাতো দেবী, লছমী দেবী ও কৃষ্ণা দেবী এই ৬ (ছয়) জন ছিলেন কৃষ্ণরাম রায়ের স্ত্রী এবং বাকী ৭ জন কুন্দ দেবী, কোতা দেবী, চিমো দেবী, লছমী দেবী ২য়, আনন্দ দেবী, কিশোরী দেবী ও কুঞ্জ দেবীরা ছিলেন পুর নারী। ৭ জনের মধ্যে ৩ জন বিধবা ছিলেন। তাঁরা সকলেই শুক্লা সপ্তমী তিথিতে আত্মঘাতী হয়েছিলেন।

বর্ধমান অধিকার ও কোষাগার লুঠ করে ক্ষমতাদম্ভী শোভা সিংহ সপ্তগ্রাম-হুগলী, চুঁচুড়া, চন্দন নগর অঞ্চলের দিকে অগ্রসর হন। এই সময় নুরউল্লা খাঁ যশোহর, হুগলী, বর্ধমান, মেদিনীপুর ও হিজলীর ফৌজদার ছিলেন। তিনি হুগলীতে শোভা সিংহকে বাধা দেন কিন্তু শোভা সিংহের কাছে পর্যুদস্ত হয়ে ১৬৯৬ খ্রীঃ অব্দে ২২ শে জুন প্রাণভয়ে রাতের অন্ধকারে হুগলী দুর্গ ছেড়ে পালিয়ে যান। চুঁচুড়া ও চন্দননগর আক্রমণকালে ওলন্দাজদের সাহায্যে স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ শোভা সিংহকে বাধা দেন। শোভা সিংহ বাধা পেয়ে চলে আসেন বর্ধমানে। এখানে ফিরে এসে কামোন্মত্ত শোভা সিংহ কৃষ্ণরাম রায়ের কন্যা সত্যবতীর ঘরে প্রবেশ করে তাকে বলপূর্বক ধর্ষণ করতে উদ্যত হলে, মাথার চুলের খোপার মধ্যে লুকিয়ে রাখা ছুরি দিয়ে তিনি শোভা সিংহের উদর চিরে ফেলেন, তখনই তাঁর মৃত্যু হয়। সত্যবতীও সেই ছুরিকা দ্বারা আত্মঘাতী হন। এ সম্বন্ধে (*Pertch*) বলেছেন ঃ

At this time Sinha having seen a very beautiful daughter of Krishnarama who by some chance had escaped death and fallen in love with her, began to keep as his mistress. And in spite of the admonitions of his counsellors. to the effect that he should not inconsiderately enjoy one who belonged to the party of his enemies, untill after having overcome his adversaries and firmly established his authority over vardhamana he might enjoy her with

security, he yet persisted in his imprudence.

Bengal District Gazetteer J.C.K. Peterson (P.27)-এর উদ্ধৃতি দেওয়া হল ঃ—

"Amongst the captives taken in Burdwan was the Raj Kumari Satyabati, the daughter of the Raja whom Subha singh kept in confinement until an opportunity should offer of sacrificing her to his lust. Entering her apartment secretly, he endeavoured to outrage her, but the heroic girl as he approached drew from her clothes a dagger which she bad concealed as the last defence of her honour and stabbed him, killing him almost immediately. Feeling herself polluted by his touch, she then turned the weapon on herself and pierced her own heart."

"ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিতম্"-এ উল্লেখ আছে—শোভা সিংহ মদ্যপানে উন্মত্ত অবস্থায় কৃষ্ণরাম রায়ের কন্যাকে সম্ভোগের জন্য শয্যায় তুললে তিনি নিজ কেশপাশে লুক্কায়িত তীক্ষ্ণধার ছুরি দিয়ে উদর বিদীর্ণ করলে শোভাসিংহ কর্মফল প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

"শোভাসিংহঃ সুরাপানেনাতিমত্তঃ কৃষ্ণরামরায় দুহিত্রা সম্ভোগায়
শয্যায়ামারোপিতয়া নিজকেশপাশস্থাপিত তীক্ষ্ণ ধার ক্ষুদ্র ছুরি কয়া
সমুদরে বিদারিতো মুক্তপ্রাণঃ কর্মানুরূপাং গতিমবাপ।।"

শোভা সিংহের হত্যার ব্যাপারে গ্লাড্উইন বলেছেন ঃ *She drew from under her garment a knife which she had concealed in hopes of binding an opportunity to gratify her revenge. With this weapon she ripped up his belly. ("Narrative of the Govt. of Bengal"---by Francis Gladwin, 1788, p. 5-8)*

ঐ মন্তব্যটি আচার্য দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয় উল্লেখ করেছেন। সমসাময়িক ইংরেজ ইতিহাস বেত্তাগণ প্রদত্ত বিবরণ থেকে *C.R. Willson* লিখেছেন—

Then a blow was struck by the hand of a woman, the young daughter of the murdered Krishna Ruam, when Subha Singha had carried off captive to Burdwan. Here was enacted once again the old story of man's brutality and woman's constancy. Subha Singha, after flattering and entreating invain, at last had recourse to violence. But the girl, driven to extremities plucking from her dress a sharp knife, stabbed the wretched to death through his body and then plunged the point in her own heart.

উক্ত বিবরণগুলি থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় শোভা সিংহ ১৬৯৬ খ্রীঃ অব্দে জুন মাসে নিহত হন, ফরাসী কুঠিয়াল মাঁর্তাও শোভা সিংহের মৃত্যুর সময় কাল সম্বন্ধে একই মন্তব্য করেছেন।

শোভা সিংহের মৃত্যুর পর বিদ্রোহীদের নেতারূপে মনোনীত হন তাঁর ভাই হিম্মত সিংহ। তিনি নামে মাত্র নেতা ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে রহিম খাঁর হাতেই সমগ্র নেতৃত্বের ক্ষমতা চলে গেল। অতঃপর তিনি 'শাহ' উপাধি গ্রহণ করেন। অর্থাৎ রহিম খাঁ, 'রহিম শাহ' হয়ে ভাগীরথির পশ্চিম অঞ্চলের উপর স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করেন।

রহিম খাঁ হঠাৎ মুর্শিদাবাদ ও কাশিমবাজার লুণ্ঠন করেন। লুণ্ঠিত অর্থের পরিমাণ ৬০ লক্ষ টাকা। এই অর্থে তিনি তাঁর সৈন্যদলে ১০ হাজার অশ্বারোহী ও ১০ হাজার পদাতিব সৈন্য নিয়োগ করেন। ঐতিহাসিক *C. Stewart* তাঁর *"The History of Bengal"* গ্রন্থে (পৃঃ ৩৭৫) উল্লেখ করেছেন—রহিম খাঁ রাজমহল ও মুর্শিদাবাদ লুণ্ঠন করেন এবং অর্থে প্রলুব্ধ হয়েও কাশিমবাজার আক্রমণ করেন নাই। তবে মুর্শিদাবাদ আক্রমণের সময় ঐ অঞ্চলের জায়গীরদার নিয়ামত খাঁ ও তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র রহিম খাঁকে বাধা দিতে গিয়ে আফগান সেনাদের কাছে পরাজিত ও নিহত হন। এই সংবাদ পাওয়া মাত্র দাক্ষিণাত্যে অবস্থান রত সম্রাট ঔরঙ্গজেব, সুবেদার ইব্রাহিম খাঁকে বরখাস্ত করে তাঁর পুত্র জবরদস্ত খাঁকে (১৬৯৭ খ্রীঃ অঃ) অস্থায়ী সুবেদার নিয়োগ করে তাঁর উপর বিদ্রোহ দমনের দায়িত্ব দেন। জবরদস্ত খাঁ ঢাকা হতে অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে প্রথমে রাজমহল ও মালদহ পুনরুদ্ধার করে মুর্শিদাবাদের দিকে অগ্রসর হন। তখন বিদ্রোহীরা বাদশাহী সৈন্যদের ভয়ে বর্ধমানে এসে আশ্রয় গ্রহণ করেন আবার কিছু অংশ মেদিনীপুরের জঙ্গলে গিয়ে আত্মগোপন করে থাকেন। ঘটনাটি ঘটেছিল ১৬৯৭ খ্রীঃ অব্দের মে মাসে। জবরদস্ত খাঁ বিদ্রোহীদের বিপর্যস্ত ও প্রদমিত করে এনেছেন সেইসময় সুবেদার নিযুক্ত হন আজিম-উস্-শান। নবনিযুক্ত সুবেদার সাহজাদা আজিম-উস্-শান সসৈন্যে মুঙ্গেরে উপস্থিত হয়ে জানতে পারলেন যুদ্ধ জয়ের যশগৌরব জবরদস্ত খাঁর অনুকূলে। তখন এক আদেশবার্তায় জানালেন তিনি বর্ধমানে না পৌঁছানো পর্যন্ত জবরদস্ত খাঁ যেন আর অগ্রসর না হন। এর পেছনে একটা কারণ ছিল। কারণটা হলো—জবরদস্ত খাঁ বিদ্রোহীদের দমন করে অবশ্যই যুদ্ধে জয়লাভ করবেন এবং যুদ্ধে জয়লাভ করলে তিনিই স্থায়ী সুবেদার হবেন। এই ভাবনা চিন্তা করে আজিম-উস্-শান বর্ধমানের দিকে যত শীঘ্র সম্ভব অগ্রসর হতে থাকেন। কিন্তু বর্ষা শুরু হয়ে যাওয়ায় মুঙ্গেরে তাঁকে সমস্ত বর্ষাকাল কাটাতে হয়। এদিকে জবরদস্ত খাঁও বর্ষাকালটা বর্ধমানে অতিবাহিত করেন। ১৬৯৭ খ্রীঃ অব্দের নভেম্বর মাসে আজিম-উস্-শান এক বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে বর্ধমানে এসে শিবির স্থাপন করেন। এখানে জবরদস্ত খাঁর সঙ্গে সৌজন্য মুলাকাত হয়। কিন্তু তাঁর প্রতি নিস্পৃহ

মনোভাব থাকায় জবরদস্ত খাঁর বুঝতে অসুবিধা হলো না যে, এখানে তাঁর প্রয়োজন শেষ হয়ে গেছে। সুতরাং তিনি পিতা ইব্রাহিম খাঁ সহ ৮০০০ (আট হাজার) সুশিক্ষিত অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে দাক্ষিণাত্যে সম্রাটের নিকট গমন করেন। (*History of Aurangzib---Vol.-V.P.288; Riyazu-S-Salatin--P. 238-9*) তখন এতদঞ্চলের জমিদার শ্রেণী, বিত্তশালী ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের অভ্যর্থনা ও নজরাণা গ্রহণ করতে করতে বিদ্রোহীদের কথা বিস্মৃত হয়ে যান, আমোদ-প্রমোদেই ব্যস্ত।

সেই সুযোগে বিদ্রোহী রহিম খাঁ ১৬৯৮ খ্রীঃ অঃ বর্ধমান উপকণ্ঠে শিবির স্থাপন করে আক্রমণের জন্য প্রস্তুত। খবর পেয়ে আজিম-উস্-শান দূত মারফৎ পত্র দিয়ে রহিম খাঁকে জানালেন—তিনি যদি আত্মসমর্পণ করেন, তা হলে তাঁর সমস্ত অন্যায় মার্জনা করা হবে পরন্তু সম্রাটের অধীনে কোন উচ্চপদে নিয়োগ করা হবে। সুচতুর কুটবুদ্ধি সম্পন্ন রহিম খাঁ, আজিম-উস্-শানের দুর্বলতা বুঝতেপেরে, বেশ গর্বিতভাবে দূত মুখে মৌখিক প্রত্যুত্তর দিলেন ঃ তিনি যদি তাঁর উজির খাজা আনোয়ারকে তাঁর শিবিরে (রহিম খাঁর) উপস্থিত হয়ে সন্ধি চুক্তি সম্পাদন করেন, তবে সম্রাটের প্রতি আনুগত্যের বিষয় বিবেচনা করা যাবে।

রহিম খাঁর দুরভিসন্ধির কথা বুঝতে না পেরে, সরল বিশ্বাসী শাহজাদা আজিম-উস-শান, তাঁর প্রধান উজির আনোয়ারকে রহিমের শিবিরে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। খাজা আনোয়ার রাজনীতি বিশারদ, শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত হলেও উদার স্বভাব সাধু প্রকৃতির ছিলেন এবং রহিম খাঁর আশ্বাস বাক্যে বিশ্বাস করে মাত্র কয়েকজন সঙ্গীসহ ১৬৯৮ খ্রীঃ অগষ্ট মাসে রওনা হলেন। আশ্চর্যের বিষয় উজির, রহিম খাঁর শিবিরদ্বারে উপস্থিত থাকা সত্বেও তাঁকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য বিশিষ্ট ব্যক্তি বা রহিম খাঁ নিজেও আসেন নাই। তখন উজিরের মনে ঘোরতর সন্দেহ জাগে। তিনি পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে শত্রু শিবিরের ভিতরে প্রবেশ করা ঠিক হবে না, বিবেচনা করায় বাইরে অপেক্ষা করা যুক্তিযুক্ত মনে করলেন। রহিম খাঁ, তাঁকে (উজিরকে) ভিতরে ঢুকতে না দেখে, যদি পালিয়ে যায় এই ভেবে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে অনুচরবর্গসহ অতর্কিতে উজিরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। উজিরও সেই সামান্য কয়েকজনকে নিয়ে তাঁদের বাধা দিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু সশস্ত্র শত্রুরা তাঁদের চারদিকে বেষ্টন করে অল্পক্ষণের মধ্যেই অনুচরসহ উজিরকে নিহত করেন।

খাজা আনোয়ারকে নিহত করে গর্বোদ্ধত রহিম খাঁ আজিম-উস্-শানের শিবির আক্রমণ করেন। দু পক্ষের তুমুল যুদ্ধ হয়। আজিম-উস্-শানের এক নিপুণ যোদ্ধা হামিদ খাঁ কুরেশীর নিক্ষিপ্ত তীরে বিদ্ধ হয়ে রহিম খাঁ ও তাঁর অশ্ব একেবারে ধরাশায়ী হয়ে পড়ে। তাঁর মাথা কেটে নিয়ে হামিদ খাঁ বর্শার ফলকে গেঁথে বিজয় উল্লাস প্রকাশ করায় বিদ্রোহী আফগান

সৈন্যদল ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে যান। এই ঘটনাটি "রিয়াজ-উস-সালাতিন"-এ উল্লেখ আছে। মোগল সৈন্যদল বিজয়-উল্লাসে আফগান শিবির লুণ্ঠন করে প্রচুর ধনরত্ন লাভ করেন। আজিম-উস-শান আফগানদের নির্মূল করতে মনস্থ করেন এবং কিছু দিনের মধ্যে যশোহর, হুগলী, বর্ধমান হতে আফগানদের বিতাড়িত করেন। ঐতিহাসিক *C. Stewart* ও গোলাম হোসেন সলিম বলেছেন রহিম খাঁর সঙ্গে আজিম-উস-শানের যুদ্ধ বর্ধমান শহরের উপকণ্ঠে সংঘটিত হয়েছিল এবং সেখানেই রহিম খাঁ নিহত হন। যদুনাথ সরকার মহাশয় যদিও বলেছেন, রহিম খাঁ চন্দ্রকোণার যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন। কিন্তু অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনে স্বীকৃত—খাজা আনোয়ার, আজিম-উস-শানের আদেশে মাত্র ৪ জন সঙ্গী সহ বর্ধমান দুর্গ (বর্তমান রাজবাড়ী) হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে বাঁকা নদী (দামোদরের প্রাচীন প্রবাহ) পার হয়ে রহিম খাঁর শিবিরে যান। দামোদর পার হয়ে অল্প কিছু দূরে ছিল রহিম খাঁর মূল ঘাঁটি (সম্ভবত বর্তমানে যে অঞ্চলের নাম 'মূলকাঠি')।

যুদ্ধ জয়ের পর আজিম-উস্-শান শহরে প্রবেশ করে হজরৎ বহরাম সক্কার সমাধিতে নতজানু হয়ে অভিবাদন জানান। তিনি আরও ২ বছর বর্ধমানে অবস্থান করেন। কৃষ্ণরাম রায়ের মৃত্যুর পর প্রায় ৩ বছর সময়কালে একটা বিশাল অঞ্চলে সাময়িক অরাজকতার জন্য কোন রাজস্ব আদায় হয় নাই। ৫০টি পরগণা বিশিষ্ট বর্ধমান জমিদারীতে কোন রাজস্ব আদায়কারী ও ফৌজদার না থাকায় প্রকৃতপক্ষে এই অঞ্চলে শ্মশানের রাজত্ব চলছিল। শাসনকার্য ও রাজস্ব আদায়ের সুবন্দোব্যস্ত করার জন্য তিনি বর্ধমানে বাসগৃহ, রাস্তাঘাট ও 'শাহী জুম্মা মসজিদ' নির্মাণ করান।

বর্ধমানে থাকাকালীন আজিম-উস্-শানের সভায় সাধুসন্ত ও সুফীদের নিয়ে ধর্মালোচনা হতো, মৌলনা রুমের কবিতা ও ইতিহাস আলোচনা হতো। সাধুসন্তদের মধ্যে সুফী বায়াজিদ ছিলেন সর্বাগ্রগণ্য। একদিন তিনি তাঁর দুই পুত্র করিমউদ্দীন ও ফারুকসায়ারকে সুফী বায়াজিদ এর কাছে আশীর্বাদ প্রার্থনা করে পাঠালেন। সুফির আস্তানায় প্রবেশ করলে তিনি তাদের 'সালাম আলেকুম' বলে সম্বর্ধনা জানালে জ্যেষ্ঠ করিম-উদ্দীন রাজকীয় গাম্ভীর্য বশতঃ নিরুত্তর থাকেন আর কনিষ্ঠ ফারুকসায়ার নগ্নপদে, নতশিরে পিতার প্রার্থনা নিবেদন করলেন। খুশী হয়ে সুফি বায়াজিদ পার্শীভাষায় বলেছিলে—"*Sitdown you are Emperor of Hindusthan*" (ইংরাজী অনুবাদ)। তারপর একদিন আজিম-উস্-শানের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় হিন্দুস্থানের সিংহাসন প্রার্থনা করেন বায়াজিদের নিকট। তাতে বায়াজিদ উত্তরে বলেছিলেন "আপনি যা যাজ্ঞা করছেন, আমি তা ফারখসায়ারকে দান করেছি। হস্তচ্যুত তীরকে ফেরানো যায় না। আমার বাণী খোদাতাল্লার কাছে পৌছে গেছে।" যাই হোক নানা

রাজনৈতিক বিপর্যয়ের মধ্যে শেষ পর্যন্ত ফারুকশায়ার ১৭১৩ খ্রীঃ অব্দের জানুয়ারী মাসে দিল্লীর সিংহাসনে বসেন। সম্রাট হয়ে তিনি সুফী বায়াজিদের কথা বিস্মৃত হন নাই। বর্ধমানে তাঁর আস্তানায় মসজিদ নির্মাণ করিয়ে দেন। এখন এই মসজিদটিকে বন-মসজিদ বলা হয়। বর্তমানে লেবেল ক্রসিং পার হয়ে কালনা রোডের পাশে অবস্থিত।

মোগল শাসকদের অদূরদর্শিতা ও ইংরাজ শাসনের বীজ বপন

বাংলার বিশেষ অঞ্চলের জমিদার ও ভূস্বামীদের বিদ্রোহ প্রসঙ্গে ইংরাজ শাসনের উল্লেখের প্রয়োজন কেন? ঘটনা হচ্ছে যে, বিদ্রোহ দমনের শেষ অধ্যায়ে সুবেদার আজিম-উস্‌-শান যখন বর্ধমানে অবস্থান করছেন সেই সময় ইংরাজ বণিকদের পক্ষে ওয়াল্‌স্ ও খাজা সুরহদ ডিহিকলিকাতা, সুতানুটি ও গোবিন্দপুর এই তিনটি গ্রাম ক্রয় করার স্থায়ী বন্দোবস্ত করতে ১৬৯৮ খ্রীঃ অব্দে মার্চ মাসে এখানে আসেন। তার আগে সুবেদার ইব্রাহিম খাঁর সময় ইংরাজ বণিকরা ঐ তিনটি গ্রাম অস্থায়ী দুর্গ স্থাপনের জন্য আবেদন করেছিলেন এবং দুর্গ নির্মাণ করে (বর্তমান 'বিনয়-বাদল-দীনেশ' বাগের পশ্চিমে) দুর্গপ্রাকারে ইউরোপ থেকে আনা কামান স্থাপনও করেছিলেন। পাঁচ-ছয় হাজার টাকার বিনিময়ে ওই গ্রাম তিন খানি ক্রয় করার আর্জি পেশ করেন। কিন্তু আজিম-উস্‌-শানের প্রধান উজির খাজা আনোয়ার ওই কাজে তাঁকে বাধা দেন। পরে ওয়ালেসের ২২শে জুন তারিখের পত্রে জানা যায়, খাজা আনোয়ারের মাধ্যমে এই কাজ সম্পন্ন করার ব্যবস্থা হয়েছে। এই তথ্যগুলি জানা যায় *Old Fort William Records---C.R.Wilson, Vol-I, P.36,37* এবং *A Short History of Calcutta---A.K.Roy, P.36-37.* পরের ঘটনা—ঐ বছর অর্থাৎ ১৬৯৮ খ্রীঃ অব্দের আগষ্ট মাসে খাজা আনোয়ারের হত্যা ও রহিম খাঁ নিহত হওয়ায় গ্রাম তিনটি হস্তান্তরের কাজ পিছিয়ে যায়। অবশেষে ১৬৯৮ খ্রীঃ অব্দের ৯ই নভেম্বর তারিখে অলস বিলাসী সুবেদার আজিম-উস্‌-শান-এর সম্মতিতে বর্ধমানের মাটিতে ডিহিকলিকাতা, গোবিন্দপুর ও সুতানুটি গ্রাম তিনখানির ক্রয়কার্য সমাধা হয় ১৬,০০০/- (ষোল হাজার) টাকার বিনিময়ে। কাজির মোহর, জমিদারের স্বাক্ষর গ্রহণের পর গ্রাম তিন খানি ইংরাজদের উপর বর্তায়। (বার্ষিক খাজনা ছিল ১১৯৪ টাকা ১৪ আনা ৫ পাই এখনকার হিসাবে ১১৯৪ টা. ৯০ পঃ)। কাজেই বলা যায়, বর্ধমানের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ও মোগল শাসকদের অদূরদর্শিতায় একদিন ভারতের মাটিতে উপ্ত হয়েছিল ইংরাজ শাসনের বীজ। ওই তিনখানি গ্রাম ছাড়া ফারুক সায়ারের সময় ১৭১৫ খ্রীঃ অব্দে আরও ৫৫ খানি গ্রামে জমিদারী স্বত্বলাভ করেন। তাঁর ৪২ বৎসর পরে ১৭৫৭ খ্রীঃ পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরেজরা সুবেবাংলার ভাগ্যনিয়ন্তা।

জগৎরাম রায়

(১৬৯৯-১৭০২)

১৬৯৬ খ্রীঃ অব্দে কৃষ্ণরাম রায়ের মৃত্যুর পর তাঁর একমাত্র পুত্র ভাগ্যবিড়ম্বিত জগৎরাম রায় ৩ বৎসর বিভিন্ন স্থানে কালযাপন করতে বাধ্য হন। নুতন সুবেদার আজিম-উস্‌-শান কর্ত্তৃক বিদ্রোহ দমিত হলে বর্ধমান চাকলায় মোগল আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন আবার জগৎরাম রায় তাঁর পৈতৃক জমিদারী ফিরে পান। সুবেদার আজিম-উস্‌-শানের সুপারিশক্রমে সম্রাট ঔরঙ্গজেব ৫ই জমাদিয়ল আউল তারিখে (১৬৯৯ খ্রীষ্টাব্দে) জগৎরামকে ৫০ টি পরগণার রাজস্ব আদায়কারী জমিদার ও চৌধুরাই উপাধি সহ ফরমান দেন।

মোহর।

(আবল জাফর মহম্মদ মহীঅদ্দিন আলমগীর বাদসাহ গাজী)

অতি শুভক্ষণে এই মহামান্য প্রথম বিশ্বাসপ্রদ ফরমানে প্রচারিত হইল যে—বঙ্গ দেশের সুবার এলাকাধীন বর্দ্ধমান ওগয়রহার ৪৯ উনপঞ্চাশ মৌজার চৌধুরাই ও জমিদারী কিষণরামের পুত্র জগৎকে প্রদান করিলাম। মহাল সমূহে প্রজাবৃদ্ধি ও কৃষিকার্য্যের উন্নতিসাধন, প্রজাগণের নিকটবর্তী স্থান সমূহের অধিবাসিদিগের সহিত সদ্ভাব স্থাপন করতঃ কোন প্রকারে তাহাদিগের প্রতি অসদ্ব্যবহার বা অত্যাচার না হয়, তৎপক্ষে বিশেষরূপে দৃষ্টি রাখা, প্রজাগণ পূর্ব্বাবধি যেরূপ নির্দিষ্ট হারে রাজস্ব প্রদান করিতেছে তদপেক্ষা কোন প্রকারে অতিরিক্ত রাজস্ব গ্রহণ করা না হয়, এই সকল নিয়মের কোন প্রকার ত্রুটী না করাই তাহার কর্ত্তব্য। নজরানা স্বরূপ যে ১ লক্ষ ১ হাজার টাকা প্রদান করিতে স্বীকার করিয়াছে, তন্মধ্যে এই ফরমান প্রাপ্তির পরেই ৩০ হাজার টাকা, সরকারে প্রদান করত, অবশিষ্ট টাকা তুল্য কিস্তি অনুসারে সুবার রাজধনাগারে ৫ বৎসরের মধ্যে প্রদান করিবে। এবং তাহার পিতার অঙ্গীকৃত নজরানার টাকা যাহা বাকী আছে, তাহাও পরিশোধ করিতে স্বীকার করায়, উক্ত টাকাও ধার্য্য সময়ে উক্ত ধনাগারে দাখিল করে। বর্ত্তমান ও ভাবী হাকিম কারকুন, মোৎসোদ্দি ও জায়গীরদারগণের কর্ত্তব্য যে, উক্ত ব্যক্তিকেই পরগণা হায় মজকুরার জমীদার ও চৌধুরী বলিয়া মান্য করেন ও প্রতি বৎসর এই জন্য নূতন সনন্দ দাখিল করিতে না বলেন।

সন ৪৩ জুলুস ৫ই জামাদিয়ল উলা (ইং ১৭০১)

তপসীল মহল।

পরগণে বর্দ্ধমান

পঃ হাবেলি ওগয়রহা মতালক

ওগয়রহা
পঃ বর্দ্ধমান
'' বাখা
''সাহাবাদ্।
''বর্দ্ধমান সায়ের।
''জাহানাবাদ সায়ের।
''সেরগড় বাঘা সায়ের।
''সেজাপুর।
''আজমতসাহি সেওয়াই
বাজে বাজার
বাজার এব্রাহিমপুর
পঃ মজফরসাহি ওগয়রহা
সরকার সরিফাবাদ ৭ মহাল।

রেকাবি বাজার।
সমদ্দারপুর।
পঃ লবঙ্গা
মহাম্মদপুর।
পঃ শোখপুর।
''সাহপুর।
''হৌসসুকি ওগয়রা
সরকার মন্দারণ ৪ মহাল।
''মঞ্জাম।
''হোসেন ফতাহ।
''বানিয়া বাসন্দরী।
''হৌসসুকি।
''কবির
পঃ জাহানাবাদ ওগয়রহা
''সরকার মন্দারণ ১১৫ মহাল।

সরকার সলিমাবাদ ১২ মহাল

'' মজ্ফর সাহি।
''সোলেমান সাহি।
খণ্ড।
''হেরিনী (খান জাহাঁ
আফগানের বরতরফের
পূর্ব্বে খারিজ মতে
বাদসাহি হুকুমানুসারে
প্রদত্ত হইল)
(বালাগাড়িয়া চৌমাহা, জাহান, কিঃ সাতসৈকা
মৌঃ বাজপুর, ওগয়রহা
পঃ সমরসাহি)
লবঙ্গা
কিঃ হাবেলি।
হেয়াতপুর।
পঃ চম্পাই নগরী
''আমির পুর।
''গোয়ালাভূম।
''সমরসাহী।
''ময়নাবাগ।
পঃ পাণ্ডুয়া ওগয়রহা
সরকার সলিমাবাদ
৩ মহল।
পাণ্ডুয়া
খাঁপুর।
জাহাঙ্গির আবাদ।

''চিতুয়া - বয়রা।
''জাহানাবাদ সেনপাহাড়ি।
''রানীগাড়ি।
''আম্বুয়া সরকার শানগ্রাম।
''নলহি।
''আমিরাবাদ।
সেরগড় মায় পরগণে কান্দড়া
ও ততম্বা সলিমপুর, ধাওয়া,
সরকার উদয় বেড়িয়া মায়
কিশোরনগর মৌজা ও হাট।

জগৎরাম রায় মাত্র ৪ বছরকাল জমিদারী পরিচালনা করেন। অবশ্য পিতা কৃষ্ণরাম রায়ের জীবিতাবস্থায় তিনি জমিদারী পরিচালনায় সহায়তা করতেন। বর্ধমানের সন্নিকটে জগদাবাদ নামে বর্তমান যে গ্রামটি আজও বিদ্যমান, সেই গ্রামটি জগৎরাম রায়ের প্রতিষ্ঠিত। এই গ্রামে তৎকালে নিপুণ তন্তুবায় বয়ন শিল্পীদের বসবাস ছিল এবং তাঁরা অত্যুৎকৃষ্ট গরদের বস্ত্রাদি প্রস্তুত করতেন।

তিনি বাংলার ১১০৮ সালের ফাল্গুন মাসে কৃষ্ণপক্ষীয় ৩য়া তিথিতে পিতৃ প্রতিষ্ঠিত কৃষ্ণসায়রে স্নান করার সময় গুপ্ত ঘাতকের ছুরির আঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত হন, ইং ১৭০২ খ্রীঃ অব্দে ৩রা মার্চ তারিখে। সেইজন্য রাজপরিবারের কোন ব্যক্তি ঐ সরোবরে স্নান করেন না, জল ব্যবহার করেন না, এমন কি পুকুরের মাছ পর্যন্ত খান না। এই সম্বন্ধে *Bengal District Gazetteer J.C.K. Peterson (P.28)*-এর উদ্ধৃতি দেওয়া হল ঃ—

"Jagat Ram Rai, who had been restored to the estate and honours of his father, the deceased Raja Krishna Ram Rai, After the revolt of Subha Singh, made further additions to the family estates of the Burdwan house, and was honoured with a farman by the Emperor Aurangzeb. He was treacherously murdered in 1702 A.D., and left two sons, Kirti Chandra Rai and Mitra Sen Rai.

কীর্তিময়ী বীরাঙ্গণা ব্রজকিশোরী

জগৎরাম রায়ের মৃত্যু আকস্মিক। মৃত্যুকালে স্ত্রী ব্রজকিশোরী ও দুই পুত্র কীর্তিচাঁদ ও মিত্রসেন রায়কে রেখে যান। ব্রজকিশোরী অত্যন্ত দৃঢ় চেতা মহিলা ছিলেন। তিনি সম্ভ্রান্ত কূলদ্ভবা ছিলেন। তাঁর কীর্তির যে সব শিলালিপি পাওয়া যায় তাতে তাঁকে কোথাও রাজকুমারী রাজমহিষী ও নৃপপ্রসূ বলা হয়েছে। তিনি দীর্ঘজীবি ছিলেন। বিভিন্ন সময়ে তাঁর বিভিন্ন কীর্তির কথা এবং তিনি যে ব্যক্তিত্বময়ী মহিলা ছিলেন তা জানতে পারা যায়।

একবার, রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের পিতা নরেন্দ্রনারায়ণ রায় বর্ধমান জমিদারীর অধীন ভুরশুট পরগণার ইজারাদার ছিলেন। বিষয়ঘটিত কোন ব্যাপারে নরেন্দ্রনারায়ণ রায় ব্রজকিশোরীর প্রতি দুর্ব্যবহার করেন, শুধু তাই নয় তাঁকে চরম কটূবাক্য বলেন। তাতে ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি দুই সেনাপতি আলমচাঁদ ও ক্ষেমচাঁদ-এর সহায়তায় নরেন্দ্রনারায়ণের পেঁড়োরগড় আক্রমণ করেন ও অধিকার করেন। নরেন্দ্রনারায়ণ প্রাণভয়ে সপুত্র নওয়াপাড়া গ্রামে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন। নওয়াপাড়া ভারতচন্দ্রের মাতুলালয়। ব্রজকিশোরী তাঁর সমস্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি বলপূর্বক অধিকার করে তাঁকে সর্বস্বান্ত করেন। পরে পুরনারীদের আকুল আবেদনে দেব সেবার জন্য সামান্য কিছু ভূমি দান করেন। কিছুদিন পর বর্ধমান রাজ নরেন্দ্রনারায়ণ রায়কে কিছু ভূ-সম্পত্তি পুনরায় ইজারা দেন।

রাজবংশানুচরিত পৃষ্ঠা ৩২-এ উল্লিখতঘটনা থেকে জানা যায় তিনি ব্যক্তিত্বময়ী মহিলা ছিলেন। "১৭৩০ খ্রীঃ অব্দে পুণ্যবতী ব্রজকিশোরী দ্বিতীয়বারে শ্রী শ্রী জগন্নাথ ক্ষেত্রে গমনকালীন বঙ্গাধিপতি মহাম্মদ সুজাউদ্দিন খাঁ বাহাদুর বঙ্গ ও উড়িষ্যা বিভাগের যাবতীয় ঘাটওয়াল ও ফাঁড়িদার প্রভৃতিকে তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণ করিবার জন্য যে পরোয়াণা প্রদান করেন তাহার মর্ম নিম্নে লিখিত হইল ঃ

(মহাম্মদ সা বাদসাহ গাজি
ফিদবি মমিনব মুল্‌ক মহাম্মদ
সুজাউদ্দিন খাঁ বাহাদুর আসদ জঙ্গ)

মোহরাঙ্কিত।

বর্ধমানের জমিদার কীর্তিচন্দের মাতা পুরুষোত্তমে সমুদ্র স্নান করণার্থে গমন করিতেছেন। অতএব ঘাটওয়াল, চৌকীদার ও ফাঁরিদারগণ নিজ নিজ সীমা হইতে তাঁহাকে নিরাপদে অপর সীমায় পৌহুঁছিয়া দিবে এবং পথে তাঁহার কোন প্রকার বিপদ না হয়, তজ্জন্য বিশেষ রূপে সতর্ক থাকিবে। তাঁহার সহিত ১৫ খানি জানানা সওয়ারী, ১০ খানি মরদানা চৌপালা ও আনুসঙ্গিক লোক গমন করিতেছে। ২৫ রজব, ১১ জুলুস।"

কীর্তিচাঁদ মাতা কীর্তিময়ী মহিষী ছিলেন। তিনি সাধারণের জলকষ্ট নিবারণের জন্য সুপ্রসিদ্ধ বিশাল সরোবর প্রতিষ্ঠা করেন ১৬৩০ শকাব্দে (ইং ১৭০৯ খ্রীঃ অঃ)। এই সরোবরটি 'রাণীসায়র' নামে তাঁর অক্ষয় কীর্তি আজও ঘোষণা করছে। সরোবরের দক্ষিণ দিকে বাঁধা ঘাট নির্মাণ করিয়ে একটি শিলালিপি গ্রথিত করেন। ওই শিলালিপিতে তাঁহার নাম ও শকাব্দা খোদিত ছিল। তবে খোদিত অক্ষরগুলি কালের গতিতে কিছু কিছু ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে গেছে। তবুও তাঁর নাম ও শকাব্দা পড়া যায়।

কীর্তিময়ী ব্রজকিশোরীর কীর্তি শুধু বর্ধমানেই সীমাবদ্ধ ছিল না, ভারতের বিভিন্ন তীর্থক্ষেত্রে তা ছড়িয়ে আছে।

বৃন্দাবন ধামে—

''সম্বৎ ১৭৮৪, ইং ১৭২৭ খ্রীঃ অব্দে কীর্তিচন্দ জননী ব্রজকিশোরী ঁবৃন্দাবন ধামে গমন করতঃ তত্রস্থ রাণাপতি ঘাটের পশ্চিমে, ইমলিঘাট নামক ঘাটের সোপাণবলি প্রস্তুত করিয়া দেন। তাহাতে গ্রথিত শিলালিপিতে দেবনাগর অক্ষরে হিন্দী ভাষায় খোদিত আছে—

শ্রী রাধাবল্লভ জয়তী

শ্রী বৃন্দাবন অধিকারী, শ্রী ব্রজলাল সুত সুন্দরলালজী, শ্রী সম্বৎ ১৭৮৪ মিতি চৈত্রবদি সপ্তমী ইহ শুভ ঘাট বন বাও, বাংলা বরদ্মান চাকলেকে রাজাধিরাজ শ্রী মহারাজ কীর্তিচন্দজী কি শ্রী মাতা মহাভাগ্যবতী শ্রীমাতাজীনে শ্রীহরি হরদাসদারগা বৈষ্ণাকার শ্রী বৃন্দাবন দাস।

ঐ সময় পুণ্যবতী ব্রজকিশোরী মথুরা ধামে ও যমুনা তীরে ২টি প্রস্তর নির্মিত ঘাট ও তন্নিকটে একটি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। অদ্যাবধি উক্ত ঘাটদ্বয় বাঙ্গালীঘাট নামে প্রসিদ্ধ এবং প্রতিষ্ঠিত শিবের পূজারীও রাজসরকার হইতে নির্বাহ হইয়া আসিতেছে।'' বর্তমানে জমিদারী প্রথা এবং বর্ধমান রাজ বিলুপ্ত হওয়ায় কিরূপে উহার ব্যয় নির্বাহ হয় তা জানা যায় না।

কীর্তিময়ী ব্রজকিশোরীর কর্ম এখানেই শেষ নয়। তিনি দেশের বিভিন্ন দেববিগ্রহ প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু করে জনসাধারণের সুবিধার্থে নানাবিধ কাজ করেন। বর্ধমান জেলার অম্বিকা কালনায় আজও যে ঁলালজীউ মন্দির বিদ্যমান তা তাঁরই কীর্তি। ১৬৬১ শকাব্দে ইং ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে মন্দির নির্মাণ করে লালজীর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দিরের শিলালিপিতে খোদিত আছে—

''যৎ পুত্র পৃথিবী তলে সুবিদিত সৎ কীর্তিচন্দ্র কৃতী
সা রাজকুমারিকা ব্রজকিশোরী কৃষ্ণ ভক্ত্যার্থিনী।
শাকে সৈকষড়ঙ্গু চন্দ্রগণিতে প্রসাদ মেতৎ দদৌ।
রাধাকৃষ্ণ যুগায় সৎকবিসঙ মধ্যেযু তৎপ্রীতয়ে।। শকাব্দ ঃ ১৬৬১।''

এই দেবসেবার জন্য তিনি যে রকম ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন তা অন্য যে কোন দেবালয় থেকে ভিন্ন, অন্য কোন দেবালয়ে এরূপ ব্যবস্থা ছিল না। নিত্য "৫২ প্রকার খাদ্যদ্রব্যের ভোগ প্রদান করতঃ তদ্দ্বারা ব্রাহ্মণ ও অতিথিদিগকে পরিতোষরূপে ভোজন করানো হইত। তদ্ভিন্ন মহারাণীর যখন যে দ্রব্য মনে উদয় হইত তৎক্ষণাৎ তাহা সংগ্রহ করতঃ লালজীউর ভোগ প্রদান করিতেন।"

কথিত আছে কীর্তিচাঁদ জননী ব্রজকিশোরীর নিকট একটি রাধিকামূর্তি ছিল। একদা এক সন্ন্যাসী একটি রমনীয় শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ মূর্তি নিয়ে জগন্নাথ ধামে যাবার সময় অম্বিকায় এসে উপস্থিত হন। অম্বিকার জনগণ ঐ বিগ্রহের কমণীয় মূর্তি দেখে মোহিত হয়েছিলেন। তারপর ঐ বিগ্রহের বিষয় ব্রজকিশোরীর নিকট পৌঁছলে তিনি ঐ মূর্তি দেখার জন্য আগ্রহী হন। একদিন সন্ধ্যায় ভ্রমণে বার হয়ে পথপার্শ্বে এক গাছের তলায় এক সাধুকে ধ্যানস্থ অবস্থায় দেখলেন। তাঁর সামনে অপূর্ব কৃষ্ণ মূর্তি যা তিনি লোকমুখে শুনেছিলেন এবং ওই মূর্তি দেখে মুগ্ধ হন। কিছুক্ষণ পরে সাধুজীর ধ্যান ভঙ্গ হলে তিনি তাঁকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে সন্ন্যাসীর কাছে শ্যামসুন্দরকে ভিক্ষা চাইলেন। সাধুজী তাঁর প্রাণের ঠাকুরকে ছাড়তে অসম্মত হন। তখন ব্রজকিশোরী কৌশলে সন্ন্যাসীর নিকট হতে বিগ্রহটি পাবার জন্য পন্থা অবলম্বন করেন। তিনি বিশ্বস্ত লোক মারফৎ সন্ন্যাসীকে বলে পাঠান : আমার একটি রাধিকা মূর্তি আছে, আমার একান্ত ইচ্ছা যে ঐ রাধিকার সহিত তোমার শ্রীকৃষ্ণের শুভ বিবাহ দিয়া জীবন সার্থক করি।

সরল প্রকৃতির ঐ সন্ন্যাসী রাণীর কৌশল বুঝতে না পেরে তাঁর প্রস্তাবে সম্মতি দেন। তখন রাজরাজাদের ছেলেমেয়েদের মত মহা সমারোহে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের বিবাহ উৎসব সমাধা করেন। বিবাহের কয়েকদিন পর সন্ন্যাসী মহারাণীকে তাঁর শ্যামরায়কে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য বলে পাঠালে ব্রজকিশোরী বলেন, "আমাদের রাজবংশের নিয়ম আছে যে, কন্যার বিবাহ দিয়া কখনও তাহাকে স্বামী গৃহে প্রেরণ করা হয় না। তাঁহাদিগকে গৃহেই রাখিয়া তাঁহাদের ভরণপোষণের উপযুক্ত বৃত্তি বা ভূসম্পত্তি প্রদান করা হয়। আপনার পুত্রের সহিত যখন আমার কন্যার শুভ বিবাহ দেওয়া হইয়াছে, তখন আমাদের বংশের চিরাচরিত প্রথানুসারে, তিনি আর পিতৃগৃহে গমন করিতে পারিবেন না। আপনার পুত্র ও পুত্রবধূ চিরকাল এই স্থানেই অবস্থিতি করিবেন। আপনার যখন ইচ্ছা, পুত্রের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন ও আপনার যখন যাহা আবশ্যক হইবে, রাজসরকার হইতে তৎক্ষণাৎ তাহা প্রাপ্ত হইবেন।" তখন সন্ন্যাসীর বুঝতে কোন অসুবিধাই হলো না যে, রাণী ব্রজকিশোরী তাঁর শ্যামরায়কে সুকৌশলে হস্তগত করেছেন। তখন আর শ্যামরায়কে ফিরে পাওয়ার কোন আশা নাই দেখে তিনি শ্যামরায়কে আক্ষেপ করে বলেছিলেন—"বাবা তুমি রাজভোগ প্রাপ্ত হইয়া এই দরিদ্র

সন্ন্যাসীকে বিস্মৃত হইলে। ভাল, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।" সেইদিনই সন্ন্যাসী কালনা পরিত্যাগ করে চলে যান। কালনার সুপ্রসিদ্ধ বিগ্রহ লালজীউ-ই উক্ত শ্যামরায়। বর্ধমানে রাজ-জামাতাদিগকে 'লালজী' বলা হয়ে থাকে। তার থেকেই এই 'লালজী' নামকরণ হয়েছে।

লালজীর মন্দির দেখার মত। ২৫ দেউল বিশিষ্ট সারা ভারতে এই ধরণের ২৫ চূড়া মন্দির আর নাই। বিষ্ণুপুরের স্থপতিরা এই মন্দির নির্মাণ করেন। মন্দিরের গায়ে অসংখ্য টেরাকোটার কাজ দর্শকদের বিস্ময় উদ্রেক করে।

রাজবংশানুচরিতে (পৃঃ৭৫) আরও জানা যায়, "ব্রজকিশোরী ১৭৪৭ খ্রীঃ অঃ তিলকচাঁদের পিতামহী, কীর্তিচাঁদের জননী কীর্তিমতী ব্রজকিশোরী, ব্রজধামের অন্তর্গত নন্দগ্রামে পাবন সরোবরের যে সোপানাবলি নির্মাণ করাইয়াছিলেন, তাহার শিলালিপিতে দেবনাগর অক্ষরে হিন্দী ভাষায় খোদিত আছে ঃ—

"শ্রীমান্ রাজা সাহেব ঔর রাণীজী, মহারাজা কীর্তিচন্দ্র কি মাতা
শ্রীযুত ত্রিলোকচন্দ্র জীকে, দাদীজী, রাজ বর্ধমান, সুবা বাঙ্গালাকে
গুমস্তা সাফলরাম দাস জী। সম্বৎ ১৮০৪, সন ১১৫৪।"

১৭৪৮ খ্রীঃ পুণ্যবতী ব্রজকিশোরী উক্ত পাবন সরোবরের তীরে পাবন বিহারী নামক একটি বিগ্রহ স্থাপন করতঃ, তদীয় মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। উক্ত মন্দিরের শিলালিপিতে খোদিত আছে ঃ—

শ্রী রাধাগোবিন্দ
শ্রী গদাধর চৈতন্য,
শ্রী পাবন সরোবর কুঞ্জ

শ্রীমতী রাণী রাজেশ্বরী, রাজা কীর্তিচাঁদ কি মাতা, শ্রী রাজ তিলোকচাঁদ জী কি দাদীজী রাজ সুবা বাঙ্গালা বর্ধমান।—

ব্রজকিশোরী তৃতীয়বার যখন জগন্নাথ দর্শনে যান, সেখানেও তাঁর কীর্তির পরিচয় রেখে আসেন ঃ—

"১৬৬৩ শকে ইং ১৭৪২ খৃষ্টাব্দে কীর্তিচাঁদ জননী কীর্তিমতী ব্রজকিশোরী তৃতীয়বার শ্রী শ্রী জগন্নাথ ক্ষেত্রে গমন করিয়া পূর্ব্বোক্ত মার্কণ্ডেয় সরোবরের পুনরায় পঙ্কোদ্ধার করতঃ অপর তিন দিকে প্রস্তর নির্ম্মিত সোপানাবলি প্রস্তুত করিয়া দেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত মন্দির মধ্যে গ্রথিত শিলালিপিতে উড়িষ্যা অক্ষরে নিম্নলিখিত শ্লোক খোদিত আছে —

"শুভ মস্তু শকাব্দা ১৬৬৩।
শকাব্দেহরি রসর্ত্তুগ্র শিরোরত্নে ব্যাধাৎ পবত
মার্কণ্ডেয় হ্রদাৎ পঙ্কোদ্ধারং সোপান মণ্ডপৌ।

হরেকৃষ্ণেন সিংহেন কীওচন্দ্র নৃপ প্রসূঃ।।"

অতঃপর অম্বিকাকালনায় ব্রজকিশোরী ১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দে বৈকুণ্ঠনাথ শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এইরূপ কারুকার্য খচিত মনোহর শিবমন্দির সচরাচর দেখা যায় না। মন্দির শিলালিপিতে খোদিত আছে —

রসদ্ধিরসচন্দ্রাঁকগণিতেশব্দে শকবধি।।
চক্রে বৈকুণ্ঠনাথস্য মন্দিরং সুমনোহরম্।।
জগদ্রায়স্য মহিষী কীর্ত্তিচন্দ্র নৃপ প্রসূঃ।।
শ্রীশ্রী ত্রিলোকচন্দ্রস্য নৃপার্ত যা পিতামহী।। শকাব্দা ১৬৭৬।"

ব্রজকিশোরী একদিকে ছিলেন তেজস্বিনী অন্যদিকে তেমনি ছিলেন ভক্তিমতী, আবার সাধারণ প্রজাদের প্রতিও ছিলেন দয়াময়ী। তিনি বর্ধমান জমিদারীতেই নয় ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠা করেছেন দেববিগ্রহ। তাঁর চরিত্রের আর একটি বড় দিক ছিল সারস্বত সাধকদের স্বীকৃতি দান। তৎকালীন সময়ে অম্বিকা কালনার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন প্রাণবল্লভ। পিতা বংশীঘোষ। কীর্তিচাঁদ জননী ব্রজকিশোরীর পৃষ্ঠপোষকতায় এবং তাঁরই নির্দেশে তিনি রচনা করেন 'জাহ্নবী মঙ্গল' কাব্য। কাব্যটি রচিত হয়েছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভকালে। কবি প্রাণবল্লভ তাঁর প্রথমেই যাঁর অনুগ্রহে ও পৃষ্ঠপোষকতায় কাব্যটি রচনা করেন সে কথা স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন —

"যথায় ভূপতি বাবু রায়ের সন্ততি।
কীর্তিচন্দ্র মহারাজ জগতে খেয়াতি।।
যাঁহার জননী যতি কৃষ্ণপরায়ণী।
বহুরাজ্য সুশাসিত কৈল ঠাকুরাণী।।
নবরত্ন সম সভা জগতে বাখা নে।
অবন অতুল বিপ্র তুষিলেন দানে।।
তাঁহার আশ্রিত বংশী ঘোষের নন্দনে।
শ্রী প্রাণবল্লভ ভণে গুরুর চরণে।।"

উক্ত উদ্ধৃতি থেকে বোঝা যায় কবি রাজ পরিবারে আশ্রিত ছিলেন। 'জাহ্নবী মঙ্গল' কাব্যের পুঁথিটি আবিষ্কৃত হয় মেদিনীপুর জেলার চেতুয়া পরগণার (বর্তমান ঘাটাল) বাসুদেবপুর গ্রামে। মূল-পুঁথিটির ২০ বছরের মধ্যে কবির জীবিতাবস্থায় ১৭২৪ খ্রীষ্টাব্দে অনুলিখিত হয়।

কীর্তিচাঁদ রায়

(১৭০২-১৭৪০)

জগৎরাম রায়, স্ত্রী ব্রজকিশোরী এবং দুই পুত্র জ্যেষ্ঠ কীর্তিচাঁদ ও মিত্র সেনকে রেখে আততায়ীর হাতে নিহত হন। কাজেই তাঁর শোচনীয় পরিণতির পর রাজবংশ পরম্পরায় জ্যেষ্ঠাধিকার নিয়মানুসারে কীর্তিচাঁদ জমিদারীর দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। কনিষ্ঠ ভ্রাতা মিত্রসেন রায়কে যথোপযুক্ত মাসিক বৃত্তি দেওয়ার বন্দোবস্ত করা হয়। কিন্তু বিশাল জমিদারীর ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে দুই ভাইয়ের মধ্যে ঘোর বিবাদ উপস্থিত হয়। তখন কীর্তিচাঁদ ভাই মিত্রসেন রায় ও স্ত্রী লক্ষ্মী দেবীকে কালনার নিকট রাজবংশের কোগাছি দুর্গে বন্দী করে রাখেন। বন্দী অবস্থায় থাকাকালীন তাঁর একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। তাঁর নাম তিলকচাঁদ।

পাঞ্জাবের ট্যাণ্ডন পরিবারের বুলচাঁদের কন্যা রাজরাজেশ্বরীর সঙ্গে কীর্তিচাঁদের বিবাহ হয়। এখানে বলা প্রয়োজন কন্যার বিবাহের পর বুলচাঁদ, পিতা-পিতাম্বর, ভ্রাতা ফতেচাঁদ এবং স্ত্রী-পুত্র পরিবার সহ পাঞ্জাব পরিত্যাগ করে বর্ধমানে বসতি স্থাপন করেন।

কীর্তিচাঁদ সাহসী বীর যোদ্ধা ছিলেন। তা ছাড়া তিনি কূটবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিও ছিলেন। জমিদারী প্রাপ্তির এক বছরের মধ্যেই তিনি সম্রাট ঔরঙ্গজেবের নিকট ১৭০৩ খ্রীঃ অব্দে সনদ পান এবং এইটি তাঁর প্রথম সনদ। রাজবংশানুচরিত পৃষ্ঠা ২০ হইতে উদ্ধৃত।

মোহর
(আবলজাফর মহীঅদ্দিন আলমগীর বাদসাহ গাজী)

অতি শুভক্ষণে এই মহামান্য প্রথম ফরমানে প্রচারিত হইলে যে—বঙ্গদেশের সুবার অধীনস্থ পরগণে বর্দ্ধমান ওগয়রহার ৪৯ উনপঞ্চাশ মৌজার জমিদারী. জগতের পুত্র কীর্ত্তিচন্দকে প্রদত্ত হইল। তাহার কর্ত্তব্য যে, প্রজাগণ ও অপর সাধারণের সহিত সদ্ভাব করতঃ, মহাল মজকুরার ও কৃষিকার্য্যের উন্নতি সাধনে যত্নবান হয়, প্রজাগণের প্রতি কোন প্রকার অত্যাচার না হয়, সুবা মজকুরের প্রচলিত রাজস্ব যাহা প্রজাগণ পূর্ব্বাবধি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক দিয়া আসিতেছে, তদপেক্ষা কাহারও নিকট হইতে, কোন প্রকারে অতিরিক্ত কর গ্রহণ করা না হয়, বর্ত্তমানের সমস্ত নজরানা এবং জগতের নিকট প্রাপ্য নজরানার অবশিষ্ট টাকা, ধার্য্য কিস্তি অনুসারে সুবার ধনাগারে, দাখিল করে। উপস্থিত ও ভাবী হাকিম কারকুন ও মোৎসদ্দিগণের কর্ত্তব্য যে, ইহাকেই পরগণা হায়ের জমীদার বলিয়া গণ্য করেন এবং কোন প্রকার পরিবর্ত্তন না করেন। এবং প্রতি বৎসর নূতন সনন্দ দাখিল করিতে না বলেন।

২০ সওয়াল সন ৪৮ জুলুস (ইং ১৭০৬ খৃঃ)

তপশীল মহাল

মোট মহাল

৪৯

জায় —

জগতের মৃতুর পর

৪৫

হাল

৪

৪৯

পরগণে বর্দ্ধমান মায় মাশুল ও কিশোর নগর।
" আজমত সাহি বোরি মৌজা ও বাজার।
"রেকাবি বাজার।
" বাঘা।
"সোলেমানসাহি।
"মালডাঙ্গা
"নন্দাপুর।
" শঙ্কর।
" মহাম্মদপুর।
" মোয়াজ্জমপুর।
" নবসঙ্গ বাহমন খণ্ডা।
" হাবেলি সোলেমানাবাদ
" সরকার মন্দারন
" খাণ্ডা।
" সাহাবাদ।

পরগণে সুজাপুর।
" বিল্লবপুর।
" এব্রাহিমপুর
"মজফ্‌ফরসাহি।
"পঃ চৌমোহান
"নলহি।
" খাঁপুর।
" বলিয়া বাসন্দরি
" সাহাপুর
পঃ পাণ্ডুয়া মহাল।
" হেয়াতপুর।
" জাহাঙ্গিরাবাদ
পঃ সেড়গড়
" ঝাঁইয়া।
" বসন্ত।

কিসমত সাতসৈকা মৌজা করজনা ও রাজুর ওগয়রহা সরকার সলিমাবাদ ১৫ মহাল। পঃ কিসম হাবেলি।

পরগণে হোসেন ফতাহ
" সমরসাহি।
" গোয়ালাভূম।
" ময়নাবাগ।

পরগণে জাহানাবাদ মায় সায়ের ৪১/৪২
" হাওস সুকী।
" মান খণ্ডি।
" আমিরাবাদ।

'' চম্পানগরী। '' কৈওড়।
'' অলহতি। '' সেনপাহাড়ি।
'' লাখা সেড়গড়। '' আমীরপুর।
সরকার সলিমাবাদ ২ মহাল জগতের মৃত্যুর পর পঃ অম্বিকা।
'' রাণীহাটী।

কীর্তিচাঁদ তাঁর পিতামহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী ও চক্রান্তকারীদের কথা ভোলেন নাই। তিনি কৃষ্ণরাম রায়ের হত্যাকারী শোভা সিংহের ভাই হেম্মত সিংহ-এর জমিদারী চেতুয়া, বরদা, রঘুনাথ সিংহের জমিদারী চন্দ্রকোণা, ও বয়রা, ঘাটালের নিকট বরদ এবং হুগলী জেলার তারকেশ্বর এর নিকট বলাগড়ের জমিদারকে যুদ্ধে পরাজিত করে তাঁদের জমিদারী অধিকার করেন। তাছাড়া তিনি নিকটবর্তী কতকগুলি ছোট ছোট জমিদারদের সম্মুখ যুদ্ধে পরাস্ত করে তাঁদের জমিদারীগুলিও নিজ অধিকারে আনেন। পরে বাংলার সুবেদারের নিকট হতে বিজিত সম্পত্তি দিল্লীর সম্রাটের প্রদত্ত বলে সনদ প্রাপ্ত হন। অবশ্য দিল্লীর সম্রাটের কাছ থেকে পৃথক পৃথক সনদ পেয়েছেন।

২য় সনদ

(আবল ফতাহ নসরুদ্দিন মহাম্মদ সা বাদসাহগাজী) মোহরাঙ্কিত।

''মৃত কৃষ্ণরাম বর্দ্ধমানের জমিদারী, ১লক্ষ টাকা নজর দিয়া প্রাপ্ত হয়েন। তাঁহার পুত্র জগৎরাম রায়ও ঐরূপে পৈত্রিক সম্পত্তির সনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পরগণে চন্দ্রকোণার জমিদার রঘুনাথ সিংহ এবং চিতুয়া ও বরদার তালুকদার শোভা সিংহ, সরকারে মালগুজারি না দিয়া বিদ্রোহী হওতঃ চাকলে বর্দ্ধমান ও মুর্শিদাবাদ দখল করে এবং কৃষ্ণরাম রায়ের ধন রত্নাদি লুণ্ঠন করতঃ তাঁহার বাটীর প্রায় ২৫ জন পরিবারবর্গ সহ তাঁহাকে হত্যা করিয়া, শোভা সিংহও হত হয়। কীর্ত্তিচন্দ বাদসাহী সৈন্যের সহায়তায় শোভা সিংহের ভ্রাতা হেম্মত সিংহকে আক্রমণ করায় সে পলায়ন করিয়াছে, এক্ষণে উপরোক্ত জমিদারী পরগণে চন্দ্রকোণা ওগয়রহ কীর্ত্তিচন্দকে বন্দোবস্ত করিয়া নজরাণা স্বরূপ ২৫ হাজার টাকা গ্রহণ করতঃ সনন্দ দেওয়া গেল এবং আদেশ করা যায় যে কিস্তি কিস্তি খাজনার টাকা সরকারে আদায় দেওয়া হয়। ইত্যাদি। ১৫ রমজান ১৭ জুলুস''

এই দ্বিতীয় সনদ তিনি মহম্মদ সা বাদশাহের রাজত্বকালে ১৭৩৭ খ্রীঃ অব্দে প্রাপ্ত হন। ''এই সনদে বাদসাহ, কীর্তিচাঁদকে ঐ সকল বিজিত, জমিদারী সরঞ্জামী নানকর রসুম ও নজরাণা গ্রহণ করিবার এবং দস্যু ও তস্করদিগকে দমন করিবার জন্য প্রভূত ক্ষমতা প্রদান করিয়া ছিলেন। কীর্তিচন্দ 'রাজা' উপাধি প্রাপ্ত না হইয়াও রাজার ন্যায় ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং দেশস্থ সকলেই তাঁহাকে মহারাজা বলিয়া সম্বোধন করিত। ১৭০৯ খ্রীঃ অব্দে, শকাব্দা ১৬৩১ শকে সুপ্রসিদ্ধ কবিরত্ন ঘনরাম তদীয় বিরচিত শ্রী ধর্ম্মমঙ্গল নামক

কাব্যে কীর্তিচন্দকে মহারাজা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ঃ—

"অখিলে বিখ্যাত কীর্তি, মহারাজ চক্রবর্ত্তী,
কীর্তিচন্দ্র নরেন্দ্র প্রধান।
চিন্তি তাঁর রাজোন্নতি, কৃষ্ণপুব নিবসতি,
দ্বিজঘন রাম রসগান।"

কবি ঘনরাম চক্রবর্তী ছিলেন কীর্তিচাঁদ রায়ের বৃত্তিভোগী। প্রতি মাসে এই বৃত্তি পাওয়ার ফলে সংসার পরিচালনার খরচের চিন্তা করতে হতো না। কাজেই তিনি নিশ্চিন্ত মনে কাব্য চর্চা করতে পারতেন। তিনি গুরুর উপদেশে 'শ্রীধর্মমঙ্গল' কাব্য রচনা করেন।

বিষয় সম্পত্তি ব্যাপারে ভারতচন্দ্রের পুনরুল্লেখ করতে হচ্ছে। কীর্তিচাঁদ মাতা ব্রজকিশোরী প্রসঙ্গে ভারতচন্দ্রের কথা আলোচিত হয়েছে। এখন ভারতচন্দ্র দেবানন্দপুর থেকে ফার্সী ভাষায় কৃতবিদ্য হয়ে স্বগৃহে ফিরে আসেন। তারপর তিনি অগ্রজদের অনুরোধে নতুন ইজারালব্ধ সম্পত্তির মোক্তার হয়ে বর্ধমানে আসেন। কিন্তু এই ইজারালব্ধ সম্পত্তির রাজস্ব বাকী পড়ে ও কিস্তি দিতে না পারায় এবং ভারতচন্দ্র তাতে নানাপ্রকার আপত্তি উপস্থাপিত করায় কীর্তিচাঁদ তাঁকে কারারুদ্ধ করেন। ইজারাদেওয়া সম্পত্তি খাস করে নিজ দখলে রাখেন। কারারুদ্ধ করার ব্যাপারে ভারতচন্দ্র কীর্তিচাঁদের দেওয়ান রাজবল্লভকে দায়ী করেছেন ঃ—

"রাজবল্লভের কার্য্য,
কীর্তিচাঁদ নিল রাজ্য।"

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, ভূমিরাজস্ব আইন অনুসারে তৎকালে এই ব্যবস্থা ছিল, যদি কোন জমিদার, নবাব সরকারে নির্দিষ্ট সময়ে রাজস্ব জমা দিতে না পারতেন তা হ'লে জমিদারকেও কারারুদ্ধ হতে হতো, তেমনি ইজারাদাররা যদি জমিদারদের রাজস্ব দিতে না পারতেন তবে তাঁদেরও কারারুদ্ধ করা হতো। কারারুদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে ভারতচন্দ্র কিন্তু কীর্তিচাঁদকে দোষারোপ করেন নাই, তাঁর উক্তি থেকেই সে কথা প্রমাণিত হয়। তাছাড়া, প্রভাকর পত্রিকার সম্পাদক কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত দায়ী করেছেন রাজকর্মচারীবৃন্দকে। তাঁদের চক্রান্তেই এ কাজ হয়েছিল। চক্রান্তকারীদের অন্যতম ছিলেন দেওয়ান রাজবল্লভ, যিনি ভারতচন্দ্রের পিতা নরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের জ্ঞাতি শত্রু।

কীর্তিচাঁদ সম্পর্কে কবি প্রশস্তি ঃ- --

তৎকালে রাজা ও জমিদারদের বৃত্তিভোগী কবি, সঙ্গীতজ্ঞ, বহু জ্ঞানী ব্যক্তি তাঁদের সভা অলঙ্কৃত করতেন। কবিগণ সেই রাজা বা জমিদারদের প্রশস্তি গান করতেন তাঁদের সৎকর্মের

দিকগুলি উল্লেখ করে। রাজ্য বা জমিদারী পরিচালনা ক্ষেত্রে তাঁরা কখনও কখনও কঠোর আবার প্রয়োজন বোধে কোমল হৃদয়ের পরিচয় দিতেন। তাঁদের সুকীর্তির কথা বৃত্তিভোগী কবি সাহিত্যিকই নয়, তাঁদের পরবর্তীকালের কবি সাহিত্যিকগণও প্রশস্তি করেছেন। কীর্তিচন্দ্রের বৃত্তিভোগী কবি ঘনরাম চক্রবর্ত্তী মঙ্গল কাব্য রচনাকালে কীর্তিচন্দ্রের প্রশস্তি করেছেন—

"ভণে দ্বিজ ঘনরাম নৈতন মঙ্গল।
চিন্তি মহারাজা কীর্তিচন্দ্রের কুশল।।"

লাউসেনের জন্ম পালায়, ঘনরাম, কীর্তিচাঁদের হিত চিন্তায় বলেছেন ঃ—

"মহারাজ কীর্তিচন্দ্র করিয়া কল্যাণ।
শ্রী ধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম গান।।"

অন্যত্র তাঁর মঙ্গল কামনায় ঃ—

"নূতন মঙ্গল দ্বিজ কবিরত্ন গান।
মহারাজা কীর্তিচন্দ্র করিয়া কল্যাণ।।"

কবি ঘনরাম চক্রবর্তী, 'সত্যনারায়ণ রসসিন্দু' নামে একটি সত্যনারায়ণ পাঁচালী রচনা করেন। সেখানেও তিনি কীর্তিচাঁদের কল্যাণ কামনায় লিখেছেন ঃ—

"জয়যুক্ত রিপুমুক্ত কব কষ্টদায়।
দ্বিজভক্ত মহারাজা কীর্ত্তিচন্দ্র রায়।।"

কবি বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার — নদীয়া রাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি ছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে মনোমালিন্য হওয়ায় ১৭৪৪ খ্রীঃ অব্দে বর্ধমান রাজ চিত্রসেনের সভায় যোগ দেন। কীর্তিচাঁদ সম্পর্কে প্রশস্তি করেছেন ঃ—

"ত্বৎকীর্তিচন্দ্রমুদিতং গগনে নিশাম্য
রোহিণ্যপি স্বপতি সংশয় জাতশঙ্কা।।
শ্রী কীর্তিচন্দ্রনৃপ কজ্জ্বল লাঞ্ছনেন
প্রেয়াংসমঙ্কয়দসৌ ন বিধৌ কলঙ্কঃ।।"

অর্থাৎ "হে কীর্তিচন্দ্র মহারাজ! তোমার কীর্তি চন্দ্রের ন্যায় আকাশে উদিত হইয়াছে; ইহা দেখিয়া চন্দ্রের পতিব্রতা পত্নী রোহিনীরও মনে শঙ্কা হইল যে, পাছে তাঁহার স্বামীকে তিনি চিনিতে না পারেন এই ভাবিয়া আপনার স্বামীর গায়ে একটি কজ্জ্বলের দাগ দিলেন, তাহাকেই আমরা চন্দ্রের কলঙ্ক বলিয়া থাকি।"

অকিঞ্চন চক্রবর্তী তাঁর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে বার বার কীর্তিচাঁদের প্রশংসা করেছেন ঃ—

"মহারাজ চক্রবর্তী কীর্তিচন্দ্র কৃতকীর্তি
ইন্দ্রের সমান বর্ধমানে।
নিবাস তাঁহার দেশে নূতন মঙ্গল ভাষে
ব্রাহ্মণ কবীন্দ্র অকিঞ্চনে।"

ধর্মমঙ্গলের কবি নরসিংহ বসু ১৬৫৯ শকাব্দে ইং ১৭৩৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর কাব্য রচনা করেন। তাঁর পিতামহ মথুরা বসু কীর্তিচাঁদের সময়ে বর্ধমান জেলার শাঁখারী গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। সম্ভবত মথুরা বসু, তৎপুত্র ঘনশ্যাম বসু ও তৎপুত্র কবি নরসিংহ বসু কীর্তিচাঁদের আনুকুল্য লাভ করেছিলেন।

নরসিংহ বসুর পৈত্রিক বাসস্থান ছিল পানাগড় থেকে ১৪/১৫ কিলোমিটার উত্তরে গোপভূম পরগণার বসুধাগ্রামে। তাঁর পিতামহ মথুরা বসু বসুধাগ্রাম ত্যাগ করে দক্ষিণ দামোদরের কৃষ্ণপুরের সন্নিকটে শাঁখারী গ্রামে বসবাস করেন।

নরসিংহ বসু বীরভূমের জমিদার (রাজনগর) আসফ-উল্লাখানের তরফে মুর্শিদাবাদের নবাব দরবারে উকিল নিযুক্ত ছিলেন। তাঁর মনিবেরও সুখ্যাতি এই গ্রন্থের স্থানে স্থানে পাওয়া যায়।

"বাঙলার বীরভূম বিখ্যাত অবনি
শ্রী অসফুল্লা-খান রাজা শিরোমণি।"

১৭১৪ খ্রীঃ অব্দে নরসিংহ বসুর 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যে কীর্তিচাঁদের সংক্ষিপ্ত উল্লেখ ও দেখা যায় তাঁর প্রশস্তি —

"অধিকারী দেশের কীর্তিচন্দ্র রায
জগজনে যাহার যশের গুণ গায়।"

কীর্তিচাঁদের সমসাময়িক কাল হতে পরবর্তী কালেও বহু ছড়া, গাথাঁ ও মঙ্গলকাব্যে তাঁর বহু যশকীর্তন শোনা যায় এবং সেগুলি একত্রিত করলে একখানি প্রশস্তিগ্রন্থ রচিত হয়। এখানে বিভিন্ন কবির দুই/এক ছত্র উদ্ধৃতি করে তিনি যে একজন প্রকৃত যশস্বী রাজতুল্য জমিদার ছিলেন তাই বলতে চেষ্টা করেছি। তাঁর মহাপ্রয়াণে কোন এক অজ্ঞাত কবির একটি সম্পূর্ণ গাঁথা উল্লেখ করছি ঃ—

"রাজা রাজ বল হো,
যাগেশ্বর দিয়ে দীঘি নাম রহিল।।
বন কেটে বসালেন রাজা কাঞ্চননগর।

হেদে হে ধার্ম্মিক রাজা দয়ার সাগর।।
বর্ধমানে বাড়ী তোমার, মহারাজ! দীঘনগরে হাট।
সাধ করে বাঁধালেন রাজা মা গঙ্গার ঘাট।।
রাজা রাজ বল হো।
যাগেশ্বর দিয়ে দীঘি নাম রহিল।।
ধর্ম্মশীল মহারাজা, পাপে না দেন মন।
কত শত করান রাজা, ব্রাহ্মণ ভোজন।।
আজান বাহু ছিল তোমার জানি জগতেতে।
অর্জ্জুন রাজার সমান তুমি ছিলে ক্ষমতাতে।।

রাজা রাজ বল হো।
যাগেশ্বর দিয়ে দীঘি নাম রহিল।।
জমিদারেরা ছিল দেশে, বড়ই অত্যাচারী।
তোমার নামে কাঁপ্‌ত তারা থরথরি।।
বর্গীর ভয় হতে রাজা, আমাদের রাখলে যতনেতে।
তোমার সমান দয়াল রাজা, না দেখি ধরাতে।।

রাজা রাজ বল হো।
যাগেশ্বর দিয়ে দীঘি নাম রহিল।।
ক্ষেত্রীকুলে জনম তোমার, তরবালের ধ্বনি।
চন্দ্রকোণা জয় করিতে, সাজিলেন আপনি।।
দক্ষিণ ছেড়ে এলেন রাজা সাত গাড়ী টাকা।
মাল মুলুকে লুটে নিলে যমে দিলে রাজা।।

রাজা রাজ বল হো।
যাগেশ্বর দিয়ে দীঘি নাম রহিল।।
আষাঢ়েতে রথযাত্রা, অগ্রাণ মাসে রাস।
অগ্রাণ মাসে ম'লেন রাজা স্বর্গে করলেন বাস।।
হাঁড়া হাঁড়া ঘৃত জ্বলে, জ্বলে চন্দন কাট।
দাঁইহাটে থাকিল রাজার, সাহান বাঁধা ঘাট।।

রাজা রাজ বল হো।
যাগেশ্বর দিয়ে দীঘি নাম রহিল।।
পাক কান্দে, পাকুরি কান্দে, কান্দে রাজ তোতা।
মা-জননী এসে বলে বাছা গেলি কোথা।।
শহরের লোক কান্দে সব, করে হায় হায়!
হেট মুণ্ডু করে কান্দে, হরেকৃষ্ণ রায়।।

রাজা রাজ বল হো।
যাগেশ্বর দিয়ে দীঘি নাম রহিল।।
হাতি-শালে হাতী কান্দে, ঘোড়ায় না খায় পানি।
বিনিয়ে, বিনিয়ে কান্দে, কীর্ত্তিচাঁদের রাণী।।
ছোট-রাণীর কাপড় খানি, বড় রাণীকে সাজে।
রাণীর কপালে সিন্দুরের ফোটা, গঙ্গা জলে ভাসে।।
হাতি শালে হাতী কান্দে, পাইক শালে ঘোড়া।
মাণিক চাঁদ বাবু কান্দে, ভিজে জামা জোড়া।।
রাজা রাজ বল হো।
যাগেশ্বর দিয়ে দীঘি নাম রহিল।।

মহানুভব জমিদার কীর্তিচাঁদের কীর্তি ঃ—

দীর্ঘ ৩৮ বছর (১৭০২-১৭৪০ খ্রীঃ অঃ) বেশ কৃতিত্বের সঙ্গে জমিদারী পরিচালনা করেছিলেন। তিনি সুবে বাংলার অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রভাব ও পরাক্রমশালী জমিদার ছিলেন। কীর্তিচাঁদ প্রসঙ্গে হাণ্টার মন্তব্য করেন ঃ *Kirti Chandra was a man of bold and adventurour spirit, and Kirti Chandra Roy was a man of great valour.*
১৭২২ খ্রীঃ অঃ নূতন রাজস্ব বন্দোবস্তের ফলে বর্ধমান চাকলার আয়তন বৃদ্ধি পেয়ে ৫৭টি পরগণার জমিদারীতে পরিণত হয় এবং আয়তন ছিল ৫০০০ (পাঁচ হাজার) বর্গ মাইল। রাজস্ব দিতে হত ২০,৪৭,৫০৬ টাকা (কুড়িলক্ষ সাতচল্লিশ হাজার পাঁচ শত ছয় টাকা) বছরে।

বিদ্রোহী দমন মারাঠা বিতরণ ঃ—

কীর্তিচাঁদ জমিদারী পাওয়ার পর সর্বপ্রথম পিতামহ কৃষ্ণরাম রায় ও তাঁর পরিবারের হত্যাকারী ও পৈশাচিক অত্যাচারের প্রতিশোধ স্বরূপ চন্দ্রকোণার রাজা, চিতুয়ার জমিদার

ও বিষ্ণুপুরের রাজা প্রভৃতি বিদ্রোহীগণকে সম্মুখ যুদ্ধে পরাজিত করেন। সেই মুহূর্তেই তাঁদের জমিদারী অধিকার করেন নাই। তিনি বিষ্ণুপুর রাজ গোপাল সিংহের নিকট হ'তে সুবর্ণ অক্ষরে পারসী ভাষায় তাঁর নাম খোদাই করা বিচিত্র তরবারি খানি বিজেতা হিসাবে গ্রহণ করেন এবং উহা যত্ন সহকারে রাজবাটীতে রক্ষা করেন (জমিদারী প্রথা বিলুপ্তির পর বহু বস্তু লুপ্ত হয়ে যায়)। ''তৎপরে উভয়ে সদ্ভাব স্থাপন করতঃ, বঙ্গাধিপতির সাহায্যার্থে মারহাট্টা দস্যুগণের বিরুদ্ধে কাটোয়া গমন করেন। তৎকালে মারহাট্টা দস্যুগণ পশ্চিমপ্রদেশ লুণ্ঠন করতঃ কাটোয়ায় অবস্থিতি করিতেছিল। বীরবর কীর্তিচন্দ্র মারহাট্টাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাজয় করিয়া দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন।''

''কীর্তিচন্দ যে সকল রাজ্য ও জমিদারী, যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া অধিকার করিয়াছিলেন, তাহার তালিকা ও তৎকালীন তৎসমূহের ধার্য্য বার্ষিকী রাজস্বের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল' এখন ঐ সকল জমিদারীর বার্ষিকী রাজস্ব পূর্ব্বাপেক্ষা বহুগুণ বৃদ্ধি হইয়াছে। ঐ সকল রাজস্ব প্রতি বৎসর বঙ্গদেশের সুবার রাজ ধনাগারে প্রদান করিতে হইত।

যাঁহার জমিদারী	জমিদারীর নাম	বার্ষিকী রাজস্ব
শোভা সিংহ	বরদা	২,৪৫২
	চিতুয়া	৯৪, ১৮৯
রঘুনাথ সিংহ	চন্দ্রকোণা	৬,০১৪
	বয়রা	৮৮, ৭৩৪
কবিবর ভারতচন্দ্রের	ভুরসুট	১,৫৫১
পিতার রাজ্য	মনোহর সাহী	৮৪,৭০৭
ঘাটালের সন্নিকট বরদের জমিদারী	বরদ	১,৪০,০৪৪
হুগলী জেলাব অন্তর্গত তারকেশ্বরের	বলাগড়ে	২৩,৪৭০
বেনঘরের রাজা।		
		৪,৪১,১৬১

উক্ত তথ্যগুলি 'রাজবংশানুচরিত', পৃঃ ২২-২৩ হ'তে উদ্ধৃত।

কীর্তিচাঁদ ছিলেন অত্যন্ত উচ্চভিলাষী। তাঁর আশা ছিল বঙ্গদেশে অপ্রতিদ্বন্দ্বী বড় জমিদার হওয়া। তৎকালে বঙ্গদেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা চলার ফলে সেই সুযোগে শোভা সিংহের দুই ভাই হিম্মত সিংহ ও মাহাসিং কে সম্মুখ যুদ্ধে পরাজিত এবং তাঁর গোষ্ঠীকে নির্মূল করে সেই কীর্তির স্মারক স্বরূপ আজও বিদ্যমান কাঞ্চননগরের 'বারদ্বারী তোরণ'।

কীর্তিচাঁদের মহান কীর্তি কাঞ্চননগর প্রতিষ্ঠা, কাঞ্চননগরে বারদ্বারী প্রাসাদ ও বারদ্বারী তোরণ ঃ —

কীর্তিচাঁদই নগর বর্ধমানের প্রায় ৩ কি.মি. পশ্চিমে কাঞ্চননগর প্রতিষ্ঠা করেন। রাখালদাস মুখোপাধ্যায়ের 'রাজবংশানুচরিতে' ২৭ পৃষ্ঠা থেকে জানা যায়, ''বর্দ্ধমান নগরের সন্নিকটস্থ্ কাঞ্চননগর নামক ক্ষুদ্র নগরটি কীর্ত্তিমান কীর্তিচন্দ্রেরই স্থাপিত। পূর্ব্বে বর্দ্ধমানের সন্নিকটে ইহার ন্যায় সুন্দর নগর আর ছিল না। দুইপার্শ্বে সুদৃশ্য হর্ম্ম্যাবলী পরিশোভিত সুপ্রশস্ত রাজপথ, বিবিধ প্রকার পণ্যদ্রব্য পরিপূরিত বিপণি শ্রেণী, স্বর্ণকার, কাংসকার ও কর্মকারগণ বিনির্ম্মিত নয়নমুগ্ধকর বিবিধ কারুকার্য্যপূর্ণ আপন সমূহ এবং স্থানে স্থানে নিত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যপূর্ণ কাঞ্চননগর যেন নিত্যই উৎসবময় বলিয়া অনুভূত হইত। বিশেষতঃ, কাঞ্চননগর, সুচারু কারুকার্য্যের কারিকরগণের আবাসভূমি বলিয়া বঙ্গদেশ মধ্যে অতিকায় খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। এখানকার কাংসকার নির্মিত বিবিধপ্রকার কাংসপাত্র বঙ্গদেশে অতি সমাদরে বিক্রীত হইত, কিন্তু জগতে কিছুই চিরস্থায়ী নহে। ঘূর্ণায়মান কালচক্রে উর্দ্ধাথঃ আবর্ত্তনে আজ সেই কাঞ্চননগর অধস্থ্। দেশব্যাপী ম্যালেরিয়ার কড়ালগ্রাসে নিপতিত হইয়া উহা একেবারে হতশ্রী, জঙ্গলপূর্ণ ও বন্যজন্তুর আবাসস্থল হইয়াছে।''

কীর্তিচাঁদের তীব্র আকাঙ্খা 'রাজার' সম্মানের অধিকারী হওয়া। সেই আকাঙ্খা পূরণের জন্য তিনি এই কাঞ্চননগর প্রতিষ্ঠা করেন যা নগরবর্ধমান থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল। কিছুদিনের মধ্যে এই নগরটি সমৃদ্ধিশালী হয়ে ওঠে এবং এই নগরের তৈরী ছুরি, কাঁচি, কাঁসা পিতলের বাসন অখণ্ড বাংলাদেশ তো বটেই ভারতবর্ষ এবং বিদেশে সম্মান অর্জন করে। এই নগর পরিকল্পনা মাফিক সুন্দর সুন্দর পথঘাট, পথের দুধারেই সুসজ্জিত দোকানপাঠ, পরিকল্পনা মাফিক সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা, বিভিন্ন কারুকার্য খচিত কারিগরগণের আবাসভূমি নির্মিত করে এই নগর সুপরিকল্পিত ভাবে প্রতিষ্ঠা করে এই নগরেই নিজ পরিবারের বাসের জন্য এক সুন্দর মনোরম প্রসাদ নির্মাণ করে তার নাম দেন 'বারদ্বারীপ্রাসাদ'। এখন এই প্রাসাদের অবলুপ্তি ঘটেছে কিন্তু অতীতের সাক্ষ্য হিসাবে বহু প্রাকৃতিক দুর্যোগ, কালের পরিবর্তন-বিবর্তনের মধ্য দিয়ে সময় সঙ্কেতকে অগ্রাহ্য করে কীর্তিচাঁদের কীর্তিকে ঘোষণা করছে সেই 'বারদ্বারী সিংহদ্বার' যা বর্ধমানের একটি প্রধান সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার রূপে আমরা পেয়েছি। যাকে সংরক্ষণের মাধ্যমে বাঁচিয়ে রাখা আমাদের অবশ্য কর্তব্য। তোরণটির উচ্চতা প্রায় ১০ মিটার এবং প্রস্থ ৭ মিটার। তোরণের মাথায় বারোটি ছোট ছোট দ্বার আছে যেগুলি মন্দিরের মত দেখতে। এই বারোটি (১২) দ্বার হচ্ছে পূর্বদিকে পাঁচটি, পশ্চিম দিকে পাঁচটি,

উত্তরদিকে একটি ও দক্ষিণ দিকে একটি। অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনী স্মারক গ্রন্থেও উল্লেখ আছে—"রাস্তার উপরে বারদ্বারী নামে একটি ফটক আছে। প্রবাদ এইরূপ যে, মহারাজ কীর্তিচন্দ্র বিষ্ণুপুর রাজকে পরাজিত করিয়া কীর্তিচিহ্ন স্বরূপ এই ফটক প্রস্তুত করিতে আদেশ দেন।"

প্রসঙ্গক্রমে বর্তমানে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে—উক্ত স্থানে ১২টি তোরণ দ্বার নির্মিত হয়েছিল না ১টি (এক) তোরণদ্বার নির্মিত হয়েছিল? কিন্তু জনশ্রুতি ও ইতিহাসে চিরপ্রবাহিত নদীর মোহনার পাকদণ্ডী পথে বার বার ঘুরপাক খেতে হয় দর্শক, পাঠক এবং গবেষকদের। কারণ এই তোরণদ্বারের উভয় দিকে যে শ্বেতপাথরের শিলালিপি আছে তাতেই এই প্রমাদ। একদিকে শিলালিপিতে উপরে দেবনাগরী এবং নীচে বাংলায় আর একদিকে উপরে ইংরাজী ও নীচে ফারসী ভাষায় উল্লেখ আছে, যার বাংলা অংশটির উদ্ধৃত করছি, "বর্ধমানপতি বীরবর কীর্তিচাঁদ চিতুয়া ও বরদার জমিদার শোভা সিংহের পাশবিক অত্যাচারের প্রতিশোধার্তে তাহার ভ্রাতা হিম্মত সিং এবং রহিম খাঁকে সম্মুখ সমরে ইংরাজী ১৭৩৭ সালের কিছুকাল পূর্বে পরাজিত করিয়া বর্ধমানের নিকট স্বস্থাপিত কাঞ্চননগর প্রবেশ দ্বার বারদুয়ারী নামক স্থানে দ্বাদশটি বিজয় তোরণ নির্মাণ করেন। তন্মধ্যে একটি মাত্র তাঁর সেই প্রাচীন কীর্তি ঘোষণা করিতেছে বর্তমানে।" আমার ধারণা শিলালিপি কীর্তিচাঁদের আমলে লেখা হয় নাই। নিশ্চয় তার পরবর্তী কোন রাজা ঐ ফলক স্থাপন করেন। কারণ ফলকের উপর ফলক স্থাপনের সময়ের কোন উল্লেখ নাই। ১৭৪০ খ্রীঃ অব্দে কীর্তিচাঁদের জীবনাবসান হয়। এখন প্রশ্ন যদি দ্বাদশটি তোরণ থাকতো তা হলে একটি অবশিষ্ট রইল আর এগারটির কোন চিহ্ন নাই এমন কি ভীতের গাঁথনিরও কোন অস্তিত্ব থাকবে না এটা সম্ভব নয়। তা ছাড়া কীর্তিচাঁদ-এর সময়ের যে বর্ণমালা বাংলায় ছিল, শিলালিপিতে খোদিত বাংলা বর্ণ মালার পার্থক্য অনেক। শিলালিপির বর্ণমালা অনেক আধুনিক। সুতরাং কীর্তিচাঁদের পরবর্তীকালের কোন রাজপুরুষ কর্তৃক লিখিত হয়েছে।

আবার 'বার' কথাটি চলিত ভাষা যার অর্থ 'বাহির'। আবার সেই 'বার' কথাটি '১২' সংখ্যাও বোঝায়। কীর্তিচাঁদ বর্ধমান শহরের বাহিরে প্রাসাদ নির্মাণ করেন বলেই তার নাম দেন 'বারদ্বারী'। আসলে তিনি একটি মাত্র সিংহদ্বার নির্মাণ করেন এবং এই দ্বারের ওপর ১২ (বার) টি ছোট ছোট দ্বার নির্মাণ করেন। যে জন্য এই বিভ্রান্তি।

অতীত ঐতিহ্য ঃ—

অতীতে কাঞ্চননগর বিশেষ সমৃদ্ধশালী ও রাঢ়ীয় সভ্যতার কেন্দ্র বলে পরিচিত ছিল।

এখনও কাঞ্চননগরে সেই অতীত কীর্তির বহু নিদর্শন বর্তমান। তাই অনেক গবেষকদের মতে কাঞ্চননগরই কর্ণসুবর্ণের বা রাঢ়ের রাজধানী ছিল। তৎকালে এই কাঞ্চননগরই ছিল ছুরি-কাঁচির জন্য বিখ্যাত এবং আন্তর্জাতিক বাজারে এখানকার তৈরী ছুরি-কাঁচির প্রচুর চাহিদা ছিল। তাই কাঞ্চননগরকে ইংলণ্ডের বিখ্যাত শিল্প নগরী 'শেফিল্ড'-এর সমকক্ষ হিসাবে চিহ্নিত করে বলা হত 'শেফিল্ড অব্ ইণ্ডিয়া'। কাঞ্চননগরে এই ছুরি-কাঁচি তৈরীর পথিকৃৎ ছিলেন 'প্রেম চাঁদ মিস্ত্রী'। আবার কাঞ্চননগর ছিল পোড়া মাটির শিল্প সমৃদ্ধ নগর। এখানকার বহু মন্দিরের গায়ে পোড়ামাটির শিল্প কার্য শোভিত ছিল যার নিদর্শন এখনও কিছু কিছু পাওয়া যায়। বর্ধমান রাজপরিবার যে বাংলার শিল্প-সংস্কৃতি এবং শিল্প কলার বিশেষ সমাদর করতেন এবং প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন তার বহু নিদর্শন আছে। কীর্তিচাঁদ বহু মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যেগুলি সবই পোড়া মাটির শিল্পকর্ম সমৃদ্ধ।

দেব দেউল ও মন্দির প্রতিষ্ঠা ঃ—

কীর্তিচাঁদের অন্যান্য কীর্তির ন্যায় দেব বিগ্রহ ও মন্দির প্রতিষ্ঠাও ছিল উল্লেখযোগ্য। তিনি অনেক ছোট ছোট জমিদারী দখল করে নিজ জমিদারীর অন্তর্গত করলেও তৎত্রত্ব স্থানে দেব বিগ্রহ মন্দির ও দেব সেবার সুবন্দোবস্ত করেন। 'রাজবংশানুচরিতে' উল্লেখ আছে-–চন্দ্রকোণার রাজা রঘুনাথ সিংহকে পরাজিত করে তিনি তাঁর সমুদয় জমিদারী অধিকার করেন এবং তাঁদের পূর্বপুরুষদের প্রতিষ্ঠিত দেবালয় সমূহের দেব সেবার সুব্যব বন্দোবস্ত করেন। যেমন মল্লেশ্বরপুরে ঁমল্লনাথ, চন্দ্রকোণার ঁরঘুনাথ জীউ এবং ঁলাল জীউ প্রভৃতি দেবদেবীর সেবা ও অতিথি সৎকারের প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। চন্দ্রকোনার ঁরঘুনাথ জীউ'র মন্দিরটি বহু প্রাচীন। ১৫৭৭ শকে, ইং ১৬৫৭ খ্রীঃ অব্দে চন্দ্রকোণার কোন পূর্বতন কোন রাজ মহিষী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। গ্রথিত শিলালিপিতে তাঁর নাম ও বিবরণাদি খোদিত ছিল। এখন থেকে প্রায় তিন'শ (৩০০) বছর পূর্বে কীর্তিচাঁদ মল্লনাথের মন্দিরের চূড়া প্রস্তুত করাইয়া দেন।

''কীর্তিচন্দ্র শ্রী বৃন্দাবন ধামে শ্রীশ্রী বৃন্দাবন বিহারীর যে যুগল মূর্ত্তি স্থাপন করেন, তৎ সম্বন্ধে একটি কিংবদন্তি প্রচলিত আছে।

যখন তিনি চন্দ্রকোণার রাজাকে পরাজয় করতঃ, উক্ত যুগলমূর্ত্তি বর্দ্ধমানে স্থাপন করিবার অভিলাষ করেন, তখন তাঁহাকে স্বপ্ন যোগে প্রত্যাদেশ হইয়াছিল যে, ওই যুগলমূর্ত্তি বর্দ্ধমানে স্থাপন না করিয়া, যেন শ্রীবৃন্দাবনে স্থাপন করা হয়। তদনুসারে উক্ত যুগল মূর্তি শ্রীশ্রী বৃন্দাবন ধামেই স্থাপন করা হইয়াছিল।''

''শোভা সিংহের ভ্রাতা হেম্মত সিংহকে পরাস্ত করিয়া তদীয় জমিদারী পরগণে বরদার

অন্তর্গত বগড়ীর সুপ্রসিদ্ধ বিগ্রহ শ্রীশ্রী ৺কৃষ্ণরায় জীউকে স্বীয় অধিকার মধ্যে প্রাপ্ত হইয়া কীর্ত্তিচন্দ্ অতিশয় পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন এবং তাঁহার সেবাদির ব্যয় সুচারুরূপে নির্ব্বাহোপযোগী বিস্তর দেবত্ত্বর ভূমি প্রদান করেন, কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, কালে তাঁহারই বংশধরের অদূরদর্শীতায় উক্ত বিজিত সম্পত্তি ও বিগ্রহটি এক্ষণে বর্দ্ধমান রাজ্যাধিকার হইতে বিচ্যুত হইয়াছে।''

''কীর্ত্তিচন্দ্ দিল্লীশ্বরের নিকট হইতে যে সকল জমিদারী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সুপ্রসিদ্ধ মহাপীঠস্থান ক্ষীরগ্রাম ও তাহার অন্তর্ভূক্ত। এই স্থানে দেবীর দক্ষিণ চরণের অঙ্গুষ্ঠ নিপতিত হয়। তথায় দেবী যুগাদ্দা ও ক্ষীরখণ্ডক ভৈরব বিরাজমান আছেন। কীর্ত্তিচন্দ্ এই স্থানের অধিকার প্রাপ্ত হইয়া অনির্ব্বচনীয় আনন্দ লাভ কারয়াছিলেন। তিনি ঐ স্থানে দেবীর একটি রত্নবেদী, মন্দির, শয়ন গৃহ ও নাট্যমন্দির প্রস্তুত করিয়া দেন। রত্নবেদীতে একখানি শিলালিপি গ্রথিত আছে, কিন্তু তাহার অক্ষরগুলি বিনষ্ট হওয়ায় কিছুই পড়িতে পারা য়ায় না। অদ্যাবধি দেবীর পূজাদি রাজসরকার হইতে সুচারু রূপ নির্ব্বাহ হইয়া আসিতেছে।''

''দাঁইহাট গ্রামে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত অনেকগুলি শিবমন্দির ও একটি আবাসভূমি ছিল। কালে সেগুলি বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, কেবল দাঁইহাট গ্রামের সন্নিকট বিকিহাট গ্রামে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ৺হরগৌরী মূর্ত্তি অদ্যাবধি বর্ত্তমান রহিয়াছেন। উহা এক্ষণে ইন্দ্রানি পরগণার গ্রাম্য দেবতাস্বরূপ পূজিত হইয়া আসিতেছেন।''

''বর্দ্ধমানের সন্নিকট দীর্ঘনগর নামক গ্রামে কীর্ত্তিচন্দ সাময়িক বাসোপযোগী সুবৃহৎ অট্টালিকা প্রস্তুত ও একটি সুদীর্ঘ সরোবর খনন করাইয়া তন্মধ্যস্থলে 'বারদ্বারী' নামক একটি রমনীয় বিলাসভবন প্রস্তুত করাইয়া সময়ে সময়ে তথায় অবস্থিতি করিতেন এক্ষণে উক্ত অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ, রাশি রাশি ইষ্টক স্তূপ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে, কেবল বিলাসভবনটি মাত্র অসংস্কৃতাবস্থায় অদ্যাবধি বর্ত্তমান আছে।''

''ইঁহাদের আদি বাসস্থান বৈকুণ্ঠপুর গ্রামে ১৬৫৪ শকে ইং ১৭৩৩ খ্রীষ্টাব্দে যে একটি শিবমন্দির ও পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করেন তা অদ্যাবধি বর্ত্তমান রহিয়াছে, উক্ত মন্দিরস্থ শিলালিপিতে ক্ষোদিত আছে যে,

শকাব্দা ১৬৫৪।
শকে পয়োধি শর ষট্ কুমিতে হরায়
নির্ম্মায়িতং সকল ভূপতিনাং কৃত্তিমা।
বেশ্মষ্টকাময় মিদংদ্বিজ ধর্ম গোপ্তা
শাস্ত্রা সতাং নিখিল কীর্ত্তি সুধা করেন।।''

এই শ্লোকের মধ্যম পদের অক্ষরগুলি লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। তৎকালীন বঙ্গের অদ্বিতীয় পণ্ডিত

জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন মহাশয়কে তিনি অত্যন্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন। তিনি তর্কপঞ্চনন মহাশয়কে বিস্তর নিষ্কর ভূমি ও ত্রিবেণীতে একটি পুষ্করিণী দান করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন দেশস্থ অনেক ব্রাহ্মণকেও বহুতর ব্রহ্মোত্তর ভূমি প্রদান করতঃ তাঁহাদের চিরান্ন সংস্থানের উপায় করিয়া দিয়াছেন।"

কাটোয়ার সন্নিকটে যাগেশ্বরডি নামক বিশাল সরোবর কীর্ত্তিচাঁদের একটি অতুল কীর্ত্তি। কথিত আছে "একদা তিনি বর্ধমান হইতে মুর্শিদাবাদ গমন কালে ঐ স্থানে আসিয়া তাঁহার অত্যন্ত পিপাসা হয়। অনুচরবর্গ বহুদূর পশ্চাতে, বিস্তীর্ণ ময়দান, কোথাও জলাশয় নাই। দেখিলেন সম্মুখে একটি বৃক্ষমূলে বসিয়া একজন রাখাল বালক গরু চরাইতেছে। কীর্তিচাঁদ পিপাসায় অত্যন্ত কাতর হইয়া সম্মুখস্থ রাখাল বালককে, নিকটবর্তী গ্রাম হইতে এক ঘটি জল আনিতে আদেশ করিয়া সেই বৃক্ষমূলে উপবেশন করতঃ তাহার অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়াও রাখাল বালক আসিতেছে না দেখিয়া তিনি গ্রামাভিমুখে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে হইতে দেখিলেন, রাখাল বালক একটি ছোট ঘটি করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া আসিতেছে। বালক নিকটে আসিলে, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই ছোট এক লোটা জল আনিতে তোমার এত বিলম্ব কেন হইল? বালক উত্তর করিল, সিপাই! আমি গ্রামের মধ্যে ১০ ঘরে যাঞ্চা করিয়া এই জল সংগ্রহ করিয়াছি, তাহাতেই এত বিলম্ব হইয়াছে। আমাদের গ্রামে জলাশয় নাই, দুই-তিন ক্রোশ দূরত্ব হইতে জল আনিয়া আমাদের গৃহকার্য্য হইয়া থাকে এবং মনুষ্য ও গৃহপালিত পশু প্রভৃতি পান করে, আমাদের অত্যন্ত জল কষ্ট। বালক তাঁহাকে সামান্য সিপাহী বলিয়া অনুভব করিয়াছিল। কীর্ত্তিমান কীর্তিচাঁদ এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন, এবং সেই পঙ্কিল জল পান করতঃ কথঞ্চিৎ পিপাসা শান্তি করিয়া বালককে কহিলেন, বালক! তুমি এই স্থান হইতে যতদূর দৌড়াইয়া যাইতে পারিবে, ততবড় দীর্ঘ একটি সরোবর খনন করাইয়া তোমাকে দিব। তচ্ছ্রবণে বালক প্রাণপনে যতদূর পারিল দৌড়িয়া একস্থানে দাঁড়াইলে, কীর্তিচাঁদ ভল্লদ্বারা তথায় চিহ্ন করিয়া চলিয়া গেলেন। বালক এই ঘটনা গ্রামস্থ সকলের নিকট আনুপূর্ব্বিক বিবৃত করিলে, সকলেই উপহাস করিয়া কহিল, একজন সিপাহির কি এতদূর ক্ষমতা হইতে পারে, যে, এতবড় দীর্ঘ একটি সরোবর খনন করাইয়া দিবে? ফলতঃ তখন বালকের কথা কেহই প্রত্যয় করিল না। এই ঘটনার অত্যল্পদিন পরেই বর্ধমান হইতে তথায় জনৈক কর্ম্মচারী ও সহস্রাধিক মজুর দীর্ঘিকা খনন করিবার জন্য প্রেরিত হইল। তখন সকলেই বুঝিল যে, বর্ধমানাধিপতি কীর্তিচাঁদ সেই সিপাহি। সরোবর খনন করিয়া সেই রাখালবালককে প্রদান করতঃ বালকের নামে দীর্ঘিকার নমকরণ হইল যাগেশ্বরডি। থাকবস্তার ম্যাপে উক্ত গ্রামের

নাম ও যগেশ্বরডিহি বলিয়া লিখিত আছে। বোধ হয় বালকের নাম যগেশ্বর ছিল। ঐ বিশাল সরোবর অদ্যাবধি বর্তমান রহিয়াছে এবং নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহে বিমল পানীয় প্রদানে তাহাদের প্রাণ রক্ষা করতঃ কীর্তিচাঁদের অতুল কীর্ত্তি নিরন্তন ঘোষণা করিতেছে।''

''পূর্ব্বকালে কেহ পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা, দেবতা স্থাপন প্রভৃতি মহান পুণ্যপ্রদ কার্য্য নিচয় সম্পাদন করিলে, গ্রাম্য লোকেরা তদীয় কীর্ত্তি বর্ণনা করতঃ গীতি রচনা করিয়া, তাঁহার যশবিস্তার করিত। বঙ্গদেশ মধ্যে এরূপ অনেক মহাত্মার কীর্তিসূচক বহুতর গ্রাম্যগাথা অদ্যাবধি প্রচলিত রহিয়াছে। কীর্ত্তিমান কীর্তিচাঁদের পরলোক গমনের পর, তাঁহারও যশঃ বর্ণনা করতঃ একটি গ্রাম্যগীত রচিত হইয়াছিল। অদ্যাবধি এ প্রদেশস্থ বাজীকরদিগের নিকট হইতে উক্ত গীতটি শ্রুত হওয়া যায়। ''রাজা রাজ বল হো। . . . .'' কীর্তিচাঁদের যশগাথা প্রসঙ্গেপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

''জেলা বর্ধমানের অন্তর্গত হাটকীর্ত্তিনগর বীরবর কীর্তিচাঁদেরই স্থাপিত। তৎকালে এই হাট এতদ্দেশ মধ্যে প্রধান হাট বলিয়াই পরিগণিত ছিল। এখন আর ইহার তাদৃশ গৌরব নাই।'' যে সমস্ত কীর্ত্তির কথা এখানে উদ্ধৃত করা হলো সেগুলি ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে প্রকাশিত রাখালদাস মুখোপাধ্যায়ের 'রাজবংশানুচরিত' গ্রন্থ হতে নেওয়া হয়েছে।

কীর্তিচাঁদের কীর্ত্তি অতুল। যুগান্তের ঘূর্ণবর্তে নানা উত্থান পতনের মধ্যেও কীর্ত্তির স্মৃতি কিছু থেকে যায়। আবর্তন-বিবর্তনের মধ্যে পরিবর্তনও হয়, শেষে কীর্ত্তি, কাহিনীতে পরিণত হয়। শহরের বাইরে এবং ভিতরে কীর্তিচাঁদের বহু কীর্ত্তি হয় তো অবলুপ্ত, অনেক কীর্ত্তি কালের অমোঘ বিধানে, আঘাত সংঘাতে জীর্ণ হয়ে তারই সাক্ষ্য বহন করছে; আবার অনেক কীর্ত্তি পরিবর্তিত হয়ে নতুন আঙ্গিকে আজও বিদ্যমান। শহরের দুটি কীর্তি পরিবর্ত্তিত হয়েও ঘোষণা করছে তাঁরই কীর্ত্তি, একটি মহন্ত-অস্থল অন্যটি ঁসর্ব্বমঙ্গলা বাড়ী।

মহন্ত-অস্থল —শহরের একেবারে পশ্চিমে রাজগঞ্জ নামক মহল্লায় অবস্থিত। এই অস্থলটি নিম্বার্ক সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণবীয় মঠ। এই মঠটি কীর্তিচাঁদের প্রতিষ্ঠিত একটি কীর্ত্তি। এখানে 'ঁরাধাদামোদর' বিগ্রহ আছেন। এই মন্দিরটি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। রাজ বংশানুচরিতে আছে,—

''যখন কীর্তিচাঁদ বিষ্ণুপুরাধিপতির সহিত সংগ্রামার্থে গমন করেন, কাঞ্চননগরস্থিত বারদ্বারী নামক আম্রকাননে একজন সন্ন্যাসী, রঘুনাথ জীউ বিগ্রহ লইয়া অবস্থান করিতেছিলেন। কীর্ত্তিচন্দ তথায় গমন করতঃ ভক্তি সহকারে রঘুনাথ জীউ ও সন্ন্যাসীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলে সন্ন্যাসী তাঁহাকে কহিলেন, আপনি যে সংগ্রামার্থে গমন করিতেছেন, তাহাতে নিশ্চয়

জয়লাভ করিবেন। কীর্ত্তিচন্দ্ কহিলেন ঃ প্রভো! যদি এই যুদ্ধে আমি জয়লাভ করি, তাহা হইলে এখানে প্রত্যাগমন করিয়াই, আমি আপনার রঘুনাথ জীউ ও সাধু সন্ন্যাসীদের সেবার্থে যথোপযুক্ত সম্পত্তি প্রদান করিব। দৈবানুগ্রহে তিনি যুদ্ধে জয়লাভ করিলেন, এবং বর্ধমানে প্রত্যাগমন করিয়াই, রাজগঞ্জে উক্ত দেবতার জন্য একটি উৎকৃষ্ট বাটী প্রস্তুত করাইয়া দিলেন এবং দেবতা ও অতিথিদিগের সেবার্থে কয়েকটি নিষ্কর মহল ও দেবত্র ভূমি প্রদান করিলেন। উক্ত মোহন্তের আশ্রমে যে নিত্য শত শত সাধু-সন্ন্যাসী প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়া পরিতৃপ্ত হইত। তাহাও কীর্তিচাঁদের একটি অতুল কীর্ত্তি।''

সর্বমঙ্গলা মন্দির ঃ—

শহর বর্ধমানের কেন্দ্রস্থলে বর্ধমানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সর্বমঙ্গলা দেবীর যে মন্দিরটি রয়েছে, তাও কীর্তিচাঁদেরই কীর্তি। তবে এই দেবী মূর্তি কে বা কবে এবং আদি পূজা বেদী কোথায় ছিল তা জানা যায় না। ৬ষ্ঠ শতকে কুব্জিকা তন্ত্রে শ্রী বর্ধমান মঙ্গলা দেবী পীঠের উল্লেখ আছে। পরবর্তীকালে আদি চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচনাকার মাণিক দত্ত, নূতন বর্ধমানকেই 'দেবীপীঠ' বড়বর্ধমান বলেছেন। এছাড়া রামানন্দ যতির চণ্ডীমঙ্গল কাব্য, মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্মমঙ্গল কাব্যে সর্বমঙ্গলা দেবীর উল্লেখ পাওয়া যায়। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর কাব্যেও দেবীর কথা আছে। রূপরাম চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গলে—

''বৰ্দ্ধমানে বন্দোদেবী সর্ব্বমঙ্গলা।
অধিষ্ঠান হন দেবী ঠিক দুপুর বেলা।।''

সুতরাং দেবী সর্বমঙ্গলা অতি প্রাচীন নিঃসন্দেহ। এখানে প্রশ্ন হচ্ছে দেবী এক্ষণে যে মন্দিরে অধিষ্ঠিতা সেই নবরত্ন মন্দিরটি কে নির্মাণ করেন? যে কারণে অনুমান করা যায়, চিত্রসেনের পূর্বে তাঁর পিতা কীর্তিচাঁদই দেবী মন্দিরটি নির্মাণ করিয়েছিলেন। দেবী মন্দিরের ঠিক দক্ষিণে আদি নাট্যমঞ্চ। তার দক্ষিণে তিনটি শিব মন্দির (দুটি তেজচাঁদ নির্মিত — কমলেশ্বর ও রামেশ্বর) এবং আরও যে দুটি আটচালা শিব মন্দির আছে সে দুটি চিত্রসেনের নির্মিত, যা মন্দির গাত্রে গ্রথিত শিলালিপি থেকে জানা যায়। এই শিবমন্দিরগুলি নির্মাণের পূর্বেই দেবী মন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল এবং তাঁদের পূর্ববর্তী রাজা কীর্তিচাঁদ (চিত্রসেনের পিতা) দেবীমন্দির নির্মাণ করিয়েছিলেন। সুতরাং সর্বমঙ্গলা মন্দির কীর্তিচাঁদের কীর্তি।

দেবী সম্বন্ধে প্রচীন কাহিনী শোনা যায়। বর্ধমানের উত্তরে বাহিরসর্বমঙ্গলা নামে একটি এলাকা আছে। স্থানটি তখন ধানক্ষেত, জলা জায়গা। অনেক পুকুরও এখানে ছিল। ওখানে যারা বাস করতো তাদের বেশীর ভাগই বর্গক্ষত্রিয় (বাগ্দি) সম্প্রদায়। ওরা ঐ জলা ও পুকুর থেকে জিওল মাছ, গুগলী, শামুক, কাঁকড়া প্রভৃতি ধরতো। একদিন একজনের জালে একটি

পাথর ওঠে। তারা ওই পাথরে গুগলী, শামুক থেঁতো করতো। শামুক, গুগলী, ঝিনুকের খোসাগুলি তার একপাশে জমা করে রাখতো। চূনারিরা সেগুলি কিনে নিয়ে গিয়ে পুড়িয়ে চূণ তৈরী করতো। ঐ পাথরটিও শামুক-ঝিনুকের খোসার সঙ্গে চূণারির ঘরে চলে যায়। ভাটিতে পোড়াবার সময় পাথরটি ঝিনুক ইত্যাদির খোসার সঙ্গে থেকে যায়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় আগুনে পুড়েও শিলাটির কোন বিকৃতি ঘটে নাই। সেই রাত্রেই স্বপ্নে বর্ধমান রাজাকে সর্বমঙ্গলা আদেশ দেন, আমি দামোদরের তীরে চূণের ভাটায় শিলারূপে আছি। আমায় উদ্ধার করে রাজবাড়ীর কাছে মন্দির তৈরী করে আমায় প্রতিষ্ঠা কর এবং পূজার ব্যবস্থা কর। ভোর না হতেই রাজা চূণভাটায় পাথরটি আনতে গিয়ে জানতে পারলেন তাঁর সেখানে পৌঁছানোর কিছুক্ষণ আগেই তিনজন ব্রাহ্মণ ওই শিলাটি পূজার জন্য নিয়ে গেছেন। শোনা মাত্র রাজা ব্রাহ্মণদের খোঁজে গিয়ে তাঁদের সঙ্গে দেখা করে মায়ের স্বপ্নাদেশের কথা জানিয়ে শিলাটি দেবার জন্য অনুরোধ করেন। ব্রাহ্মণগণ দেবী বিগ্রহটি রাজাকে দিতে অস্বীকার করেন। তখন রাজা তাঁদের বলেন, দেবীর অধিকারী তাঁরাই হবেন, তিনি কেবল দেবীর মন্দির নির্মাণ করিয়ে প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করবেন আর তাঁর পূজার সমস্ত ব্যয় তিনি করবেন। এই ব্যবস্থাতেই তাঁরা সম্মত হন। সেই মতই রাজবাড়ীর কাছে দেবীর নবরত্ন মন্দির নির্মাণ করিয়ে দেন। ব্রাহ্মণরা সেখানে দেবী প্রতিষ্ঠা করেন। তখন হতেই রাজা পূজার সমস্ত ব্যয় বহন করে আসছেন। এই হলো সর্ব্বমঙ্গলাদেবীর মন্দির নির্মাণ প্রসঙ্গ।

এছাড়াও কীর্তিচাঁদের সময়ে বর্ধমান জেলার বিভিন্ন স্থানে যে সব মন্দিরগুলি নির্মিত হয়েছিল সেগুলিও কীর্তিচাঁদের কীর্ত্তি বলে ধরা যেতে পারে। ঐ মন্দিরগুলির গঠন শৈলী পূর্বোল্লিখিত মন্দিরগুলির অনুরূপ। এখানে মন্দিরগুলির অবস্থান, স্থান ও নির্মাণের সময় উল্লেখ করা হলো।

জৌগ্রামের শিব-এর প্রতিষ্ঠা কাল ১৭০৯ খ্রীঃ, কামারপাড়ার শিব ১৭১০ খ্রীঃ অব্দ, খাঁদরার রাধামাধব ১৭২১ খ্রীঃ অব্দ, জাবুই-এর হরগৌরী ১৭২৬ খ্রীঃ অব্দ, রামগোপালপুরের লক্ষ্মীজনার্দন মন্দির ১৭২৬ খ্রীঃ অব্দ, বড়বৈনানের বিষ্ণু মন্দির ১৭৩৮ খ্রীঃ অব্দ, উখড়ার সীতারাম মন্দির ১৭৪০ খ্রীঃ অব্দে নির্মিত হয়েছিল।

অম্বিকা কালনায় জগন্নাথ বাটীর পার্শ্বে ভাণ্ডারহাটীর জগন্নাথ নামে যে জগন্নাথ মন্দিরটি আছে তা 'জগন্নাথবাটীর' জগন্নাথ মন্দির প্রতিষ্ঠার পূর্বে নির্মিত হয়েছিল। কথিত আছে কীর্তিচাঁদ ভাণ্ডারহাটী লুণ্ঠন করে ঐ জগন্নাথ মূর্তিটি অম্বিকা কালনায় একটি মন্দির নির্মাণ করে সেখানে এই মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। যেহেতু মূর্তিটি লুণ্ঠন করে আনা হয়েছিল তাই ঐ মূর্তিটিকে 'লুটের জগন্নাথ' বলে অভিহিত করা হয়েছে।

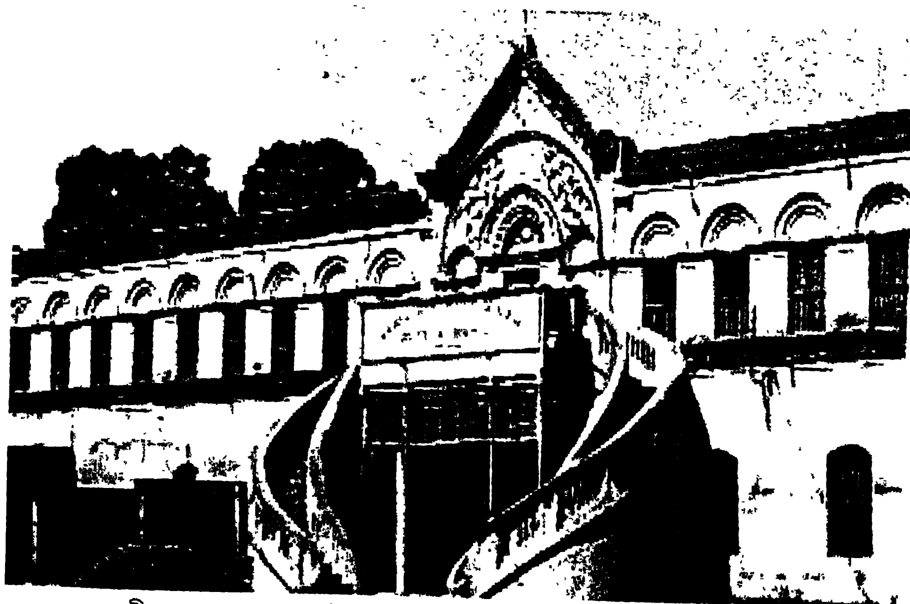
বীরকেশরী বীরেশ্বর জমিদারী প্রাপ্ত হয়ে তাঁর পিতামহের হত্যাকারী চিতুয়ার জমিদার, চন্দ্রকোনার রাজা, বিষ্ণুপুরের রাজা গোপাল সিংহ প্রভৃতিদের পরাজিত করেন এবং জয়লাভের প্রতীক হিসাবে "গোপাল সিংহের নিকট হইতে পারসী ভাষায় সুবর্ণাক্ষরে তদীয় নাম খোদিত যে বিচিত্র তরবারী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহা অদ্যাবধি রাজবাটীতে বিদ্যমান রহিয়াছে।" উক্ত তরবারি ও অঙ্গের বর্ম ছিল কীর্তিচাঁদের জীবন সহচর। ঐগুলি রাজবাড়ীর ধনাগারে রক্ষিত ছিল। বিজয়া দশমী ও মহারাজাদিগের পুণ্যাভিষেকের দিনে ওইগুলির পূজা হতো। ঐ তরবারিখানিকে কীর্তিচাঁদের 'তেগা' বলা হতো। তা ছাড়া যুদ্ধস্থল থেকে আনা একটি লৌহ গোলক রাজবাড়ীতে ছিল।

এই প্রসঙ্গে একটি কিংবদন্তী প্রচলিত ছিল, তাঁর জীবন সহচর নিজ তরবারি খানি বর্ধমানের অন্তর্গত কামারপাড়া গ্রামের এক কর্মকার একখানি তরবারি নির্মাণ করে বিক্রী করার জন্য রাজবাড়ী গিয়ে দারোয়ান মারফৎ তরবারিখানি কীর্তিচাঁদের কাছে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু তিনি তরবারি পরীক্ষা না করেই তা কর্মকারকে ফেরত পাঠান। কর্মকার দুঃখিত হয়ে বলেন, তিনি বহু যত্ন ও পরিশ্রম করে তরবারিটি তৈরী করেছিলেন এবং এদেশে ঐ তরবারি ধারণ করার উপযুক্ত একমাত্র ব্যক্তি বীরবর কীর্তিচন্দ্র। কিন্তু তিনি ইহার গুণ বিচার না করেই ফিরিয়ে দিলেন। তবে তিন দিনের মধ্যেই এই তরবারির গুণের পরিচয় পাবেন। এই ঘটনার তিন দিন পর রাজবাটীর প্রধান দ্বারের নিকট একটি প্রকাণ্ড গাছ ছিল। ঝড়ঝঞ্ঝা ছাড়া হঠাৎ গাছটি মাটিতে পড়ে যাওয়ায় রাজপুরুষেরা তার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখেন গাছটি এক কোপে দ্বিখণ্ডিত হয়ে পড়ে আছে। কীর্তিচাঁদ আশ্চর্য হয়ে গাছটি দেখে বুঝলেন, সেই কর্মকারের তরবারির এক আঘাতেই ছেদিত হয়েছে। তখন তিনি কর্মকারকে ডেকে এনে উচিত মূল্যে তরবারিখানি ক্রয় করলেন ও তিনি তাঁকে ওইরূপ তরবারি আর তৈরী না করতে আদেশ দিয়ে, স্বচ্ছন্দে তাঁর জীবিকা নির্বাহ উপযোগী প্রচুর পরিমাণে নিষ্কর জমি দান করেন।

কীর্তিচাঁদ যখন বাংলার উল্লেখযোগ্য বিশাল জমিদার "তৎকালে বঙ্গদেশে শস্যাদি অতি সুলভ মূল্যে বিক্রীত হইত। ১৭৩৯ খ্রীঃ অব্দে সুজাউদ্দিন বঙ্গদেশে সুবেদার নিযুক্ত হইলে তদীয় পুত্র সরফরাজ খাঁ ঢাকার নায়েব নাজিম ও মেদিনীপুরের রাজা যশবন্ত সিংহ ঢাকার দেওয়ান পদে অভিষিক্ত হয়েন। এই সময়ে ঢাকায় ১ টাকায় ৮ মণ করিয়া চাউল বিক্রয় হইয়াছিল। শাসন কর্ত্তা ও তদীয় মন্ত্রীবর্গের সুশাসন ও সুব্যবস্থার গুণেই দ্রব্যাদি ঈদৃশ সুলভ মূল্যে প্রাপ্ত হওয়া যাইত। ১৬৬৪/৬৫ খ্রীঃ অব্দে নবাব শায়েস্তা খাঁর শাসন সময়েও বঙ্গদেশে একবার ৵৹ (দু আনা) চাউলের মণ বিক্রীত হইয়াছিল। যখন চাউলের



রাধা দামোদর জীউ মন্দির (মহন্ত অস্থল)



অতীতের মহন্ত অস্থল বর্তমানে হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

মণ ০/·, তখন অপরাপর খাদ্য দ্রব্যের তো কথাই নাই, এক প্রকার বিনা মূল্যে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বৰ্ত্তমান কালের সহিত তাদৃশ্য স্বর্ণযুগের তুলনা করিলে কি ভয়ানক পরিবর্ত্তনই দৃষ্ট হয়! সে সমস্ত যেন এক প্রকার স্বপ্ন কল্পিত ঘটনা বলিয়াই মনে হয়। স্বর্ণ প্রসবিনী বঙ্গ ভূমি প্রকৃত স্বর্ণ প্রসব করিতেন এবং তাঁহার সন্তানগণ প্রকৃতই স্বর্গসুখোপভোগ করিতেন। দুঃসহ অন্নচিন্তার মর্ম্মভেদী মর্ম্ম তাঁহারা আদৌ অবগত ছিলেন না। এই কারণে তাঁহারা অকাতরে অজস্র অর্থব্যয় করিয়া অতুল কীর্তি সমূহ স্থাপন করতঃ আপনাদিগকে চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন।" (রাজবংশানুচরিত পৃঃ ৩৫)

পিতার মৃত্যুর পর কীর্তিচাঁদ ৩৮ বছর জীবিত থেকে বহু কীর্ত্তি ও প্রভূত ভূসম্পত্তি রেখে গেছেন। বাদশাহ প্রদত্ত ৫৭টি পরগণা বিশিষ্ট বিশাল জমিদারীর অধিকার প্রাপ্ত হয়ে সুবার রাজধনাগারে বছরে ২০,৪৭,৫০৬ (কুড়ি লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার, পাঁচ শত ছয় টাকা) রাজস্ব প্রদান করতেন। (*Fifth report from the select committee of the East India Company*)

সন ১১৪৭ সাল, ইং ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় সপ্তমী তিথিতে কীর্তিচাঁদ পরলোক গমন করেন। দাঁইহাট গ্রামে গঙ্গাতীরে তাঁহার অস্থি সমাহিত হয়। বর্ধমান রাজবংশের নিয়ম আছে যে, কোন রাজা বা রাজমহিষীর মৃত্যু হইলে, তদীয় মৃত-দেহের যথারীতি সৎকার করতঃ কিঞ্চিৎ অস্থি গঙ্গাতীরে সমাহিত করিয়া তদুপরি একটি সমাধি মন্দির নির্মাণ পূর্বক তন্নিকটে একটি শালগ্রাম শিলা প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং প্রত্যহ ঐ শিলা যথা শাস্ত্র পূজা ও ভোগ প্রদান করিয়া তদ্দারা অতিথি ভোজন করানো হয়। এতদ্ভিন্ন তাঁহারা জীবিতাবস্থায় যেরূপ আহার ব্যবহার করিতেন সমাধি স্থলেও তাঁহাদের উদ্দেশে তদনুরূপ ভোজ্য, বস্ত্র-আভরণাদি প্রদত্ত হইয়া থাকে।

এইরূপ সমাধিকে সমাজ বলে। পূর্বতন রাজাদিগের সমাজ দাঁইহাটেতেই প্রতিষ্ঠিত আছে। মহারাণী বিষ্ণুকুমারীর পূর্ববর্তী রাজা ও রাজমহিষীদের সমাজ দাঁইহাটেতেই আছে। এছাড়াও মৃত মহারাজা বা মহারাণীদিগের "কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অস্থি লইয়া শ্রীক্ষেত্রধামে ও শ্রীবৃন্দাবন ধামে সমাহিত করিয়া তদুপরি এক একটি সমাধি মন্দির প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হয় এবং তত্রস্থ দেবতার প্রসাদ দ্বারা স্বর্গীয় মহারাজা ও মহারাণীদিগের উদ্দেশ্যে ভোগ প্রদান করতঃ নিত্য অতিথি সৎকার হইয়া থাকে এবং কিঞ্চিৎ অস্থি কাশীধামস্থ মণিকর্ণিকা তীর্থেও প্রদান করিবার প্রথা আছে।" (রাজবংশানুচরিত পৃঃ ৩৪)। বর্তমানে ঐ প্রথা প্রচলিত আছে কি নাই তা বলা সম্ভব নয়। কারণ, জমিদারী প্রথা ও রাজতন্ত্রের বিলুপ্তি ঘটেছে।

কীর্তিচাঁদ মহিষী রাজরাজেশ্বরী কীর্ত্তির বিশেষ পরিচয় না পাওয়া গেলেও, রাণীসায়রের

পশ্চিম পার্শ্বে, অধুনা খোষবাগানে ফৌজদারী কালীমাতার মন্দিরের পাশে রাজরাজেশ্বর শিব মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন। কীর্তিচাঁদ আর যে ফরমান পান তা এখানে উদ্ধৃত হল ঃ—

মোহর

সাহেব কোরাণ, ২য় গাজী বাদসা

আবুল ফতা নসীরদ্দীন মহম্মদ,

পিতা, মহম্মদ জাহান সা বাহাদুর,

পিতা, সাহ আলম বাদসা,

পিতা, আলমগীর বাদসা,

পিতা, সাজাহান বাদসা,

পিতা, জাহাঙ্গির বাদসা,

পিতা, আকবর বাদসা,

পিতা, হুমায়ুন বাদসা,

পিতা বাবর সা,

পিতা, সেখ উমার সা,

পিতা সুলতান সাইয়দ সা,

পিতা, সুলতান মহাম্মদ সা,

পিতা, মিরণ সা,

পিতা, সাহেব কেরাণ

আমীর তাইমুর।

আবুল ফতা নসীরুদ্দিন মহম্মদ বাদসা গাজী

উমদাতল মুলুক, বকসী উল মুলুক, সমসামদ্দৌলা, আমীরি আমীর, মনসুর জঙ্গ বাহাদুরের অনুরোধানুসারে আদ্যন্ত বিজয় সম্বলিত, এই—

শুভক্ষণে মহামান্য পরম বিশ্বাসপ্রদ ফরমানে প্রচার হইল যে — দুরাচার সোভা ও হেম্মত এবং বিষ্ণুপুরের জমীদার রঘুনাথ সিংহের মৃত্যু হওয়ায় বঙ্গদেশের সুবার অধিকারের অন্তর্গত চাকলে বর্দ্ধমান, সরকার সলিমাবাদের অন্তর্গত, পরগণে ফতাহপুর ওগয়রহার জমীদারি, চাকলা বর্দ্ধমান ওগয়রহার জমীদার কৃষ্ণরামের পৌত্র ও জগৎরামের পুত্র কীর্তিচান্দকে প্রদান করিলাম। ঈদৃশ অনুগ্রহের জন্য এপক্ষকে ধন্যবাদ প্রদান করতঃ, নিয়ম অনুসারে পরগণে চন্দ্রকোণা ওগয়রহার রাজস্ব আদায় বাদে, রসুম, নানকর ও সরঞ্জামি

গ্রহণ করিবে। চিরকাল বাদসাহের অনুগত থাকিয়া তাঁহার হিতাভিলাষী হইবে ও রাজ-ভক্তি প্রদর্শন করিবে। প্রজা বৃদ্ধি ও দুর্বৃত্তদিগকে সর্ব্বদা দমন করিবার যত্ন করিবে। উপরোক্ত পরগণায় যাতে কোন প্রকার অত্যাচার না হয়, প্রজাগণকে সতত সন্তুষ্ট রাখিয়া, যাহাতে কৃষি কার্য্যের উন্নতি সাধন হয় তৎপক্ষে যত্নবান হইবে। এ পক্ষের মহাল খালেসার তহশীল ও জায়গীরদারদিগের নিকট হইতে খাজনা আদায় সম্বন্ধে, সরকারী আমলা ও গোমস্তাগণের সাহায্য করিবে। সুবার ও তাঁহার নায়েবগণের অধীনতা স্বীকার করতঃ তাঁহাদের আদেশ প্রতিপালন করিবে। বাদসাহের অধীনতা স্বীকারে, স্বীয় ধন ও সম্মানেরই উৎকর্ষতা জ্ঞান করতঃ, উপরোক্ত আদেশ সকল প্রতিপালন করাই তাহার কর্ত্তব্য। ১৫ রমজান ১৯ জুলুস।

সন ১৭ জুলুস ১৫ সাবান তারিখের, মুতমনল মোলক সোজাঅদ্দৌলা সোজা অদ্দিন মহাম্মদ খাঁ বাহাদুর আসদ জঙ্গের মোহর যুক্ত পত্রে প্রকাশ হইলে যে চাকলে বর্দ্ধমান ওগয়রহার জমীদার মৃত কিষণরাম সরকারের নজরাণা স্বরূপ এক লক্ষ টাকা প্রদান করতঃ স্বনামে জমীদারি প্রাপ্ত হইয়াছিল। পরে তদীয় পুত্র জগৎও পিতার ন্যায় নজরাণা প্রদান করতঃ জমীদারি প্রাপ্ত হয়। তৎপরে পরগণে চন্দ্রকোণার জমীদার রঘুনাথ সিংহ, এবং পরগণে বরদা চিতুয়া ও বয়রার জমীদার বিদ্রোহী সোভা সিংহ, সরকারের বিপক্ষতাচরণ করতঃ রাজস্ব না দিয়া, চাকলে বর্দ্ধমান এবং মুর্শিদাবাদ ওগয়রহা অধিকার করিয়া, মৃত কিষণরামের ধনরত্নাদি লুণ্ঠন ও অন্যূন পঞ্চবিংশতি জন পরিবারবর্গসহ তাহাকে হত্যা করতঃ উক্ত দুরাচারও হত হয়। কিয়দ্দিবস পরে কীর্ত্তিচাঁদ বাদসাহি সৈন্যের সহায়তায়, শোভার, হেম্মত নামক দুরাচার ভ্রাতার বিরুদ্ধে গমন করিলে, উক্ত দুরাত্মা অরণ্যমধ্যে পলায়ন করে। কীর্ত্তিচাঁদের ঈদৃশ কার্য্য-তৎপরতা ও আনুগত্য দৃষ্টে উক্ত জমীদারি তাহাকেই প্রদান করায়, প্রতি বৎসরে নিরূপিত সময়ে, বিনা আপত্যে সরকারের রাজস্ব প্রদান করিতেছে। এক্ষণে বাদসাহের আশ্রিতের নিকট হইতে নজরাণা-স্বরূপ পঁচিশ হাজার টাকা দুই বৎসরের মধ্যে গ্রহণ পূর্ব্বক পরগণে চন্দ্রকোণা ওগয়রহার ফরমান প্রদানের আজ্ঞা হইল।

মহর ২৭ মৌজা।

তপশীল মহল

উক্ত ব্যক্তির সাবেক ফরমান সওয়ায়

সরকার সলিমাবাদ ওগয়রহ

১৪ মহল

সরকারের ধার্য্য জমা

৩৯৯৯৯৮৶৪

সরকার সলিমাবাদ

৫ মহল

সরকারের ধার্য্য জমা

৭৩৩৪২।।৶ ১৩।।০

সরকার মন্দারণ

৮ মহল

সরকারের ধার্য্য জমা

২৪৪২৩১।১২

ফতেপুর

বারাসত

চিতুয়া

চন্দ্রকোণা

জঙ্গলবার

বলসখি

ঝাকরা

মাফরোল

বিকাল বারাসত

বেন্টরা

বরোদা

গাজুরা

মনোহর সাহির অন্তর্গত

সরকার সরিফাবাদ

সরকারের ধার্য্য জমা

৬১৫২৪৸।।০

উপরোক্ত কীর্ত্তিচন্দের পুত্র

জমীদার চিত্রসেনের অধিকারস্থ

মহল

৬ মহল

৭ মৌজা

বাকড়ি ওগয়রহ সরকার

গোয়ালপাড়া

৪ মহল।

ধার্য্য জমা

১৬০১৲

নিকাশ বরদা।

বাকড়ি

রামপুর

মতাসেমপুর।

ইন্দ্রায়ণ

কিসমত বারাসত

মণ্ডলঘাট

সরকারের ধার্য্য জমা

১৬৯৯২৭।৶ ২।।

৩ মহল

সরকারের ধার্য্য জমা

৩৯২৬৮৲ ৫।

সরকার মন্দারণ

৩ মহল।

ধার্য্য জমা

১২৮৩৮৬৸৶৯

সরকারের সরিফাবাদ ওগয়রহ

মৌজা সর্ব্বানন্দ সানি

পরগণা কুতবপুর

মানকর ৫ মৌজা

কিসমত বেলিয়ালন্দরী সরকারের ধার্য্য জমা

সরকার সরিফাবাদ ৬৯৯।০

৭ মৌজা

সরকারের ধার্য্য জমা

১৩৭২৲৫ ।।

মৃজাপুর ওগয়রহ

পরগণা মনোহর সাহি

২ মৌজা

সরকারের ধার্য্য জমা

১২৭৩ ।।৶১০

মোহর

নসরত জং এতমাদত উদ্দৌলা উজীরল মুলক কমরদ্দিন হোসেন খাঁ বাহাদুর
ফিদবী মহাম্মদ সা ঘোরী বাদসা। তারিখ ৬ জুলুস ১১৩৬।

মোহর

(মহাম্মদ সা বাদসা গাজী ফিদবী নসরৎজঙ্গ এতেমাদদ্দৌলা উজীরল
মোলক কমরদ্দিন হোসেন খাঁ বাহাদুর) ১১৩৬

বঙ্গদেশের সুবার এলাকাস্থ সরকার সেলিমাবাদ পরগণে ফতাহপুর ওগয়রহার বর্ত্তমান ও ভাবী মোৎসদ্দিয়ান অবগত হইবেন যে, সন ১৭ জুলুস ১৫ রমজান তারিখের মহামান্য ফরমানের মর্ম্মানুসারে, বিষ্ণুপুরের জমিদার, সোভা ও হিম্মত এবং রঘুনাথ সিংহের মরণান্তে, পরগণা মজকুরার জমীদারি কৃষ্ণরামের পৌত্র এবং জগৎরামের পুত্র কীর্ত্তিচাঁদকে প্রদান করতঃ চকলা বর্দ্ধমান ওগয়রহার জমীদারির সামিল করা হইল। তাঁহার কর্ত্তব্য সর্ব্বদা সাবধানের সহিত স্বীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন। সরকারের মালগুজারী বাদে পরগণে চন্দ্রকোনা ওগয়রহার, সরঞ্জামী, নানকর ও রসুম গ্রহণ করেন। দেশ মধ্যে প্রজা বৃদ্ধি ও কৃষিকার্য্যের উন্নতি সাধন পক্ষে যত্নবান হয়েন। তস্কর ও দস্যুদ্দিগকে দমন করিতে সর্ব্বদা যত্ন ও চেষ্টা করেন। কোন দুষ্ট লোক কর্ত্তৃক দেশমধ্যে কোন প্রকার দৌরাত্ম্য না হয়। বৃদ্ধি মহাল, খালেসা ও জায়গীরদারদিগের নিকট হইতে রাজস্ব আদায় সম্বন্ধে সরকারি আমলা ও গোমস্তাগণকে যথাসাধ্য সাহায্য করেন। সুবার নাজেম ও অন্যান্য নায়েবদিগকে মান্য করেন। অধিবাসীগণের সহিত সদ্ভাব রক্ষা করতঃ বাদসাহের অধীনতা স্বীকার করিয়া রাজভক্তি প্রদর্শন করেন। ইতি ৫ জিকদা সন ১৯ জুলস।

রাজা চিত্রসেন

(১৭৪০-১৭৪৪)

কীর্তিচাঁদের পরলোক গমনের পর তাঁর একমাত্র পুত্র চিত্রসেন রায় পিতার বিপুল সম্পত্তি ও বিশাল জমিদারীর মালিক হন। ইনিই প্রথম দিল্লীর বাদশাহের নিকট 'রাজা' উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি দিল্লীশ্বর, বঙ্গেশ্বর এবং দিল্লীশ্বরের প্রধান মন্ত্রীর নিকট হতে যে সব ফরমান ও পরোয়ানা পেয়েছিলেন তার মর্ম পর পর উদ্ধৃত করা হলো। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন তিনি পিতার জীবিতকালেও বহু ফরমান পেয়েছিলেন।

১ম — ১৭২৯ খ্রীষ্টাব্দে দেওয়ান সরফরাজ খাঁর মোহর ও কাজি মহাম্মদ ওয়ালি স্বাক্ষরিত পরোয়ানার মর্ম্ম ঃ—

বঙ্গদেশে সুবার এলাকাস্থ মহাল খালেসা সরিফা, চাকলে বর্দ্ধমান সরকার সলিমাবাদের ইন্দ্রায়ণ পরগণার পূর্ব্বজমিদার রামভদ্র চৌধুরীদিগের পরিবর্ত্তে ১১৩৪ সাল হইতে সরকারের প্রাপ্য নজরাণা ও বকেয়া রাজস্ব গ্রহণে, কীর্ত্তিচন্দের পুত্র চিত্রসেনকে উক্ত পরগণা প্রদত্ত হইল। সরকারি রাজস্ব যথাসময়ে রাজধনাগারে প্রদান করেন। সকলের সহিত সদ্ভাব স্থাপন করতঃ দেশমধ্যে যাহাতে দস্যু ও তস্করের উপদ্রব না হয়, তৎপক্ষে বিশেষ যত্নবান হইবেন। ইত্যাদি সন, ১০ জুলুস, তারিখ ২০ রবিয়স সানি।

২য়— ১৭৩১ খ্রীষ্টাব্দে (মহাম্মদ সা বাদশাহ্ গাজি ফিদ্‌বী নসরৎ জঙ্গ এতে মাদতদ্দৌলা উজীরল মোমালেক কমরুদ্দিন খাঁ বাহাদুর) মোহরাঙ্কিত পরোয়ানার মর্ম।

যেহেতু বাদসাহের হুজুর হইতে জমিদারী ও রাজা উপাধি ঃ পারচা-খেলাত এবং এক জোড়া মুক্তা রাজা চিত্রসেনকে প্রদান করা হইয়াছে, তজ্জন্য বাদসাহকে ধন্যবাদ প্রদান করতঃ তাঁহার চিরাণুগত থাকাই কর্ত্তব্য ইত্যাদি ঃ ১৫ সওয়াল, ১২ জুলুস।

৩য়— ১৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে (মহাম্মদসা বাদসাহ্ গাজী ফিদ্‌বী সরফরাজ খাঁ বাহাদুর নশীরি) মোহরাঙ্কিত পরোয়ানার মর্ম্ম ঃ–

বঙ্গদেশে সুবার এলাস্থ মহাল খালেসা সরিফা মোতালক চাকলে শালগ্রাম, সরকার মন্দারণ ওগয়রহা পরগণে মণ্ডল ঘাটে পূর্ব জমিদার জগন্নাথ চৌধুরী দিগের পরিবর্ত্তে বর্দ্ধমান ওগয়রহার জমিদার কীর্ত্তিচন্দের পুত্র চিত্রসেনকে ১১৩৮ সাল হইতে উক্ত জমিদারী প্রদত্ত হইল ইত্যাদি ঃ ১লা সওয়াল, ১৩ জুলুস।

৪র্থ— ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে কীর্ত্তিচন্দের পরলোক গমনের পর রাজা চিত্রসেনকে তদীয় ত্যজ্য সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী বলিয়া দিল্লীশ্বরের প্রদত্ত (আবল ফতাহ নশীরুদ্দিন মহাম্মদ

বাদসা গাজী) মোহরাঙ্কিত ফরমানের মর্ম্ম।

এই শুভ সময়ে ওমদতর মূলক বফ্‌সিয়ান মোমালেক আমীরল ওমরা সমসামদ্দৌলা খাঁন দৌরাণ খাঁ বাহাদুর মনসুর জঙ্গের নিবেদনানুসারে মহামান্য পরম বিশ্বাসপ্রদ প্রথম ফরমানে প্রচার হইল যে, বঙ্গদেশের সুবার এলেকাস্ত চাকলে বর্দ্ধমান ওগয়রহার জমিদার কীর্ত্তিচন্দ্‌ পরলোক গমন করায় তদীয় পুত্র চিত্র সেন-কে রাজা উপাধি সহ জমিদারী প্রদত্ত হইল ইত্যাদি। ২০ রমজান ২১ জুলুস।

৫ম— ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে ঐ সম্বন্ধে বাদসাহের প্রদত্ত ফরমানের (মহাম্মদ সা বাদশাহ্‌ গাজী ফিদ্‌বী উজীরল মমালেক নসরৎ জঙ্গ এতেমাদদ্দৌলা কমরুদ্দিন খাঁ বাহাদুর) মোহরাঙ্কিত পরওয়ানা।

৬ষ্ঠ— ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে ঐ সম্বন্ধে (মহাম্মদ সা বাদশাহ্‌ গাজী ফিদ্‌বী আলাউদ্দৌলা সরফরাজ খাঁ বাহাদুর নসরৎ জঙ্গ) মোহরাঙ্কিত পরওয়ানা।

৭ম— ১৭৪১ খ্রীষ্টাব্দ (মহাম্মদ সা বাদশাহ্‌ গাজী ফিদ্‌বী নওয়াজেস মহাম্মদ খাঁ) মোহরাঙ্কিত পরওয়ানার মর্ম্ম।

বঙ্গদেশের সুবার নাজিম মাননীয় মহাম্মদ আলিবর্দ্দি খাঁ মহব্বত জঙ্গের স্বাক্ষরিত আবেদন পত্রের মর্ম্মানুসারে পরগণে আর্শার পূর্ব জমিদার গোবিন্দদেব পরলোক গমন করায় চাকলে বর্দ্ধমান ওগয়রহার জমিদার রাজা চিত্রসেনের নিকট হইতে সরকারের নজরানা গ্রহণ করতঃ তাঁহাকে উক্ত জমিদারী প্রদত্ত হইল ইত্যাদি। ১লা রবিয়স সানি ২২ জুলুস।

৮ম— ১৭৪১ খ্রীষ্টাব্দে (মহাম্মদ সা বাদশাহ গাজী ফিদ্‌বী মহাম্মদ আলিবর্দ্দি খাঁ বাহাদুর) মোহরাঙ্কিত পরওয়ানার মর্ম্ম; সুবে উড়িষ্যার এলেকাধীন সরকার গোয়ালপাড়ার সামিল পরগণে ব্রাহ্মণভূমের জমিদার ত্রিলোচনের অসদ্ব্যবহারে প্রজাগণ উৎপীড়িত হওয়ায় এবং যথাসময়ে সরকারের রাজস্ব পরিষোধ না করিয়া পলায়ণ করার বিবরণ সদরের কানুনগো ইন্দ্রজিতের আবেদন পত্রে প্রকাশ হওয়ায়, উক্ত ত্রিলোচনের পরিবর্তে চাকলে বর্দ্ধমান ওগয়রহার জমিদার রাজা চিত্রসেনকে উক্ত পরগণা প্রদত্ত হইল। দেশের উন্নতি, দস্যু ও তস্কর হইতে দেশ রক্ষা ও কৃষী কার্য্যের উন্নতি সাধনে যত্নবান হওয়া তাঁহার কর্ত্তব্য ইত্যাদি। ১৯ রবিয়ল আউল ২২ জুলুস।

৯ম— ১৭৪৫ খ্রীষ্টাব্দে (উজীরল মোমালেক কমরউদ্দিন খাঁ বাহাদুর) মোহরাঙ্কিত চিত্রসেন রায়ের পিতৃ সম্পত্তি প্রাপ্তির আমল নামা। ৯ সফর ২৬ জুলুস।

আর্শা পরগণা রাজা চিত্রসেনকে প্রদত্ত হইবার পর, নথু নামক কোন ব্যক্তি তাহাতে একটি মিনার প্রস্তুত করে। রাজা চিত্রসেন তাহাকে উক্ত মিনার ভঙ্গ করিবার আদেশ করিলে

নথু মিনারটি ভঙ্গ না করায় রাজা তৎসম্বন্ধে দিল্লীশ্বর সমীপে আবেদন করিলে, দিল্লীশ্বর তৎসম্বন্ধে যে অনুমতিপত্র সহ খেলাত প্রদান করেন তাহার মর্ম্ম।

১০ম— (মহাম্মদ সাহ বাদশাহ গাজী ফিদ্‌বী নওয়াজেস মহাম্মদ খাঁ বাহাদুর সাহামত জঙ্গ) মোহরাঙ্কিত।

প্রেরিত পত্রে আপনার প্রতি বাদশাহের বিশেষ অনুগ্রহ, আর্শা পরগণা প্রাপ্তি ও নথু মিনার ভাঙ্গিবার অনুমতি অমান্য করা ইত্যাদি সংবাদ অবগত হইলাম। হুজুর হইতে মিনার ভাঙ্গিবার জন্য পুনরায় উহাকে পরওয়ানা প্রেরণ করা হইল। বোধ হয় এতদিন ভাঙ্গিয়াছে। আপনার জন্য খাসা খেলাত ও একটি হস্তী এবং সেনাপতি মাণিকচাঁদের জন্য খেলাত ও একটি ঘোটক বাদশাহের আদেশানুসারে উকীলের নিকট প্রেরণ করা হইল ইত্যাদি। ১৫ সাবান।

ব্রাহ্মণভূমি পরগণা প্রাপ্ত হইবার পর ১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দে রাজা চিত্রসেন রায় দিল্লীশ্বরের নিকট হইতে খেলাত ও সনন্দ প্রাপ্ত হয়েন।

১১শ— (মহাম্মদ সা বাদসা গাজী ও রাজা ইন্দ্রজিৎ) মোহরাঙ্কিত সুবা উড়িষ্যার এলেকাধীন সরকার গোয়াল পাড়ার সামীল পরগণে ব্রাহ্মণভূমি জমিদার রাজা চিত্রসেন রায়কে নিম্নলিখিত খেলাত সহ সনন্দ প্রদত্ত হইল।

খেলাত।
ছত্র।
আস্পীনাকারা।
আড়ানী।

১২শ— ঐ সম্বন্ধে বঙ্গেশ্বরের (মহাম্মদ শা বাদসাহগাজী ফিদবী মহাম্মদ আলিবর্দ্দি খাঁ মহাব্বতে জঙ্গ বাহাদুর) মোহরাঙ্কিত পরওয়ানা ১৭, রবিয়স সানি, ২৩ জুলুস।

সন ১১৫১ সাল ইং ১৭৪৪ খ্রীষ্টাব্দ রাজা চিত্রসেন রায় আর্শা পরগণার মাল গুজারি প্রদান করতঃ যে দাখিলা প্রাপ্ত হয়েন, তাহার প্রতিলিপি প্রদত্ত হইল। দাখিলা খানি পারসী অক্ষরে লিখিত। এখানে বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইল।

মোহর।

মহাম্মদ্ সা বাদসাহ গাজী
ফিদ্‌বী আলিনকী
দাখিলা
বঙ্গদেশের সুবার অধীনস্থ চাকলা

মোহর
মহাম্মদ সা বাদসাহ
গাজী
বান্দা কৃপারাম
সন ২ জুলুস

মুর্শিদাবাদ এলেকার বক্তেয়ার সিংহ খাজাঞ্চির তহবীল বাবত পরগণে আর্শা ওগয়রহার জমিদার রাজা চিত্রসেনের ১১৫১ সালের খাজনা আলিনকী দারগার এহতেমামে আরজী সহ সরকারী ধনাগারে দাখিল হইল।

মোহর।

মহাম্মদ সা বাদসাহ গাজী

বান্দা বক্তেয়ার সিংহ

আদায়	মঃ চৌত্রিশ হাজার ছয় শত
১৯ জিলহেজ্জ সন ২৭ হিজরি	পঁচিশ টাকা তের আনা
৮১৪৪৮/০	কিস্তি
১৩ মহরম সন ঐ	৮১৪৪৮/০
২৫০০৲	২১৬৮৲
১লা সফর সন ঐ	৮৮০০৲
১৯৯৫।/৬	৭২.,
৭ রবিয়ল আউল	৫৫৮০৲
৫১১৩৲ ইত্যাদি	৪৯২০৲
৭ রবিয়ল আউল সন, ২৭ জলুস।	ইত্যাদি

রাজা চিত্রসেন এইরূপ ১২ খানি ফরমান, সনদ ও পরোয়ানা পেয়েছিলেন। তাঁর কার্যদক্ষতা ও সদ্‌গুণে স্বয়ং দিল্লীশ্বর এবং সাম্রাজ্যের সকল প্রধান প্রধান কর্মচারীগণ তাঁর প্রতি অত্যন্ত পরিতুষ্ট ছিলেন। সেই সময় বাংলাদেশে তাঁর মান সম্ভ্রমের শেষ ছিল না। তৎকালীন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রধান কর্মাধ্যক্ষের নিকটেও তাঁর যথেষ্ট সম্মান ছিল।

রাজা চিত্রসেন রায় পিতার বর্তমানেই ১৭২৯ খ্রীষ্টাব্দে ইন্দ্রায়ণ পরগণা, ১৭৩১খ্রীঃ দিল্লীশ্বরের নিকট হতে 'রাজা' উপাধি এবং ১৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে মণ্ডলঘাট পরগণার জমিদারী সনদ পান। তখন মণ্ডলঘাট ও আর্শা পরগণার বার্ষিক ২ লক্ষ টাকা রাজস্ব ধার্য ছিল। কীর্তিমান কীর্তিচন্দ্র জীবিত থাকাকালীন, পুত্র চিত্র সেন 'রাজা' উপাধি ভূষিত হয়েছিলেন তার কোন কারণ জানা যায় না।

রাজা চিত্রসেন ও তাঁর পরবর্তী রাজা তিলোকচাঁদ দিল্লীশ্বরের নিকট হতে যে সমস্ত

জমিদারীর সনদ ও ফরমান পেয়েছিলেন, তাতে ঐ সমস্ত জমিদারীর শাসনভার সম্পূর্ণ রূপে অর্পিত হয়েছিল। প্রতি ফরমানেই উল্লেখ ছিল, মাদকদ্রব্য যাতে দেশ মধ্যে প্রচলিত করা না হয়, সে দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখার নির্দেশ ছিল। তাছাড়া ফরমানে আরও উল্লেখ ছিল, রাজ্যমধ্যে কৃষিকর্মের উন্নতি সাধন, দস্যু ও তস্করের অত্যাচার নিবারণ ও তাদের যথোচিত দণ্ড বিধান এবং পথিকগণের গমনাগমনের সুবিধা বিধান করবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে সেই সময় 'বর্ধমান রাজ্য' একটি করদ রাজ্য হিসাবে পরিগণিত হতো। সরকারী রাজস্ব ছাড়া, সুবার সঙ্গে আর কোন বিষয়েই কোন সংস্রব ছিল না এবং সুবাও আভ্যন্তরিন কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতেন না। রাজা চিত্রসেন বাদশাহের অনুমতি অনুসারে হুগলীর ফৌজদার পদে নিযুক্ত হয়ে সেখানকার অন্যান্য স্থানের ফৌজদারী আব্ওয়াব্ কানুনগোর নজরাণা এবং তাঁর পিতার বিজিত চন্দ্রকোণা, বরদা ও ভুরসুট প্রভৃতি স্থানের নজরাণা গ্রহণ করবার ক্ষমতা পেয়েছিলেন। সেই সময় বাদশাহের বিনা অনুমতিতে কোন জমিদারই প্রজার নিকট হতে নজরাণা গ্রহণ করতে পারতেন না, রাজা চিত্রসেনেরই সেই ক্ষমতা ছিল। তিনি বার্ষিক ২২,৫১,৩০৬ টাকা রাজস্ব এবং জায়গীর তহবিল ইত্যাদি বাবদ বার্ষিক ১৯,১৬৬ টাকা মোট ২২,৭০,৪৭২ টাকা বঙ্গেশ্বরের ধনাগারে দিতেন। তিনি বর্ধমান রাজবংশের মর্যাদা ও গৌরব বৃদ্ধি করেন এবং তাঁর কর্মকুশলতায়, ন্যায় পরায়ণতায় দিল্লীশ্বর তাঁকে 'রাজছত্র' ধারণের ক্ষমতা প্রদান করেন।

রাজা চিত্রসেনের পারিবারিক ও দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ঃ —

রাজা চিত্রসেনের দুই মহিষী ছিলেন। জ্যেষ্ঠা রাণী ছঙ্গকুমারী ছিলেন কাসীরাম সেট তলওয়ার কন্যা, ও পরাণচাঁদ সেট তলওয়ারের পৌত্রী। পরাণচাঁদ পঞ্জাব প্রদেশ থেকে এসে মুর্শিদাবাদে বসবাস করতে থাকেন। কনিষ্ঠা রাণী ইন্দুকুমারী ছিলেন ধরমচাঁদ মেহেরার কন্যা। ধরমচাঁদ মেহেরা কানপুর থেকে অম্বিকায় এসে বসতি স্থাপন করেন। দুই মহিষীরই কোন সন্তানাদি হয় নাই। রাজা চিত্রসেন ছিলেন শান্তিপ্রিয় ও নিষ্ঠাবান পুরুষ। দেব-দ্বিজে তাঁর শ্রদ্ধা ছিল। তিনি প্রত্যহ প্রত্যূষে শয্যা ত্যাগ করে স্নানাদি সেরে গো-সেবা, পূজাপাঠ প্রভৃতি মাঙ্গলিক কাজ সম্পন্ন করতেন। তারপর ব্রাহ্মণ ভোজন, পরে আত্মীয়স্বজন ও পারিষদবর্গ সহ নিজে ভোজন করতেন। তৎপরে তিনি পারিষদ ও বিশিষ্ট জ্ঞানীগুণীদের নিয়ে সভায় বসতেন। রাজসভা চলতো রাত দশটা পর্যন্ত।

রাজা চিত্রসেনের সভাপণ্ডিত ছিলেন অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রখ্যাত সংস্কৃত পণ্ডিত, শাস্ত্রবেত্তা, কবি ও গ্রন্থকার বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার। তাঁর প্রথম এবং প্রধান গ্রন্থ 'চিত্রচম্পূ'। এই গ্রন্থটি ১৭৪৪ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃত ভাষায় রচিত। গ্রন্থটি রাজা চিত্রসেনের চরিতকাব্য। এই

গ্রন্থে তাঁর রাজসভা ও তাঁর সম্পর্কে বহু তথ্য উল্লিখিত আছে।

এখানে উল্লেখ্য, কবি বাণেশ্বরের সঠিক জন্মসাল জানা যায় না। তবে অনুমান করা যায় অষ্টাদশ শতাব্দীর গোরার দিকে গুপ্তি পাড়ায় প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও দেবীবর ঘটকের গুরু শোভকর-এর বংশে বাণেশ্বরের জন্ম। ত্রিবেণীর জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের পূর্বকাল পর্যন্ত বাণেশ্বর তর্কালঙ্কার ছিলেন বাংলার অবিশংবাদী পণ্ডিত। তিনি নদীয়া থেকে বর্ধমান রাজ চিত্রসেনের আশ্রয়ে আসেন। এই তথ্য জানা যায় 'চিত্রচম্পূর' রচনাকাল থেকে। ১৭৪৪ খ্রীষ্টাব্দের কার্তিক মাসের কিছু আগে তিনি চিত্রসেনের আশ্রয়লাভ করেন। সেই সময় বর্ধমানে বর্গীর হাঙ্গামা প্রচণ্ডরূপ ধারণ করে। নিরাপত্তার অভাবে রাজা চিত্রসেন সপরিবারে গঙ্গার পশ্চিমতীরে নিজ নির্মিত কাউগাছি গড়ে আশ্রয় নেন। গুপ্তিপাড়ার নিকটেই কাউগাছি। মনে হয় এখানেই বাণেশ্বর সর্বপ্রথম চিত্রসেনের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছিলেন চিত্রসেনের প্রধান মন্ত্রী মাণিক্যচন্দ্র। মাণিক্যচন্দ্রেরও বাড়ী ছিল গুপ্তিপাড়ায়। সেই সময় তিনি ছিলেন এক প্রভাবশালী ব্যক্তি।

কবি বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার বাড়ী যাবার বিশেষ প্রয়োজনে রাজার কাছ থেকে ছুটি নিয়ে গুপ্তিপাড়া যান। বাড়ী থেকে ফিরে এলে রাজা চিত্রসেন তাঁকে তাঁর পারিবারিক কুশলাদি জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তরে নীচের উদ্ধৃত শ্লোকটি শুনিয়ে তাঁর সংসারের অভাব-অনটন ও সুখ-দুঃখের কথা সুকৌশলে বিবৃত করেন।

"লজ্জা মানসৃতা সমাদ্য বনিতা ভিক্ষাপহরা দৈনজা
তাতৈশ্বর্য্যবিগর্ব্বিতা বলবতীভিক্ষা প্রগলভাহভবৎ।
সা লজ্জা নিহতা তয়ৈব তনয়া শোকেন মনোমৃতো
ভিক্ষা দৈন্যসৃতা চিরাৎ পতিরতানাদ্যাপি মাং মুঞ্চতি।।"

চিত্রসেন কবির শোক-দুঃখ বেদনার কথা বুঝতে পেরে তাঁর দুঃখ মোচনের ব্যবস্থা করেন। এই ঘটনা থেকে জানা যায় রাজা চিত্রসেন প্রকৃতপক্ষে প্রজাবৎসল ছিলেন এবং রাজাপ্রজার মধুর সম্পর্ক তথা দুঃখ দরদী মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য রাজা চিত্রসেন বাণেশ্বরকে সাদরে বরণ করে নিয়েছিলেন। কিন্তু শোনা যায় বর্ধমানে তাঁর গুণের তেমন কদর হয় নাই।

কাউগাছির জীবন যাত্রা সম্বন্ধে কবি বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার লিখেছেন, বর্ধমানের অনুরূপ দেব সেবা, দরিদ্রজনে অন্নদান প্রভৃতি সৎকার্য মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হত। এখানেও রাজা চিত্রসেন পণ্ডিতবর্গ ও রাজসভাসদ পরিবৃত অবস্থায় অতিবাহিত করতেন। তিনি তাঁর 'চিত্রচম্পূ' কাব্যের শেষ শ্লোকে রাজা চিত্রসেন ও প্রধান মন্ত্রী মাণিক্যচন্দ্রের নাম কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ

করেছেন ঃ—

"ধীরঃ শ্রী চিত্রসেনঃ ক্ষিতিপালকঃ শ্রী মাণিক্যোচন্দ্রো
মন্ত্রিস্তোমাগ্রগণ্য স্তদুভয় মিলনং রত্নহেমোভিষঙ্গং
আস্তাং ভুভুষণায় প্রকটিত মহিমা পুত্রপৌত্রপ্রপৌত্রৈঃ
স্ফূর্জদীপ্তিশ্চিরায় প্রথয়তু পরমং কীর্ত্তিকর্পূররাশিম্।"

কবি বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কারের আর একটি উল্লেখযোগ্য রচনা 'চন্দ্রাভিষেক' নাটকেও রাজা চিত্রসেন ও মাণিক্যচন্দ্রের উচ্ছ্বসিত স্তুতি বন্দনা আছে। মাণিক্যচন্দ্রের ইচ্ছা অনুসারে বসন্তমহোৎসবে বর্ধমানে নাটকটি অভিনীত হয়েছিল।

বর্গীদমন ঃ—

কীর্তিচাঁদ বহুকীর্ত্তির কীর্তিমান পুরুষ এবং দীর্ঘ ৩৮ বছর অপ্রতিহত প্রভাবে জমিদারী পরিচালনা ও প্রজানুরঞ্জন মূলক বহু কাজ তিনি করলেও প্রকৃত রাজগৌরব লাভ করেন তাঁর সুযোগ্য পুত্র চিত্রসেন রায়। তিনিই সর্বপ্রথম 'নজরানা' গ্রহণ ক্ষমতা প্রাপ্ত, 'রাজা' উপাধি এবং 'ছত্র ধারণ' সম্মান-এর অধিকারী হন। তিনি মাত্র ৪ বছর রাজত্ব করেন। রাজত্ব লাভ করার ২ বছর পরেই তাঁকে এক বিরাট শক্তির মোকাবিলা করতে হয়েছিল। যে শক্তি সারা ভারতকে কাঁপিয়ে তুলেছিল সেই বিপুল বর্গীবাহিনীব মুখোমুখী হতে হয়েছিল। তবে আত্মরক্ষার জন্য কখনও কখনও তাঁকে বিভিন্ন গড়ে আশ্রয় নিতে হয়েছিল।

১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে ভাস্কররাম ২০,০০০ (কুড়ি হাজার) অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে বর্ধমানের ওপর হামলা করে। বর্গীবাহিনী আসার পূর্বেই চিত্রসেনের মন্ত্রী মাণিকচাঁদ মুর্শিদাবাদে পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এদিকে ঐ বিশাল সৈন্যবাহিনীকে, সামান্য কয়েক হাজার সৈন্য নিয়ে বাধা দিতে যাওয়া নিতান্তই মূর্খামি, তাই চিত্রসেন ভাগীরথীর পূর্বতীরে পূর্বোল্লিখিত কাউগাছির দুর্গে গিয়ে সাময়িক আত্মগোপন করে থাকেন। প্রবল পরাক্রান্ত অশ্বারোহী বর্গীরা গ্রামের পর গ্রাম লুট করে চলেছে। ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে দিচ্ছে, জমির ফসল নষ্ট করছে, চাষের গাছপালা কেটে তাদের ঘোড়ার খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করছে। চিত্রসেনকে মারাঠা দস্যুদের এই সব অত্যাচার প্রত্যক্ষ করতে হয়েছে। কিন্তু একক প্রতিরোধ গড়ে তোলার ক্ষমতা তাঁর ছিল না, এমন কি সুবেবাংলার নবাব আলিবর্দী খাঁর-ও সে সামর্থ ছিল না। তখন রাজা চিত্রসেন, তাঁর নিজ সৈন্য, নবাব সৈন্য ও ছোট ছোট জমিদারগণ নিজের মধ্যে বাদ বিসম্বাদ ভুলে সকলেই সমবেত হয়ে তাঁদের সৈন্য সহ বিশাল বর্গীদস্যুদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। এইভাবেই তিনি বর্গীদের অত্যাচার প্রতিহত করেন। এই সময়ের পূর্বে, রাজা কীর্তিচাঁদের সময় হতে এবং রাজা চিত্রসেনেরও নির্মিত

কতকগুলি দুর্গ বহিঃশত্রুর আক্রমণ হতে আত্মরক্ষার জন্য বর্ধমানের বিভিন্ন অঞ্চলে ছিল। রাজগড়, সেনপাহাড়ী, পানাগড়, তালিতগড়, কাউগাছি বা কোগাছি দুর্গের কথা আগেই বলেছি, কোথাও কোথাও এইসব দুর্গগুলির ধ্বংসাবশেষ এখনও দেখা যায়। তবে নবাব আলিবর্দীর সুকৌশলে ভাস্কররাম নিহত হওয়ায় বর্গীরা সাময়িকভাবে পলায়ন করে।

বর্গীর হামলা ঃ—

বর্গীর হামলায় সুবেবাংলার অন্তর্গত মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, চাকলাবর্ধমান, বীরভূম, চাকলা রাজশাহী প্রভৃতি অঞ্চল যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল তেমনি অধিবাসীগণের দুর্দশা সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল।

বর্গীর হামলার জন্য প্রকৃতপক্ষে দায়ী বলা যেতে পারে দিল্লীর সম্রাট মহম্মদ শাহ। লুণ্ঠনকারী নাদির শাহ ১৭৩৯ খ্রীঃ ২১ মার্চ দিল্লী আক্রমণ, রাজ কোষ লুণ্ঠন করে এবং দিল্লীর চারলক্ষ অধিবাসীকে নৃশংসভাবে গণহত্যা করে দেশে ফিরে যায়। এই পরিস্থিতিতে মহম্মদ শাহ্ হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হয়ে একদিকে আলিবর্দী খাঁকে সুবেবাংলার সুবাদারীর ফরমান দিয়েছেন, অপর দিকে বালাজী বিশ্বনাথের পুত্র প্রথম বালাজীরাওকে ১৫ লক্ষ টাকার বিনিময়ে সুবেবাংলার চৌথ আদায়ের কর্তৃত্বও দিয়েছেন। চৌথ আদায়-এর উদ্দেশ্যেই মারাঠা দস্যু বা বর্গীরা বাংলার উপর অত্যাচার উৎপীড়ন চালায়।

নবাব আলিবর্দী উড়িষ্যার বিদ্রোহ দমন করে ফেরার পথে ১৭৪২ খ্রীঃ এপ্রিল মাসে বর্ধমান রাণি দিঘির (রাণিসায়র) পারে শিবির স্থাপন করেছিলেন। অবশ্য প্রত্যাবর্তন করার পথেই নবাব এক হরকরার মুখে সংবাদ পান একদল মারাঠা অশ্বারোহী সৈন্য বর্ধমান অভিমুখে নাগপুর থেকে যাত্রা করেছে। এইদিন ভাস্কররাম-এর নেতৃত্বে ২০ হাজার অশ্বারোহী বর্গী সৈন্য বর্ধমান শহরে উপস্থিত হয়। ১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই এপ্রিল ভোররাতে নবাব শিবির আক্রমণ করে, শহরের এক অংশে আগুন লাগিয়ে দেয় এবং পাশ্ববর্তী অঞ্চল লুণ্ঠন করে। কিন্তু নবাব শিবিরের কোন ক্ষতি সাধন করতে না পেরে ভাস্কররাম খাদ্য সরবরাহ যাতে বন্ধ হয়ে যায় সেই জন্য শিবির অবরোধ করে। এই বিষম সঙ্কট মুহূর্তে নবাব এক সপ্তাহ বর্ধমানে অবস্থান করতে বাধ্য হন। অবস্থা এমন শোচনীয় হয়েছিল যে সমগ্র সৈন্যদল প্রায় তিন দিন অভুক্ত ছিল। অথচ সৈয়দ গোলাম হোসেন খাঁ বলেছেন "*.....he (Nawab) took the resolution of advancing into Burdwan, a country, for populousness and plenty of provisions, Superior to most in Bengal, his intention being to encamp with his back to this capital and his front to the enemies.*"। কিন্তু শহরের শস্যভাণ্ডার পুড়িয়ে দেওয়ার ফলে তাঁকে নিরাশ হতে হয়।

নবাবশিবিরকে অবরুদ্ধ রেখে ভাস্কররামের বর্গীসৈন্যরা বর্ধমান শহরকে কেন্দ্র করে ৪০-৪৫ মাইল অঞ্চল জুড়ে লুঠতরাজ, অগ্নি সংযোগ, ও নানা প্রকার নৃশংস অত্যাচার করতে থাকে। হরকরাগণ বর্গীদের এই অমানুষিক অত্যাচারের খবর নবাবের কাছে পেশ করে। নবাবের অসহায়তার সুযোগে ভাস্কররাম দাবী করে ঃ

"*If ten lakhs of rupees were given to me by way of hospitality, I would go back (to my place), for I have come to your Excellency's country after suffering the hardships of journey over a long distance.*" (রসপুর রায়বংশের ইতিকথা পৃঃ ২-৪) এখানে বলা প্রয়োজন ইউসুফ আলি সবসময়ই নবাবের সঙ্গে ছিলেন।

দু'পক্ষের দূতগণ দুই শিবিরে যাতায়াত করেও সমস্যার কোন সমাধান করতে পারেন নাই। নবাব সেনাপতিগণের পরামর্শ অনুসারে শত্রুকে ঘুষ দেওয়ার পরিবর্তে ঐ অর্থ বরং সৈন্যদের ভাগ করে দিলে তারা উৎসাহও যেমন পাবে তেমনি নবাবের প্রতি তাদের প্রভু ভক্তি ও দায়িত্ববোধ বাড়বে। গোলাম হোসেন শলিমের বিবরণে পাওয়া যায়, এক সপ্তাহের মধ্যে নবাব শিবিরে খাদ্যাভাব চরম অবস্থায় পৌছেছে। "*And when the stores and granaries of Burdwan were exhausted and the supply of imported grains were also completely cut off, to avert death by starvation, humanbeings ate plantain roots, whilst animals were fed on the leaves of trees even these gradually ceased to be available. For break fasts and suppers, nothing except dises of the sun and the moon feasted their eyes.*"। প্রত্যক্ষদর্শী কবি গঙ্গারামের বিবরণীতেও এর সমর্থন মেলে ঃ—

"কলার আইঠা জত আনিল তুলিয়া।
তাহা আনি সব লোকে খায় সিজাইয়া।।"

ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল মহাশয়ের 'সাহিত্য প্রকাশিকা' থেকে জানতে পারি প্রত্যক্ষদর্শী ইউসুফ আলিও নবাব শিবিরে দারুণ খাদ্যাভাব ও বর্ধমান হতে কাটোয়া পৌছতে তিনদিন যে সব খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করেছিলেন তার তালিকা দিয়েছেন, —"*It comes to (my memory that once in the course of three days about three-quarters of a seer of Khichri were procured and even that was partken of by seven persons; and next day three persons subsisted on seven pieces of shakarpdra, a kind of sweet meat; and on the third day several persons lived on half a seer of beef kabab. However, on the day of their arrival at Katwa, the*

hungry people, thinking that sufficient corns of every variety would be available there, betook themselves to that place with the utmost possible haste. But the situation there was that prior to the arrival of the Nawab's men, the Marhatta troops having entered that village to village it, had set fire to the store of corns which it was not possible for them to carry off. In this condition men and animals, after starving for three days, reached Katwa on the fourth day and used the burnt grams at their food, taking them to be manna and salwa."।

অনন্যোপায় হয়ে নবাব স্থির করলেন ২২ এপ্রিল অতি প্রতূষে মারাঠা ব্যূহ ভেদ করে বর্ধমান শহর ছেড়ে কাটোয়ার দিকে অগ্রসর হবেন। নবাব ভারবাহীচাকরদের ও স্ত্রীলোকদের বর্ধমান শহরেই অবস্থান করতে হুকুম দিলেন। কিন্তু বর্গীর ভয়ে তারা কেউ থাকতে চায় নাই, সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে তারাও অগ্রসর হতে থাকে। কিন্তু বৃষ্টিপাতের জন্য নবাব-এর অবস্থা সঙ্গীন হয়ে পড়ল। এদিকে বর্গীরা নবাব বাহিনীকে ঘিরে ফেলায় বর্ধমানে তাঁদের ফিরে আসা সম্ভব হয় নাই, বাধ্য হয়ে বর্ধমানের ৬/৭ ক্রোশ উত্তরে 'নিগন সরাই' স্থানে অবস্থান করতে হয়।২৪ শে এপ্রিল খুব ভোরে উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হয়। যুদ্ধের সময় বেগ শরফ-উন-নিসা 'লণ্ডা' নামে এক হস্তিনীর পিঠে চরে যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হন। বর্গীরা তাঁকে বন্দী করার কৌশল করায় সেনাধ্যক্ষ উমর খানের পুত্র মোসাহেবখান অসীম বীরত্বে যুদ্ধ করে বেগমকে উদ্ধার করেন কিন্তু তিনি শত্রু হস্তে নিহত হন। কার্যতঃ প্রায় বন্দী অবস্থায় উপনীত হয়ে বর্ধমান রাজার দক্ষিণ দেশীয় বক্সী মীর খয়ের উল্লার মাধ্যমে ইনি বর্ধমান রাজার পক্ষে দেওয়ান মাণিক চাঁদ সসৈন্যে আলিবর্দীর সৈন্যবাহিনীতে যোগ দেন।

যাইহোক শেষ পর্যন্ত নবাব কাটোয়ায় উপনীত হন। সেখানে পৌঁছে তিনি জানতে পারলেন পূর্বেই বর্গীরা কাটোয়ার শস্য ভাণ্ডার পুড়িয়ে দিয়েছে। কাটোয়ায় শিবির স্থাপন করে আলিবর্দী মুর্শিদাবাদে হাজী আহম্মদের কাছে খাদ্য ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী পাঠানোর সংবাদ প্রেরণ করেন। এদিকে বর্ষা আগত দেখে ভাস্কররাম নাগপুর ফিরে যেতে মনস্থ করে। কিন্তু নবাবের পূর্বতন সেনাধ্যক্ষ মীরহাবিব বিশ্বাসঘাতকতা করে ভাস্কর রামের সঙ্গে যোগ দিয়ে সাত শত বাছাই করা অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে বর্ধমান জেলার কাটোয়া ও কেতুগ্রাম থানা সহ বীরভূম ও মুর্শিদাবাদের বিস্তীর্ণ এলাকা লুটতরাজ ও পুড়িয়ে মরুভূমি করে দেয়। তাদের মূল শিবির ছিল দেওয়ানগঞ্জে (দাঁইহাটে)। ভাস্কর রাম বর্ধমানের জমিদার কীর্তিচাঁদের প্রাসাদতুল্য রাজবাড়ী অধিকার করে সেখানে অবস্থান করেন। কাটোয়া থেকে দাঁইহাট পর্যন্ত

বিরাট এলাকা নিয়ে বর্গীদের শিবির ছিল। তাদের অত্যাচারে ঐ অঞ্চল সহ পার্শ্ববর্তী অঞ্চল প্রায় জন শূন্য হয়ে পড়েছিল।

প্রকৃতপক্ষে বর্গীদের অত্যাচারের কথা অবর্ণনীয়। যতদূর সম্ভব রাজা চিত্রসেন বিশাল সৈন্যদল রেখে সচিবদের উপর বর্ধমান নগর রক্ষার ভার দিয়ে বহু দুস্থ শরণাগত আর্ত দরিদ্রদের নিয়ে 'বিশাল নগরীতে' উপস্থিত হন। এই বিশাল নগর তাঁর নিজ অধিকারস্থিত দক্ষিণ প্রয়াগ ও গঙ্গাসাগর তীর্থদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থান।

বলা বাহুল্য, তিনি তাঁর সামর্থ ও সাধ্যানুযায়ী বর্গীদের প্রতিহত করতে চেষ্টা করেন এবং প্রজাবর্গের যতদূর সম্ভব রক্ষা করতে সাহায্য করেন। যদিও তাঁর পরবর্তীকালেও বর্গীদের হাঙ্গামা চলেছিল। পরে সে প্রসঙ্গ যথাস্থানে উল্লেখ করা হবে।

রাজা চিত্রসেনের দেব কীর্তি ও নগর প্রতিষ্ঠা ঃ—

সিদ্ধেশ্বরী মন্দির ঃ অম্বিকা কালনায় 'সিদ্ধেশ্বরী পাড়া' নামে একটি পাড়া বা মহল্লা আছে। এক সময় ঐ অঞ্চল ছিল গভীর জঙ্গলাকীর্ণ। কালনা মহকুমার কালনা ছিল সে সময় বর্ধমানের বন্দর শহর এবং বর্ধমান রাজাদের বিরাট প্রাসাদ, বিনোদন শহর। রাজা চিত্রসেন তখন সেখানে অবস্থান করছেন। একদিন তিনি ঘোড়ায় চড়ে জঙ্গল অঞ্চলের পাশ দিয়ে যাচ্ছেন। যাওয়ার সময় তিনি শুনতে পেলেন বনের মধ্যে ঘন্টার শব্দ। তিনি শব্দ অনুসরণ করে বনের ভিতর গিয়ে দেখেন সেখানে কোন মানুষজন নাই একটি ভাঙ্গা মন্দিরে কালী মূর্ত্তি রয়েছে আর সেখানে রয়েছে পূজার নৈবেদ্য, কালীপূজার উপযোগী ফুল ফল ইত্যাদি নানা উপাচার। রাজা জানতে পারলেন এইটিই চতুর্ভুজা কালিকা মূর্ত্তি। এই দেবী হলেন সিদ্ধেশ্বরী অম্বিকা, যাঁর নামানুসারে গ্রামের নাম অম্বিকা কালনা।

দেবীর ভগ্ন মন্দির দেখে রাজা চিত্রসেন সেখানে একটি সুদৃশ্য মন্দির নির্মাণ করিয়ে দেন। মন্দিরের স্থাপত্য রীতি ভিন্ন ধরণের, জোড় বাংলার রীতিতে মন্দিরটি নির্মিত। দেবী সিদ্ধেশ্বরী অম্বিকার এই মন্দিরটি ১৬৬৩ শকে ইং ১৭৪১ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত হয়। মন্দির গাত্রে গ্রথিত শিলালিপি থেকেই তা বোঝা যায় ঃ—

"শুভমস্তু শকাব্দা — ১৬৬৩/২
২৬/৬ শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী দেবী
শ্রীযুক্ত মহারাজা চিত্রসেন রায়স্য। মিস্ত্রী শ্রীরামচন্দ্র।"

ইন্দ্রেশ্বর ও চন্দ্রেশ্বর শিব মন্দির ঃ—

বর্ধমানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সর্ব্বমঙ্গলা মন্দিরে দক্ষিণ দিকে নবনির্মিত প্রবেশদ্বার দিয়ে ঢুকে একই ধরণের দুটি আট চালা শিব মন্দির দেখা যায়। মন্দির দুটি পথের দুপাশে অবস্থিত।

একটি দক্ষিণ পার্শ্বে আর একটি বাম পার্শ্বে। দক্ষিণ পার্শ্বের শিবলিঙ্গটি 'চন্দ্রেশ্বর' এবং বাম পার্শ্বের নাম 'ইন্দ্রেশ্বর'। দুটি মন্দিরেরই সম্মুখ ভাগ অনেকগুলি টোরাকোটা টালি বসিয়ে সুসজ্জিত করা। মন্দির গাত্রে শ্বেত পাথরে খোদিত যে শিলালিপি গ্রথিত আছে তাহা প্রমাণ করে মন্দির দুটিই রাজা চিত্রসেনের নির্মিত।

দক্ষিণ দিকের মন্দিরে আছে — "স্থাপিতং চিত্র সেনস্য নৃপতে জায়-যাদয়া।
রাজ্ঞা ছঙ্গাকুমার্য্যেশ লিঙ্গং চন্দ্রেশ্বরাভিধম্।।"

এবং বাম পার্শ্বের মন্দিরে আছে — "স্থাপিতং চিত্র সেনস্য ভূমিভক্ত দ্বিতীয়াম্ময়া।
মাহিষ্যেন্দ্র কুমার্য্যেশ লিঙ্গমিন্দ্রেশ্বরাভিধম্।।"

নগর স্থাপন ঃ—

রাজা চিত্রসেনের রাজত্বকাল খুব অল্প। তা ছাড়া তাঁর সময় সুবে বাংলার রাজনীতি ছিল ঘটনা বহুল। বিশেষ করে বর্ধমানের ওপর তখন বর্গীহামলা এমন ভয়াবহ এবং ভীষণ আকার ধারণ করেছিল তা বর্ণনাতীত। তৎসত্ত্বেও দুস্থ ও অনাথ আতুরদের রক্ষার জন্য নিজ অধিকারভুক্ত অঞ্চলে নগর পত্তন করেন যদিও তা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। দক্ষিণ প্রয়াগ ও গঙ্গাসাগর এই দুই তীর্থক্ষেত্রের মধ্যবর্তী অঞ্চলে 'বিশাল নগর' নামে অতি মনোরম নগর পত্তন করেন। বর্তমানে উত্তর ২৪ পরগণার অন্তর্গত হাবড়ার কাছে 'চিত্রসেন পুর' তাঁরই পত্তন করা শহর।

'গড়' নির্মাণ ঃ—

চিত্রসেনের পূর্ববর্তী কীর্তিচাঁদ দীর্ঘকাল জমিদারী পরিচালনার সময় বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করা, জমিদারী রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য নিজ নিজ সীমানায় গড় বা দুর্গ নির্মাণ করেন। রাজা চিত্রসেনও বর্গী দস্যুদের গতিবিধি লক্ষ্য করে তালিতগড়, রাজগড়, এছাড়াও উত্তর সীমান্ত রক্ষার জন্য অজয় নদের দক্ষিণ তীরে সেনপাহড়ীতে দুর্গ নির্মাণ করান। এখানে যে কামান পাওয়া গিয়েছিল তাতে পারসী ভাষায় রাজা চিত্রসেনের নামাঙ্কিত ছিল।

নতুন প্রথা প্রবর্তন (পারিবারিক ক্ষেত্রে) ঃ—

রাজা চিত্রসেন রায়ের আভিজাত্যবোধও ছিল অনন্য সাধারণ। বর্ধমান রাজবংশে তিনিই সর্বপ্রথম মৃতের চিতাভস্ম সংরক্ষণ করে তার ওপর স্মৃতি-সৌধ নির্মাণ প্রথা প্রচলন করেন। কীর্তিচাঁদের মৃত্যুর পর তাঁর চিতাভস্মের উপর স্মৃতিসৌধ নির্মাণই প্রথম সৌধ এবং সৌধগাত্রে প্রস্তর নির্মিত স্মৃতি ফলক গ্রথিত করণ। অতঃপর সকল রাজগণেরই প্রস্তর ফলক খচিত স্মৃতি সৌধ নির্মাণ বর্তমান কাল পর্যন্ত চলে আসছে।

স্বল্পকাল সময়ে নানা কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে, দীন-দুঃখীর প্রতিপালক, বর্গী দস্যুদের দ্বারা নিপীড়িত প্রজাবর্গের সুখ-দুঃখের অংশীদারী রাজা চিত্রসেন রায় বাংলা ১১৫১ সালের রাসপূর্ণিমার পূর্বদিন (১৭৪৪ খ্রীঃ) ধরাধাম থেকে চির অবসর গ্রহণ করেন।

রাজা চিত্রসেন রায়ের পরলোক গমনের পর তাঁর শোক সন্তপ্তা মহিষীদ্বয় দেব সেবা দেব-অর্চনা এবং দেব প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি কর্ম নিয়েই থাকতেন। জ্যেষ্ঠা মহিষী রাণী ছত্রকুমারী অম্বিকা কালনায় শ্রীশ্রী জগন্নাথ দেবের একটি মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ স্থানটি জগন্নাথবাটী নামে পরিচিত। জগন্নাথবাটীতে ১৬৭৬ শকে তিনি শ্রীশ্রী রাজেশ্বর শিব প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দিরে উৎকীর্ণ শিলালিপিতে উল্লেখ আছে ঃ—

বানাদ্রি মাতৃ কামানে
শাকে প্রাসাদামৈষ্টকাম।
চিত্রসেনস্য মহিষী
মহেশায় ন্যবেদয়ৎ ।। শকাব্দ ১৬৭৫

রাজা চিত্রসেন রায়ের কনিষ্ঠা মহিষী ইন্দ্রকুমারী ঐ রাজেশ্বর শিব মন্দিরের পার্শ্বে ভুবনেশ্বর শিব প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ রাজেশ্বর শিব ও ভুবনেশ্বর শিব মন্দির দুইটির নির্মাণ কৌশল একই ধরণের। মন্দির গাত্রের শিলালিপি অধিকাংশ নষ্ট হয়ে গেছে। তবে যে অংশটুকু বোধগম্য হয় তাহাতে বোঝা যায় কনিষ্ঠা রাজমহিষীই উহা প্রতিষ্ঠা করেন।

"......শাকে রুদ্রায় মন্দিরম্।
......রাজ্ঞী প্রাদাৎকানীয়সী।।"

রাজা চিত্রসেন আর যে সমস্ত ফরমান এবং সনন্দ পান তা এখানে উদ্ধৃত করা হলো।

কাজী মহাম্মদ ওয়ালির দস্তখত

মোহর।
(দেওয়ান সবফরাজ খাঁ)
সন ১০ জুলুস ২০শে রাবিয়সসানি।

বঙ্গদেশের সুবার এলাকাস্থ মহাল খালেসা সরিফা চাকলে বর্দ্ধমান সরকার সলিমাবাদ পরগণে ইন্দ্রায়নে বর্ত্তমান ও ভাবী মোৎসদ্দি, কারকুন, প্রজাগণ ও কৃষকগণ অবগত হইবে যে, মাননীয় সুজা অদ্দি মহাম্মদ খাঁ বাহাদুরের সাক্ষরিত পত্রের মর্ম্মানুসারে অবগতি হইল যে, পরগণা মজকুরার ১১৩৩ সালের বাকী রাজস্ব

৩৩৭৭৯ /. ও ১৫০০ /. নজর গ্রহণ করতঃ, ভূতপূর্ব্ব জমীদার রামভদ্র চৌধুরীদিগের পরিবর্ত্তে ১১৩৪ সাল হইতে কীর্ত্তিচাঁদের পুত্র চিত্রসেনকে প্রদত্ত হইল। তাঁহার কর্ত্তব্য যে যথা সময়ে রাজস্ব রাজ ধনাগারে প্রদান করেন। প্রজাগণের সহিত সদ্ভাব স্থাপন করতঃ যাহাতে দেশ মধ্যে কৃষিকার্য্যের উন্নতি হয়, তৎপক্ষে বিশেষরূপে যত্ন করেন। চোর ও দস্যুদিগকে সর্ব্বদা শাসনে রাখিয়া, যাহাতে পথিকগণ নিরাপদে গমনাগমন করিতে পারে, তাহার সুব্যবস্থা করেন। কোন প্রকার দুষ্কার্য্য ও মাদক দ্রব্য ব্যবহার, যাহাতে দেশ মধ্যে না হয়, তাহার চেষ্টা করেন। প্রজাদিগের নিকট হইতে যে সকল বাব গ্রহণ করিতে পূর্ব্বাবধি নিষেধ আছে তাহা কদাচ গ্রহণ করা না হয়। সরকারি কাগজাদিতে স্বয়ং কারকুনগনের দস্তখত করাইয়া সরকারি দপ্তরখানায় দাখিল করেন। এমতে ইহাকেই তথাকার একমাত্র জমীদার জানিয়া সকলে যথোপযুক্তমান্য করিবেন। (ইং ১৭২৮)

মোহর

(মহাম্মদ সা বাদসাহগাজী ফিদবী নসরৎজঙ্গ এতেমাদতদ্দৌলা উজীরল
সোমালেক কমরদ্দিন খাঁ বাহাদুর)

রফয়ৎ পানাহ জোবদতল আমাসেল—
অল একরান রাজা চিত্রসেন মহকুজ বাসন্দ।

যেহেতু বাদসাহের হুজুর হইতে আপনাকে রাজা উপধিযুক্ত পরওয়ানা, চারি পারচা খেলাত ও একযোড়া মুক্তা প্রদত্ত হওয়ায়, আপনার কর্ত্তব্য যে ঈদৃশ অনুগ্রহের জন্য ধন্যবাদ প্রদান করতঃ সর্ব্বদা সরকারের হিতাভিলাষী ও রাজভক্তি প্রদর্শন করিতে ক্রুটী না করেন। ইনি ১৫ সওয়াল ১২ জুলুস। (ইং ১৭৩০)

মোহর

(মহাম্মদ সা বাদসা গাজী ফিদবী সরফরাজ খাঁ বাহাদুর নসীরি)

বঙ্গদেশের সুবার অধিনস্থ মহার খালেসা সরিফা মোতালক চাকলা শালগ্রাম, সরকার মন্দারণ ওগয়রহার পরগণে মণ্ডলঘাটার বর্ত্তমান ও ভাবী মোৎসদ্দি, কাননগো, প্রজাগণ ও কৃষকগণ অবগত হইবে যে—মাননীয় পরম বিশ্বাসী সুজা আদ্দৌলা সুজা অদ্দিন খাঁ বাহাদুর আসদ জঙ্গের সাক্ষরিত পত্রে প্রকাশ পাইতেছে যে—পরগণা মজকুরার ইস্তক ১১৩৪ নাগাইদ ১১৩৭ সালের বকেয়া মালগুজারি ৭৫৫৮৩ ৵. টাকা গ্রহণ করতঃ পূর্ব্ব জমীদার জগন্নাথ ওগয়রহা চৌধুরী আনের পরিবর্ত্তে, ১১৩৮ সাল হইতে বর্দ্ধমান ওগয়রহার জমীদার চিত্রসেনকে জমীদারি পদ প্রদান করা হইল। জমীদারি সংক্রান্ত কার্য্য সকল, সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিয়া, নানকার ওগয়রহা মজকুরাত মজুরা বাদে, সরকারি রাজস্ব প্রতি বৎসর নিয়মিত সময়ে সরকারি ধনাগারে

দাখিল করেন। প্রজাগণের সহিত সতত সদ্ব্যবহার করতঃ যাহাতে দেশ মধ্যে কৃষিকার্য্যের উন্নতি হয় তৎপক্ষে যত্নবান হয়েন। দস্যু ও তস্করদিগকে এপ্রকারে শাসন করেন, যেন তাহারা দেশ মধ্যে আদৌ স্থান না পায়। এবং পথিকগণ নিরুপদ্রবে স্থল ও জল পথে যেন গতায়াত করিতে পারে। কোন স্থানের ডাকাইতি অথবা রাহাজানি হইলে, বিশেষরূপে অনুসন্ধান করিয়া, তাহাদিগকে ধৃত করতঃ অপহৃত দ্রব্য মালিককে প্রত্যর্পণ করিয়া—দস্যুগণকে যথোপযুক্ত দণ্ড প্রদান করেন। দেশ মধ্যে কেহ কোন প্রকার মাদক দ্রব্য ব্যবহার অথবা কোন প্রকার দুষ্কার্য্য না করে। হুজুর হইতে যে সকল বাব গ্রহণ করিতে নিষেধ আছে তাহা কদাচ গ্রহণ করা না হয়। নওয়াজিমা কাগজাদিতে স্বয়ং ও কাননগোর সাক্ষর করাইয়া সরকারি দপ্তরখানায় দাখিল করেন। সাধারণের কর্ত্তব্য যে উক্ত ব্যক্তিকেই তথাকার জমীদার জানিয়া যথোপযুক্ত মান্য ও উচিত ব্যবহার করে। ইতি ১লা সওয়াল ১৩ জুলুস (ইং ১৭৩২। ৩৩ খ্রীঃ)—



রাজা চিত্রসেন নির্মিত ইন্দ্রেশ্বর শিবমন্দির টোরাকোটা কাজ (সর্ব্বমঙ্গলা)

ইবন সা আলম বাদসা

ইবন সা কেরাণ আমীর তাইমুর

ইবন মীরাণ সা

ইবন সুলতান মহম্মদ সা

ইবন আলমগীর
বাদসা

ইবন সাজাহান
বাদসা

আবলফতা নসীরুদ্দীন সা ৩য় সাহেব
কেরাণ সানি বাদসা গাজী ইবন মহম্মদ
জাহান সা বাহাদুর। ১১৩৩।

ইবন উমর সেখ
সা

ইবন সুলতান আবু
সায়েত সা

ইবন জাহাঙ্গির বাদসা

ইবন আকবর বাদসা

ইবন হুমায়ুন বাদসা

ইবন বাবর সা

পঃ বিল্লধরপুর আমলা—

আজমতসাহি ৪ মহাল।

কিসমত আজমতসাহি।

সরকার পরগণাবাদ।

কিসমত মজঃফরসাহি।

কিসমত ভাতসাখা

সরকার ঐ

পরগণে সেরগড় সরকার

মন্দারণ

" চিতুয়া সরকার ঐ

" বয়রা সরকার সলিমাবাদ।

" দেবকাল পঃ সরকার

মন্দারণ।

" মাঙ্গুরুল পঃ বয়রা সরকার

সলিমাবাদ

" মনোহরসাহি সরকার

রাজ-আবাদ

" বগড়ি সরকার নরাখপাড়া

" রামপুর সরকার ঐ

" বঙ্কবহরম সরকার ঐ

(৩৭)

পঃ বজোড়া সরকার ঐ

" জগড়া পঃ জাহানাবাদ

" বরদা আমলা পঃ ঐ

" ভুরসীট সরকার সলিমাবাদ

" জঙ্গলপাড়া ঐ

" নওবাসুকী পঃ জাহানাবাদ

" মকন্দা মতালক চাকলা--

হুগলী

আমলা পরগণা জাহানাবাদ

ওরাক কিসমত জাহানাবাদ

" মানকর সরকার মন্দারণ

" আমলা বালিয়া বাসন্দরী

কিসমত ৬ মহাল।

কিসমত মণ্ডলঘাট সরকার

মন্দারণ

পঃ ইন্দ্রানি সরকার সলিমাবাদ

" ফৈয়াজ কোর ঐ

" আজমতপুর সরকার —

পবনাবাদ মৌজে ব্রাহ্মণগ্রাম

ওগয়রহা মহাল।

আবওয়াব ফৌজদারি

ওগয়রহা মোতাল্ক

হুগলী।

আবওয়াব ফৌজদারি

মহাল।

কাননগোর নজরাণা

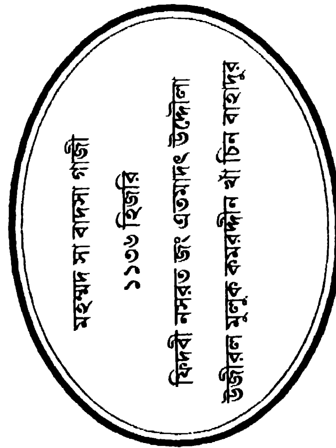
মহাল।

নজরাণা ৩ মহাল

চন্দ্রকোণা মহাল

বরদা মহাল

ভুরসুট মহাল



মোহর।

(মহাম্মদ সা বাদসাহ্ গাজী ফিদবী উজীরল্ মোলক নসরৎজঙ্গ
এতেমাদ আদ্দৌলা কমরদ্দিন খাঁ চিন বাহাদুর)

বঙ্গদেশের সুবার অধীনস্থ চাকলে বর্দ্ধমান ওগয়রহার বর্ত্তমান ও ভাবী মোৎসদ্দি ও কারকুনগণ অবগত হইবেন।

সন ২১ জুলুসের ২০ রমজান তারিখের ফরমানের মর্ম্মানুসারে, মৃত কীর্ত্তিচাঁদের পুত্র চিত্রসেনের নিকট হইতে, সরকারের নজরাণা স্বরূপ ২ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা গ্রহণ করতঃ মহাল মজকুরার জমীদারি ও রাজা উপাধি প্রদান করা হইল। তাঁহার কর্ত্তব্য স্বীকৃত নজরাণার টাকা সরকারি ধনাগারে প্রদাণ করেন। সরকারি রাজস্ব যথাসময়ে প্রদান করতঃ উদ্বৃত্ত অর্থ স্বয়ং গ্রহণ করেন। দেশমধ্যে যাহাতে প্রজাবৃদ্ধি ও কৃষিকার্য্যের উন্নতি হয়, তদ্বিষয়ে যত্নবান হয়েন। দেশমধ্যে যাহাতে দুষ্ট লোকের প্রাদুর্ভাব না হয়, তৎপক্ষেও বিশেষরূপে যত্নবান হয়েন। পরগণার অধিবাসিগণের সহিত সদ্ভাব স্থাপন করেন। মহাল খালেসা ও জায়গীরদারগণের নিকট হইতে, রাজস্ব আদায় সম্বন্ধে সরকারি আমলা ও গোমস্তাগণের সাহায্য করেন। সুবার নাজেম ও তাঁহার নায়েবদিগের অনুগত থাকিয়া স্বীয় ধন, মান ও সম্ভ্রমাদি অক্ষুণ্ণ রাখিতে যত্ন করেন। এমতে বাদসাহের হুকুমানুসারে সকলে উঁহাকেই মহাল মজকুরার জমীদার বলিয়া মান্য করেন!

২৭ সওয়াল ২১ জুলুস (ইং ১৭৪০।১ খৃঃ)।

মোহর।

(মহাম্মদ সা বাদসাহ গাজী ফিদবী আলা উদ্দৌলা সরফরাজ খাঁ বাহাদুর নসরত্ জঙ্গ)

প্রকাশ হইল যে পরগণা মজকুরার জমীদার কীর্ত্তিচাঁদের মৃত্যু হওয়ায়, ১১৪৫ সালে পূর্ব্ব নিয়মানুসারে ২০৩০০০ ্ টাকা সরকারের নজরাণা প্রভৃতি গ্রহণ করতঃ, তদীয় পুত্র চিত্রসেনকে উক্ত জমীদারি ও রাজা উপাধি-যুক্ত ফরমান প্রদান করা হইল। তাঁহার কর্ত্তব্য যে, সকল বিষয়ে সাবধান হইয়া প্রজাগণের সহিত সদ্ভাব স্থাপন পূর্ব্বক কার্য্যানুবর্ত্তী হয়েন। মহাল মজকুরার রাজস্ব আদায় ও কৃষিকার্য্যের উন্নতির বিষয়ে বিশেষরূপে যত্ন করেন। তস্কর ও দস্যুগণ তাঁহার অধিকারমধ্যে স্থান না পায় এবং পথিকগণ যাহাতে নির্ব্বিঘ্নে গমনাগমন করিতে পারে, তাহার সুব্যবস্থা করেন। কোন স্থানে ডাকাইতি বা রাহাজানি না হয়। ঁনা করেন, কোন স্থানে এবম্বিধ ঘটনা্পস্থিত হইলে, তস্করদিগকে ধৃত করিয়া, অপহৃত দ্রব্য মালিককে প্রদান করতঃ, তাহাদিগকে যথোপযুক্ত দণ্ড প্রদান করেন। অপহৃত দ্রব্যের কোন উপায় করিতে না পারিলে তিনিই তাহার

ক্ষতিপূরণ করিবেন।

জমীদারির মধ্যে কেহ কোন প্রকার মাদক দ্রব্য ব্যবহার না করে। সরকারি রাজস্ব সন সন যথাসময়ে রাজধনাগারে প্রদান করেন ও হুজুরের নিষিদ্ধ কোন প্রকার বাব গ্রহণ না করেন। সরকারি কাগজাদিতে স্বয়ং ও কাননগোর সাক্ষর করাইয়া, সুবার দপ্তরখানায় দাখিল করেন। এমতে সকলে উক্ত ব্যক্তিকে মহালাত মজকুরার একমাত্র জমীদার জানিয়া তাঁহাকে যথোপযুক্ত মান্য করে।

১৯ রমজান ১১ জুলুস (ইং ১৭৪১ খৃঃ)

মোহর।

(মহাম্মদ সা বাদসাহ্ গাজী ফিদবী মহাম্মদ আলিবর্দ্দি খাঁ বাহাদুর মহব্বৎ জঙ্গ)

সুবে উড়িষ্যার এলাকাধীন সরকার গোয়ালপাড়ার সামিল পরগণে ব্রাহ্মণভূমের বর্ত্তমান ও ভাবী চৌধুরী, কাননগো, তালুকদার, মণ্ডল, প্রজা ও কৃষকগণ অবগত হইবে যে ত্রিলোচনের অসদ্ব্যবহারে প্রজাগণ উৎপীড়িত হওয়ায়, এবং ১১৪৭ সালের কির্স্তির টাকা না দেওয়ায় ও প্রজাগণকে উৎপীড়ন করতঃ টাকা আদায় করিয়াও রাজস্ব না দিয়া পলায়ণ করায়, সদরের কাননগো ইন্দ্রজিতের মোহর ও দস্তখত যুক্ত পত্রের মর্ম্মানুসারে উক্ত ত্রিলোচনের পরিবর্ত্তে বর্দ্ধমান ওগয়রহার জমীদার জোবদত্তল আমাসেল চিত্রসেন মালগুজারকে (মালগুজারির সরবরাহকারী ও জমীদারির উন্নতিকারী) উক্ত জমীদারি প্রদান করা হইল। তাঁহার কর্ত্তব্য যে প্রজাগণের সহিত সদ্ভাব স্থাপন করতঃ প্রতিবৎসর নিয়মিত সময়ে রাজস্ব প্রদান করেন। কৃষিকার্য্যের উন্নতিসাধন পক্ষে যত্নবাণ হয়েন। পতিত জমী আবাদ ও উর্ব্বরা জমী যাহাতে পতিত না থাকে তৎপক্ষে যত্ন করেন। রাজস্ব যাহাতে বাকী না থাকে তাহার চেষ্টা করেন। দস্যু তস্কর ও ঠগদিগকে দমন করতঃ পথিকগণের নির্ব্বিঘ্নে গমনাগমনের সুব্যবস্থা করেন। কোন স্থানে চুরি কিম্বা ডাকাইতি হইলে, তস্করদিগকে ধৃত করিয়া অপহৃত দ্রব্য মালিককে প্রদান করেন। যদি অপহৃত দ্রব্যের অনুসন্ধান না হয়, তবে তিনিই মালিকের ক্ষতিপূরণ করিবেন। যে সকল বাব গ্রহণ করা পূর্ব্বাবধি নিষেধ আছে, তাহা কদাচ গ্রহণ করিবেন না। এমতে সকল উক্ত প্রশংসিত ব্যক্তিকেই পরগণা মজকুরার একমাত্র জমীদার জানিয়া, যথোপযুক্ত মান্য করিবে। ইতি

১৯ বরিঅল আউল ২২ জুলুস (ইং ১৭৪১ খৃঃ)

মোহর।

(মহাম্মদ সা বাদসাহ্ গাজী ফিদবী নওয়াজেস মহাম্মদ খাঁ)

সুবা বঙ্গদেশের এলাকস্থ্ পরগণে আরশার বর্ত্তমান ও ভাবী মোৎসদ্দিয়ান্, কাননগোয়ান্, প্রজাগণ ও কৃষকগণ অবগত হইবে, সুবার নাজেম মান্যবর মহাম্মদ আলিবর্দ্দি খাঁ মহব্বৎ জঙ্গের সাক্ষরিত পত্রের মর্ম্মানুসারে

প্রকাশ হইল যে — মৃত গোবিন্দদেবের পরলোক গমনের পর ১১৪৮ সাল হইতে উক্ত পরগণা মজকুরার জমীদারি, সরকারি ২৫০০০, টাকা নজরাণা গ্রহণ করতঃ পরগণে বর্দ্ধমান ওগয়রহার জমীদার রাজা চিত্রসেনকে প্রদত্ত হইয়াছে। এক্ষণে তাঁহার কর্ত্তব্য যে প্রজাগণের সহিত সদ্ভাব স্থাপন করতঃ দস্যু ও তস্করদিগকে সম্পূর্ণরূপে দমন করেন। এমন কি তাহাদিগকে স্বীয় অধিকার হইতে দূরীভূত করিয়া যাহাতে পথিকগণ সর্ব্বদা নিরাপদে গমনাগমন করিতে পারে, তাহার সুব্যবস্থা করেন। ˘না করেন যদি কোন স্থানে চুরি কিম্বা ডাকাইতি অথবা রাহাজানি হয়, তাহা হইলে ঐ সকল দস্যুগণকে ধৃত করিয়া, তাহাদিগকে যথোপযুক্ত দণ্ড প্রদান করতঃ অপহৃত দ্রব্যাদি গৃহস্থকে প্রদান করেন। যদি অপহৃত দ্রব্যের কোন প্রকার প্রতীকার না হয়, তাহা হইলে জমীদারই তাহার দায়ী হইবেন। জমীদারির মধ্যে কেহ কোন প্রকার দুস্কার্য্য অথবা কোন প্রকার মাদক দ্রব্য ব্যবহার করিতে না পারে, তদ্বিষয়ে সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিবেন। দেশমধ্যে যাহাতে কৃষিকার্য্যের উন্নতি হয়, সর্ব্বদা তাহার চেষ্টা করিবেন। প্রতিবৎসর নিরূপিত সময়ে সুবার ধনাগারে রাজস্ব প্রদান করতঃ, তাহার দাখিলা গ্রহণ করেন। বর্ত্তমান তালুকদারগণের সত্ত্বের প্রতি কোন প্রকারে হস্তার্পণ না করেন। যে সকল বাব পূর্ব্বাপর গ্রহণ করিতে নিষেধ আছে, তাহা কদাচ গ্রহণ করা না হয়। সেরেস্তার কাগজাদিতে স্বয়ং স্বাক্ষর করতঃ কাননগোর সাক্ষর করাইয়া, সরকারি সুবার সেরেস্তায় দাখিল করেন। এমতে সকলেরই কর্ত্তব্য যে, ইহাঁকেই উক্ত স্থানের জমীদার জানিয়া যথোপযুক্ত সম্মান ও ব্যবহার করতঃ অত্র আদেশ প্রতিপালন করেন।

সন ২২ জুলুস ১লা রবিয়স সানি (ইং ১৭৪১ খৃঃ)

মোহর।

(মহাম্মদ সা বাদসাহ্ গাজী ফিদবী নওয়াজ মহাম্মদ খাঁ বাহাদুর সাহামত জঙ্গ)

রফয়ত্ পানাহ মহব্বত ও মওয়ালত নেশান রাজা চিত্রসেন।

প্রেরিত পত্রে, আপনার প্রতি বাদসাহের বিশেষ অনুগ্রহ, আরশা পরগনার পরওয়াণা প্রাপ্তি, নথুর, মিনার ভাঙ্গিবার পরওয়ানা অমান্য করা এবং আপনি যথাসাধ্য বাদসাহের আজ্ঞা প্রতিপালনে সতত যত্নবান্ ইত্যাদি বিবরণ অবগত হইলাম। মান্যবর! উক্ত মিনার ভাঙ্গিবার জন্য হুজুর হইতে পুনরায় পরওয়ানা প্রেরিত হইয়াছে, বোধ হয় এত দিন উহা ভাঙ্গাও হইয়াছে। অদ্য ১৫ সাবান আপনার জন্য খাসাখেলাত ও একটি হস্তি এবং সেনাপতি মানিকচাঁদের জন্য খেলাত ও একটি ঘোড়া, বাদসাহের আদেশানুসারে আপনার উকীলের নিকট প্রেরণ করা হইল। আপনার প্রতি বাদসাহের যেরূপ অনুগ্রহ হইয়াছে, তাহা সর্ব্বদা স্মরণ করিয়া, সতত তাঁহার অনুগত ও স্বীয় কর্ত্তব্য কার্য্য প্রতিপালনে যত্নবান থাকিবেন। জগদীশ্বর আপনার মঙ্গল বিধান করুন।

১৫ শাবান।

মোহর।

(মহাম্মদ সা বাদসাহ গাজী) ও (রাজা ইন্দ্রজিত)

ইয়াদদস্তের অনুবাদ।

সুবা উড়িষ্যার এলাকাধীন সরকার গোয়ালপাড়ার সামিল পরগণে ব্রাহ্মণ ভূমির জমীদার রাজা চিত্রসেন রায়কে নিম্নলিখিত খেলাতসহ প্রদত্ত হইল।

খেলাত

ছত্র

আস্পী-নাকার

আড়ানী

মোহর।
(মহাম্মদ সা বাদসাহ গাজী ফিদবী মহাম্মদ আলিবর্দ্দি খাঁ মহব্বত্ জঙ্গ বাহাদুর)

জোবদতল আমশাল অল্ একরান্ মতদ্দত্ ও

এখলাস্ নেশান্ চিত্রসেন বয়াফিয়ত্ বাসন্দ।

পরগণে ব্রাহ্মণভূমীর জমীদারির সনন্দ, খেলাত, নাকারা আস্পি, ছত্র ও আড়ানির পরওয়ানা প্রাপ্ত হইয়া, যে আরজ দস্ত প্রেরণ করিয়াছেন, তৎপাঠে আপনার অটল বিশ্বাসের সহিত রাজ-ভক্তির যথেষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গেল। আমিও আপনাকে চিরকাল পরম বিশ্বাসী ও চিরানুগত বলিয়াই জানি। ফলতঃ এই বিশ্বাস ও আনুগত্যতা চিরদিন সমভাবে রক্ষা করতঃ সরকারের প্রাপ্য রাজস্ব প্রদান করিতে যেরূপ যত্ন ও চেষ্টা করিতেছেন ও ভবিষ্যতে করিবেন লিখিয়াছেন, তাহা হইলে ঈশ্বরানুগ্রহে পুনরায় এ পক্ষ হইতে আপনার ইচ্ছানুরূপ অশেষ অনুগ্রহও লাভ করিতে পারিবেন।

১৭ রবিয়স্সানি ২৩ জুলুসে লিখিত হইল। (ইং ১৭৪২ খৃঃ)

মোহর।
(উজীরণ মোমালেক কমরদ্দিন খাঁ বাহাদুর)

বঙ্গদেশের সুবার অধীকারস্থ, পরগণে বর্দ্ধমান ওগয়রহার মোৎসদ্দি, কাননগো, চৌধুরি, কর্ম্মচারী, ও মণ্ডলগণ অবগত হইবে, যে, বাদসাহি হুকুমানুসারে, মৃত কীর্ত্তিচাঁদের পুত্র চিত্রসেনের নিকট হইতে, সরকারের নজরাণা স্বরূপ দুই লক্ষ তেত্রিশ হাজার টাকা গ্রহণ করতঃ উক্ত সুবার এলাকাস্থ পরগণা মজকুরা ওগয়রহার মহালাতের জমীদারি, ও রাজা উপাধি প্রদত্ত হইল। সাধারণ ও প্রজাগণের সহিত সদ্ভাব স্থাপন পূর্ব্বক, স্বীয় কার্য্যানুবর্ত্তী হয়েন। তস্কর ও দস্যুদিগকে বিশেষরূপে দমন করিবার চেষ্টা করেন। যে সকল দুর্বৃত্ত লোক ইতিপূর্ব্বে তাঁহার রাজ্য হইতে বিতাড়িত হইয়াছে, তাহারা যেন পুনরায় রাজ্য মধ্যে স্থান না পায়। বিদেশীয় পথিকগণ যাহাতে নির্ব্বিঘ্নে গতায়াত করিতে পারে তাহার সুব্যবস্থা করেন। কোন স্থানে চুরি কিম্বা ডাকাইতি হইলে, তাহাদিগকে ধৃত করিয়া, অপহৃত দ্রব্য মালিককে প্রদান করেন। তদন্যথায় তিনিই উক্ত ক্ষতিপূরণ করিবেন। জমীদারির মধ্যে কেহ কোন প্রকার মাদক সেবন না করে, তৎপক্ষে বিশেষরূপে দৃষ্টি রাখিবেন। কেহ কোন প্রকার ধর্ম্ম-বিরূদ্ধ কার্য্য না করে। উপরোক্ত কর্ম্মচারীগণের কর্ত্তব্য যে, ইহাঁকেই উক্ত স্থানের জমীদার জানিয়া যথোপযুক্ত মান্য করেন। ৯ সফল ২৬ জুলুস। (ইং ১৭৪৫ খৃঃ)

তপশীল মহাল

পরগণে বর্দ্ধমান সরকার	পঃ সকোর
সরিফাবাদ	” পাণ্ডুয়া
” সোজাপুর।	” চোমহা।
বাজার এব্রাহিমপুর।	” মালদান।
রেকাবি বাজার।	” নলৈ।
পঃ আজমতসাহি সরকার	” লবঙ্গা।
ঐ	” হেয়াতপুর।
” মজফ্‌ফরসাহি।	” জাহাঙ্গিরাবাদ।
” ভট্রসানা।	পঃ সমর সাহি।
” সেরগড়।	” হোসসাকি।

" বাঘা।

" সোলেমানসাহি।

" রক্ষা।

" জলপাই।

" লবঙ্গা।

" সাহাবাদ।

" সিওস্তা।

পঃ হুসেনপুর সরকার

সলিমাবাদ

" হাবেলি

" খাঁপুর

পঃ সৈয়েদপ্যব।

" আজমতসাহি।

" অম্বিকা

" সাহপুর।

" আজ্জমপুর।

" সন্দিপুর।

" মহাম্মদপুর।

" সেরঞ্জী আমলা।

" লবঙ্গ।

সাবেক সেওয়ায় সোভা সিংহ

" গোয়ালাভুম।

" মালদহ।

" মনিয়াবাগ।

" আমীরাবাদ।

" জাহাঙ্গিরী।

" খাণ্ডুয়া।

" আলুই।

" সেনপাহাড়ী।

" আমীরপুর।

" বালিয়া বসুন্দরী।

" আলী মহল।

আবওয়াব ফৌজদারি

সরকার সালগ্রাম।

ঐ ভুরসীট সরকার

সলিমাবাদ।

পঃ জঙ্গলপাড়া

" মনোহর সাহি।

মানঘর সরকার মন্দারণ

" বরদা।

" চন্দ্রকোণা।

পঃ আজমতসাহি সরকার

ওগয়রহার পরিবর্ত্তে দোরবস্ত	সরিফাবাদ।
পঃ জেওড়া সরকার মন্দারণ।	" ভুরসীট দো মহাল।
" বাড় সরকার সলিমাবাদ	" মালিয়াড়া।
" দরকল।	" মাফরি।
" জেওড়া।	" রাইপুর।
" সকরল।	" লবঙ্গ ভুম।
" বাড়।	" মহুড়া।
পঃ মণ্ডলঘাট সরকার	" মরোয়া।
মন্দারণ।	" জাহানাবাদ।
পঃ ইন্দ্রায়ণ সরকার	" ঝিকরা।
সলিমাবাদ।	" বুদসকলি।
পঃ ফৈয়াজপুর সরকার	" মলহদা।
সলিমাবাদ।	

মহারাজাধিরাজবাহাদুর তিলোকচাঁদ

(১৭৪৪-১৭৭০)

রাজা চিত্রসেন রায়, তার দুই মহিষীকে রেখে অপুত্রক অবস্থায় রাসপূর্ণিমার পূর্ব্বদিবস ১৭৪৪ খ্রীষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। তিনি মৃত্যুর পূর্বে খুল্লতাত মিত্রসেন রায়ের একমাত্র পুত্র তিলোকচাঁদকে তাঁহার উত্তরাধিকারী করে যান। তদনুসারে তিলোকচাঁদ বর্ধমান জমিদারীর অধিকার প্রাপ্ত হন। এই সময় বর্ধমানে শ্মশানের রাজত্ব বিরাজ করছিল। সশস্ত্র মারাঠা ও মীরহাবিবের পদাতিক বাহিনীর অত্যাচারে গ্রামের পর গ্রাম ভস্মীভূত, মানুষওপশুর খাদ্য-সামগ্রী লুণ্ঠিত অথবা অগ্নিদগ্ধ হয়েছিল। বর্ধিষ্ণু পরিবার, সম্পদশালী ব্যক্তিগণ দেশত্যাগী হওয়ার ফলে বর্ধমানের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবন ধ্বংসপ্রায় হয়ে গিয়েছিল। যদিও তাঁর জমিদারীর সময়কাল দীর্ঘ, তৎসত্বেও তাঁকে এই ২৬ বছর অর্থাৎ আমৃত্যু কঠোর সংগ্রাম ও কূটকৌশল অবলম্বন করে জমিদারী পরিচালনা ও রক্ষা করতে হয়েছিল।

তিলোকচাঁদ বাংলা ১১৪০ সালের ২১ শে অগ্রহায়ণ ইং ১৭৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। (কাউগাছি দুর্গে, কারণ পিতা মিত্রসেন রায় যাবজ্জীবন ঐ দুর্গে বন্দী অবস্থায় ছিলেন)। রাজবংশানুচরিতে উল্লেখ আছে, ''চিত্রসেন রায়ের পরলোক গমনের পর একাদশ বৎসর বয়ক্রমকালে বর্দ্ধমান রাজ সিংহাসন প্রাপ্ত হয়েন। ইনিও দিল্লীশ্বর, উজীর ও বাংলার নবাব প্রভৃতি সাম্রাজ্যের উচ্চতম কর্মচারীদের নিকট হতে সনদ, ফরমান, পরোয়ানা ও সম্মানসূচক পত্রাদি প্রাপ্ত হন।

১ম — রাজা চিত্রসেন রায় পরলোক গমন করিলে ১৭৪৪ খ্রীষ্টাব্দে তদানীন্তন ভারত সম্রাট মহাম্মদ সা বাদসাহের নিকট হইতে ফরমান প্রাপ্ত হয়েন, তাহার মর্ম্ম।

(আবল ফতাহ নাসেরদ্দিন মহাম্মদ সা বাদসাহ গাজি)

মোহরাঙ্কিত

অতি শুভক্ষণে এই মহামান্য পরম বিশ্বাসপ্রদ ফরমান প্রচার হইল যে, বঙ্গদেশে সুবার অধিকারস্থ বর্দ্ধমান ওগয়হার জমিদার মৃত কীর্ত্তিচন্দের ভ্রাতুষ্পুত্র তিলোকচন্দের নিকট হইতে সরকারের নজরানা স্বরূপ দু লক্ষ আটান্ন হাজার টাকা গ্রহণ করতঃ উক্ত স্থানের জমিদারী ও রাজা উপাধি হুজুর হইতে প্রদত্ত হইল। এই ফরমান প্রচার হইলে এক লক্ষ টাকা সরকারে প্রদান করতঃ অবশিষ্ট টাকা কিস্তি অনুসারে সুবার ধনাগারে প্রদান করিবেন ইত্যাদি। ৯ জমাদিয়ল, আখের, ২৪ জুলুস।

২য় -- ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত বিষয়ে সাহমতজঙ্গ নওয়াজেস খাঁ বাহাদুরের প্রদত্ত পরওয়ানার মর্ম। (মহম্মদ সা বাদসাহ গাজী ফিদাবি-এ হতে সামতেদ্দৌ সাহামত জঙ্গ নওয়াজেস খাঁ বাহাদুর) মেহরাঙ্কিত।

বঙ্গদেশের সুবার অধিকারস্থ পরগণার বৰ্দ্ধমান ওগয়রহার বৰ্ত্তমান ও ভাবী মোৎসুদ্দি আদি অবগত হইবে যে, সুবার নাজেম মান্যবর সোজাউলমোল্‌ক হেসামতেদ্দৌলা মহাম্মদ আলিবৰ্দ্দী খাঁ বহাদুর মহব্বদ জঙ্গের স্বাক্ষরিত পত্রের মৰ্ম্মানুসারে প্রকাশ যে, রাজা চিত্রসেন পরলোক গমন করায়, চিত্রসেনের পুত্র (দত্তক) ও জগৎরামের পৌত্র মান্যবর তিলোকচন্দ্‌ উল্লিখিত জমিদারী ও রাজা উপাধি প্রাপ্তির প্রার্থনায় মৃত চিত্রসেনের নিকট হইতে সরকারের নজরাণা স্বরূপ প্রাপ্ত ১,৩৩,০০০ টাকা ও নিজ পরওয়ানা প্রাপ্তির জন্য নজরানা ২,৫৮,০০০ টাকা একুনে ৩,৯১,০০০ টাকা প্রদান করিতে স্বীকার করায়, তাঁহাকে এই সনদ প্রদান করা হইল, ইত্যাদি।

২রা সঁকর, ২৯ জুলুস।

৩য় — সম্রাট মহাম্মদ সা বাদসাহ পরলোক গমন করিলে আহম্মদ সা বাদশাহ দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করতঃ ১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজা তিলোকচন্দ্‌কে যে ফরমান প্রদান করেন, তাহার মৰ্ম্ম।

(আবুশ নসর মোজাহদ্দিন আহম্মদ্‌সা বাদসাহ গাজী)

মোহরাঙ্কিত।

অতি শুভক্ষণে এই মহামান্য পরম বিশ্বাস প্রদ ফরমান প্রচার হইল, যে —

বঙ্গদেশের সুবার এলাকাস্থ পরগণে বৰ্দ্ধমান ওগয়হার জমিদার রাজা চিত্রসেনের মৃত্যু হওয়ায়, তদীয় খুল্লতাত পুত্র তিলোকচন্দের নিকট হইতে ২,৫৮,০০০ নজর ও মৃত চিত্রসেনের নিকট প্রাপ্য ১,৩৩,০০০ টাকা গ্রহণ করতঃ বাদসাহের হুজুর হইতে তাঁহাকে উক্ত স্থানের জমিদারী ও রাজা উপাধি দেওয়া হইল, ইত্যাদি।

৭ রজবর মোজ্জব। ৭ জুলুস।

৪র্থ — ১৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত সম্বন্ধে বাদসাহের উজীরের পরওয়ানা।

ইহাতে উক্ত ফরমানের বিবরণেরই উল্লেখ আছে। মোহর (উজীর মদারণ মহাম কমরদ্দি খাঁ বাহাদুর) অঙ্কিত তারিখ ২৫ রজবর। ৭ জুলুস।

৫ম — ১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীশ্বর আলমগীর বাদসাহের আজ্ঞানুসারে বঙ্গদেশের সুবার খেদা হইতে মহারাজা তিলোকচন্দকে যে একটি হস্তী প্রেরণ করিবার পরওয়ানা হয়, তাহার মৰ্ম্ম।

(আলমগীর বাদসাহগাজী ফিদবী মোতে মদ্দৌলা জিয়া অদ্দৌলা বাহাদুর) মোহরাঙ্কিত।

৬ষ্ঠ — বঙ্গদেশের সুবার অধিকারস্থ বর্ধমানের জমিদার রাজা তিলোকচন্দকে ১টি হস্তি ও জমিদারী ফরমান প্রদানে অনুগৃহীত করা হইছে। অতএব সুবা মজকুরার খেদা হইতে ১টি হস্তী তাঁহাকে প্রেরণ করতঃ আজ্ঞা প্রতিপালন করিবে। ২৬ মহবর মল হারাম, ১ জুলুস।

৭ম — ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে মোঙ্গলকোট নিবাসী সাহ হজ্জতুল্লার মৃত্যুর পর তদীয় জমিদারী তালুক ভেদিয়া, তিলোকচন্দ দিল্লীশ্বরের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়া, যে ফরমান প্রাপ্ত হয়েন তাহার মৰ্ম্ম।



মহারাজাধিরাজ বাহাদুর তিলকচাঁদ

(আবল মোজাফ্ফর জালালদ্দিন মহাম্মদ সা বাদশা) মোহরাঙ্কিত।

অতি শুভক্ষণে এই মহামান্য পরম বিশ্বাসপ্রদ ফরমান প্রচার হইল যে,—

বঙ্গদেশের সুবার অধিকারস্থ চাকলে বর্দ্ধমান মোতালক তালুক ভেদিয়া ওগয়রহার তালুকদারী, মোঙ্গলকোট নিবাসী সাহজ্জতুল্লার মৃত্যুর পর ১১৭৪ সালের শ্রাবণ মাস হইতে রাজা তিলোক চন্দ্‌কে প্রদান করিলাম। ইত্যাদি। রবিয়ল আখের।

৮ম — সাহ আলম বাদসাহের রাজত্বকালে, রাজা তিলোকচন্দ্ ৪০০০ চার হাজার জাত, বাহাদুর খেতাব, ঝালরদার পালকী ও নহবত আদি, প্রাপ্তির যে সনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহার মর্ম্ম।

(সাহআলম বাদসাহ গাজী) মোহরাঙ্কিত।

আফিদৎ ও জালাদৎ নেসান, ফিদ্‌বী খাল লায়োসল্ এনায়ত এহ্‌সান্ বতো ফজ্জলাত বেলা নেহায়ত্ মোবাহিবুদা বেদানন্দ রাজা তিলোকচন্দ।

ঈশ্বরানুগ্রহে এই শুভ সময়ে উক্ত খাসের কিদবীকে উন্নত করিয়া চারহাজার জাত, বাহাদুরী খেতাব, নহবত ও ঝালরদার পালকী প্রদান করতঃ কৃতার্থ করিলাম। ঈদৃশ অনুগ্রহের জন্য ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক সর্ব্বদা হিতাভিলাষী হইয়া রাজভক্তি প্রদর্শন করতঃ এপক্ষের অধিকার অনুগ্রহ লাভ করাই কর্ত্তব্য ইত্যাদি।

ঐ সম্বন্ধে রাজা খেতাব রায় মহারাজ তিলোকচন্দের নিকট আনুগত্য প্রকাশ করতঃ একখানি পত্র প্রদান করেন। তাহাতে লিখিত আছে। "দিল্লীশ্বর সাহ আলম বাদসাহ গাজী অনুগ্রহ পূর্ব্বক আপনাকে যে 'বাহাদুর' খেতাব যুক্ত সনদ, ঝালরদার পালকী আদি প্রদান করিয়াছেন, তৎসমূদয় কলিকাতার লর্ড ক্লাইভের নিকট আসিয়া পঁহুছিয়াছি ইত্যাদি।"

দিল্লীশ্বরের নিকট হইতে "ফিদবী খাস" উল্লেখে সনন্দ প্রাপ্তি, বঙ্গদেশের কোন ভূপতির ভাগ্যে ঘটে নাই। "ফিদবী খাস" অর্থে, বাদসাহের বিশেষ অনুগৃহীত উচ্চ পদস্থ কর্মচারী। বঙ্গের নবাব, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর গবর্ণর এবং সাম্রাজ্যের প্রধান সেনাপতি প্রভৃতিকে 'ফিদবী' বলিয়া সম্বোধন করা হইত, এবং তাহাদিগের মোহরেও তাঁহারা 'ফিদবী' শব্দ ব্যবহার করিতেন ; কিন্তু এই মহোচ্চ সম্মান, কেবলমাত্র মহারাজা তিলোকচন্দের ভাগ্যেই ঘটিয়াছিল।

৯ম — বাদসাহের বিশেষ অনুগৃহীত ও প্রিয়পাত্র মসিরউদ্দৌলা বাহাদুর মহারাজা তিলোকচন্দের ঈদৃশ সম্মান প্রাপ্তির জন্য সহানুভূতি প্রকাশ করতঃ পত্র প্রেরণ করেন।

১০ম — ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীশ্বরের আজ্ঞানুসারে মহারাজ তিলোকচন্দ যে পঞ্চ হাজারী জাতের সনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহার মর্ম্ম।

(জিয়াউদ্দৌলা ফিরোজ জঙ্গ) মোহরাঙ্কিত

(নজীব উদ্দৌলা বক্সীয়ান মোসালক) মোহরাঙ্কিত।

. . . . ১১৮১ হিজরী ৪ঠা রমজান বৃহস্পতিবার ৯ জুলুস।

মহামান্য হুকুম প্রচার হইল যে, মহারাজা তিলোকচন্দ্‌কে পঞ্চহাজারী জাত, তিন হাজার সওয়ার, ও মহারাজাধিরাজ উপাধি প্রদানে অভিহীত করা হইল। ১১ রমজান ৯ই জুলুস।

পূর্ব্বপ্রাপ্ত

৪ হাজার জাত

উন্নতি ...... "

১ হাজার জাত .... "

পঞ্চহাজারি জাত।

তিনহাজার সওয়ার

মহারাজাধিরাজ খেতাব।

আরজী দপ্তরে পৌঁহুছিল। ইত্যাদি।

১১ম — ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীশ্বর সাহ আলম্ বাদসাহ্ মহারাজাধিরাজ তিলোকচন্দ্ বাহাদুরকে হস্তীর পৃষ্ঠে হাওদা দিয়া তদুপরি আরোহন করিবার অধিকার প্রদান করতঃ যে সনন্দ প্রদান করেন তাহার মর্ম্ম — (সাহ আলম বাদসাহ্ গাজী ফিদবী ওম্‌দতল্ মোমালেক্ একতে খারান্ মোলক্ কমরদ্দৌলা সেপাহদার জঙ্গ বাহাদুর) মোহরাঙ্কিত।

চাকলে বর্দ্ধমানের ফৌজদার, আমেলা, কারকুন ও অধিবাসীগণ অবগত হইবে।

মহারাজাধিরাজ শ্রী তিলোকচন্দ বাহাদুরের আনুগত্য, মিত্রতা ও সম্মানের বিষয় বিবেচনা করিয়া হাওদা, সওয়ারির পরওয়ানা দেওয়া গেল। অতঃপর মহারাজা হাওদা, সওয়ারী দ্বারা আপন অধিকার মধ্যে যথেচ্ছ গমনাগমন করিতে পারিবেন। সন ১৪ জুলুস, ১৫ রজব, ১১৮৬ হিজরী।

তৎকালে সম্রাটের বিনানুমতিতে কেহই হস্তী পৃষ্ঠে হাওদা দিয়া তদুপরি আরোহন করিতে পাইতেন না। সম্রাটের দরবারে বিশেষরূপে প্রতিপত্তি লাভ করিতে না পারিলে এরূপ সর্ব্বোচ্চ সম্মান লাভ কাহারও ভাগ্যে সহসা ঘটিয়া উঠিত না। তৎকালে বঙ্গে কেবলমাত্র ইনিই এই মহোচ্চ সম্মান লাভ করিয়াছিলেন।

মহারাজা তিলোকচন্দ্‌কে ৪ পারচা খেলাত ও ১টি হস্তী প্রদান করতঃ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রধান কর্ম্মাধ্যক্ষ মিঃ হেনরি ওয়াটস্ সাহেব বাহাদুর তাঁহাকে পারসী অক্ষরে যে পত্র লিখেন তাহার মর্ম্ম নিম্নে লিখিত হইল।

মোহর

"বন্ধুবর

আপনার সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি। ইতিপূর্বে ৪ পারচা খেলাত ও ১টি হস্তী

প্রদান করতঃ আপনাকে সম্মানিত করা হইয়াছে। রামদেব নাগের মাঃ খেলাতের বস্ত্রাদি প্রেরণ করা হইল। হস্তী এখানে ক্রয় করিতে না পাওয়ায় তাহার মূল্য প্রেরণ করিতেছি ইত্যাদি। ১৬ রমজান।"

মহারাজ তিলোকচাঁদের সঙ্গে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মাধ্যক্ষগণের যথেষ্ট প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল। তাঁহারা মহারাজকে বিশেষ সম্মানও করতেন। কিন্তু বিশেষ কারণ বশতঃ মহারাজা ইংরেজদের প্রতি রুষ্ট হন। এমনিতেই তিনি ছিলেন স্বাধীনচেতা, তৎপরে ইংরেজদের গতিবিধি ও আচরণে তিনি ক্ষুব্ধ হন।

মারাঠা উপদ্রব — রাজা তিলোকচাঁদ জমিদারীর অধিকারী হন ১৭৪৪ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর থেকে, তখন তিনি কিশোর বালক। ঠিক এক বছর পর ১৭৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে রঘুজী ভোঁসলের নেতৃত্বে মারাঠা বাহিনী নবাবের প্রবল বাধা দানে মুর্শিদাবাদ থেকে পালিয়ে আসে বর্ধমানে কাটোয়ার পথ ধরে। নবাব সৈন্যও তাদের পিছু ধাওয়া করে। শেষ পর্যন্ত বর্ধমান শহরের রানিদীঘির (রানীসায়র) পশ্চিম পারে উভয়পক্ষের তুমুল যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে রঘুজী শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে বর্ধমান জেলার পশ্চিম অঞ্চল দিয়ে নাগপুরে পলায়ন করে। তৎপূর্বে ১৭৪৪ খ্রীষ্টাব্দেই ভারত সম্রাট মহাম্মদসা বাদসাহের নিকট হতে প্রথম ফরমান পান এবং রাজা হিসাবে স্বীকৃত হন।

রাজবংশানুচরিতে উল্লেখ আছে রাজা তিলোকচাঁদ ২য় ফরমান পান মহাম্মদসা বাদসাহের নিকট হতে ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দে। কিন্তু সুরেন্দ্রমোহন বসু মহাশয়ের 'ভারত গৌরব' গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ৩২২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে, রাজা তিলোকচাঁদ 'রাজাবাহাদুর' উপাধি প্রাপ্ত হন এবং সেই সঙ্গে ৪০০০ অশ্বারোহী ও ২০০০ পদাতিক সৈন্য রাখার অনুমতি পান। ১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট আহম্মশাহের ফরমানে উল্লেখ আছে তিলোকচাঁদ, 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি লাভ করেন এবং ব্যবহার করার অনুমতি পান (*Calcutta Review --- 1910 Page 125*)

রাজা তিলোকচাঁদের ফরমান, মনসবদারী প্রভৃতি সনদগুলি পর্যায়ক্রমে পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এক্ষণে ত্রিলোকচাঁদের সময়ে বর্ধমানে মারাঠাদের অত্যাচার কখন কখন হয়েছিল তার বিবরণ লিপিবদ্ধ করছি।

১৭৪৫ খ্রীষ্টাব্দে রঘুজীর নেতৃত্বে মারাঠা বাহিনী বর্ধমান শহরের বুকে রানিসায়রের পাড়ে নবাব সেনার সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে নিজদেশে ফিরে যায়।

১৭৪৭ খ্রীষ্টাব্দে মীর হাবিব ও রঘুজীপুত্র জানোজী যৌথভাবে বর্ধমান বীরভূম মেদিনীপুরের গ্রাম শহরে লুঠতরাজ, অগ্নিদগ্ধ করতে থাকে। বর্ধমানের ওপর নবাব সৈন্যের সঙ্গে মারাঠা বাহিনীর যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে মারাঠা বাহিনী সাময়িকভাবে বর্ধমান

ছেড়ে পলায়ণ করে।

১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে মারাঠারা আবার বর্ধমানে শিবির স্থাপন করে বর্ধমান, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলায় লুণ্ঠন ও অগ্নিসংযোগ চালায়। নবাবের বাছাই করা সেনাবাহিনী নিয়ে ফতেআলি খাঁ কাটোয়া রওনা হলেন। এই সংবাদে মারাঠারা কাটোয়া ছেড়ে চলে যায় কিন্তু প্রধান দলটি চলে গেলেও বর্ধমান জেলায় যে সব মারাঠা দস্যুরা দূর দূর গ্রাম গঞ্জে ছড়িয়ে পড়েছিল তারা সেই লুঠতরাজ অগ্নিসংযোগ যথারীতি চালিয়ে যাচ্ছিল। ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে নবাব আলিবর্দী অসুস্থ হওয়ায় মারাঠাদের সাহস বেড়ে যায় এবং অত্যাচারের মাত্রাও বেড়ে যায় দ্বিগুণ মাত্রায়। ১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দে নবাব মারাঠাদের সঙ্গে সন্ধি করলেও, তারা চুক্তি অনুসারে বাংলা ছেড়ে যায় নাই। তবে বৃহত্তর ক্ষেত্রে হাঙ্গামা বন্ধ হলেও বর্ধমান, মেদিনীপুর মারাঠাদের হাত হতে রেহাই পায় নাই। পরে কয়েক বছরের মধ্যে বাংলার মসনদে রদবদল ঘটেছে। সিরাজদ্দৌলা মসনদে বসেছেন। পলাশীর যুদ্ধে বাংলার ভাগ্যাকাশে নেমে এসেছে দুর্যোগের ঘনঘটা। ইংরেজের হাতের পুতুল হয়ে মীরজাফর বসেছে সিংহাসনে। এদিকে মারাঠা সেনাপতি শিউভাট একদল অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে চাকলা বর্ধমানের দক্ষিণ অঞ্চলে লুণ্ঠন অগ্নিসংযোগ চালিয়ে যাচ্ছে। তখন মীরজাফর, জামাতা মীরকাশিমসহ সসৈন্যে বর্ধমানে উপস্থিত। মীরজাফর মহারাজ তিলোকচাঁদের নিকট দশ লক্ষ টাকা দাবী করেন। সেই অর্থ হতে তিনি শিউভাটকে সাত লক্ষ টাকা প্রদান করেন। শিউভাট সাময়িকভাবে কটকে ফিরে যায়। এদিকে মীরজাফরের অপশাসনের বিরুদ্ধে বাংলার জমিদারগণ দ্বিতীয় আলমগীরের পুত্র শাহ আলম, বাংলা অধিকার করার ইচ্ছায় বীরভূম ও বর্ধমান অতিক্রম করে বিষ্ণুপুরে শিবির স্থাপন করে তাঁর সঙ্গে যোগদানের জন্য মারাঠাদের আহ্বান করেন। তিনি মারাঠাদের ন্যায় মহারাজা তিলোকচাঁদের নিকট প্রচুর অর্থ আদায় করে এলাহবাদে ফিরে যান। প্রকৃতপক্ষে চাকলা বর্ধমানের ওপর বর্গীর হাঙ্গামার সঙ্গে সঙ্গে কি দিল্লীর বাদশাহ, কি বাংলার নবাব এঁরা তিলোকচাঁদের নিকট হতে বহুপ্রকারে অর্থ আদায় করেন। অতঃপর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি মহারাজের প্রতি সৌজন্য মূলক আচরণ করেন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নিকট হতে যখন মহারাজা তিলোকচাঁদ খিলাত পান (১৭৬০, ২৪ ডিসেম্বর) সেই সময় দুর্দান্ত মারাঠাগণ বর্ধমান এসে লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ করতে থাকায় জনগণ আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সহ গ্রামে পালিয়ে প্রাণ রক্ষা করেছিল, যার ফলে শহরাঞ্চল জনহীন শ্মশানে পরিণত হয়েছিল। ব্যবসায়, বাণিজ্য, কৃষিকার্য সব বন্ধ হয়ে যায়। তিন মাস কাল যাবৎ মারাঠারা ক্রমান্বয়ে অত্যাচার উৎপীড়ন চালিয়ে ছিল। ইত্যাদি কারণে মহারাজা যথা সময়ে রাজস্ব আদায় না হওয়ায়, তিনি ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে আগষ্ট মাসে ইষ্ট ইণ্ডিয়া

কোম্পানিকে বর্ধমানের এইরূপ শোচনীয় অবস্থার কথা অবগত করেন এবং রাজস্ব বাকী পড়ার কারণ দর্শান। (*Selections from unpublished records of India Government*)

ঐ বৎসরে মহারাজ তদীয় সৈন্য বিভাগে প্রায় ১৫ সহস্র লোক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সোলেমান বাগ হইতে ১৭৬০ খৃঃ অব্দে নভেম্বর মাসের রিপোর্টে লিখিত আছে যে ঃ "বর্ধমানের মহারাজা তদীয় সৈন্য মধ্যে ১৫ সহস্র লাঠিয়াল, পাইক ও ডাকাইত নিযুক্ত করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন।" বঙ্গের নবাব মীরকাশিম খাঁ-ও ঐ সম্বন্ধে ইষ্টি ইণ্ডিয়া কোম্পানির গভর্ণর সাহেব বাহাদুরকে লিখিয়াছেন যে, 'বর্ধমানের মহারাজা যুদ্ধার্থে ১০/১৫ সহস্র সৈন্য নিযুক্ত করিয়া বীরভূমের রাজার সহিত যোগদান করিয়াছেন।' আমি এই সংবাদ অবগত হইয়াই ২/৩ সহস্র অশ্বারোহী এবং ৫/৬ সহস্র পদাতিক সৈন্য পাঠাইয়া বীরভূমের রাজাকে দমন করিবার মনস্থ করিয়াছি। পূর্ব্বে চিতুয়া, বরদা এবং চন্দ্রকোণার রাজাকে পরাজিত করিয়া, তাঁহাদের যে সকল রাজ্য, বর্ধমানের রাজা অধিকার করিয়াছেন তৎসমূদয় পুনরাধিকার করতঃ পূর্ব্ব জমিদারদিগের উত্তরাধিকারীগণকে প্রদান করিয়া, বর্ধমানের রাজাকে দমন করাই আমার অভিপ্রায়। বীরভূম হইতে যাইবার সময়ে মেজর হোয়াইট্ যেন অবশ্যই বর্ধমান অধিকার করেন। (*Selections from unpublished records of India Government*)

উক্ত সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া ১৭৬০ খ্রীঃ ২৪ শে নভেম্বর তারিখে বোর্ড হইতে কাপ্তেন হোয়াইটের প্রতি আদেশ হয় যে, মিঃ সমরকে বর্দ্ধমানের মহারাজের নিকট প্রেরণ করা হইয়াছে, তিনি আপনাকে যেরূপ বলিবেন, আপনি সসৈন্যে তাহাই করিবেন। আপনি মিঃ নচার্সের জন্য হুগলীতে অপেক্ষা করিবেন। যদি রাজা বশ্যতা স্বীকার না করেন, তাহা হইলে আপনারা উভয়েই সসৈন্যে অম্বিকা হইয়া বর্ধমানে যাইবেন। আর যদি রাজা বশ্যতা স্বীকার করেন, তবে বোটগুলিকে হুগলী অথবা অম্বিকা হইতে ফেরৎ পাঠাইয়া বরাবর মেদিনীপুরে যাইবেন। আমার বোধ হয়, মহারাজ বশ্যতা স্বীকার করিবেন। (*Selections from unpublished records of India Government*)

বোর্ডের অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া কাপ্তেন হোয়াইট্, মহারাজার নীলগড় নামক দুর্গ অবরোধ করিলে, ১৭৬১ খ্রীঃ জানুয়ারী মাসে মহারাজা তৎসম্বন্ধে বোর্ডে যে পত্র লিখেন, তাহার মর্ম্ম নিম্নে লিখিত হইল ঃ "বর্গীরা আমার দেশ লুণ্ঠন করিয়াছে, এবং আমি সেনপাহাড়িতে আসিবার পরেই, মেজর হোয়াইট্ আসিয়া সহসা আমার নীলগড় দুর্গ আক্রমণ করতঃ কামানগুলি ও দেবালয়ের দ্রব্যাদি সমূদয় অধিকার করিয়াছেন। কেল্লাদার হীরা সিংহকে

বন্দী করতঃ দুর্গ মধ্যে স্বীয় প্রহরীগণকে নিযুক্ত করিয়াছেন। সহসা এরূপ আক্রমণ করিবার কারণ জানিতে না পারায়, আমি অতিশয় দুঃখিত ও বিস্মিত হইয়াছি। আমার প্রতি আপনার যথেষ্ট অনুগ্রহ আছে এবং আমিও আপনার চিরনুগত ও আশ্রিত, কিন্তু কি কারণে মেজর সাহেব যে সহসা আমার ও এদেশের এরূপ অনিষ্টকর কার্য্য করিবেন, তাহা বলিতে পারি না। (*Selections from unpublished records of India Government*)

"সন ১১৬৭ সালে ইং ১৭৬০ খৃঃ মহারাজ তিলোকচন্দ্ বাহাদুর মারহাট্টাগণ কর্ত্তৃক বিবিধ প্রকারের উৎপীড়িত হইয়াও সরকারের প্রাপ্য রাজস্ব ও আবওয়ার ইত্যাদি বাবদে ৩১,৭৫,৪০৬ ্ টাকা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে রাজস্ব কখনই বাকী পড়ে নাই। মারহাট্টাগণের অত্যাচার সম্বন্ধে মহারাজ ১৭৬১ খৃঃ ফেব্রুয়ারী মাসে বোর্ডে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহার মর্ম্ম নিম্নে লিখিত হইল।

"মারহাট্টা দস্যুগণ এখনও এখানে আমার ও দেশের প্রতি যে কতদূর অত্যাচার করিতেছে, কত প্রজার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন ও গৃহাদি দগ্ধ করিয়া দিতেছে, তাহা বোধ হয় আপনি বা অপর কেহই অবগত নহেন। কিন্তু নিশ্চয়ই পরে লোক মুখে সমূদয় অবগত হইবেন। যদি মেজর সাহেব কোন প্রকার গোলযোগ না করিতেন অথবা মারহাট্টা দস্যুদিগের অত্যাচারে এবম্প্রকার ক্ষতিগ্রস্ত না হইতাম, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সমূদয় খাজনা পরিশোধ হইত। এখন পর্যন্তও উক্ত দস্যুগণ দেশ লুণ্ঠনে নিবৃত্ত হয় নাই। আমি পলাতক প্রজাগণকে স্ব-স্ব স্থানে ফিরাইয়া আনিবার জন্য বিশেষ রূপে চেষ্টা করিতেছি; কিন্তু তাহারা মারহাট্টাদিগের ভয়ে আসিতে স্বীকার করিতেছে না।"(*Selections from unpublished records of India Government*)

দুর্দ্দান্ত মারহাট্টা দস্যুদিগের পৈশাচিক অত্যাচার নিবারণার্থে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানি বর্দ্ধমান প্রদেশের কয়েকটি স্থানে সেনানিবাস সংস্থাপন করিলে, মহারাজা তাঁহার অধিকৃত দুর্গ ও সেনানিবাস হইতে ১১৭৪ সালে ইং ১৭৬৭ খৃঃ যে সকল সৈন্যগণকে পদচ্যুত করিয়াছিলেন, তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

স্থানের নাম	সওয়ার	পদাতিক	মাসিক বেতন
রাজবাটী	৩১	০	৭৫০ ্
মহব্বৎগড়	১৩	৪৯	৬১৯ ্
অম্বিকা	১১	০	২৫০ ্
সেনপাহাড়ীগড়	১০	৫০	৪৮১৸৹
চন্দ্রকোণা	২৮	১১২	১৫২৮ ্

বিল্লগগড়	৩২	১৯২	১৬৯২।
আরোরাগড়	৯	৪৩	৪০৪
রজিগড়	১০	২৬	৩৭৩
সেরগড়	১	৬	৪৯
জামুগা	১	১৭	৯৯
ওরধগড়	১	১৬	৯৫
	১৪৭	৫০১	৬,৩৪১

উল্লিখিত স্থান হইতে সৈন্যগণকে পদচ্যুত করিয়া, অবশিষ্ট যে যে স্থানে যত সৈন্য নিযুক্ত ছিল তার তালিকা ঃ

রাজবাটী	১১৯	৪২৮	৬,০৭৭।·
অম্বিকা	৬০	১৮৩	১,৮৪৬৸·
হরকরা মোহরের	–	৭৯	–
গোশকটাদি	–	–	৭৩৬
	১৪৯	৬৯০	৮,৬৬০

১১৭৪ সাল, ইং ১৭৬৭ খৃঃ বর্দ্ধমানাধিপতির রাজস্ব ও খরচের বরাদ্দের তালিকা যাহা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহার অবিকল প্রতিলিপি নিম্নে প্রদর্শিত হইল ঃ

জমিদারী খাজনা বিগত সনের হিসাব		৩৯,৩৩,৯১২
যে সকল পতিত জমির অধিকাংশ বর্ত্তমান সনে আবাদ হইয়াছে তাহার বৃদ্ধি খাজনা		৬,৮৭৭
		৩৯,৪০,৭৮৯
বাদ সিলেক্ট কমিটির আদেশানুসারে রাজস্ব হইতে যে সকল তন্‌খা বাদ দেওয়া হইয়াছে		৫৩,৪৭২
		৩৮,৮৭,৩১৭
গত সনের বাজেয়াপ্ত চাকরাণ জমির খাজনা বাবদ	৬১,২৩৯	
বর্তমান সনের ঐ জমির খাজনা	৬০,০৪৫	
মোৎসদ্দিদিগের নিকট ১,০৪৭ বিঘা জমির সেলামি	৫২৪	১,২১,৮০৮

জের		৪০,০৯,১২৫৲
ওজন বাটা বিগত সনের হিঃ . . .	১,৬৪,৪৪৭৲	
চাকরাণ জমির বৃদ্ধি খাজনা	৭,২২৪৲	১,৭১,৬৭১৲
জমিদারী সম্বন্ধীয় খরচ—		
মহারাজার মাসিক	২০,৫৫০৲ টাকা	
হিঃ বার্ষিক বরাদ্দ	২,৪৬,৬০০৲	
নানাবিধ রীতরসুম আদির খরচ	৫,২৪০৲	২,৫১,৮৪০৲
গত সনের ন্যায় থানাদার দিগের খোরাকী	৩৬,৩৭১৲	
বাদ মাসিক কমি ১,০৭২ হিঃ বার্ষিক '	১২,৮৭০৲	২৩,৫০১৲
রাজ্য মধ্যে নানাবিধ রীতরসুন ও		
দেবদেবীর পূজাদির জন্য বরাদ্দ	১২,৭৪৯৲	
গত সনের ন্যায় কাগজকালি ইত্যাদি		
সরঞ্জামী খরচ	৫,৯০০৲	১৮,৬৪৯৲
রাজ্য মধ্যে ডাক বিভাগের খরচ	৩,৬৮৯৲	
গত সনের কুলী, বেহারা আদি খরচ	৭,৩০১৲	
গত সনের ন্যায় খয়রাত খরচ	৫,৭২৪৲	
বিবিধ প্রকার ক্ষতি ও দেনা পরিশোধ	১,০০,০০০৲	১,১৬,৭১৪৲
		৪৫,৯১,৫০০৲

অতঃপর দেখা য়ায় ১৭৪৪ খ্রীঃ থেকে প্রায় তাঁর রাজত্বকালের শেষ দিন পর্যন্ত মারাঠা/বর্গীর অত্যাচার, সেই সঙ্গে তেলেঙ্গনা বাহিনীরাও বর্ধমান লুঠতরাজ, তারপর ১৭৫২ খ্রীঃ অব্দে বাংলায় দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি নানা প্রতিবন্ধকতার সঙ্গে সংঘর্ষ করে তিনি রাজকার্য চালিয়েছিলেন।

স্বাধীনচেতা তিলোকচাঁদ বাহাদুরের ব্রিটিশ বিরোধিতা ঃ—

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অভ্যুত্থান হয়েছিল মহারাজাধিরাজ তিলোকচাঁদের সময়ে এবং তাঁর রাজত্ব কালেই ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভ করে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাংলা, বিহার, উড়িষ্যায় প্রকতরূপে আধিপত্য স্থাপন করেন। মহারাজাধিরাজ তিলোকচাঁদ এমন প্রবল পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন যে, লর্ড ক্লাইভ তাঁর কাছে ১০০০ অশ্বারোহী সৈন্য দিয়ে সাহায্য চেয়ে অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু তিনি কোনরূপ সাহায্য করেনই নাই উপরন্তু তাঁর অধিকারস্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর যাবতীয় কুঠীর কাজ সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিয়েছিলেন। এই তথ্য জানা যায় রেভারেণ্ড লং সাহেবের লিখিত On Published Records of Government গ্রন্থ্ থেকে। তারই কয়েক ছত্র এখানে উদ্ধৃত করছি — *"Tilake Chand was the Raja of Burdwan at this time; he was very rich and wielded all the powers of a Feudal Chieftain in his district, as may be seen in this fact, he shut up all the English factories and stopped their business."*

Selections from records of the Government of India থেবে জানতে পারা যায় ইতোপূর্বে ১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজাধিরাজ বাহাদুর তিলোকচাঁদ ২২ বছর বয়ক্রমকালেই নিজ অধিকার মধ্যে ইংরেজদের সমস্ত কুঠীর কাজ বন্ধ করে দেন। তখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বর্ধমান মহারাজার সব বৃত্তান্ত জানিয়ে বাংলার নবাবের কাছে ১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল তারিখে একখানি আবেদন পত্রে জানান তাঁরা যাতে অবাধে ব্যবসা বাণিজ্য করতে পারেন। ঐ আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে নবাব ইংরেজদের অনুকূলে ১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই মে তারিখে, মহারাজের কাছে এক পরোয়ানা পাঠান। ঐ পরোয়ানা বলে মহারাজাধিরাজ ইংরেজদের সব কুঠী ছেড়ে দেন।

মহারাজাধিরাজ ইংরেজদের কুঠীর কাজ বন্ধ করে দেওয়ার পশ্চাতে যথেষ্ট কারণ ছিল। কারণটি হলো, রামরঞ্জন কবিরাজ নামে মহারাজের এক পদস্থ্ কর্মচারী জন উড নামক এক ইংরেজের নিকট ৬,৩৫৭ টাকা ধার নিয়েছিলেন। এই পাওনা টাকার জন্য জন উড মেয়র কোর্টে নালিশ করেন। মেয়রকোর্ট অনাদায়ী অর্থের জন্য সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার পরওয়ানা দেন। পরওয়ানা বলে মহারাজ তিলোকচাঁদের কলিকাতাস্থ্ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। তখন মহারাজ ঐ কাজের প্রতিবাদে ইংরেজদের ক্ষীরপাই-এর ফ্যাক্টরী ও বর্ধমানে অবস্থিত বাণিজ্যকুঠীগুলি বন্ধ করে দেন। তৎপরে পলাশীযুদ্ধের প্রাক্কালে রবার্ট ক্লাইভকে লেখা ওয়াটস্ সাহেবের পত্র (১৭-৭-১৭৫৬) থেকে জানতে পারা যায়, সিরাজদ্দৌল্লার বর্ধমান রাজার প্রতি নির্দেশ ছিল, ইংরেজরা যাতে খাদ্যদ্রব্য ও অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য সমূহ

যোগাড় করতে না পারে। সিরাজদৌল্লার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীগণের সঙ্গে বর্ধমান মহারাজ ও বীরভূমের জমিদার যোগদান করেন নাই। ফলে, এই দুই জমিদার নূতন দরবারে অপাঙ্‌ক্তেয় হয়েছিলেন।

১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ২৩ শে জুন, বৃহস্পতিবার পলাশীর প্রাঙ্গণে যুদ্ধ হলো— তাকে যুদ্ধ না বলে যুদ্ধের প্রহসন বলাই যুক্তিযুক্ত। নবাব সিরাজদৌল্লা পরাজিত হলেন। তাঁকে নৃশংসভাবে হত্যা করার পর, ইংরেজদের অনুগ্রহে মীরজাফর বাংলার মসনদে বসলেন। কিন্তু যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ মীরজাফর ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল তারিখে চাকলা বর্ধমান ও নদীয়ার রাজস্ব ইংরেজ কোম্পানিকে হস্তান্তর করলেন। কিন্তু মহারাজাধিরাজ তিলোকচাঁদের সঙ্গে ইংরেজ কোম্পানি সম্পর্ক ভালো ছিল না। সেইজন্য বর্ধমান চাকলার রাজস্ব মুর্শিদাবাদের রায়রায়ান মাধ্যমে আদায় হতো। সেই সময় বর্ধমান চাকলার বার্ষিক রাজস্বের পরিমাণ ছিল ২৮,৫৬,১১৯ টাকা ৭ আনা ৬ পাই, যা তৎকালীন সমগ্র বাংলাদেশের কোন জমিদারীর আয় এত বেশী ছিল না। অবশ্য প্রথমের দিকে ইংরেজরা নিজেদের স্বার্থে মহারাজ তিলোকচাঁদের সঙ্গে সদ্ভাব রাখতে চেষ্টা করেছিল, কারণ সেই সময় ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গটি তৈরী হচ্ছিল এবং পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে প্রচুর শ্রমিকের প্রয়োজন। এই পার্শ্ববর্তী সব অঞ্চল মহারাজা তিলোকচাঁদ বাহাদুরেরই জমিদারীর অংশ। ১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে গভর্ণর হলওয়েলকে লেখা হগওয়াট্‌স্‌-এর এক পত্রে বেশ পরিষ্কার বোঝা যায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে মহারাজা তিলোকচাঁদের সম্পর্ক মোটেই ভাল নয়। মহারাজ মুর্শিদাবাদের নবাবের অধিনস্থ কোম্পানির কর্তৃত্বকে মেনে নিলেও কোম্পানির কর্মকর্তাদের ব্যক্তিগত লাভালাভের প্রশ্ন জরিত থাকায় যুদ্ধ অনিবার্য ছিল। কাজেই ওয়াট্‌স্‌-এর পত্র পেয়ে লেঃ নোল্লিকিন্‌সের অধীনে ৪৩০ জন সৈন্যের একটি দল বর্ধমান অভিমুখে যাত্রা করে। এই যুদ্ধে উভয়পক্ষে ৪৪ জন সৈন নিহত ও ৫৭ জন আহত হয়। *(IBID, P.-142)* যাইহোক যুদ্ধের পর একটা মিটমাটের ব্যবস্থা করা হয়।

এদিকে মীরজাফর বাংলার মসনদে আরোহন করার পর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ইংরেজ কর্মচারীগণ যারা সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিল প্রভৃতিকে চুক্তি সম্মত অর্থ দিতে না পারায় তাঁকে পদচ্যুত করে ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দের ২৭ সেপ্টেম্বর তারিখে তাঁর জামাতা মীরকাশিমকে বাংলার নবাব হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এই স্বীকৃতি পাওয়ার প্রধান কারণ, অপদার্থ মীরকাশিম, কোম্পানি ও ইংরেজ কর্মচারীগণকে প্রচুর উপঢৌকন দিয়েছিলেন।

ঐ বছরই অর্থাৎ ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই অক্টোবর (১লা কার্তিক, ১১৬৬ সাল) তারিখে, চাকলা বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রামের রাজস্ব আদায়ের সনদ কোম্পানির হস্তগত

হয়।

এই ব্যাপারে মীরকাশিমের সঙ্গে কলিকাতাস্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সিলেক্ট কমিটির যে চুক্তি হয়, তা হ'ল — *"No. 5. Far all charges of the company and of the said Army, and provisions for the field, & c, the Lands of Burdwan, Midnapur and Chittagong shall be assigned, and sunnad for that purpose shall be written and granted. The company is to stand to all losses and receive all the profits of these three countries, and we will demand no more than the three assignments aforest." (The Treaty between the Nobab Meer Mohomed Kossim Khan and the Company).*

অতঃপর তিলোকচাঁদের সঙ্গে কোম্পানি ও মীরকাশিমের বিরোধ চরম পর্যায়ে পৌঁছল। নবাব ও কোম্পানির অসহযোগিতা, বর্ধমানের দক্ষিণ অঞ্চলে মারাঠা তেলেঙ্গনা সৈন্যদলের হাঙ্গামা, সমগ্র দেশে অরাজকতা, সুতরাং বিপুল পরিমাণে রাজস্ব আদায় বাকী পড়ায় রাজা দেয় রাজস্ব সময়মত উসুল দিতে অক্ষম ছিলেন। ইতিপূর্বে ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে ক্লাইভ স্বদেশে ফিরে গেছেন। হলওয়েল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নতুন গভর্ণর নিযুক্ত হয়েছেন। মীরকাশিম কোম্পানির মনোরঞ্জনের জন্য মহারাজ তিলোকচাঁদের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ করেন। আরও জানান মহারাজা ১৫০০০ সিপাহী সৈন্য সংগ্রহ করেছেন। ইত্যাদি বিভিন্ন রকমের সংবাদ নবাবের কাছ থেকে পেয়ে একদল ইংরেজ সৈন্যকে বর্ধমান প্রেরণ করা হয়। কিন্তু সৈন্যদলটি বর্ধমান না গিয়ে মেদিনীপুরের দিকে যাত্রা করে, কারণ হলো সংঘর্ষ এড়িয়ে যাওয়া। কিন্তু যুদ্ধ সাময়িকভাবে এড়ানো গেলেও শেষ রক্ষা হলো না। জুন মাসে (১৭৬০) হলওয়েল, ব্রাউনের অধীনে ২০০ সৈন্য দিয়ে বর্ধমান অভিযানে পাঠায়। মহারাজ তিলোকচাঁদ ৭/৮ শত সিপাহি নিয়ে ব্রাউনের আক্রমণ প্রতিরোধ করেন। দুপক্ষের যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে কোম্পানির ৪৫ জন সৈন্য মারা যায় এবং ৫৭ জন গুরুতর আহত হয়। মহারাজা আরও ৫০০০ সৈন্য সংগ্রহ করেছে জানতে পেরে ইংরেজরা আর বর্ধমানের দিকে অগ্রসর হয় নাই। এদিকে বীরভূমের নতুন জমিদার সেপ্টেম্বর মাসে, চাকলা বর্ধমানের, সেনপাহাড়ী, সেরগড়, গোয়ালভূম আজমৎশাহী, মজঃফরশাহী ও মনোহরশাহী পরগণা আক্রমণ ও লুঠতরাজ করে। রাজা ব্যাপারটি জানালেও কোম্পানি কোন প্রতিকার করে নাই। অথচ উত্তরোত্তর রাজস্ব বৃদ্ধির দাবী মেটাতে অক্ষম হয়ে রাজা সপরিবারে শহর ছেড়ে পালিয়ে আত্মগোপন করে অবস্থান করেন।

তখন ক্যাপটেন মার্টিন হোয়াইট একদল সৈন্য নিয়ে এসে দামোদরের দক্ষিণ

তীরে শিবির স্থাপন করে অপেক্ষায় থাকে। মহারাজা সেনপাহাড়ী দুর্গে অবস্থান করছেন সংবাদ পেয়ে হোয়াইট সেনপাহাড়ী দুর্গ অবরোধ করে কামানগুলি দখন করে নেয়, তাছাড়া দুর্গের অন্যান্য জিনিষও লুঠ করে এবং কিল্লাদার হায়ার সিংকে বন্দী করে দুর্গটিকে প্রহরী বেষ্টিত রাখে। কিন্তু তৎপূর্বেই মহারাজ অন্যত্র চলে যান।

ক্লাইভ দ্বিতীয়বার ভারতে ফিরে এসে ত্রিলোকচাঁদের সঙ্গে কোম্পানির বোঝাপরা প্রয়োজন অনুভূত হয়। কারণ, সুবে বাংলার সর্বাধিক রাজস্ব আদায়ী জমিদারী চাকলা বর্ধমান ক্লাইভের সঙ্গে দিল্লীশ্বরের সাক্ষাতের সময় মিঃ সামনার বর্ধমান রাজার জন্য রাজাধিরাজ উপাধি, ঝালরদার পালকী ও শিরোপা প্রার্থনা করে। ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দেই ২৪ শে ডিসেম্বর তারিখে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নিকট হতে মহারাজ তিনপ্রস্থ খিলাত পেয়েছিলেন (হস্তী ২০০০ টা, পোষাক -৬০০ টা, ও শিরপৈচ - ৪০০ টা)। এখানে উল্লেখ্য, মহারাজের সমস্ত ফরমান সনদ, খিলাত বিস্তারিতভাবে অন্যত্র সন্নিবদ্ধ করা হয়েছে।

বাংলায় নবাবী শাসনের সময়ের মধ্যে বর্ধমানের ওপর যথেষ্ট অবিচার, ক্ষতি সাধন হয়েছিল, অপদার্থ, যুদ্ধ বিদ্যায় অজ্ঞ, কূটনীতি শুধু নয় সর্বপ্রকার নীতি জ্ঞান বিবর্জিত ও অপরিণামদর্শী নবাব মীরকাশিমের আমলে। কাটোয়া ও অগ্রদ্বীপের যুদ্ধে মীরকাশিম, তিলোকচাঁদের সঙ্গে যুদ্ধে চূড়ান্তভাবে পরাজিত হন। মীরকাশিমের পরাজয়ের পর ইংরেজদের সঙ্গে ত্রিলোকচাঁদের কোন আপোষ-মীমাংসা হয়েছিল কিনা জানা যায় না।

১৭৬১ খ্রীঃ অব্দে বর্ধমান ও সঙ্গত-গোলার মধ্যস্থিত নদীতীরে ক্যাপটেন হোয়াইটের সঙ্গে মহারাজার সৈন্যগণের যুদ্ধ হয়েছিল। ১৭৬১ খ্রীঃ অব্দে ২৯ শে ডিসেম্বর তারিখে বস্তিকাবাগ হতে এই যুদ্ধ সম্বন্ধে যে রিপোর্ট সিলেক্ট কমিটি প্রেসিডেন্টকে পাঠানো হয়েছিল তার মর্ম —

"মহিমা বরেষু।

বর্ধমান ও সঙ্গতগোলার মদ্যস্থিত নদীতীরে মহারাজার সেনাপতি মিছ্রি খাঁ ও দুন্দর সিংহ প্রভৃতির সহিত যে যুদ্ধ হইয়াছে, তাহার মর্ম নিজে দিতেছি।

বিগত ২৫ তারিখে, আমি মহারাজাকে লিখিয়াছিলাম যে, আমাদের সহিত তাঁহার যেরূপ সদ্ভাব আছে, তাহা আমি বিশেষ অবগত আছি। তাঁহার প্রজাদিগের ও দেশের হিতের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, বিশেষ কার্য্যানুরোধে, আমি তাঁহার রাজধানীর ভিতর দিয়া সঙ্গতগোলার নিকটে নদী পার হইয়া যাইব। আমার সৈন্যগণ কর্তৃক তাঁহার কিছুমাত্র অনিষ্ট হইবে না এবং বিশেষ আবশ্যক হওয়ায় আমাকে ১০ সহস্র টাকাও দিতে হইবে ; আমি ঐ টাকার বিল কোম্পানির নামে লিখিয়া দিব। তদুত্তরে মহারাজ তাঁহার একজন উকীলের দ্বারা বলিয়া

পাঠাইলেন যে, উক্ত টাকা তিনি দিতে প্রস্তুত আছেন, কিন্তু আমাকে সঙ্গতগোলার দিকে না গিয়া ফিরিয়া যাইতে হইবে। আমি বলিলাম এখন আমার ফিরিয়া যাওয়া অসম্ভব। আমার দ্বারা তাঁহার কোন প্রকার ক্ষতি হইবে না। মহারাজ বলিয়া পাঠাইলেন যে, আমার কথায় তিনি নির্ভর করিতে পারেন না, রাজসৈন্যেরা নিশ্চয়ই তাঁহার গমনে বাধা দিবে। যাহা হউক, আমি ২৭ শে তারিখে নদীতীরে ছাউনী করিয়া পুনরায় মহারাজকে বলিয়া পাঠাইলাম যে, যাহাতে আপনার সহিত সদ্ভাব রক্ষা হয় এবং আমাদ্বারা আপনার কোনপ্রকার ক্ষতি না হয়, আমি এইরূপ আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি কেবলমাত্র উক্ত ১০ সহস্র টাকার অপেক্ষায় আছি এবং তাঁহার বিলও কোম্পানির নামে লিখিয়া দিতে প্রস্তুত আছি। আমার নিজমুখে এই কথা শুনিবার জন্য, মহারাজা তাঁহার একজন প্রধান হরকরাকে আমার নিকট প্রেরণ করেন। পরে হরকরার মুখে সমস্ত বিবরণ অবগত হইয়া, ধনাগার হইতে উক্ত টাকা পাঠাইয়া দিবার আদেশ দেন। যৎকালে টাকা পাঠানো হইবে, সেই সময়ে মিছ্রি খাঁ প্রভৃতি কয়েকজন সেনাপতি উক্ত টাকা আটক করিয়া ধনাগারে প্রহরী নিযুক্ত করিয়া দেয়। প্রধান হরকরা ফিরিয়া আসিলে, তাঁহাকে কিঞ্চিৎ অর্থ প্রদানে বশীভূত করতঃ, এই সকল ও অপরাপর কয়েকটি গোপনীয় সংবাদ অবগত হইয়াছিলাম। পরদিন যখন আমি নদীর নিকট হইব, এমন সময়ে একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী আমার নিকটে আগমন করিল। বোধহয় আপনার অনুমতির বিষয় যাহা কিছু আমি বলিয়া পাঠাইয়াছিলাম, তাহা শুনিয়াই মহারাজ ঐ ব্যক্তিকে আমার নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, আপনার সরকারকে আমার সহিত পাঠাইয়া দিউন, আমি তাঁহার সহিত টাকা পাঠাইয়া দিব। কিয়ৎক্ষণ পরে দুজনেই ফিরিয়া আসিলে রাজকর্ম্মচারী বলিলেন যে, আপনি যদি ফিরিয়া না যান, অথবা কাটোয়ার পথে চলিয়া না যান, তাহা হইলে এক কপর্দকও দেওয়া হইবে না। তাহাকে কিঞ্চিৎ অর্থ প্রদানে বশীভূত করতঃ আরও অবগত হইলাম যে, আমাকে মেজর ইয়র্কের সহিত মিলিত হইতে না দিয়া, সেই রাত্রেই, আক্রমণ করিবার জন্য ১০টি কামান সহ সৈন্যগণকে সজ্জিত করা হইয়াছে এবং আরও ১২ টি কামান আনাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আপনি আমার প্রতি যেরূপ আদেশ করিয়াছিলেন, বোধ হয় তাহারা তাহা শুনিয়া আমাদিগকে কাপুরুষ মনে করিয়াই এতদৃশ উৎসাহিত হইয়াছিল। তাহাদের প্রায় ১০ সহস্র সৈন্য আমাদের সম্মুখীন হইয়া পরপারে যাইবার প্রতিকূল অবস্থিতি করিল। যাহা হউক সেই যুদ্ধে শত্রুপক্ষের প্রায় ৫ শত লোক হতাহত হইয়াছে। এবং আমাদের পক্ষের ২ জন ইউরোপীয় ও ৯ জন সিপাহী আহত হইয়াছে। আমরা তাহাদের ১০ টি কামান অধিকার করিয়া, তাহার ছিদ্র বন্ধ করিয়া দিয়াছি। আমার সহিত অধিক লোক বা পশ্বাদি না থাকায় ঐ সকল কামান আনিতে পারি

নাই। তৎপরে আমি মহারাজকে লিখিলাম যে, তাঁহার অবাধ্য সেনাপতিগণের দোষেই এই গোলযোগ ঘটিয়াছিল। ইহাতে তাঁহার কোন দোষই নাই। তাঁহার সহিত ইংরাজ কোম্পানির যেরূপ সদ্ভাব আছে, তাহার কোন অন্যথা হইবে না। তিনি তজ্জন্য নিশ্চিন্ত থাকুন।''

অতঃপর বোঝা যায় গোকুল নামক জনৈক রাজকর্মচারী, মহারাজ সরকারের বহু অর্থ আত্মসাৎ করে এবং তার যথাযথ হিসাব-নিকাশ দিতে না পারায় মহারাজ তাকে কারারুদ্ধ করেন। গোকুল নিস্কৃতি লাভের আশায় কোন উপায়ে কৌন্সিলে আবেদন করেন। এই সম্বন্ধে বিশেষ জানবার জন্য কৌন্সিল সেই সময়কার বর্ধমানের রেসিডেন্ট মিঃ জনস্টোন্ মহারাজকে ১৭৬৪ খ্রীঃ ১৯ শে জানুয়ারী যে পত্র দেন তা হতে স্পষ্ট হয়। সেই পত্রের অনুবাদ নীচে দেওয়া হলো—

''মহাশয়গণ!

গোকুল মজুমদার কৌন্সিলে যে ইংরাজি আবেদন পত্র প্রেরণ করিয়াছিল, তাহার মর্ম্ম আমি অবগত হইয়াছি। আপনারা গোকুল মজুমদারের বৃত্তান্ত অবগত হইতে ইচ্ছুক হওয়ায়, তাহা লিখিত হইল। সম্প্রতি গোকুলকে টাকা পরিশোধ করিবার জন্য আপনাদিগের অভিপ্রায়ানুসারে মিঃ জনস্টোন ও আমার পিয়াদাদিগের জিম্বায় বাটী পাঠান হইয়াছে। গোকুল অত্যন্ত অবাধ্য ও আমার তহবিল হইতে বহু অর্থ আত্মসাৎ করায়, তাহাকে পদচ্যুত করা হইয়াছে। অবিশ্বাসী কৃতঘ্ন গোকুলের নিকট হইতে অপহৃত অর্থ আদায় করিবার জন্যই, তাহাকে কারারুদ্ধ করিয়াছিলাম। বঙ্গদেশের নিয়মই এই যে পদচ্যুত কর্মচারী প্রভুর নিকট দেনা পাওনার নিকাশ দেওয়া যাইবে। সেই জন্য দেওয়ান মাণিকচাঁদ, লালা অমর চাঁদ, রামবাবু, হরবসু মজুমদার প্রভৃতি আমার পূর্ব্বতন কর্মচারীগণও পদচ্যুত হইয়া, তাহাদের কৃত কার্য্যের ও তহবিলের নিকাশ না দেওয়া পর্যন্ত কারাগারে আবদ্ধ ছিল।

ভিন্ন ভিন্ন স্থানের ইৎমম্‌দার, সহিদার ও মোৎসুদ্দিগণের প্রদত্ত কাগজ অনুসারে গোকুল ১,৮৪,০০০ টাকার দায়ী হওয়ায় উহার পদে শৃঙ্খলবদ্ধ করতঃ কারাগারে রাখা হয়। এ পর্যন্ত উহার নিকট প্রায় অর্দ্ধেক টাকা আদায় হইয়া অবশিষ্ট টাকার জন্য এখনও কারাবদ্ধ ছিল। তাহার বাটীর দ্রব্যাদি সমুদয় অধিকার করা হইয়াছে বলিয়া যে দরখাস্তে উল্লেখ করিয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা ; কারণ, এতদ্দেশের সকলেই অবগত আছে যে, সে প্রায় ২/৩ বৎসর পূর্ব্বেই তাহার ধন-সম্পত্তি ও পরিবারবর্গকে বীরভূমের কাশীম আলি খাঁর অধিকারে পাঠাইয়া দিয়াছে।

আপনারা যখন আমার নিকট হইতে, কেবল বার্ষিক রাজস্ব নহে, বকেয়া পর্যন্ত সমস্ত টাকাই আদায় করিয়া লইয়া থাকেন, তখন আমি আমার কর্ম্মচারীগণের নিকট হইতে

এইরূপে অপহৃত টাকা আদায় না করিলে, কি প্রকারে আপনাদের প্রাপ্য রাজস্ব পরিশোধ করিব? দেনা পাওনার বিষয়ে এবম্বিধ শৈথিল্য প্রকাশ করিলে, অপরাপর কর্ম্মচারীগণও প্রশ্রয় পাইয়া রাজ্যের বিশেষ অনিষ্টসাধন করিবে এবং আপনারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার প্রতি যে জমিদারীর ভারার্পণ করিয়াছেন, তাহার রাজস্ব সংগ্রহের পক্ষেও অত্যন্ত অসুবিধা হইয়া পরিবে। সম্প্রতি আবার রামধন নাগ ও তাহার কয়েকজন আত্মীয় মিলিত হইয়া আমার প্রায় ১ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করিয়াছে। ঐ ব্যক্তিও আমার সরকারে পূর্ব্বাবধি বহুবিধ কার্যে নিযুক্ত ছিল। সে যে ক্ষতি করিয়াছে, তাহারও আদায়ের বন্দোবস্ত করিবার জন্য, তাহার বাটীতেও প্রহরী নিযুক্ত করা হইয়াছে। গোকুল ও রামধন নাগ আমার তহবিলের টাকা আত্মসাৎ করিয়াই এখন ধনী হইয়াছে, আর আমি লক্ষ লক্ষ টাকা ঋণগ্রস্থ হইয়াছি।

গত ২ বৎসর আমি কোম্পানিকে হাল ও বকেয়া খাজনা বাবদে যে বিপুল অর্থ প্রদান করিয়াছি এবং ঐ সকল অর্থ সংগ্রহ করিতে যে কত ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা আপনাদের অবিদিত নাই। আমার পদচ্যুত সৈন্যগণের প্রাপ্য বেতন পরিশোধ করিতেও বিপুল অর্থ ব্যয় হইয়াছে। এই সকল বিষয় স্মরণ করিলেই গোকুলের প্রতি আমার দণ্ডাজ্ঞার মর্ম্মানুভব হইবে। (*Selections from unpublished records of India Government*)।"

কৌন্সিল হইতে মহারাজাকে উক্ত পত্রের যে প্রত্যুত্তর প্রদত্ত হয়, তাহার বঙ্গানুবাদ নিম্নে দেওয়া হইল —

"প্রিয় মহারাজা,

আপনি গোকুল মজুমদার ও রামদেব নাগকে কারারুদ্ধ করার বিবরণ সহ যে পত্র প্রেরণ করিয়াছেন তাহা প্রাপ্ত হইলাম। তাহারা আপনার ভৃত্য, তহবিলের টাকা আত্মসাৎ করিলে, অবশ্যই আপনি তাহাদিগকে পদচ্যুত করিতে পারেন। কিন্তু বাস্তবিক তাহারা দোষী কি না, প্রথমে তাহার বিচার না করিয়াই তাহাদিগকে প্রহার বা কারারুদ্ধ করা যুক্তিসঙ্গত নহে। বিশেষতঃ আপনারই কর্ম্মচারীর বিরুদ্ধে আপনিই অভিযোগ করিয়া নিজেই তাহার বিচার করা কর্তব্য নহে। বরং মিঃ জনস্টোন্ আদি যে কয়েকটি ভদ্রলোক তথায় আছেন, তাঁহাদেরই প্রতি আপনি বিচারের ভারার্পণ করুন, তাহাতে যদি যে ব্যক্তি দোষী সপ্রমাণ হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের সহিত পরামর্শ করিয়া যে রূপে হয়, প্রাপ্য টাকা আদায় করিবেন। (*Selections from unpublished records of India Government*)।"

বর্ধমান বিভাগের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রধান মিঃ হগ্ ওয়াট্স্ ১৭৬০ খ্রীঃ অব্দে ১লা জুলাই তারিখে জন্-জেড্, হলওয়েল সাহেবকে যে রেকর্ড পাঠান তার মর্ম্ম—

"মহারাজের সৈন্যগণ, আমাদের ইজারদার দিগকে অবরুদ্ধ করায় অথবা আমাদের

কাছারি লুণ্ঠন করায় আমি তত ভীত নহি, কিন্তু আমাদের প্রাপ্য টাকা আদায় করিবার ব্যাঘাত দেওয়ায়, বড়ই বিব্রত হইতে হইয়াছে।

গত পরস্বদিন, আমাদের গোকুল জমাদারকে পাল্‌কী হইতে নামাইয়া, কারারুদ্ধ করিবার ভয় দেখানো হইয়াছে। অদ্য তাহাদের সুখলাল জমাদার, আমাদের একজন সিপাহিকে বধ করায়, আমি একজন সুবেদারকে ৩০ জন সিপাহির সহিত তাহাকে ধরিয়া আনিবার জন্য পাঠাইয়া ছিলাম। তাহারা ৭/৮ শত লোক বন্দুক লইয়া আমাদের সিপাহিদিগকে আক্রমণ করে। আমি এই সংবাদ পাইয়া তাহাদিগকে মহারাজার কাছারিতে আশ্রয় লইবার জন্য বলিয়া, লেফ্‌টেনেন্ট ব্রাউনকে ২০০ শত সিপাহি লইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে আদেশ করিলাম। সেই যুদ্ধে আমাদের পক্ষে ৫০ জন সিপাহি ও ৭ জন সার্জেন্ট হত হইয়াছেন এবং মিঃ ব্রাউন ও কয়েকজন সিপাহি আহত হইয়াছেন। পরে আমাদের সৈন্যদিগের নিকট শুনিলাম যে, শত্রুপক্ষ হইতে প্রায় ৫০০০ সৈন্য যুদ্ধ ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিল। যাহা হউক এখন আর কোন গোলযোগ নাই।" (*Selections from unpublished records of India Government*)।

এই ঘটনার পর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি মহারাজার বিরুদ্ধে বাংলার নবাবের কাছে অভিযোগ করেন। ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে নবাব ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে বর্ধমান প্রদেশের রাজস্ব আদায়ের ভার প্রদান করেন তার বঙ্গানুবাদ দেওয়া হলো—

"(নবাব নাসের উল্‌ মোল্‌ক ইমতাজউদ্দৌলা নসরৎ জঙ্গ মির মহাম্মদ কাসিম খাঁ বাহাদুর) মোহরাঙ্কিত।

বর্দ্ধমান পরগণার কাননগো, তালুকদার, রাইয়ৎ ও গ্রামস্থ মণ্ডলগণ অবগত হইবে। সুবা বাঙ্গলার অধীন মহারাজাধিরাজ ত্রিলোক চন্দের অধিকারস্থ জমিদারীর দুষ্ট লোকেরা, প্রজাগণের উপর অযথা অত্যাচার ও লুণ্ঠনাদি করায়, উক্ত পরগণা ইংরাজ কোম্পানিকে প্রদত্ত হইল। উহার উপস্বত্ত্বে কিয়দংশ হইতে ইংরাজ কোম্পানির খরচ নির্ব্বাহ ও রাজ্য রক্ষার্থ ৫ শত ইংরাজ অশ্বারোহী, ২ সহস্র ইংরাজ পদাতি ও ৮ সহস্র সিপাহি সৈন্য নিযুক্ত করিয়া তাহাদের মাসিক বেতন প্রদত্ত হইবে। ইংরাজ কোম্পানি নিযুক্ত কর্ম্মচারীকে যথাসময়ে খাজনা দিবে ও তাঁহাদের আবশ্যকীয় সমূদয় কার্য্যে সাহায্য করিবে। ইংরাজ কোম্পানি ও জমিদার ও প্রজাদিগের পূর্বাপর সমুদয় সত্ত্ব বজায় রাখিয়া, তাঁহাদের নিকট হইতে রাজস্ব আদায় করতঃ, উপরোক্ত খরচ সমুদয় নির্ব্বাহ করিবেন। অর্থাৎ সৈন্যগণের মাসিক বেতন প্রদান করতঃ রাজ্যের সুব্যবস্থা করিবেন। ১১৭৬ সাল, ১লা কার্ত্তিক ইং ১৭৬০ খৃঃ ১৬ ই নভেম্বর। (*Selections from unpublished records of India Govern-*

ment)."

উক্ত পরওয়ানা প্রাপ্ত হইয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি মহারাজকে উক্ত পরওয়ানার প্রতিলিপি প্রেরণ করতঃ, তাঁহার নিকট হইতে, বর্দ্ধমান রাজ্যের রাজস্ব হিসাব প্রেরণ করিবার জন্য লেখায় মহারাজা তাঁহার যে উত্তর দিয়াছিলেন তাহার অনুবাদ নিম্নে লিখিত হইল—

মহামান্য বঙ্গেশ্বরের নিকট হইতে আপনি যে পরওয়ানা প্রাপ্তে সম্মানিত হইয়াছেন তাহা অবগত হইয়া আমি পরমাহ্লাদিত হইলাম। বর্দ্ধমানের শোচনীয় অবস্থার বিষয় আপনি সম্যকরূপে অবগত আছেন। মারহাট্টি সৈন্যগণ কর্তৃক এ প্রদেশ যেরূপ বিধ্বস্ত হইয়াছে, [illegible] নষ্ট করিয়া আমাকে অনেক পরিমাণে খাজনা মাপ করতঃ রাজ্যের [illegible] কাগজ ও সৈনিক মোহররকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছেন। আপনি মকসুদাবাদে অবস্থিতি কালে আমার উকিল দুর্গা [illegible] দ্বারা রাজ্যের উৎপাদের ২ খানি কাগজ প্রস্তুত করাইয়া, [illegible] নিকট প্রেরণ করিয়াছি। [illegible] বার ব্রহ্মা যে কাগজ লইয়া গিয়াছেন তাহাও ফেরৎ [illegible] আসিতে। ১ম কিস্তি [illegible] মোহরসহ [illegible] আপনার নিকট [illegible] দেখিতে পাইবেন, [illegible] হইতে [illegible] কার্ত্তিক মাস পর্যন্ত যে খাজনা আদায় হইয়াছে [illegible] লইয়া গিয়াছেন তৎসমুদয় মূল হিসাবের কাগজে [illegible] *Selections from unpublished records of India Government*"

মহারাজা তিলকচাঁদ তাঁর প্রধান উকিল রামচন্দ্র রায়কে দিয়ে তাঁর রাজ্যের উৎপাদের কাগজ প্রস্তুত করে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির গভর্ণর সাহেব বাহাদুরের নিকট প্রেরণ করেছিলেন তার প্রতিলিপি নিম্নে দেওয়া হলো —

প্রতিলিপি ঃ

বার্ষিক মালগুজারি			২৬,৩৭,৯৩৭
বাদ	পতিত ও অনাবাদি জমি এবং বাদশাহী		
	সৈন্য ও মারহাট্টাগণকর্ত্তৃক ক্ষতি	৭,৯৩,০৮০	
	সুতামহলের কর যাহা নবাব জাফর আলি খাঁ		
	বাহাদুর গ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন	১,১৬,৭১১	৯,০৯,৭৯১
			১৭,২৮,১৪৬

আগের জের	১৭,২৮,১৪৬৲
বাদ — বোয়ালিয়া পরগণা যাহা ইংরাজ কোম্পানি স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছেন তাহার খাজনা	৩৮,৭৫০৲
	১৬,৮৯,৩৯৬৲
বকেয়া প্রাপ্য খাজনা	১৬,৫১,৮৭২৲
	৩৩,৪১,২৬৮৲
বাদ — রায়রায়াঁ যাহা লইয়া গিয়াছেন	১৪,৭০,৪৮২৲
	১৮,৭০,৭৮৬৲
ইহার মধ্যে রায়রায়াঁ স্বয়ং আদায় করিয়াছেন	৯,৬০,৭০০৲
	৯,১০,০৮৬৲
দরবার খরচ	১,২৫,১৯৯৲
মোট দেনা	১০,৩৫,২৮৫৲

এই টাকা ১১৬৭ সালে পৌষ মাস হইতে চৈত্র মাসের মধ্যে পরিশোধ করিবার কিস্তিবন্দি করা হয়। মহারাজের উকীল রাজচন্দ্র রায়, মহারাজের পক্ষ হইতে ৪ কিস্তিতে উক্ত টাকা পরিশোধ করিবার অঙ্গিকার করেন। (*Selections from unpublished records of India Government and firth report from the Select Committee of East India Company*)

১৭৫৯ খৃঃ অঃ সন ১১৬৫ সালের তালিকায়, মহারাজ তাঁহার অধিকারস্থ জমিদারীর বার্ষিক রাজস্ব ২২,৫১,৩০৬৲ টাকা ও জায়গীর তহবিল বাবদ ১৯,১৬৬৲ বঙ্গেশ্বরকে প্রদান করিয়াছিলেন। পরে আদায় বাবদ ৮,২৯,৯৩৩৲ টাকা বৃদ্ধি হইয়া সর্ব্বসুদ্ধ ৩১,০০,৪০৫৲ টাকা ধার্য্য হইয়াছিল। (*Fifth report from the Select Committee*)

১৭৬০খৃঃ ২৪ ডিসেম্বর মহারাজা তিলোকচন্দ্ বাহাদুর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নিকট হইতে নিম্নলিখিত উপঢৌকন সমূহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

মহারাজা স্বয়ং		মূল্য	মোট
হস্তী	১টি	২,০০০৲	
পরিচ্ছদ	১ সুট	৬০০৲	
হীরার শির-পেঁচ	১টি	৪০০৲	৩০০০

আগের জের			৩,০০০৲
দেওয়ান অমর চাঁদ			
ঘোড়া	১টি	৫০০৲	
তরবারি	১খানি	৫০৲	
পরিচ্ছদ	১ সুট	৫০০৲	
শিরপেঁচ	১ টি	৩০০	১,৩৫০৲
রামদেব নাগ			
পরিচ্ছদ	১ সুট	২২৫৲	
ঘোড়া	১ টি	৫০০৲	৭২৫
গোকুল মজুমদার			
পরিচ্ছদ	১ সুট	২২৫৲	
ঘোড়া	১ টি	৫০০৲	৭২৫
রাজচন্দ্র রায় উকীল			
পরিচ্ছদ	১ সুট	২২৫৲	
ঘোড়া	১ টি	৫০০৲	৭২৫
রাজেন্দ্র রায়			
পরিচ্ছদ	১ সুট	২২৫৲	
ধনঞ্জয় রায় উকীল			
পরিচ্ছদ	১ সুট	১৭৫৲	
৬ জন উকীলকে শাল দেওয়া হয়	৬ টি	৬০০৲	
একুন			১০০০
একুন			৭,৫২৫৲

সম্রাট শাহ্ আলম বাদসাহের আজ্ঞানুসারে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির তদানিন্তন কর্ম্মাধ্যক্ষ মিষ্টার হেনরী রিস্‌বেট সাহেব বাহাদুর মহারাজ তিলোকচন্দ্‌কে ১ হস্তী ও ৪ পারচা খেলাৎ সহ ১ খানি পরওয়ানা প্রেরণ করেন। উক্ত পরওয়ানার উপরিভাগে, (শাহ্ আলম বাদশাহ গাজী ফিদ্‌বী আলিস্ অদ্দৌল্লা হেন্‌রী রিস্‌বেট্) মোহরাঙ্কিত আছে।

তিলোকচাঁদের কীর্তি ঃ—

"মহারাজ ত্রিলোকচন্দের রাজত্বকালে ত্রিবেণীবাসী সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক ঁজগন্নাথ

তর্কপঞ্চানন মহাশয় জীবিত ছিলেন। মহারাজ তাঁহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন। তিনি তর্কপঞ্চানন মহাশয়কে অনেক ব্রহ্মোত্তর ভূমি প্রদান করিয়া গিয়াছিলেন। মৃত্যুকালে তর্কপঞ্চানন মহাশয় বার্ষিক চারি সহস্র টাকা আয়ের যে সকল নিষ্কর ভূসম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহার অধিকাংশই বৰ্দ্ধমানাধিপতি প্রদত্ত।"

কীর্ত্তিচন্দ্ ব্রজধামের অন্তর্গত ভরতপুর রাজ্যাধিকারস্থ কাম্য বনে একটি বিগ্রহ স্থাপনার্থে মন্দির প্রস্তুত করাইতে আরম্ভ করিয়া, আরব্ধ কার্য্য সুসম্পন্ন হইবার পূর্ব্বেই পরলোক গমন করেন। তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র মহারাজাধিরাজ তিলোকচন্দ্ বাহাদুর পিতৃব্যের বাসনা পূরণার্থ উক্ত মন্দিরটি প্রস্তুত করাইলে, ভরতপুরাধিপতি বলপূর্ব্বক মন্দিরটি অধিকার করিয়া স্বয়ং তন্মধ্যে ৺গোপীনাথ জীউর মূর্ত্তি স্থাপন করেন। তদবধি উক্ত মন্দির ভরতপুরাধিপতির অধীনেই আছে। কিন্তু মহারাজ তিলোকচন্দ্ উহাতে যে শিলালিপি গ্রথিত করিয়াছিলেন, অদ্যাপি তাহা বর্ত্তমান রহিয়াছে। তাহাতে খোদিত আছে —

শকাব্দা ১৬৬৯।

শ্রীমত্য রাণী রাজেশ্বরীজী, শ্রীরাজা তিলোকচন্দ্র জী, বৰ্দ্ধমানকে গোমস্তা অভিরাম বসু তথা রামেশ্বর শর্ম্মা।"

১৭৫২ খৃঃ অব্দে মহারাজা তিলোকচন্দ্রের মাতা লক্ষ্মীকুমারী অম্বিকায় শ্রীশ্রী কৃষ্ণচন্দ্র জিউ জন্য একটি সুন্দর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। তাহার শিলালিপিস্থ শ্লোক —

শ্রীশ্রী কৃষ্ণচন্দ্রজী

শ্রী হরিচরণ সরোজে গুণমুনিষোড়শ—

সংখ্যক শকাব্দে।

মন্দিরমর্পিতমেতদ্রাজ শ্রীতিলকচচন্দ্রমাত্রা।।

শকাব্দা ১৬৭৩। সাল ১১৫১।"

১৭৬৪ খৃঃ মহারাজ তিলোকচন্দ্ বাহাদুরের মাতা লক্ষ্মীকুমারী অম্বিকায় শ্রীশ্রী সিদ্ধেশ্বরী বাটীতে যে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন, তাহার শিলালিপিরাস্থ শ্লোক —

বাণাহিতর্কৌষধিনাথশাকে গঙ্গাম্বিকে শ্রীশিব দিব্য সৌধং।

ত্রিলোকচন্দ্রাবনিপালমাতা কাবেব কৈলাশ-পুরং চকার।।"

শকাব্দা ১৬৮৫।

"মহারাজ তিলোকচাঁদের জ্যেষ্ঠা মহিষী মহারানী রূপকুমারী, ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে অম্বিকায় শ্রী রূপেশ্বর শিবের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। তাহার পূর্ব্ব পার্শ্বেই আর একটি শিব মন্দির আছে, তাহা ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। উক্ত মন্দিরের শিলালিপিস্থ শ্লোকের

কিয়দংশ বিনিষ্ট হওয়ায়, উহা কাহা কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা নির্দ্ধারণ করা যায় না। অনুমান হয়, উক্ত মন্দিরটি মহারাজের কনিষ্ঠা মহিষী বিষণকুমারী কর্ত্তৃকই প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিবে: সেইজন্যই উভয় মহিষীর প্রতিষ্ঠিত মন্দির দুইটি পাশাপাশি রহিয়াছে। ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত মন্দিরস্থ্ শিলালিপির শ্লোক —

"বাণনাগর সেন্দৌ চ শকাব্দে সোমবাসরে।
মধুমাসে সিতে পক্ষে শুভলগ্নেষ্টমী তিথৌ।।
মহাবিষ্ণু বসংক্রান্ত্যাং দিনে ত্রিংশত্তমেপি চ।
.... স্থাপিতং বহুযত্নতঃ।।

শকাব্দা ১৬৮৫।

১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে তিলোকচন্দের জ্যেষ্ঠা মহিষী মহারাণী রূপকুমারীর প্রতিষ্ঠিত শ্রীরূপেশ্বর শিবমন্দিরের শিলালিপিস্থ্ শ্লোক —

"শ্রীরাম প্রতিমো মহাগুণময়স্ত্রৈলোক চন্দ্রনৃপ—
সর্স্যান্তে নৃপশেখরস্য মহিষী জ্যেষ্ঠধরিত্রীসূতা।
সাকাষীত্রিপুরান্তকস্য ভবনং কৈলাস শৈলোপম।
শাকে তত্র বষাষ্টষড়বনিমে চাপেয় মাবর্ত্তগুকে।।"

শকাব্দা — ১৬৮৬।

মহারাজ তিলোকচন্দ দাঁইহাট গ্রামে যে সকল দেবালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তৎসমূদয় অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। ঐ সকল দেব মন্দিরে ঁ কিশোর কিশোরী দেব-দেবী, ঁবর্দ্ধমানেশ্বর, ঁ রাজরাজেশ্বর, ঁকর্পূরেশ্বর শিব প্রতিষ্ঠিত আছেন। মহারাজ তিলোকচন্দ উক্ত স্থানেরই খাস হাবেলিতে ঁ ত্রিলোকেশ্বর শিব স্থাপন করেন। তদীয় কনিষ্ঠা মহিষী মহারাণী বিষণকুমারী তত্রত্য গঙ্গাতীরে বারদ্বারী নামক ঘাট ও তদুপরি একটি চাঁদনী নির্ম্মাণ করতঃ তৎপার্শ্বে ঁ গঙ্গাধর শিব স্থাপন করেন। ঐ ঘাটে একখানি শিলালিপি গ্রথিত আছে ; কিন্তু তাহার অক্ষর সমূহ বিনষ্ট হওয়ায়; কিছুই পড়িতে পারা যায় না। উক্ত গ্রামের মধ্যে মহারাজা একটি পুষ্করিণী খনন করিয়া দেন, উহা অদ্যাপি বর্তমান আছে।

কীর্ত্তিচন্দের বংশধর মহারাজাধিরাজ তিলোকচাঁদ বাহাদুরের রাজত্বকালে কেবল তাঁহারই নিজের অথবা তাঁহার পিতামহী, মাতা ও পত্নীরই যে কীর্ত্তি সমূহ স্থাপিত হইয়াছিল তাহা নহে। তিনি তাঁহার অনুগত অমাত্যবর্গ এবং রাজমহিষীদিগের অনুচরীগণ দ্বারাও অনেকগুলি দেবতা স্থাপন করাইয়া, আপনার সহিত তাহাদিগের নামও চিরস্থায়ী করিয়া গিয়াছেন।

১৭৪৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার প্রিয় অমাত্য রামদেব নাগ অম্বিকায় শ্রীশ্রী সিদ্ধেশ্বরী বাটীতে যে শিব স্থাপন করেন, তাহার শিলালিপিতে খোদিত আছে —

"শুভ মস্তু শকাব্দা ১৬৬৮/৯/৩/৬

শ্রীরামদেব নাগস্য।"

এই রামদেব নাগ মূলাযোড় পত্তনী লইয়া তত্রস্থ অধিবাসীগণকে এবং সুপ্রসিদ্ধ কবিবর ভারতচন্দ্রকে উৎপীড়িত করায়, কবিবর সুললিত নাগাষ্টক রচনা করিয়াছিলেন।

১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে রাজমহিষীর প্রিয় অনুচরী তুলসী দেবী অম্বিকায় ঁ কাশীনাথের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। তাহার শিলালিপিতে খোদিত আছে —

"অব্দির সুরসেন্দৌ চ শকাব্দে চোওরায়ণে।

ইহার্পিতং শিবাগারং শ্রীতুলস্যা দ্বিজাঙ্গায়া।।"

১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণচন্দ্র বর্ম্মন্ নামক মহারাজের কোন অনুগত ক্ষত্রিয় কর্ত্তৃক অম্বিকায় যে ঁ গোপাল জীউর মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহার শিলালিপিতে খোদিত আছে —

"শুভমস্তু শকাব্দা ১৬৮৮।

শাকাব্দে শরজাঙ্ঘ্রিরাত্রিপকলাকোটীর মূর্ত্তঙ্গভু-

সংখ্যে বাহুজবংশভূর্বিমলধী ঃ শ্রী কৃষ্ণচন্দর সুধীঃ।

প্রাসাদং প্রদদৌ ধিয়া পরময়া ভক্ত্যা পরব্রহ্মণে

গোপালায় সমস্তবাঙময়পথাতীতায় বিশ্বাত্মনে।"

শকাব্দা — ১৬৮৮

শ্রী চিত্রসেন রায়ের প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রী সিদ্ধেশ্বরী ঠাকুরাণীর মন্দিরের পূর্ব্বপার্শ্বে ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে রাধিকা নাম্নী কোন অনুচরী কর্ত্তৃক যে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার শিলালিপিস্থ শ্লোক —

"শাকে খাঙ্কর সম্বাপেশগণিতে শুদ্ধে স্বতায়াদিকে

শ্রীমদ্রাধিকায়াসুরেন্দ্রনবহধ্যোয়ভিভ্র পদ্মাশয়া।

এতন্মন্দির মিষ্টকাদিরাচিতং বিশ্বেশ্বর প্রিতায়

ভূয়োজন্মনির্বারণৈ নৈকপটবে বিশ্বেশরায়াপিতাং।

শকাব্দা — ১৬৯০

অম্বিকায় প্রাচীন দেবমন্দিরগুলির মধ্যে ত্রিমঠ শ্যামরায়ের মন্দির ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী দুইটি শিবমন্দির, বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ত্রিমঠশ্যামরায় বর্দ্ধামানাধিপতির প্রতিষ্ঠিত দেবতা না হইলেও, বহুকালাবধি বর্দ্ধমানাধিপতির বংশ পরম্পরায় তাঁহার সেবাদি করিয়া

আসিতেছেন। যে মন্দিরে শ্যামরায় অবস্থিতি করিতেছেন, তাহার সম্মুখে কিয়দংশ ভগ্ন হওয়ায়, কাহা কর্ত্তৃক যে উক্ত শ্যামরায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, তাহা অবগত হইবার কোন উপায় নাই। কিন্তু তৎপার্শ্ববর্ত্তী একটি শিবমন্দিরে একখানি ক্ষুদ্র শিলালিপিতে যে শকাব্দা খোদিত আছে, তাহা পাঠ করিলেই অবগত হওয়া যায় যে, যে সময় শ্যামরায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, সেসময়ে বর্দ্ধমান রাজবংশের অস্তিত্ব থাকা দূরে থাকুক, তখন হিন্দু বিদ্বেষী দুর্দান্ত যবনের নাম পর্য্যন্তও কেহ অবগত ছিল না। ঐ প্রাচীন মন্দিরটি ৮৮০ বৎসর আগে অর্থাৎ ১০৪৬ শকাব্দে ইং ১১২৪ খৃঃ নির্ম্মিত হইয়াছিল। তখন বাংলার রাজা ছিলেন লক্ষ্মণ সেন। লক্ষ্ম সেন ১১২৩ খৃঃ সিংহাসনে অসীন হন। এত প্রাচীন মন্দির বাঙ্গলা দেশে খুব কমই আছে। বর্ধমানের রাজারা এই মন্দির সংস্কার করেছিলেন।

মহারাজা তিলোকচাঁদের দেবকীর্তি ও ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তি দান সম্বন্ধে রাজ-বংশানুচরিত থেকে জানতে পারা যায় —

"মহারাজাধিরাজ তিলোকচন্দ্ বাহাদুর, তদীয় পূর্ব্বপুরুষদিগের ন্যায় বহু দেবোত্তর ও ব্রহ্মোত্তর ভূমি দান করতঃ এ প্রদেশীয় বহুতর ব্রাহ্মণের চিরান্ন সংস্থানের উপায় বিধান করিয়া, অক্ষয় কীর্ত্তি ও বিপুল যশোরাশি উপার্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। ঐ সকল ক্ষণজন্মা, পুণ্যবান মহাপুরুষদিগের বদান্যতা গুণে এ পর্য্যন্ত শত শত ব্রাহ্মণ নানা প্রকারে প্রতিপালিত হইয়াছেন।"

বঙ্গদেশস্থ, দিনাজপুর, নাটোর, নবদ্বীপ এবং বর্দ্ধমান এই রাজ্য চতুষ্ঠয়ের প্রাতঃস্মরণীয় পুণ্যবান নৃপতিগণের অসীম বদান্যতার খ্যাতি ভারতের চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। বঙ্গদেশে উক্ত ভূপতিবৃন্দের বদান্যতার বিষয়ে যে একটি গাথা প্রচলিত আছে, তাহা এ স্থলে উদ্ধৃত হইল —

"দিনাজপুরের নগর দান, রাণী ভবানীর কীর্ত্তি।
কৃষ্ণচন্দ্রের ব্রহ্মোত্তর, বর্দ্ধমানের বৃত্তি।।"

মহারাজ তিলোকচাঁদের দেবকীর্তি ছাড়াও নগরপত্তনও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি হাবড়ার নিকট তিলোচন্দ্পুর নামে এবং মানকরের নিকট ঐ একই নামে দুখানি জনপদ স্থাপন করেন যা আজও তাঁর কীর্তি ঘোষণা করে।

তিলোকচাঁদের শাসন ব্যবস্থা ঃ—

রাজ্যের শান্তিরক্ষার ভার মহারাজার হস্তেই ন্যস্ত ছিল। উক্ত বিভাগ ২ ভাগে বিভক্ত, যথা, থানাজাত ও গ্রাম সরঞ্জমী। থানাজাত আবার তিন অংশে বিভক্ত যথা — থানাদারী, সহর কোতওয়ালী এবং ফাঁড়ীদারী। দেশমধ্যে যাহাতে চুরি কিম্বা ডাকাইতি না

হয়, তৎপক্ষে যত্নবান হওয়া এবং চুরি কিম্বা ডাকাইতি হইলে, তস্করদিগকে ধৃত করিয়া অপহৃতদ্রব্যের পুনরুদ্ধার করাই থানাদারের কর্ত্তব্য। সহরকোতওয়াল সহরের শান্তিরক্ষক; নগর মধ্যে যাহাতে কোন প্রকার অশান্তি না হয়, তৎপক্ষে যত্নবান থাকাই তাহার কর্ত্তব্য। ফাঁড়ীদার স্থলপথের শান্তি রক্ষক , সাধারণ রাজপথে যাহাতে পথিকগণ নিরুপদ্রবে যাতায়াত করিতে পারে, তাহার বিধান করা এবং রাহাজানি হইলে দস্যুদিগকে ধৃত করিয়া রাজদ্বারে উপস্থিত করতঃ অপহৃত দ্রব্যের পুনরুদ্ধার করাই তাহাদিগের কর্ত্তব্য। অপহৃত দ্রব্যের পুনরুদ্ধার করিতে না পারিলে, থানাদার, সহর কোতওয়াল ও ফাঁড়ীদারগণকেই [illegible] অপহৃত দ্রব্যের ক্ষতিপূরণ করিতে হইত। ১৭৬৪-৬৫ খৃঃ বর্দ্ধমান রাজ্যে [illegible] জন থানাদার, কোতওয়াল ও ফাঁড়াদার নিযুক্ত ছিল। উক্ত কার্য্যের জন্য তাহারা [illegible] চাকরাণ জমি ভোগ করিত এবং তদ্ব্যতীত রাজসরকার হইতে মাসিক [illegible] টাকা প্রাপ্ত হইত। ১৭[illegible] খৃঃ উক্ত [illegible] হইতে ২৪১ জন লোককে পদচ্যুত করা হয় এবং তাহাদিগের খোরাকী মাসিক ১০৭২ রাজসরকারের [illegible] সকল চাকরাণ জমি ছিল, তাহা গভর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক বাজেয়াপ্ত হইয়া [illegible] করা হয়। তাহারই খাজনা ১৭৯৭ খৃঃ অব্দে [illegible]

গ্রাম সরঞ্জামী অর্থাৎ পল্লীগ্রামের চৌকীদার। [illegible] করা, মাঠে শস্য [illegible] হয়, সে পর্য্যন্ত তাহার প্রহরায় রক্ষা করা, [illegible] নিকট আহ্বান কর[illegible] এবং মালের কাছারিতে প্রহরায় [illegible] করাই গ্রাম চৌকীদার [illegible] ঐ কার্য্যের জন্য তাহারা চাকরাণ [illegible] রাজসরকারে ১৭[illegible] খৃঃ [illegible] জন চৌকীদার ছিল এবং তাহাদের [illegible] বিঘা পরিমাণে চাকরাণ জমি প্রাপ্ত হইয়াছিল। তদনুসারে বর্দ্ধমান রাজ্যে তৎকালে ১,৫৪,৫২১ / বিঘা চৌকিদারী চাকরাণ জমি ছিল।

১৭৬৪-৬৫ খৃঃ বর্দ্ধমান রাজ্যে থানা জাত ও গ্রাম সরঞ্জামীর চাকরাণ জমির তালিকা।

বর্দ্ধমান রাজ্যের থানাদারদিগের —

চাকরাণ জমি	৪৪,৮৪৫ ।।৭
সহর কোতওয়ালী জমি	২,৬৮৯।০
ফাঁড়ীদারী জমি	১,৪২৮ ৶৹৩
	৪৮,৯৬৩ ।০২

গ্রাম্য চৌকীদারী জমি ১,৫৪,৫২১ /

বিঘা ২,০১,৪৮৮ । ২

(Selections from unpublished records of India Government)

সন ১১৭২ সাল, ইং ১৭৬৫ এর মহারাজা তিলোকচাঁদ বাহাদুর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নিকট রাজস্ব প্রদান করতঃ যে দাখিলা প্রাপ্ত হয়েন, তাহার প্রতিলিপি নিম্নে প্রদত্ত হইল। দাখিলাখানির [illegible] সাহেবের মোহর অঙ্কিত আছে।

দাখিলা

রাজা তিলোকচন্দ [illegible] সাল ২৩ মাঘ, মতাবেক ১৭৬৫ [illegible] মতাবেক ১৭৬৬ [illegible] ৪০, ৯৮,৮৯৩ টাকা [illegible] দাখিল হইল।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

৪০,৯৮,৮৯৩ ল, [illegible]

সন ১১৭২ [illegible]

১৭৬৫ ল ✓ [illegible]

মহারাজা তিলোকচাঁদের [illegible] বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় বিভিন্ন কাজের মধ্যে। তিনি বুঝেছিলেন জমিদারীর আয়ের সঙ্গে যদি ব্যবসা-বাণিজ্যের কিছু [illegible] করা যায়, সেই সময় [illegible] ছিল নতুন নগর। সেই পরিপ্রেক্ষিতে নদীপথে [illegible] ও ব্যবসা বাণিজ্য [illegible] বিশেষ মনোযোগ দেন। কোলকাতার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে [illegible] তিনি [illegible] সেই সময় কোলকাতা নগরের পত্তন হচ্ছে এবং নদী বন্দর প্রতিষ্ঠা হচ্ছে। ব্যবসা বাণিজ্য ও মাল আমদানী-রপ্তানীর পক্ষে নদীপথই উপযুক্ত এই চিন্তা করে তিনি আরও দক্ষিণে বজবজে একটি দুর্গ নির্মাণ করেন এবং নদীপথে ব্যবসার নিরাপত্তার জন্য যথেষ্ট সৈন্য ও প্রহরী মোতায়েন রাখেন। তা ছাড়া দূরে চৌকী রাখার জন্য অম্বিকা কালনার একটি সুউচ্চ কৃষ্ণমন্দির নির্মাণ করেন।

মন্দিরের নির্মাণ কৌশল অতি বিচক্ষণতার পরিচায়ক। মন্দিরের কারুকার্য্য অতি উন্নতমানের। এই মন্দিরের ভিতরে একটি গুপ্ত সিঁড়িপথ আছে সর্বোচ্চ চূড়ায় আরোহণের জন্য। উদ্দেশ্য স্থলপথ ও জলপথে শত্রুদের নজরদারী করার জন্য। ঐ সর্বোচ্চ চূড়া হতে বহুদূর পর্যন্ত লক্ষ্য করা যায়, যাতে কোন শত্রু অতর্কিতে আক্রমণ করতে না পারে।

তিলোকচাঁদের আমলে বঙ্গের অবস্থা ঃ—

মহারাজাধিরাজ তিলোকচন্দের রাজত্বকালে, বঙ্গের কি ভয়ানক পরিবর্ত্তন ও শোচনীয় অবস্থাই সংঘঠিত হইয়াছিল। এক দিকে মোগল সাম্রাজ্যের অবসান, অপর দিকে প্রবল প্রতাপান্বিত ইংরাজ রাজত্বের অভ্যুত্থান, পলাশীর ভীষণ সমর, মারহাট্টা দস্যুগণ কর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ দেশ লুণ্ঠন, মোগল সৈন্যগণ কৃত শস্যক্ষেত্রের ধ্বংস, রাজ্যমধ্যে দস্যুগণকৃত প্রজাগণের সর্ব্বস্বাশহরণ, এবম্বিধ নানা প্রকার উপদ্রবে বঙ্গের যাবতীয় জমিদার প্রজাবর্গ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এই সকল বিপদ সত্ত্বেও তিলোকচন্দ্‌কে তাঁহার নির্ব্বোধ অদূরদর্শী সেনাপতিগণের অবাধ্যতায় প্রবল প্রতাপ ইংরাজকোম্পানির সহিত যুদ্ধ করিতে এবং হাল ও বকেয়া রাজস্বের জন্য বঙ্গের নবাব বাহাদুর ও ইংরাজ কোম্পানির নিকট পুনঃ পুনঃ নিগৃহীত হইতে হইয়াছিল। দস্যুভয়ে প্রজাগণ দেশ ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে পলায়ন করায়, বাণিজ্য ও কৃষিকার্য্য প্রায় বন্ধ হইয়াছিল; সুতরাং যথাসময়ে রাজস্ব আদায় না হওয়ায় তাহাকে অর্থ কৃচ্ছ্রে ও পতিত হইতে হইয়াছিল।পরন্তু, এতাদৃশ বিপজ্জালে বিজরিভ হইয়াও তিনি বহুল অতুল কীর্ত্তি স্থাপন করত জন সমাজে চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন।

তৎকালে রাজস্ব পরিশোধ করিতে না পারিলে, বঙ্গেশ্বর জমিদার ও রাজাদিগকে কারারুদ্ধ করিয়া সেই টাকা আদায় করিতেন। প্রবাদ আছে, একবার মহারাজ তিলোকচন্দ্ যথাসময়ে রাজস্ব পরিশোধ করিতে না পারায়, বঙ্গের নবাব বাহাদুর কর্ত্তৃক আবদ্ধ হইয়া নবাব দরবারে নীত হয়েন। তৎকালে তাঁহার ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান, দেওয়ান মাণিক চাঁদ বঙ্গেশ্বরের দেওয়ানী পদে অভিষিক্ত ছিলেন। তিনি মহারাজকে সভা মধ্যে দেখিয়াই আসন হইতে গাত্রোত্থান করতঃ তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। বঙ্গেশ্বর দেওয়ানের ঈদৃশী ধৃষ্টতা দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন তিনি নতশিরে করজোরে নিবেদন করিলেন, জাঁহাপনা! আমি মহারাজকে দেখিয়া গাত্রোত্থান করি নাই, ইহার নিমক্ (লবণ) আমাকে উঠাইয়াছে। সেবার দেওয়ান মাণিকচাঁদের যত্নেই মহারাজ অব্যাহতি লাভ করেন। এবং বর্দ্ধমানে প্রত্যাগমন করিয়াই দেওয়ান মাণিকচাঁদের মাসিক বৃত্তি নির্ব্বন্ধ করিয়া দেন। রাজবাটীর অতি সন্নিকটে দেওয়ান মাণিকচাঁদের আবাস বাটী অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। সেই বিশাল অট্টালিকার অধিকাংশই এখন ভূমিসাৎ হইয়া কিয়দংশ মাত্র বর্ত্তমান আছে।

বাংলার দুর্ভিক্ষ ও বর্ধমানের ওপর প্রভাব ঃ

১৭৫২ খ্রীঃ বাংলায় ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, তাহাতে বহু শিশু, আবাল-বৃদ্ধ অন্নাভাবে প্রাণ হারায়। এই সময় বাংলায় তৎসময়কালীন অবস্থায় খাদ্যশস্য ও জিনিসপত্রের মূল্য যেরূপ উর্দ্ধগতি হয়েছিল তার তালিকা দেওয়া হলো —

"১৭৫২ খৃঃ ২০ শে নভেম্বর তারিখে কৌন্সিলের প্রেসিডেন্ট ও গভর্ণর অনারেব্ল্ রজর ড্রেক সাহেব বাহাদুরের নিকট গোবিন্দবাম মিত্র যে রিপোর্ট প্রদান করেন, তাহা হইতেই এই তালিকাখানি উদ্ধৃত করা হইয়াছে। এই তালিকাখানির সহিত তৎকালীন সময়ের শস্যাদির মূল্যের তুলনা করিলেই প্রতীয়মান হইবে যে, তখন বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষ কি ভয়াবহ ছিল। ১৭৫১ ও ১৭৫২ খৃঃ দুই বৎসরেরই শস্যাদি মূল্যের তালিকা প্রদত্ত হইল।

১৭৫১ খৃঃ অক্টোবর মাসের শস্যাদির মূল্য

শস্য	প্রতি টাকায়	ওজন
সর্ব্বোৎকৃষ্ট চাউল	১	৸৫
গম	১৲	১।৭
সাধারণের ব্যবহাবোপযোগী		
চাউল	১৲	১।৭
বুট	১৲	১/.
ময়দা	১৲	।।৪
তৈল	১৲	/৮

১৭৫২ খৃঃ অক্টোবর মাসে শস্যাদি মূল্যের তালিকা

শস্য	প্রতি টাকায়	ওজন
সর্ব্বোৎকৃষ্ট চাউল	১৲	।২
গম	১৲	।৯।।৶
সাধারণের ব্যবহারোপযোগী		
চাউল	১৲	।।২
বুট	১৲	।৫।৵.
ময়দা	১৲	/৫
তৈল	১৲	/৩।।৵.

১৭৫২ খৃঃ দুর্ভিক্ষের সময়ে বঙ্গদেশের শ্রমজীবিগণের পারিশ্রমিকও অতিশয় বর্দ্ধিত হইয়াছিল। ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীনে যে সকল শ্রমজীবি কার্য্য করিত তাহাদের প্রত্যেককে প্রত্যহ ৵১৫ দুই পণ পনর গণ্ডা করিয়া কৌড়ি পারিশ্রমিক দেওয়া হইত।

[illegible] সর্দার আবার প্রত্যেকের নিকট [illegible] করিয়া কৌড়ি দস্তুরি গ্রহণ করিত।
[illegible] from unpublished records of India Government)।'

[illegible]চাঁদের পারিবারিক জীবন ঃ

[illegible] রায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মিত্র সেন রায় [illegible] বন্দী অবস্থায় [illegible] রায় অপুত্রক অবস্থায় মারা যান। [illegible] একমাত্র পুত্র [illegible] সমস্ত জমিদারীর মালিক হন [illegible] (এগার) বছর। [illegible] হন তখন বর্গীর অত্যাচারে [illegible] শ্মশান ভূমি। [illegible] সংক্রান্তি। বিনয় ঘোষ, [illegible] পৃঃ [illegible] জানতে পারি [illegible] বিবাহ হয়েছিল কাউগাছিতে [illegible] দেওয়ান [illegible] রূপকুমারীর [illegible] জোড়ার রাজা [illegible] এদের পূর্বপুরুষ [illegible] শ্রী জগন্নাথদেব [illegible] কাশীজোড়ার [illegible] খানেই বসবাস [illegible] রায়ের পৌত্র রাজা [illegible] নিকট 'রাজা' [illegible] রূপকুমারীর [illegible] পর সেবগড় [illegible] কুমারীর [illegible] মহল্লা থেকে [illegible] তেজচাঁদ [illegible]

[illegible] এক পুত্র ও দুই কন্যা [illegible] এবং কন্যাদের [illegible] তোতাকুমারী

[illegible]

[illegible] তিলোকচাঁদের আহারাদি সম্বন্ধে একটু বলা প্রয়োজন। তিনি এত অল্পাহারী ছিলেন যে তাহা কেহ বিশ্বাস করতে পারবেন না। রাজবংশানুচরিত থেকে জানতে পারা যায় [illegible] তিলোকচন্দ অত্যন্ত অল্পাহারী ছিলেন। যে দিবস [illegible] এক ছটাক চাউলের অন্ন ও একটি ক্ষুদ্র মৎস্য ভক্ষণ করিতেন সে দিবস তাহার মাতার আনন্দের পরিসীমা থাকিত না। এমন কি, জলযোগের সময় তিনি একজোড়া মণ্ডার একপাটি মাত্র আহার করিলেই তদীয় মাতা অতিশয় আনন্দিতা হইয়া রাজবাটীর অন্তঃপুর দ্বারে নহবত বাদ্য বাজাইবার আদেশ প্রদান করিতেন।

প্রকৃতপক্ষে দেখা যায়, ১৭৪৪-১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই ২৬ বছর রাজত্বকাল,

তিলোকচাঁদ নির্বিঘ্নে বা নিরুপদ্রবে রাজকার্য পরিচালনা করতে পারেন [illegible] কারণে তাঁর সভায় সাহিত্যচর্চার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না, যদিও মেদিনীপুরের কবি অকিঞ্চন চক্রবর্তী, রাজপরিবারের দেওয়ান চুপীনিবাসী ব্রজকিশোর ও পুত্র নন্দকুমার তাঁর বিশেষ অনুগ্রহ লাভ করেছিলেন। বাংলার সর্বপ্রধান জমিদার হিসাবে তিলোকচাঁদ [illegible] উপদ্রব, মারাঠা অত্যাচার, ইংরেজ কোম্পানির আগমন ইত্যাদি নানা প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও বহু জনহিতকর কাজ করেছেন। তাঁর আনুকূল্যে যে সকল টোল, দেবালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেগুলি রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত ভূমিদান তাঁর অক্ষয় কীর্তিকে আজও [illegible] করেছে।

যাহোক ১৭৪৪-১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সুদীর্ঘ ২৬ বছরকাল [illegible] বছরও নিরুপদ্রবে [illegible] পারেন নি। সারাজীবন [illegible] জমিদারী পরিচালনা করে এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির [illegible] হতে পৈত্রিক [illegible] মাত্র ৩৮ বছর বয়সে [illegible] ১৩ই জ্যৈষ্ঠ ([illegible]) [illegible] চতুর্দশী তিথিতে [illegible] পরলোকগমন [illegible] এক পুত্র ও দুই কন্যা [illegible]

মহারাজ তিলকচাঁদ [illegible] যে সমস্ত [illegible] করা হল।

[illegible]

([illegible])

অতিশুভক্ষণে এই মহামান্য পরম বিশ্বাসপ্রদ [illegible] প্রচার হইল যে — [illegible] বর্দ্ধমান ওগয়রাহার জমীদার [illegible] তিলোকচাঁদের নিকট হইতে [illegible] লক্ষ তেত্রিশ হাজার টাকা গ্রহণ করতঃ উক্ত স্থানের জমীদারি ও রাজা উপাধি [illegible] এলাকার কার্য্য সকল [illegible] সম্পন্ন করা, প্রজাগণের সহিত সদ্ভাব রক্ষা করতঃ দস্যুদিগের [illegible] দণ্ড বিধান করা, গরীব ও দুঃখীদিগের প্রতি [illegible] প্রকাশ করা, দেশ মধ্যে কৃষি ও বাণিজ্য [illegible] সাধনে যত্নবান হওয়া, সাধারণের নির্বিঘ্নে গমনাগমনের জন্য রাজপথ সমূহ নিরুপদ্রব রাখিতে [illegible] কর্তব্য। এই ফরমান প্রচার হইলে, উপরোক্ত নজরাণার মধ্যে এক লক্ষ টাকা সরকারে প্রদান করতঃ [illegible] কিস্তি অনুসারে ৪ বৎসরের মধ্যে সুবার ধনাগারে প্রদান করিতে হইবে। বর্ত্তমান ও ভাবী, হাকিম, আমলা ও মোৎসদ্দিগণ উক্ত ব্যক্তিকে তথাকার জমীদার জানিয়া যথোপযুক্ত ব্যবহার করেন। ৯ জমাদিয়ল আউয়াল ২৪ জুলুস। ১৭৪৮।

মোহর।

(মহাম্মদ সা বাদসাহ গাজী ফিদবী এহতে সামতেদ্দৌলা সাহামত জঙ্গ নওয়াজেশ খাঁ বাহাদুর)

বঙ্গদেশের সুবার অধীকারস্থ, পরগণে বৰ্দ্ধমান ওগয়রহার, বর্ত্তমান ও ভাবী মোৎসদ্দি, কর্ম্মচারী, কাননগো, প্রজাগণ ও সর্ব্বসাধারণে অবগত হইবে যে, সুবার নাজেম মান্যবর সোজা উল্‌মোলক হেসমতদ্দৌলা মহাম্মদ আলিবর্দ্দি খাঁ বাহাদুর মহব্বত জঙ্গের সাক্ষরিত পত্রের মর্ম্মানুসারে প্রকাশ পাইল যে, রাজা চিত্রসেন পরলোক গমন করায়, মিত্রসেনের পুত্র জগৎরামের পৌত্র মান্যবর তিলোকচঁন্দ উল্লিখিত জমীদারির ফরমান ও রাজা উপাধি প্রাপ্তির প্রার্থনায় মৃত চিত্রসেনের নিকট সরকারের নজরাণা স্বরূপ প্রাপ্য ১,৩৩,০০০ টাকা ও নিজ পরওয়ানা প্রাপ্তির জন ২,৫৮,০০০ টাকা একুনে ৩,৯১,০০০ টাকা সরকারে প্রদান করিতে স্বীকার করায়, পরগণা মজকুরার জমীদারি ও রাজা উপাধি মিত্রসেনের পুত্র ও জগৎরামের পৌত্র মান্যবর তিলোক চন্দকে প্রদান করা হইল। তাহার কর্ত্তব্য যে উক্ত কার্য্য বিশেষ দক্ষতার সহিত নির্ব্বাহ করেন। প্রজাগণ ও সাধারণের সহিত সদ্ভাব রক্ষা করতঃ প্রজা বৃদ্ধি ও কৃষিকার্য্যের উন্নতি সাধন করেন। দস্যু, তস্কর ও ঠগগণ যেন তাঁহার অধিকার মধ্যে স্থান না পায়। পথিকগণ, জপ ও স্থলপথে যেন নিরাপদে গমনাগমন করিতে পারে। চুরি কিম্বা ডাকাইতি যেন কোন স্থানে না হয়। ঈশ্বর না করেন যদি চুরি কিম্বা ডাকাইতি হয়, তাহা হইলে অপহৃত দ্রব্যসহ তস্কর ও দস্যুদিগকে ধৃত করিয়া, অপহৃত দ্রব্য মালিককে প্রদান করেন। যদি অপহৃত দ্রব্যের অনুসন্ধান না হয় তাহা হইলে তাঁহাকেই উক্ত ক্ষতিপূরণ করিতে হইবে। এবং তস্কর ও দস্যুদিগকে যথোপযুক্ত দণ্ড বিধান করিবেন। তাঁহার অধিকার মধ্যে কেহ কোন প্রকাব মাদক দ্রব্য সেবন না করে। সরকারি রাজস্ব ও নজরাণার টাকা সন সন কিস্তি অনুসারে প্রদান করতঃ বৎসরান্তে তাহার দাখিলা গ্রহণ করেন। হুজুরের নিষিদ্ধ কোন প্রকার বাব গ্রহণ না করেন। সরকারি কাগজাদিতে, স্বয়ং ও কাননগোর স্বাক্ষর কবাইয়া সরকারি দপ্তরখানায় দাখিল করেন। সাধারণের উচিত যে ইহাকেই জমীদার জানিয়া যথোচিত মান্য করে।

২রা সফর ২৯ জুলুস (ইং ১৭৪৮ খৃঃ)

মোহর।

অবু নসর মোজাহদ্দিন

আহম্মদ সা বাহাদুর গাজী

অতি শুভক্ষণে এই মহামান্য পরম বিশ্বাসপ্রদ ফরমানে প্রচার হইতেছে যে — বঙ্গ দেশের সুবার এলাকাস্থ পরগণে বৰ্দ্ধমান ওগয়রহার জমীদার রাজা চিত্রসেন নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোক গমন করায়,

তদীয় খুল্লতাত পুত্র তিলোক চাঁদের নিকট হইতে নজরাণার স্বরূপ ২ দুই লক্ষ ৫৮ আটান্ন হাজার টাকা ও মৃত চিত্রসেনের নিকট প্রাপ্য এক লক্ষ তেত্রিশ হাজার টাকা গ্রহণ করতঃ, বাদসাহের হুজুর হইতে উহাঁকে উক্ত স্থানের জমীদারি ও রাজা উপাধি প্রদত্ত হইল। প্রজাগণ এবং স্বদেশীয় ও বিদেশীয়গণের সহিত সদ্ভাব রক্ষা, তস্কর ও দস্যুদিগকে দমন করা, কৃষিকার্য্যের উন্নতি সাধনে যত্নবান হওয়া, পথিকগণের নিরাপদে গমনাগমনের সুবিধা করা, দরিদ্রদিগের প্রতি কৃপাবান হওয়া, কৃষি ও বানিজ্যের উন্নতি সহ রাজ্যের আয় যথাসম্ভব বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করাই তাঁহার কর্ত্তব্য। নজরাণা প্রভৃতি সরকারের প্রাপ্য টাকা, সুবার ধনাগারে প্রদান করেন। বর্ত্তমান ও ভাবী, হাকিম, কারপরদাজ ও মোৎসদ্দিদিগের কর্ত্তব্য যে উক্ত ব্যক্তিকেই তথাকার জমীদার জানিয়া তাঁহার সহিত যথোচিত ব্যবহার করেন। ইতি

৭ রজবল মোবজ্জব ৭ জুলুস (ইং ১৭৫৪ খৃঃ)

তপশীল মহাল।

বর্দ্ধমান ওগয়রহা দরবস্ত ৪৩ মহল।

পরগণে বর্দ্ধমান সরকার সরিফাবাদ

"   সোজাপুর।

"   বেকাবিবাজার।

"   বাঘা।

পঃ সোলেমানসাহি

  এব্রাহিমপুর।

  কলিয়ান।

পঃ সাহাবাদ।

  নবকুরা।

  হাতুয়া।

  হোসেনপুর।

পঃ সলিমাবাদ

  হাবেলি।

  খানপুর।

পঃ সমবসাহি।

হাওসসুকী।

পঃ গোয়ালাভুম

মালদহ।

পলসাড়া।

আমীরাবাদ।

জাহাঙ্গীরী।

বসন্দি

আমীরপুর।

মধাপুর।

আমলা।

পঃ আজমতসাহি।

অম্বিকা।

সাকোর।

চৌমাহা।

নলে।

বরদ

শেখুপুর।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] সরকার সলিমাবাদ

[illegible]

[illegible] সরকার সলিমাবাদ

ভরসুম।

জলবা।

সকাবোল।

অগালা পং বাঢ়।

মুগলপাড়া মহাল।

মনোহরসাহি সরকার মান্দারণ

আইনি।

সাহাপুর।

মোয়াজ্জেমাবাদ

নান্দিপুর।

মহম্মদপুর।

পং আজমৎ সাহি সরকার

[illegible]

[illegible] সরকার ঐ

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] সরকার সলিমাবাদ

[illegible] সরকার ঐ

[illegible] সরকার সলিমাবাদ

অনওয়ার কোং মেদিনি পেনকস

সরকার

শাহগ্রাম।

চন্দ্রকোণা।

ভুরশুট।

বরদা।

উজীরল মমালেক উমদাতুলমুলক মাদরা মহাম সাম সামদ উদ্দৌলা ইমামুলমুলক খাঁ খানান কমরদ্দিন খাঁ, খাঁ বাহাদুর বকসীউল মুলক নসরত জং। ফিদবী আহম্মদ সা বাহাদুর বাদসা গাজী।

ফতে সিং ফিদবী আহম্মদ সা বাহাদুর গাজী

আবুল হামি ফিদবী আহম্মদ সা বাদসা গাজী

১৭ রজব ৭ জুলুস

মোহর (আলমগীর বাদসাহ গাজী) ফিদবী মোতেমদ্দৌলা জিয়া আদ্দৌলা বাহাদুর)

বণসীয়ান মোমালকের পত্রে প্রকাশ যে—

বঙ্গদেশের সুবার অধিকারস্থ্ বর্দ্ধমানের জমীদার রাজা তিলোক চন্দ্‌কে, একটি হস্তী ও জমীদারি ফরমান প্রদানে অনুগৃহীত করা হইয়াছে। অতএব সুবা মজকুরার খেদা হইতে একটি হস্তী, তাঁহাকে প্রেরণ করতঃ আজ্ঞা প্রতিপালন করিবে।

২৬ মহবর মল হারাম, ১ জুলুসে লিখিত হইল।

(ইং ১৭৫৫ খৃঃ)

মোহর। (আবল মোজফ্ফর জালালোদ্দিন মহাম্মদ সা বাদসাহ গাজী)

অতি শুভক্ষণে এই মহামান্য পরম বিশ্বাসপ্রদ ফরমানে প্রচার হইল যে—

বঙ্গদেশের সুবার এলাকাস্থ, চাকলে বর্দ্ধমান মোতালক তালুক ভেদিয়া ওগয়রহার তালুকদারি, মঙ্গলকোট নিবাসী, সাহ হজ্জতউল্লার মৃত্যুর পর ১১৭৪ সালের শ্রাবণ মাস হইতে রাজা চিত্রসেনের খুল্লতাত পুত্র তিলোক চাঁদকে প্রদান করিলাম। মৃতব্যক্তির ন্যায় নিয়মিত সময়ে তালুক মজকুরার মালগুজারি প্রদান করিতে থাকে। বর্ত্তমান ও ভাবী হাকিম, কারপরদাজ, মোৎসদ্দি, জায়গীরদার ও প্রজাগণের কর্ত্তব্য যে বাদসাহের এই মহামান্য হুকুমানুসারে, তালুক মজকুরা উহাকেই সমর্পণ করে। মালগুজারি আদায় করিবার বিশেষ চেষ্টা করে, তৎপক্ষে কোন রূপে অন্যথা না হয়। ১৯ রবিঅল আখের (ইং ১৭৬৭ খৃঃ)

বাদসাহি পত্র

অকিদৎ ও জেলাদৎ নেসান ফিদবী খাস লায়েবল এন রং অল এহসান বতোফজ্জালাত বেলা নেহায়ৎ মোবাহি বুদা বেদানন্দ রাজা তিলোকচন্দ।

অসীম ও চিরন্তন কল্যাণ উপভোগ করুন—

বিদিত হইবেন যে অশেষ অনুগ্রহ ও অসীম কৃপায় এই শুভ সময়ে, আপনাকে ফিদবী খাস, চারিহাজারি, জাত, বাহাদুর খেতাব, ঝালরদার পালকী ও নহবত রাখিবার ক্ষমতা প্রদত্ত হইল। আপনার প্রতি ঈদৃশ মর্য্যাদাসূচক পদ ও অসীম অমুগ্রহ প্রদত্ত হওয়ায় চিরকৃতজ্ঞ ও চিরবাধ্য থাকিয়া উহা উপভোগ করিবেন। ঈদৃশ বাঞ্ছনীয় সম্মান ও মর্য্যাদা উপভোগ করা, উভয় জগতেরই কল্যাণকর ও সৌভাগ্য বর্দ্ধক। রাজভক্তি ও প্রভুভক্তিই যে বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতে মঙ্গলবর্দ্ধনকর তাহা সর্ব্বদা স্মরণ করিবেন। অশেষ রাজানুগ্রহ যে রাজভক্তেরই অমুগামী ইহা স্মরণ রাখিয়া আপনার কুশলাদি সর্ব্বদা আমাকে জ্ঞাপন করিবেন। আরও জানিবেন যে আপনার প্রতি রাজানুগ্রহ সর্ব্বদাই বর্ত্তমান আছে।

সাহ আলম বাদসা
গাজী আহাদ

মোহর।

(মসীর দৌলা বাহাদুর)

রাজা সাহেব মোসফেক মেহেরবান সল্ল—

মল্লাহে তালা—

জগদীশ্বর আপনাকে সকল বিপদ হইতে রক্ষা করুন,

প্রিয় বন্ধু!

প্রেরিত ১লা রজব শনিবারের পত্রে আপনার কুশল সম্বাদ প্রাপ্তে পরমাহ্লাদিত হইলাম। আপনি ৩/৪ মাসপীড়িত থাকায় আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে না পারায় দুঃখিত হইয়াছেন। কিন্তু প্রিয় বন্ধু! সকল সময়ে সকলের সহিত সাক্ষাৎ করিবার সুযোগ সংঘটন হয় না। দূরে অবস্থিতি করিলেও, পরস্পরের মধ্যে অকৃত্রিম প্রণয় চিরস্থায়ী হইতে পারে। কেবল শারীরিক কুশলই জগদীশ্বরের নিকট সতত প্রার্থনীয়। আপনি লিখিয়াছেন যে আমার সহিত বন্ধুতা ও আমার অশেষ যত্নেই, আপনি বাদসাহের এতাদৃশ অনুগ্রহলাভ করিয়াছেন। তাহা বাস্তবিকই সত্য, কারণ, আপনার খেতাব ও ঝালরদার পালকীর জন্য, রাজা সেতাব রায়ের আবেদন ও আমার অশেষ চেষ্টাতেই, বাদসাহ আপনাকে প্রদান করিয়াছেন। আপনার প্রতি বাদসাহ অত্যন্ত সদয় আছেন। যদি আরও কোন বিষয় আবেদন করিতে হয় লিখিবেন, আপনার এই বন্ধু দ্বারা সানন্দে তৎকার্য্য সম্পাদিত হইবে। উকীলের দ্বারায় যে উপঢৌকন প্রেরণ করিয়াছেন, আপনার পরিতুষ্টির জন্য তৎসমস্ত গ্রহণ করা হইল। যখন যাহা আবশ্যক হইবে, লিখিবেন, প্রাণপণে তৎকার্য্য সাধিত হইবে। সর্ব্বদা পত্রাদি লিখিবেন এবং আমাকে বিস্মৃত হইবেন না ইতি

মহামহীমবরের সমীপে পুনরায় পেসকরা হইল ৮ই রমজান

পুনরায় পেস হইবে
সেরেস্তা তদন্তে ঠিক জানা গেল

১১৮১ হিজরী ১৪ রমজান বৃহস্পতিবার ৯ জলুস, সম্ভ্রান্ত ও মহোচ্চ পদাভিষিক্ত, সাম্রাজ্য মধ্যে ধর্ম্ম ও সাংসারিক কার্য্যকুশল, ঐহিক ও পারলৌকিক বিষয়ে জ্ঞানী, সম্মান ও মর্য্যাদার ধ্বজাধারী, শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্বের আস্তারণ বিস্তারক, সাম্রাজ্যের ও সরকারের বাহু, বিচার ও সামরিক সম্বন্ধীয় বিশ্বস্ত মন্ত্রী, যুদ্ধক্ষেত্রে বিজেতাবীর, আনন্দময় উৎসব গৃহের অলঙ্কার, বিচার ও রাজস্ব বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক, সৌভাগ্য ও কৃতকার্য্যতার ভিত্তিস্থাপক, সম্রাটের অতি গুহ্য বিষয় রক্ষণের ভাণ্ডার, সম্রাটের পূর্ব্বানুরাগ (মনোভাব) বুঝিতে তীক্ষ্নদর্শী, অকপটতা ও প্রভু-ভক্তির স্বচ্ছ মুকুর, পবিত্রতা ও সরলতায় উজ্জ্বল আলোক, সম্রাটের আনন্দময় সহচর, সরলতা ও রাজভক্তির বিশ্বস্ত ভাণ্ডার, লেখনি ও তরবারির উপযুক্ত ব্যবহারজ্ঞ, রাজকীয় কার্য্য পরিচালক, রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী, উচ্চপদাভিষিক্ত আমীরগণের মধ্যে সর্বোচ্চ, গুরুর অনুগত ও বিশ্বস্ত শিষ্য, প্রভুভক্ত ও বিজ্ঞ কর্ম্মচারিগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, অবিচলিত ও স্থির প্রতিজ্ঞ, যোদ্ধাগণের নায়ক, যুদ্ধক্ষেত্রে সাহসী সৈন্যগণের গৌরব, অসাধারণ পরিণাম দর্শকগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, রাজ্যের কীলক স্বরূপ, বিজ্ঞ ও যশশ্রী মন্ত্রী, বিশেষ সম্মান ও পদের উপযুক্ত, পাদসা সলেমানজার সাম্রাজ্যের স্তম্ভ, বকসী উল মমালেক, আমীর উল উমরা, নসীরুল মুলক, নাজীব উদ্দৌলা, নাজীব খাঁ বাহাদুর, সাবেত জঙ্গ সেনাপতির সাক্ষরিত আরজী যাহা সাম্রাজ্যের সংবাদ বিভাগীয় বিনীত ও বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী আনন্দরাম কর্ত্তৃক লিখিত

হইয়াছিল, তাহাতে মহামহিম করুণাময় সম্রাটের আদেশ হইয়াছে, যে, মহারাজা তিলোক চন্দকে পূর্ব্ব প্রদত্ত বাদে উন্নতি পূর্ব্বক পঞ্চ হাজারি জ্জাত, তিন হাজার সওয়ার এবং মহারাজা অধিরাজ খেতাব প্রদান করা হইল। তারিখ ১১ রমজান ৯ জুলুস।

খাষের ইয়াদদস্ত অনুসারে লেখা হইল।

পূর্ব্বোক্ত উপাধি সমূহ সম্বলিত বকসী উলমুলক আমীর উল উমরা, নসীরুল মুলক, নাজীব উদ্দৌলা, নাজীব খাঁ বাহাদুর সাবেত জঙ্গ সেনাপতির সাক্ষরিত বিবরণে প্রকাশ যে ইহা সেরেস্তার তালিকাভুক্ত করা হয়।

আবেদনকারী মহারাজা তিলোকচন্দের সাক্ষরিত আবেদন অত্র সেরেস্তার আগত হইয়াছে, তাহাতে মহামহিম সম্রাট অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহাকে পূর্ব্বপ্রদত্ত বাদে উন্নতি পূর্ব্বক পঞ্চাহাজারি জাত, তিন হাজার সওয়ার এবং মহারাজাধিরাজ খেতাব প্রদান করিয়াছেন।

বকসী উল মুলকের সাক্ষরিত বিবরণে প্রকাশ যে তদীয় সাক্ষরিত উল্লিখিত বিষয় সফল হয়।

পূর্ব্ব প্রদত্ত — ৪ হাজার জাত ২ হাজার সওয়ার।

অতিরিক্ত প্রদত্ত — ১ হাজার জাত ১ হাজার সওয়ার।

পঞ্চহাজারি জাত এবং তিন হাজার সওয়ার।

পূর্ব্বোক্ত তারিখ।

বকসী উলমমালেক নসীর উলমুলক
আমীর উল উমরা, নজীব উদ্দৌলা
নজীব খাঁ বাহাদুর, সাবেত জঙ্গ
সিপাহি সরদার। ফিদবী
সা আলম বাদসা গাজী

আনন্দগাম ফিদবী
সা আলম বাদসা গাজী

জিয়া উদ্দৌলা ফরজন্দ খাঁ বাহাদুর তহুবর জঙ্গ
ফিদবী সা আলম বাদসা গাজী

ওজস্বীনী মহারাণী বিষণকুমারী

তিলোকচাঁদের পরলোক গমনের সময় তাঁর পুত্র তেজচাঁদ মাত্র ৬ বছরের শিশু। সুতরাং মহারাজের দ্বিতীয়া স্ত্রী মহারাণী বিষণকুমারী রাজ্য দেখাশুনা এবং পরিচালনার সমস্ত দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করেন। তেজচাঁদ ১১৭১ সালের ৬ই মাঘ ইং ১৭৬৪ খৃঃ ১৭ জানুয়ারী তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। মহারাজ তেজচাঁদ নিতান্ত শিশু, সেইজন্য অভিভাবিকা হিসাবে তাঁর মাতা তীক্ষ্ণধী বিষণকুমারী সমুদয় রাজকার্য পর্যবেক্ষণ করতেন। যাতে তেজচাঁদ পিতৃপদ পান সেইজন্য তিনি ১০ হাজার মুদ্রা নজরানা সহ সম্রাট দ্বিতীয় সাহ্আলম বাদশাহের নিকট এলাহবাদে আবেদনপত্র পাঠান। সেইসময় দিল্লীশ্বর শাহ্আলম এলাহবাদে অবস্থান করতেন।

১৭৭১ খৃঃ সম্রাট শাহ্আলম, প্রধান সেনাপতি, সরাফৎউদ্দৌলা মীর সায়েক আলি খাঁ বাহাদুর মোজঃফর জঙ্গ, মহারাজা তেজচাঁদ বাহাদুরকে যে ফরমান পাঠিয়েছিলেন তার মর্ম নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো—

(সাহ্আলম বাদ্ সাহগাজী—
বখসীয়ান্ মোলক সয়কত উদ্দৌলা—
মির সয়েকআলি খাঁ বাহাদুর
মোজঃফর জঙ্গ)

এই মোহরটি ফরমান খানির পৃষ্ঠদেশে অঙ্কিত।

"সন ১১৮৪ হিজরী, ১২ জুলুস, ১২ই সওয়াল মঙ্গলবারে বাদসাহের হুকুম প্রচার হইল যে, মহারাজ তিলোকচন্দের পুত্র, তেজচন্দ্রকে পঞ্চহাজারী জাত, তিন হাজার সওয়ার মহারাজাধিরাজ খেতাব, ঝালরদার পাল্কী, (অর্থাৎ পতাকা) ও নাকারা প্রদানে অনুগৃহীত করা হইল ইত্যাদি।

তৎপরে এলাহবাদ হইতে নবাব মনিরদ্দৌলা বাহাদুর মহারাজাকে যে পরওয়ানা প্রেরণ করেন তাহাতে লিখিত আছে: আপনার প্রার্থনা অনুসারে আপনার পিতার পর, হুজুর হইতে আপনাকে প্রদত্ত হইল। তদনুসারে স্বীয় মান-সম্ভ্রমের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্যানুবর্ত্তী হইবেন।" এই পরওয়ানাখানিতে কোন সন ও তারিখ নাই।

১৭৭২ খৃঃ অর্থগৃধ্নু ওয়ারেন হেস্টিংস্ ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির গবর্ণর নিযুক্ত হইয়াই, কি প্রকারে বর্ধমানাধিপতি নাবালক মহারাজ তেজচাঁদ বাহাদুরের রাজধনাগারটি আত্মসাৎ করিবেন, তাহারই উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন।

সেইসময় নাবালক পুত্রের অভিভাবিকা হয়ে বিষণকুমারী নিজেই রাজকার্য পর্যবেক্ষণ করতেন। তাঁর সুযোগ্য দেওয়ান রূপনারায়ণ চৌধুরীর সহযোগিতায় এবং তাঁর অসাধারণ কর্মকুশলতায় ও ব্যবস্থাপনায় রাজকার্য ভালভাবেই নির্বাহ হচ্ছিল।

বাদশাহ এবং ইংরাজদের কাছ থেকে তেজচাঁদ স্বীকৃতি পেলেও বিচক্ষণা বিষণকুমারী ঐ দুই দিক থেকে আঘাত আসার সম্ভাবনায় সব সময় প্রস্তুত থাকতেন। বর্ধমান রাজ একসময় ইংরেজদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছিলেন বলে ইংরেজরা বর্ধমানরাজকে সুনজরে দেখতো না। ইংরাজ কর্তৃপক্ষ দেখল, বর্ধমান রাজশক্তি এক অল্পবয়স্কা বিধবা ও শিশুপুত্রের ওপর নির্ভরশীল। বাংলার গভর্ণর ওয়ারেণ হেস্টিংস চিন্তা করলেন, বর্ধমান রাজশক্তিকে ধ্বংস করার এই প্রকৃষ্ট সুযোগ। সেই সময় বর্ধমান জেলার রেসিডেন্ট ছিলেন জন গ্রাহাম। জন গ্রাহাম হেস্টিংস-এর বিশেষ পরিচিত। চক্রান্ত করে তাঁরা তাঁদের অনুগত ব্যক্তি ব্রজকিশোর রায় নামে এক অর্থ লোলুপ ধুরন্ধর লোককে বর্ধমান রাজের ম্যানেজার নিযুক্ত করেন। চুপী নিবাসী ব্রজকিশোর রায়কে ম্যানেজার নিয়োগ করার বিশেষ কারণ হিসাবে বলা যেতে পারে, রাজা তিলোকচাঁদের আমলের ম্যানেজার রূপনারায়ণ চৌধুরী ছিলেন সজ্জন ব্যক্তি। মহারাজাধিরাজ তিলোকচাঁদের মৃত্যুর সময় মহারাজ তেজচাঁদ মাত্র ছয় বছরের শিশু। প্রকৃতপক্ষে রূপনারায়ণ চৌধুরী ছিলেন পরম রাজহিতাকাঙ্খী। সুতরাং তাঁকে অপসারণ করতে পারলে, হেস্টিং-এর স্বার্থসিদ্ধির পথ সুগম হবে। কিন্তু অত্যন্ত বুদ্ধিমতি বিষণকুমারী ম্যানেজারের গতিবিধি ও সকল কাজকর্ম বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতেন এবং 'শীলমোহর' ব্রজকিশোরকে দিতেন না। সরকারী কাজের কাগজপত্র দেখে তিনি নিজে শীলমোহর ছাপ দিতেন। এতে ব্রজকিশোরের খুব অসুবিধা হতো। তা ছাড়া জন গ্রাহাম ইতিমধ্যে অন্যত্র চলে যাওয়ায় ম্যানেজার আরও অসুবিধায় পড়েন। যাইহোক ১৭৭২ খ্রীঃ জন গ্রাহাম পুনরায় বর্ধমান আসেন। চক্রান্ত করে গ্রাহামের সহায়তায় ৮ বছরের কিশোর বালক তেজচাঁদকে কৌশলে সরিয়ে নিয়ে অন্যত্র নজরবন্দী করে রাখেন। সব চক্রান্ত বুঝতে পেরে মহারাণী বিষণকুমারী শীলমোহরটি ম্যানেজারকে দিতে বাধ্য হন। ১৭৭৪ খ্রীঃ মহারাণী বিষণকুমারী কাউন্সিলে অভিযোগ আনেন যে, ব্রজকিশোর ও রেসিডেন্ট জন গ্রাহাম হেস্টিংসের সম্মতিতে তাঁর নাবালক পুত্রের আয় ও সম্পত্তির অপচয় ঘটাচ্ছে। হেস্টিংসের তীব্র আপত্তি সত্ত্বেও কাউন্সিলে ব্রজকিশোরকে আয়-ব্যায়ের হিসাব প্রদান করতে বাধ্য করা হয়। তাঁর অভিযোগে আরও জানা যায়, বর্ধমান জমিদারী হতে হেস্টিংস ১৫০০০ টাকা ও সেক্রেটারী কানাইলাল ৫০০০ টাকা ও সহকারী কাশীলাল ৫০০ টাকা উৎকোচ গ্রহণ করেন। (ভারতবর্ষের ইতিহাস (আধুনিক— ডঃ কিরণ চৌধুরী পৃঃ ৯৪-৯৫)। ঠিক এই সময় রাজকোষ শূন্য। ১১

লক্ষ টাকার কোন হিসাব পাওয়া যায় নাই। এবং ঐ টাকা ব্রজকিশোর আত্মসাৎ করেছে যার বেশীরভাগই হেস্টিংস্-এর প্রাপ্য। মহারাণী বিষণকুমারী ব্যাপারটি বুঝতে পেরে মহারাজ নন্দকুমারের সহায়তায় রাজধনভাণ্ডার তছরূপের অভিযোগ এনে, জন গ্রাহাম ও ব্রজকিশোর রায়ের বিরুদ্ধে সরাসরি কাউন্সিলের নিকট অভিয়োগ দায়ের করেন। গভর্ণর হেস্টিংসও অনুমান করতে পারেন নাই যে, মহারাণী সরাসরি ইংরাজ কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করবেন। আত্মসম্মান রক্ষার জন্য তিনি, মহারাণীকে শীলমোহর ফেরৎ দেওয়ার জন্য ব্রজকিশোরকে নির্দেশ দিলেন।

আপাতঃ কুচক্রীরা নিরস্ত হলেও, রাণী বিষণকুমারীর প্রতি অন্তরে আক্রোশ পোষণ করতে থাকেন। শেষে তাঁরা মহারাণীর রূপযৌবনের প্রতি কটাক্ষ করে, তাঁর চরিত্র হননের চেষ্টায় নানা প্রকার কুৎসা রটনা করেন এবং জনৈক রাজকর্মচারী মারফৎ কলকাতায় ঊর্দ্ধতন ইংরাজ কর্তৃপক্ষকে অভিযোগ করে। রিচার্ড বারওয়েল, এই অভিযোগের ভিত্তিতে কাউন্সিলে রিপোর্ট করেন। চারিদিকে চক্রান্তকারী পরিবেষ্টিতা ওজস্বিনী মহারাণী দুরভিসন্ধিমূলক অপবাদের প্রতিবাদকল্পে এই অভিযোগটিও কাউন্সিলেকে জানান।

১৭৭৪ খ্রীঃ ডিসেম্বর মাসে হেস্টিংস-এর বিচারের সময় মহারাণীর অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছিল। (*Memoirs of Warren Hastings. --- G.R.Gleig, Vol.1, P.-501*)। ১৭৭৫ খৃঃ মহারাজা তেজচাঁদ বাহাদুরের একাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে তাঁহাকে খেলাত প্রদান করিবার জন্য কৌন্সিল হইতে যে পত্র লিখিত হয়, তাহার মর্ম্ম নিম্নে লিখিত হইল।

২য় (লেফাফার উপরের মোহরটির অক্ষরগুলি আদৌ পড়িতে পারা যায় না)

১১৮৫।

রামচন্দ্র।

মহারাজা সাহেব মোসফেক্ মেহেরবান

মোখ লেসান্ সালামত।

কৌন্সিলের সাহেবানের হুকুম হইল যে, ঈশ্বরানুগ্রহে আগামী পরস্ব ১৪ই মহরম শুক্রবার, কৌন্সিলের সাহেবানের হুজুর হইতে আপনাকে, রানী সাহেবাকে এবং রাজকর্ম্মচারীগণকে খেলাত দেওয়া হইবে। অতএব আপনাকে এই শুভ সংবাদ প্রদান করতঃ বিজ্ঞাপিত করিতেছি যে, আপনি ঐ তারিখে এখানে উপস্থিত হইয়া সকলের আনন্দ বর্দ্ধন করিবেন। ১২ মহরম, সন ১৬ (জুলুস)।

অতঃপর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ডিরেক্টরগণ তৎপর হয়ে গভর্ণর জেনারেলের

ক্ষমতা কমিয়ে, কাউন্সিলের হাতে সমগ্র ক্ষমতা দিলেন।

১৭৭৫ খ্রীঃ ১৫ই জানুয়ারী কাউন্সিল ব্রজকিশোরকে বরখাস্ত করার আদেশ দেন এবং জমিদারীর দায়িত্ব বিষণকুমারীর হাতে অর্পণ করেন।

"১৭৭৬ খৃঃ হইতে ১৭৭৯ খৃঃ পর্যন্ত মহারাণী বিষণকুমারী সুচারু রূপে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করতঃ পুত্রের চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে তাঁর হস্তে রাজ্যভার অর্পন করেন। অসাধারণ বুদ্ধিমতি মহারাণী বিষণকুমারী যতদিন পর্য্যন্ত রাজ কার্য্য পর্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন, ততদিন রাজ্যের সুবন্দোবস্তের বিন্দুমাত্রও ত্রুটি হয় নাই, বরং বিশেষ কার্য্যকুশলতাই প্রকাশ পাইয়াছিল। এইরূপ সুবিশাল রাজ্যের সুব্যবস্থা একটি স্ত্রীলোক কর্ত্তৃক সু-সম্পন্ন হওয়া অতীব প্রশংসার বিষয়, তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই! বর্ধমান রাজ্যে ৭৫টি পরগণার বার্ষিক ৪০ হইতে ৪৩ লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত রাজস্ব দিয়াও, কখনও এক কপর্দকও বাকী পড়ে নাই। পূর্ব্বে মহারাজা তিলোকচন্দ্ বহুতর জমির খাজনা, বঙ্গেশ্বরকে এবং তৎপরে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানিকে না দিয়া, স্বয়ং উপভোগ করিতেন। ১৭৬৩/১৭৬৪ খৃঃ হইতে ঐ সকল জমির অনুসন্ধান করিবার জন্য মিঃ জনষ্টোন, মিঃ বোল্ট ও মিঃ ভারলেষ্ট পর্য্যায়ক্রমে সুপারিন্টেনডেন্ট পদে নিযুক্ত হইয়া অবশেষে প্রায় ৫ ।। লক্ষ বিঘা জমি বাহির করতঃ মহারাজা তেজচন্দ্ বাহাদুরের সহিত বন্দোবস্ত করেন। ১১৭৭ সাল, ইং ১৭৭০ খৃঃ মহারাণী বিষণকুমারী উক্ত জমির খাজনা ও সমগ্র রাজ্যের রাজস্ব সাকল্যে ৪০,৫৭,৪৩২৲ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে প্রদান করেন। এবং সরঞ্জামী আদি খরচ নির্ব্বাহের জন্য ৬,৬১,৪৮৬৲ বাদ প্রাপ্ত হয়েন। ১১৭৮, ইং ১৭৭১ খৃঃ ৪,৩২,৮৫৯৲ টাকা হাল এবং ১,৮৮,২৫৫৲ টাকা বকেয়া বাকী সমেত সর্ব্বশুদ্ধ ৪৫,১৬,৮০৪৲ টাকা আদায় হইয়াছিল। তন্মধ্যে মহারাজার খরচ বাবদে ৮,৭৫,৯৬১ টাকা বাদে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে ৩৬,৪০,৮৪৩৲ টাকা প্রদান করিয়াছিলেন। এই বৎসর বঙ্গে ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ হইয়া প্রায় এক তৃতীয়াংশ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল, এবং কত শত গ্রাম যে শ্মশানে পরিণত হইয়াছিল, তাহার সংখ্যা নাই।

মহারাণী বিষণকুমারী রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণকালে ইং ১৭৭৩ খৃঃ সন ১১৮০ সালে আষাঢ় মাহার রাজসংসারের যাবদীয় খরচ ও কর্ম্মচারীগণের বেতনের একটি মাসিক বরাদ্দ, একখানি প্রাচীন ইয়াদদস্তে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে তাহার অবিকল প্রতিলিপি নিম্নে লিখিত হইল —

কর্মচারী	সংখ্যা	মাসিক দরমাহা
সাহেবান	৬	১,০৩৫৲
দেওয়ান দপ্তর	৪৪	৩,৩৭৫৲

দেওয়ানী আদালত	৬	৮৫৲
ফৌজদারী আদালত	২১	৪২৫৲
জমাবন্দী দপ্তর	৩	২৬৲
খাজনা দপ্তর	১৯	২৪৮।৹
জমা খরচ	৩	১৪৲
বাজে জমা	২	১৩॥৹
আমিন দপ্তর	৮	১১১॥৹
মোৎসুদ্দিয়ান্	১০	৫১০॥৹
তোষাখানা	৫	৫৩॥৹
বরাদ্দ লালা আমিরচন্দ্	১	১০০০
খাজনা দপ্তর	১০	১১০৲
বক্সী দপ্তর	১৪	১৮৬৲
মুন্সিয়ানা	১৬	২২৯৸৹
উকীল	১১	২৪০৲
আরজবেগী	৪	৩৪৲
পারসী দপ্তর	১	৭৲
আখবর নবীশ	১	৫॥৹
ভাঙ্গাপরগণা	৬৮	২৬২।৹
দপ্তরী	৩	১০॥৹
সাদা সিহাই রোজনাই ও গয়রহা	—	২৩২৲
বুতাদি	১১	৫৪॥৹
খানসামা	১১	১৪৭৲
দরমাহা খরচ		
মহারাজার খানসামানি খরচ	—	২০,৫৫০৲
মাসিক বরাদ্দ		
নগদীয়ান নিম মাহার অর্থাৎ অর্দ্ধমাহার বেতন	—	৪,৩৩০৲
খোজানার মোকবরা খাজনা	—	৩০৭॥৹
পীরবাহারাম সাহেব খরচ	—	১৫২।৹
দেবতাদি পূজার খরচ	—	৮৮২৸৴৹

মাহিনা লালা আমিরচন্দ্‌ ওগয়রাহা	—	১,৭৬৫।।
মোমবাতি	—	৭৫্
খানা খরচ	—	—
থানাদার হার রোজা	—	২,৮৮১্
দেওয়ান দপ্তর ওগয়রাহা	—	৫,১০৫্
কোটীর নগ্‌দী বরকন্দাজ	—	৪৫৬্
পাতসাহী কোত	—	১৬।৶০
তৈল মশাল	—	৩২৮।৶১০
বাগীচা হায়	—	২৮২৸৵
ছাপ্‌পরবন্দী	—	১,৩৫১।।৵৫
জমাদার, চোপদার, পেয়াদা আদি	—	১৫৯্

এই সময় চুপী নিবাসী দেওয়ান রঘুনাথ রায় মহাশয়ের পিতা ব্রজকিশোর রায় মহাশয় বৰ্দ্ধমান রাজ্যের প্রধান দেওয়ান পদে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি মাসিক এক সহস্র টাকা বেতন পাইতেন। কোম্পানির তরফ হইতে মাসিক এক সহস্র টাকা বেতনে, ভবানীচরণ মিত্র নামক এক ব্যক্তি দেওয়ান ছিলেন। তিনিও রাজসবকার হইতেই উক্ত এক সহস্রটাকা বেতন প্রাপ্ত হইতেন।"

উপরোক্ত তথ্যগুলি রাজবংশানুচরিত হতে পাওয়া গেছে (পৃঃ ৮৮-৯১)।

মহারাজা তেজচন্দ্‌ বাহাদুরের নাবালকাবস্থায় রাজ্যের দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচার তাঁহার প্রতিনিধি স্বরূপ, তদীয় প্রধান দেওয়ানই নিষ্পত্তি করিতেন। ফয়সালার উপরিভাগে পারসী অক্ষরে খোদিত (দে ওয়ানী অথবা ফৌজদারী আদালত জেলে বরদমান) মোহরাঙ্কিত এবং তৎপার্শ্বে দেবনাগর অক্ষরে "শ্রীসহী মহারাজাধিরাজ রাজা তেজচন্দ্‌ বাহাদুর" স্বাক্ষর করা হইত।

এখন ১৭৭৯-৮০ খ্রীঃ বিষণকুমারীর পরিচালনাধীন জমিদারীর দেয় রাজস্ব ৬ লক্ষ টাকা উসুল দিতে না পারায়, হেস্টিংস ও নবকৃষ্ণ মুন্সি গোপন চক্রান্ত করে ১৭৮০ খ্রীঃ ২১ শে জুলাই হেস্টিংসের পরামর্শ মত বর্ধমানের সাঁজোয়াল পদের জন্য আবেদন জানায়। নবকৃষ্ণ রাজস্ব পরিশোধের জন্য তেজচন্দ্রকে ১২% হার সুদে ৯ লক্ষ টাকা কর্জ দেন। *(Bulletin School of Oriental and African Studies : University of London, Vol xxvii, Part-2, 1964 P.389)* হেস্টিংসের বিচারের সময় *Nabakisen produced bonds for sicca rupees 934,729 with interest*

at 12 % Nabakisen versus Hastings --- P.J.Marshall. "এছাড়া তিনি ব্যক্তিগতভাবে ২৬ শে জুলাই-এর মধ্যে হেস্টিংসকে ৫% হার সুদে ৩ লক্ষ টাকা ধার দেন। হেস্টিংসের বিচারের সময় (ইম্‌পিচমেন্ট) প্রকাশ পায় যে, তিনি ঐ অর্থ নবকৃষ্ণকে পরিশোধ করেন নাই এবং ধার নেওয়ার জন্য কোন সন্তোষজনক জবাব ছিল না। উৎকোচের ৩ লক্ষ টাকা লিখিতভাবে ধার হিসাবে দেখালেও বিচারকগণ হেস্টিংসের জবাবে সন্তুষ্ট ছিলেন না; উপরন্তু প্রজাপীড়ন ও কোষাগার তছরূপের আংশিক দায়িত্বও তাঁর উপর বর্তায়। নবকৃষ্ণ আদায়ীকৃত রাজস্বের উপর ১১/২% হারে 'রসুম' (কমিশন) পেয়েছিলেন। (*East Indian Fortune, P.195 ; Ibid. P.388-94*)"।

"১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দের ৪ ঠা আগষ্ট নবকৃষ্ণ বর্ধমানের সাঁজোয়াল নিযুক্ত হন এবং এই পদে তিনি ১৮ মাস বহাল ছিলেন। প্রথম বছরে তিনি রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করলেও পরের বছর বিশেষভাবে অকৃতকার্য হন এবং বাংলা ১১৮৮ সালে তাঁর সাঁজোয়াল পদের কার্যকাল শেষ হয়। (*Memoirs of Maharaja Nabakisen Bahadur --- N.N.Ghosh, P.150-58*) প্রকৃতপক্ষে নবকৃষ্ণকে পদচ্যুত করা হয়। এ ব্যাপারে দেওয়ানী আদালতের জজ মিঃ অস্টিন, মহারাণী বিষণকুমারী ও দেওয়ান রামকান্তের অসহযোগিতাই তার কারণ।

নবকৃষ্ণ-এর পদচ্যুতির পর ১৬ বছরের তরুণ তেজচাঁদ জমিদারী পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। মহারাণী বিষণকুমারী মাসিক ৪০০০ টাকা ভাতা বরাদ্দ নিয়ে কালনায় অবস্থান করেন।

এই সময় নবকৃষ্ণ ও গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের মনোনীত কয়েকজন ব্যক্তি সদাসর্বদা তেজচাঁদকে বিপথে চালিত করার চেষ্টা করে। মহারাজা বিলাস ব্যসনে মগ্ন হয়ে রাজকার্যে অমনোযোগী হয়ে পরেন। কুসংসর্গদুষ্ট হওয়ায় এবং স্বার্থপর অর্থলোভী অনুচরবর্গের কুপরামর্শে প্রচুর অর্থ অপব্যয় করেন; সেই সুযোগে রাজকর্মচারীরাও বহু অর্থ আত্মসাৎ করেন। ফলে ইংরেজ কোম্পানিকে দেয় খাজনা ১,৭৬,৪৬২ টাকা বাকী পড়ে। তৎকালীন বর্ধমানের ম্যাজিস্ট্রেট ও কলেক্টর চার্লস আর ব্রাউন মহারাজকে গৃহবন্দী করে রাখেন এবং রাজার ৭টি হাতী, ১২ টি ঘোড়া, ১টি উট, ১টি রূপার হাওদা, ১টি সোনার পাখা, দামী কার্পেট ও বহু মূল্যবান আসবাবপত্র বাজেয়াপ্ত করেন। কিন্তু তাতে খাজনা পরিশোধ হলো না, বরং আবার বাকী পড়তে থাকল। মহারাজা নিরুপায় হয়ে মাতা বিষণকুমারীকে বিক্রী কোবালা করে দেন। বর্ধমানের কালেক্টর ব্যাপারটি বোর্ডকে অবগত করেন ১৭৯৪ খ্রীঃ ১০ই জানুয়ারী। তাতে বোর্ড আদেশ দিলেন যদি মহারাণী রাজকার্য সুশৃঙ্খলভাবে চালাতে

পারেন, তা হলে, অনুপযুক্ত ভূম্যধিকারী বিষয়ক আইন থেকে অব্যাহতি দেওয়া হবে। ইংরেজ কোম্পানি আরও জানান এই সঙ্গে মহারাজার বকেয়া খাজনাও পরিশোধ করতে হবে। বোর্ডের এই আদেশের পর মহারাণী বিষণকুমারী ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই মার্চ তারিখে বোর্ডের কাছ থেকে বাকী খাজনার একটি বন্দোবস্ত করে নিয়ে কতকগুলি জমিদারী মিঃ বাট সাহেবের কাছে বন্ধক রেখে বাকী খাজনা শোধ করার ইচ্ছা জানিয়ে তৎকালীন গভর্ণর জেনারেল স্যার জন-শোর বাহাদুরকে ১৮ই মার্চ আবেদন করেন। গভর্ণরবাহাদুর মহারাণীর আবেদন মঞ্জুর করে এও জানিয়ে দিলেন যে, যদি তাতেও খাজনা বাকী পড়ে তা হলে জমিদারী বিক্রী করে তা অবশ্যই পরিশোধ করতে হবে। মহারাণীকে জমিদারী বন্ধক রেখে খাজনা শোধ করতে হয় নাই, তাঁর নিজের কাছ হতে কিছু এবং সাহেবরা নিষ্কর জমি বিক্রয় করে বাকী খাজনা শোধ করার অনুমতি দিলেন। এইভাবে বর্ধমানের পরবর্তী কালেক্টর সামুয়েল ডেভিসের সুপারিশক্রমে পুনরায় মহারাণী বিষণকুমারীকে জমিদারীর দায়িত্ব অর্পন করেন। কালেক্টর সামুয়েল ডেভিস ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই অক্টোবর তারিখে রাজস্ববোর্ডের সভাপতি উইলিয়ম কুপারকে যে পত্র দিয়েছিলেন তা থেকে জানতে পারা যায় মহারাণীর অংশের দেয় রাজস্বের পরিমাণ ছিল ১৯,৯৯,৫৮৩ টাকা ১৩ আনা ১১ পাই ২ কড়ি *[Bengal Historical Records (New Series) Burdwan ; Letters issued --- Ed. Asoke Mitra, P.82, 98 & 109)]*। অতঃপর মাতা ওপুত্র পৃথকভাবে জমিদারী পরিচালনার দায়িত্ব পান। পুনঃ রাজ্যপ্রাপ্তির পর 8 টি বছর অর্থাৎ ১৭৯৪ থেকে ১৭৯৮ খ্রীঃ পর্যন্ত নানা বাধা বিঘ্ন, প্রতিবন্ধকতা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ (১৭৯৪ খ্রীঃ-এর প্লাবন) রাজনৈতিক দুর্যোগ এমন কি নিজ গর্ভজাত সন্তান তেজচাঁদ বাহাদুরের সঙ্গে বাদ-বিসম্বাদের মধ্য দিয়ে রাজ্যকে রক্ষা করে মহারাণী বিষণকুমারী ১৭৯৮ খ্রীঃ ৯ই সেপ্টেম্বর (বাংলা ১২০৫ সালের ২৬শে কার্তিক) পরলোক প্রাপ্ত হন।

কীর্ত্তিময়ী বিষণকুমারীর কীর্তি ঃ—

রাজা ত্রিলোকচাঁদের পরলোক গমনের পর বিষণকুমারী বিশাল জমিদারীর হাল শক্ত হাতে ধরে তা চালনা করে এসেছেন, সেই সঙ্গে তিনি তাঁর বহুকীর্তিও রেখে যান। তার মধ্যে তাঁর দেবকীর্তিও অতুলনীয়। তৎকালে বড় বড় জমিদার, রাজা-মহারাজাদের একটা সৌখিন নেশা বলা যেতে পারে এইসব দেব-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি। তাঁরা স্ব-স্ব জমিদারীর এলাকা বা অধিকৃত অঞ্চলে, দূরে বা অনতিদূরে বহু দেব-দেবীর মন্দির নির্মাণ করাতেন। এর পশ্চাতে সম্ভবতঃ কতকগুলি কারণ থাকে। প্রথমতঃ বলা যেতে পারে, সে যুগে সাধারণ

মানুষের বিনোদন বা আজ যাকে আমরা *Recreation* বলি, তা ছিল না। কাজেই এই দেব-দেবী ইত্যাদিকে অবলম্বন করে সেই সেই অঞ্চলে মেলা-পার্বন-উৎসব হতো ; সেখানে জমায়েত হতো পার্শ্ববর্তি গঞ্জ-গ্রামাঞ্চলের বহু নরনারী-শিশু, তরুণ-তরুণী। এই সবকে অবলম্বন করে একদিকে যেমন লোকসংস্কৃতি, লোকশিক্ষা, লোকশিল্পের যেমন প্রসার ও প্রচার হতো, তেমনি দেশীয় স্থাপত্যশিল্প, তার কলা-কৌশল প্রভৃতি বিদ্যাকে স্থায়িত্ব দেওয়া, সেই সঙ্গে বহুলোকের অন্ন সংস্থান হওয়া এবং কৃতীর নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা হতো।

বর্ধমান রাজ পরিবারেরও সময় সময় এক এক রাজা ও রাজমহিষীর এরূপ কীর্তি কলাপ আজও দেখা যায়। মহারাণী বিষণকুমারীর পূর্ববর্তীগণের যেমন কীর্তি আছে তেমনি তাঁরও কীর্তি আছে যথেষ্ট।

১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে মহারাণী বিষণকুমারী অম্বিকা কালনায় রূপেশ্বর শিব মন্দিরের পূর্ব দিকে একটি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দির গাত্রে শিলালিপির কিছু অংশ বিনষ্ট হয়ে গেছে। যতটুকু অংশ পাঠোদ্ধার করা গেছে তা উদ্ধৃত করা হলো—

বাণনাগরসেন্দৌ চ শকাব্দে সোমবাসরে।
মধুমাসে সিতে পক্ষে শুভলগ্নেষ্টমীতিথৌ।।
মহাবিষ্ণু সংক্রান্তাং দিনে ত্রিংশত্তমেপি চ।
. . . . . স্থাপিতং বহু যত্নতঃ। শকাব্দ ১৬৮৫।

দাঁইহাটে গঙ্গার তীরে মাহারাণী বারদ্বারী ঘাট ও তার উপর একটি চাঁদনী নির্মাণ করে তার পাশে ৺গঙ্গাধর শিব স্থাপন করেন। ঐ ঘাটে একটি শিলালিপি গ্রথিত আছে কিন্তু তার অক্ষরগুলি বিনষ্ট হওয়ায় পাঠোদ্ধার সম্ভব হয় নাই।

মহারাণী ১৭৮৪ খ্রীঃ অম্বিকা কালনায় প্রতিষ্ঠা করেছেন শ্রী শ্রী রামেশ্বর শিব। মন্দির গাত্রে গ্রথিত শিলালিপিতে উৎকীর্ণ আছে

বানব্যোমধরাধরেন্দু গণিতে শাকে শশাঙ্ক
শ্রীকনধস্যনিবাসমন্দিরমিদং রাধাপতি প্রীতয়ে।
ধীর শ্রীযুক্ত তেজচন্দ্রধরণীধ্যেরেয় চূড়ামণে—
স্মাতা সম্প্রতি নির্মাণ সুরসরিৎক্ষেত্রে হম্বিকাখ্যেপুরে।।

মন্দিরটি গঙ্গার তীরে অবস্থিত। শিবলিঙ্গটি কষ্টি পাথরে নির্মিত। বাংলার ঐতিহ্যমণ্ডিত আটচালা নক্সায় মন্দিরটি চতুষ্কোণ প্রাঙ্গণে নির্মিত হয়েছিল।

সাধারণত ভক্তরা জপের যে মালা জপ করেন তাতে ১০৮ টি কাঁঠি থাকে আর একটি অতিরিক্ত কাঁঠি থাকে তাকে মেরু বলে। হিন্দুদের নিকট ১০৮ সংখ্যার একটি

ঐন্দ্রজালিক প্রভাব আছে। মহারাণী বিষণকুমারীর বাসনা জাগল ঐ জপমালার আদলে ১০৮ শিব মন্দির প্রতিষ্ঠা করবেন। বালেশ্বরের মন্দিরের আটচালার নকসাকে নমুনা হিসাবে সাজিয়ে বর্ধমানের নবাবহাটে ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে ১০৮ শিব মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করলেন এবং অতিরিক্ত একটি মন্দির নির্মাণ করলেন ঐ জপমালার 'মেরু' চিহ্নের মত। আসলে ১০৯টি শিব মন্দির নির্মাণ করান।

১০৮ শিবমন্দির প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে অনুপ্রেরণা ছিল 'দশনামী' শৈব সম্প্রদায়ের। দশনামী শৈব সম্প্রদায় সম্বন্ধে কিছু বলার আছে। এঁরা ছিলেন তারকেশ্বরের সাধু (শৈব) সম্প্রদায়। রাজা কীর্তিচাঁদের সঙ্গে তারকেশ্বরের গদী নিয়ে সাধু-সম্প্রদায়ের সংঘর্ষ বাধে। এখানকার সাধু-সম্প্রদায় দুদলে বিভক্ত হয়ে যায়। তাঁদের একটি দল রাজ আশ্রয়ে চলে আসেন। এই রাজ আশ্রিত 'দশনামী' শৈব সম্প্রদায়ের প্রেরণায় ধর্মপ্রাণা বিষণকুমারী ১০৮ শিবমন্দির প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী হন। মন্দির প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আরও শোনা যায়, মহারাণী একদিন স্বপ্ন দেখেন, এক অপূর্ব রমনীয় সারি সারি বহু মন্দিরের সমাবেশ; যাগযজ্ঞ সহ মন্দিরে মন্দিরে শিবের পূজা করে চলেছেন তিনি।

তাঁর মনের আকাঙ্খা রূপায়ণে স্থান নিরূপণ করলেন নবাব হাটে। নিকটেই তালিত গড়। তাছাড়া বিভিন্ন গ্রামাঞ্চল থেকে বহু পুণ্যার্থীরাও আসতে পারবে দর্শনার্থে।

মন্দির চত্বরে প্রবেশ পথ পশ্চিম দিকে। প্রবেশ পথের উপরে গ্রথিত শিলালিপিতে উৎকীর্ণ ছিল ঃ

"শকে পুণ্য শশাঙ্ক শৈল কুমিতে নির্ম্মায় রাধা হরি প্রীত্যৈ
পুণ্যবতী নবাধিকসত্যং শ্রীমন্দিরাণী স্বয়ম্।
ধীর শ্রীযুত তেজচন্দ্র ধরণী-ধৌরেয় চূড়ামনে
মাতা তৎসবিধে বিধায় সুসরস্তীরে সমস্থাপয়তু।"

প্রথম মন্দিরের দ্বারের উপরে শিলালিপিতে লিখিত আছে —

"শ্রীহরী শকাবর ১৭১০, সন ১১৯৫, ইং ১৭৮৮ সালে
পুণ্য শশাঙ্ক শৈল কুমেতি নির্ম্মায়।
রাধা হরি প্রীতে পুণ্যবতী নবাধিক শত শ্রীমন্দিরাণী
স্বয়ং শ্রীল শ্রীযুক্ত তেজচন্দ্র ধরণী ধেযয় চূড়ামনে মাতা
তৎস্ববিধে বিধাও মুরাস্তীনে সংপাদশয়তঃ।"

এই সব শিলালিপি হতে জানা যায়, মন্দিরগুলি নির্মিত হয়েছিল ১৭১০ শকাব্দে, ইং ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে এবং নির্মাণ কার্য শেষ হয় ১৭৯০ খ্রীঃ। মন্দিরগুলির গঠন প্রণালী একই রকম।

বাংলার ঐতিহ্যমণ্ডিত আটচালা নক্সায় চতুষ্কোণ ভূমিতে। প্রতিটি মন্দিরের আয়তন ১০' x ১০' উচ্চতায় ১৫ ফুট, গাত্রে কোন টেরাকোটার অলঙ্করণ নাই। প্রতি মন্দিরে একটি করে দরজা। মন্দিরগুলি পাশাপাশি সজ্জিত। দরজার সম্মুখে খোলা টানা বারান্দা। একটি আয়তাকার ক্ষেত্রে অবস্থিত। প্রতি মন্দিরে কষ্টি পাথরে নির্মিত গৌরীপট্টসহ শিব লিঙ্গ। মন্দিরগুলির ভিতর অঙ্গণে আছে স্বচ্ছসলিলা প্রশস্ত-পুষ্করিণী। প্রতি মন্দিরের সম্মুখে একটি করে বেল গাছ ছিল। এখন আর বেল গাছ প্রতি মন্দিরের সম্মুখে নাই।

ধর্মপরায়ণা ও নীতিজ্ঞান সম্পন্না বিদূষী মহারাণী কিষণকুমারী স্বপ্নে দেখা মন্দিরের অনুরূপ, শ্রীকান্ত তর্কালঙ্কারের শ্লোক মত ১০৯ টি মন্দির স্থাপন করে লক্ষাধিক ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করেন। পুত্রের সুবুদ্ধি ও মঙ্গল কামনায় সমবেত লক্ষাধিক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের আশীর্বাদ কামনা করেন। পুত্র তেজচাঁদকে তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন, রাজসম্মান ও ঐতিহ্যকে রক্ষার জন্য মন্দির প্রতিষ্ঠার দিন সেখানে উপস্থিত থেকে শুদ্ধচিত্তে আমন্ত্রিত ব্রাহ্মণদের আপ্যায়ণ ও তাঁদের পদধূলি গ্রহণ করে আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করতে। মহারাজ তেজচাঁদ মাতৃআজ্ঞা যথাযথ পালন করে লক্ষ ব্রাহ্মণের পদধূলি গ্রহণ করে যত্ন সহকারে রাজ অন্তঃপুরে রক্ষা করেন।

এইভাবে মহা আড়ম্বরে ১০৮ + ১ শিব মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন ভক্তিমতী বিষণকুমারী।

আতপচাল, ঘী, গুড় ও কলাই দিয়ে শিবগুলির নিত্যসেবার ব্যবস্থা আছে। সোমবার শিবপূজার প্রশস্ত দিন। ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী তিথিতে শিবরাত্রি উপলক্ষে বেশ জাঁকজমক সহকারে পূজা উৎসব মেলা হয়ে থাকে।

এখানে উল্লেখ্য, কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় 'সংবাদ বর্ধমান' পত্রিকায় ১২৫৭ সালের ১২ আশ্বিন সংখ্যায় এই ১০৯ টি শিবলিঙ্গের নাম উল্লেখ করেছেন। পাঠকদের জ্ঞাতার্থে তা এখানে লিপিবদ্ধ করছি —

১) স্থানু ২) উগ্র ৩) মহাকাল ৪) বিভু ৫) মহেশ্বর ৬) শিব ৭) শূল ৮) শূলপাণি ৯) রুদ্র দিগম্বর ১০) মহারুদ্র ১১) পরমেশ ১২) বারাণসীপতি ১৩) আদিনাথ ১৪) সদাশিব ১৫) শ্রীবিশ্বপতি ১৬) চন্দ্রচূড় ১৭) বামলিঙ্গ ১৮) কপিল-ঈশ্বর ১৯) সিদ্ধিনাথ ২০) কৃপানাথ ২১) শ্রীতারকেশ্বর ২২) বিষধ্বজ ২৩) নাগেশ্বর ২৪) কেশব ২৫) বিভূতি ২৬) শ্রীকপর্দী ২৭) জটি ২৮) শম্ভু ২৯) শ্রীপ্রমথপতি ৩০) কৃপানাথ ৩১) পাপহারী ৩২) বিঘ্নবিনাশন ৩৩) ভোজনাথ ৩৪) বক্রেশ্বর ৩৫) যোগীজনার্দন ৩৬) হরিহর ৩৭) জগৎগুরু ৩৮) কুবের ঈশ্বর ৩৯) ভূতনাথ ৪০) চক্রেশ্বর ৪১) শ্রীরাবণেশ্বর ৪২) জগন্নাথ ৪৩) জলেশ্বর ৪৪) লক্ষ্মীকান্তশ্বর ৪৫) বিশ্বপতি ৪৬) জ্ঞানেশ্বর

৪৭) শ্রীঘন্টেশ্বর ৪৮) উমাপতি ৪৯) শিবপ্রিয় ৫০) শ্রীবাসুকীপতি ৫১) রমাপতি ৫২) বিশ্বপতি ৫৩) অগতির গতি ৫৪) যদুনাথ ৫৫) ভূতনাথ ৫৬) পুষ্পদন্তেশ্বর ৫৭) লক্ষ্মীকান্ত ৫৮) শিবকান্ত ৫৯) যদুকালেশ্বর ৬০) তিলভাণ্ডারেশ্বর ৬১) যোগীবরণপতি ৬২) নাগভট্ট ৬৩) নাদরূপী ৬৪) নীলকণ্ঠেশ্বর ৬৫) চতুর্ভুজ ৬৬) ত্রিলোচন ৬৭) রাজ রাজেশ্বর ৬৮) মৃত্যুঞ্জয় ৬৯) কাশীনাথ ৭০) শ্রীপঞ্চবদন ৭১) মদন ৭২) অন্তকদণ্ডী ৭৩) ভুজঙ্গ ভূষণ ৭৪) আশুতোষ ৭৫) তিলক বিজয়ী ৭৬) জনার্দ্দন ৭৭) সনাতন ৭৮) সভার্ণবজয়ী ৭৯) বিশ্বকর্তা ৮০) গুরুশ্রী ৮১) পরমগুরু ৮২) চক্রী ৮৩) চন্দ্রনাথ ৮৪) পরাৎপর ৮৫) গুরুধ্বনি ৮৬) পুষ্পদন্তনাথ ৮৭) ত্র্যম্বক (৮৮) ঈশান ৮৯) বদ্রী ৯০) শ্রীরুদ্র মূরতি ৯১) মহাবিষ্ণু ৯২) মহাজিষ্ণু ৯৩) শ্রীভৈরবপতি ৯৪) কালেশ্বর ৯৫) গঙ্গাধর ৯৬) শশাঙ্কশেখর ৯৭) পার্ব্বতীপতি ৯৮) প্রাণবল্লভ ৯৯) কপিরাজ নাথ ১০০) মদন অরি ১০১) শূরঅরি ১০২) রক্ষ যজ্ঞেশ্বর ১০৩) সোমনাথ ১০৪) তীব্রতবা ১০৫) জ্যোতি কূলধন ১০৬) বিশ্বগ্রাসী ১০৭) সর্ব্বগ্রাসী ১০৮) সত্যানন্দনাথ ১০৯) ত্রাটক ঈশ্বর।

তবে নির্দিষ্ট করে বলতে পারি না, কোন্ শিবলিঙ্গটির কি নাম। এ সম্পর্কে সংবাদপত্রে প্রকাশিত যে নামের তালিকা ছিল সেখানেও কোন্ শিবলিঙ্গটির কি নাম তা বিশেষভাবে উল্লিখিত হয় নাই। সুতরাং নামগুলিই কেবল লিপিবদ্ধ করা হলো।

মহারাণী বিষণকুমারীর এক শত আট বা এক শত নয় শিব প্রতিষ্ঠা ব্যাপারে *Bengal District Gazetteers*-এ উল্লেখ আছে —

"About 2 miles from the town, at Nawabhat, is a group of 108 Siva Lingam temples which stand in a rectangle planted with trees and containing some well kept tanks; these temples were built and consecrated in October 1788 by the Maharani Adhiswari Bishnukumari Bibi, wife of Tilak Chandra and mother of Tej Chandra. This series of temples is exactly similar to that of Kalna, of which a full description is given is the article on that town. Near the temples and probably intended to Guard there is the spacious fort of Talitgarh which formed the refuge of the Burdwan family and its retainers during the Maratha invasions of the 18 th century."

তৎকালীন সময়ে লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করে ১০৯ শিব প্রতিষ্ঠাই মহারাণী বিষণকুমারীর জীবনের শেষ কীর্তি। তিনি মোগল-ইংরেজ প্রভৃতি রাজনৈতিক দুর্যোগ,

প্রাকৃতিক দুর্যোগ (১৭৭৪-এর প্লাবন) এবং আভ্যন্তরীণ বাদ-বিসম্বাদ প্রভৃতি নানা প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়ে রাজ্যকে রক্ষা করে এবং দেবকীর্তি স্থাপনা করে ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই সেপ্টেম্বর, বাংলা ১২০৫ সালের ২৬ শে কার্তিক এই ধরাধাম থেকে চিরতরে বিদায় গ্রহণ করেন।



১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে বিষণকুমারী প্রতিষ্ঠিত ১০৮ শিব মন্দির, নবাবহাট, বর্ধমান



রাধা দামোদর জীউ মন্দির (মহন্ত অস্থল)

মহারাজাধিরাজবাহাদুর তেজচাঁদ

(১৭৭০-১৮৩২)

কোন রাজার মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র সিংহাসনের অধিকারী হন। যেখানে বংশধর একমাত্র পুত্র সেখানে ঐ পুত্রই রাজা হিসাবে ঘোষিত হন: তবে তিনি যদি নাবালক হন, তাহলে তাঁর প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তি একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত রাজকার্য পরিচালনা ক'রে থাকেন। তারপর প্রাপ্ত-বয়স্ক হলে রাজপুত্র সিংহাসনে আরোহণ করে তাঁর দায়িত্ব বুঝে নেন।

মহারাজা তিলোকচাঁদ যখন ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে মহাপ্রয়াণ করেন তখন তেজচাঁদ মাত্র ৬ বছরের শিশু। তাঁর অভিভাবিকা মাতা, মহারানী বিষণকুমারী জমিদারী পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তেজচাঁদ ১১৭১ সালের ৬ই মাঘ, ইং ১৭৬৪ খ্রীঃ ৬ জানুয়ারী তারিখে জন্ম গ্রহণ করেন।

মহারাণী বিষণকুমারী জমিদারীর ভার গ্রহণ করার ব্যাপারে ইংরেজ কোম্পানির উচ্চপদস্থ কর্মচারীগণ তেজচাঁদের জমিদারীর দায়িত্ব তাঁকে দিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। কোম্পানির মনোভাব বুঝতে পেরে তীক্ষ্ণধী বিষণকুমারী, তেজচাঁদের মহারাজাধিরাজ পদপ্রাপ্তির জন্য ১০ হাজার মুদ্রা নজরানাসহ সম্রাট দ্বিতীয় সাহ আলম বাদশাহের নিকট এলাহবাদে আবেদন পাঠান। ১৭৭১ খ্রীঃ সম্রাট সাহ আলম, প্রধান সেনাপতি সারাফৎউদ্দৌলা-মীর-সায়েক-আলি খাঁ বাহাদুর-মজঃফর জঙ্গ মারফৎ যে ফরমান পাঠান তাতে "বাদশাহের হুকুম প্রচার হইল যে, মহারাজ তিলোকচন্দের পুত্র তেজচন্দ্রকে পঞ্চহাজারী জাত, ৩ হাজার সওয়ার, মহারাধিরাজ খেতাব, ঝালরদার পাল্কী ও নাকারা প্রদানে অনুগৃহীত করা হইল। ইত্যাদি (সন ১১৮৪ হিজরী, ১২ জুলুস, ১২ই সওয়াল, মঙ্গলবার)"।

অতঃপর ১৭৭৫ খ্রীঃ মহারাজা তেজচাঁদের ১১ বছর বয়ঃক্রমকালে তাঁকে খেলাত প্রদানের জন্য কৌন্সিল হতে যে পত্র দেওয়া হয়েছিল তার মর্ম নীচে উল্লেখ করা হলো—

১১৮৫

রামচন্দ্র।

মহারাজা সাহেব মোসফেক মেহেরবান

মোখলেসান সলামৎ।

কৌন্সিলের সাহেবানের হুকুম হইল যে, ঈশ্বরানুগ্রহে আগামী পরশ্ব ১৪ই মহরম শুক্রবার, কৌন্সিলের

সাহেবানের হুজুর হইতে আপনাকে, রাণীসাহেবাকে এবং রাজকর্ম্মচারীগণকে খেলাত দেওয়া হইবে। এতএব আপনাকে এই শুভ সংবাদ প্রদান করতঃ, বিজ্ঞাপিত করিতেছি যে, আপনি ঐ তারিখে এখানে উপস্থিত হইয়া সকলের আনন্দ বর্দ্ধন করিবেন। ১২ মহরম, সন ১৬ জুলুস।

'রাজবংশানুচরিত' -এর ৯২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে—

"১৭৭৯ খৃঃ মহারাজ তেজচন্দ্র মাতার হস্ত হইতে স্বয়ং রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন বটে, কিন্তু শৈশবকাল হইতেই কুসংসর্গ বশতঃ অত্যন্ত বিলাসপ্রিয় হওয়ায় রাজকার্য্যে ক্ষণমাত্রও মনোযোগী না হইয়া সতত বয়স্যবর্গের সহিত বিবিধ প্রকার আমোদ-প্রমোদে ব্রত থাকিতেন, স্বার্থপর অনুচরবর্গের কুপরামর্শে অর্থের প্রতি দৃক্পাত না করিয়া, অকাতরে অজস্র অর্থ অপব্যয় করিতেন। অর্থলোভী নীচাশয় রাজকর্মচারীগণও অবসর পাইয়া বহুল অর্থ আত্মসাৎ করিত। সুচারুরূপে রাজস্ব আদায় না হওয়ায় কোম্পানির নিকট রাজস্বও বাকী পড়িতে লাগিল। এই বাকী খাজনাই মহারাজার অনর্থপাতের মূল হইল।"

"পুনঃ পুনঃ তাগাদা করিয়াও সম্যক্রূপে রাজস্বের টাকা আদায় হইতেছে না দেখিয়া, ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানি, মুন্সি নবকৃষ্ণকে (পরে ইনি রাজা হইয়াছিলেন) বর্দ্ধমান রাজ্যে ক্রোক সাঁজোয়াল পদে নিযুক্ত করিয়া পাঠান এবং তাঁহাকে রাজস্ব আদায় করিয়া, রাজসংসারের যাবদীয় ব্যয় নির্ব্বাহ করিবার ও কিস্তি কিস্তি খাজনার টাকা কোম্পানির নিকট প্রেরণ করিবার আদেশ দেন। পরন্তু, তিনিও যথাসময়ে খাজনার টাকা পরিশোধ করিতে না পারায় এবং রাজবাটীর সিপাহি প্রভৃতি ভৃত্যবর্গের মাসিক বেতন যথাসময়ে দিতে না পারায় বোর্ড হইতে তিরস্কৃত হইয়া ১৭৮২ খৃঃ কার্য্য পরিত্যাগ করেন। তখন মহারাজা পুনরায় স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করতঃ বাকী খাজনার সমুদয় টাকা পরিশোধ করিতে অপারগ বলিয়া, বোর্ডে একখানি আবেদন পত্র প্রেরণ করেন। বোর্ড তাঁহার আবেদনে কর্ণপাত না করিয়া, বিনা আপত্তিতে সমুদয় টাকা পরিশোধ করিবার আদেশ দেন। (*Bengai Records*)

তখন মহারাজা তেজচাঁদ এখানে এবং সোনামুখীতে যে সব ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কুঠী ছিল তা সমস্তই বন্ধ করে দেন এবং কুঠিয়ালদের বিতাড়িত করেন। কুঠীর অধ্যক্ষ মহারাজের বিরুদ্ধে বোর্ডে অভিযোগ দায়ের করেন। ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ২৫ শে এপ্রিল এক পত্রে কুঠী ছেড়ে দেওয়ার জন্য বোর্ড মহারাজকে নির্দেশ দেন এবং ভবিষ্যতে যাতে আর এরূপ না করেন তার জন্য সতর্ক করে দেন। (*Bengal Records*)

১১৯০ সাল, ইং ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে সমগ্র বর্ধমান জমিদারীর রাজস্ব ৪৩ লক্ষ, ৫৮ হাজার ২৬ টাকা আদায় হয়েছিল। তার মধ্যে ৩৬ লক্ষ ৯৬ হাজার ৮২৫ টাকা কোম্পানিকে দেওয়ার পর ৬ লক্ষ ২২ হাজার ২৭১ টাকা মহারাজা নিজে গ্রহণ করেন। সুতরাং ৩ লক্ষ ৩

হাজার ১৭৫ টাকা বাকী পড়ে। তখন কোম্পানি বাকী টাকা কয়েক কিস্তিতে পরিশোধ করার ব্যবস্থা করে দেন। ঐ কিস্তির টাকা পরিশোধ তো করতে পারলেন না বরং আরও কিস্তির টাকা বাকী পড়তে থাকে। কোম্পানি তখন ঐ খাজনা পরিশোধ করার জন্য বারবার তাগাদা দিতে থাকেন। কোম্পানি বেশ বুঝতে পারেন মহারাজার বিলাসপ্রিয়তা, কাজে শৈথিল্য এবং কুসংসর্গ দোষ ও তাঁহার অসম্ভব অপব্যয়ের জন্যই রাজস্ব বাকী পড়তে থাকে। তখন মহারাজকে যথাযথ উপদেশ প্রদানের জন্য বোর্ড ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে কমিশনার সাহেবকে নির্দেশ দেন। ঐ নির্দেশ অনুসারে কমিশনার সাহেব মহারাজকে কলকাতা যাওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু কমিশনারের অনুরোধ উপেক্ষা করে মহারাজ কলকাতা না গিয়ে সপারিষদ গঙ্গাস্নানে বাঁশবেড়িয়া যান। তাতে কমিশনার ক্ষুব্ধ হয়ে বোর্ডকে সমস্ত অবগত করেন। তদনুযায়ী বোর্ড মহারাজকে এক পত্রে জানান, যদি তিনি কুসংসর্গ ত্যাগ না করেন, রাজকার্যে অমনোযোগী হন তা হলে তাঁর সমস্ত জমিদারী হস্তচ্যুত করা হবে। বোর্ডের পত্র পেয়ে মহারাজ বিশেষ চিন্তিত হয়ে ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ২৭শে নভেম্বর বোর্ডকে জানালেন, "তিনি তীর্থস্নানোপলক্ষে বাঁশবেড়িয়ায় গমন করাতেই, কমিশনার সাহেববাহাদুরের অনুরোধ ও উপদেশ অনুসারে কলিকাতায় গমন করিতে পারেন নাই, তজ্জন্য তিনি অত্যন্ত দুঃখিত ও লজ্জিত হইয়াছেন, অতঃপর তিনি বিশেষ সাবধান হইয়া রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিবেন এবং যাহাতে সমুদয় রাজস্ব ও বাকী খাজনা পরিশোধ হয়, তৎপক্ষে বিশেষ যত্নবান হইবেন।" এই পত্রে বোর্ড সন্তুষ্ট হন এবং মহারাজের কলকাতা যাওয়ার প্রয়োজন হয় নাই।

মহারাজ যদিও খাজনা পরিশোধ করার কথা বলেছিলেন কার্যত তা সম্ভব হয় নাই। তখন বোর্ড ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ১৬ ই মার্চ তারিখে এক পত্রে জানান —"যদি মাঘ কিস্তির সমুদয় টাকা একেবারে পরিশোধ করিতে না পারেন, তাহা হইলে তাঁহার সমস্ত জমিদারী ক্রোক করা হইবে।"

বোর্ডের নির্দেশানুযায়ী বর্ধমানের কালেক্টর সাহেব মহারাজকে গৃহবন্দী রেখে কিছু টাকা আদায় করেছিলেন।

বোর্ড মহারাজকে তাঁর বাজে জমার একটি হিসাব দাখিল করতে বলা সত্ত্বেও তিনি তা করেন নাই। তখন ১৭৮৮ খ্রীঃ ৭ই অক্টোবর তারিখে তাঁর ৫ হাজার টাকা অর্থ দণ্ড হয়। তাতেও উক্ত হিসাব প্রস্তুত না হওয়ায় এবং খাজনা দিতে না পারায় তাঁকে পুনরায় গৃহবন্দী করা হয়।

বারবার এরূপ নিগৃহীত হওয়ার কারণ হিসাবে বলা যেতে পারে, তাঁর রাজকার্যে অমনোযোগিতা, রাজকর্মচারীদের অসহযোগিতা ও অর্থ আত্মসাৎ করা। ফলে খাজনা বাকী

পড়া, কিস্তি খেলাপী হওয়া এবং লাঞ্ছিত হওয়া।

অবশেষে ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা মে তারিখে ভারতের তৎকালীন গভর্ণর জেনারেল, মহারাজের কিছু জমিদারী বিক্রী করে বাকী টাকা আদায় করার নির্দেশ দেন। অতঃপর মহারাজা বোর্ডকে খাজনা কিছু কমাবার জন্য প্রার্থনা জানিয়ে আবেদন করেন। বোর্ড তাঁর প্রার্থনা অনুযায়ী জমা কমানো দূরে থাক, তাঁকে ধার্য জমা ৪০ লক্ষ ১৫ হাজার ১০৯ টাকা এবং পুলবন্দি বাবদে বার্ষিক ১ লক্ষ ৯৩ হাজার ৭২১ টাকায় জমিদারী রাখতে রাজি আছেন কিনা তা জানিয়ে ১৭৮৯ খ্রীঃ মে মাসে একখানি পত্র লেখেন। অগত্যা মহারাজা ধার্যজমা স্বীকার করে ১৭৮৯ খ্রীঃ ৪ঠা জুন তারিখে বোর্ডকে পত্র দেন যদিও পরিশোধের কোন উপায় ছিল না। কালেক্টর সাহেব বারবার তাগাদা দিয়েও টাকা আদায় করতে না পারায় বোর্ডকে জানান। বোর্ড তদুত্তরে ১৭৯০ খ্রীঃ ১০ ই মে তারিখে মহারাজার কিছু জমিদারী বিক্রী করে প্রাপ্য টাকা আদায় করার আদেশ দিলে আজমতশাহী ও মুজাফরসাহী পরগণা বিক্রী করার জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। (*Bengal Records*)

রাজবংশনুচরিতের ৯৬-৯৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে ঃ

"১৭৯০ খৃঃ সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত বর্ধমান রাজ্যের যাবদীয় দেওয়ানি ও ফৌজদারী মোকদ্দমা রাজসরকারে দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত হইতেই নিষ্পত্তি হইত। যদি কোন অপরাধী ভীত হইয়া বর্দ্ধমান রাজ্যাধিকার হইতে স্থানান্তরে পলায়ন করিত, তাহা হইলে তাহাকে ধৃত করিয়া রাজধানীতে প্রেরণ করিবার জন্য মহারাজা মহামাণ্য গভর্ণর সাহেবের নিকট আবেদন করিতেন। একদা বর্দ্ধমান রাজ্যাধিকারস্থ বালিয়া ও চন্দ্রকোণার ইজারদার রাজসরকারের প্রাপ্য ৬০ হাজার টাকা খাজনা আত্মসাৎ করিয়া শ্রীরামপুরে পলায়ন করে, উক্ত ব্যক্তিকে ধৃত করিয়া রাজধানীতে প্রেরণ করিবার জন্য ১৭৯০ খৃঃ ফেব্রুয়ারী মাসে মহারাজা বর্দ্ধমানের কালেক্টর সাহেব দ্বারা মহামান্য গবর্ণর সাহেব বাহাদুরের নিকট আবেদন করেন। উক্ত আবেদন পত্রখানি বোর্ডের মহাফেজখানায় বিদ্যমান আছে। কিন্তু ক্রমে মহারাজার বিলাস প্রিয়তা ও কার্য্যশিথিলতায় তিনি উক্ত অধিকার হইতে বিচ্যুত হয়েন। ১৭৯০ খৃঃ অক্টোবর মাসে বোর্ডের আদেশানুসারে তাঁহার কারাগারস্থ যাবদীয় বন্দীগণকে বর্দ্ধমানের কালেক্টর সাহেবের হস্তে সমর্পণ করিবার আদেশ হয়। এই সময়েই তাঁহার হস্ত হইতে দেওয়ানী ও ফৌজদারী ক্ষমতা প্রকৃতপক্ষে অন্তর্হিত হইয়া, কেবলমাত্র রাজ্যের শান্তি রক্ষার ভার অবশিষ্ট রহিল। (*Bengal Records*) বর্দ্ধমানাধিপতি পুলিশ বিভাগ সম্বন্ধে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সিলেক্ট কমিটির পঞ্চম রিপোর্টের ১৭ পৃষ্ঠায় যে মন্তব্য লিখিত আছে, তাহার কিয়দংশের বঙ্গানুবাদ লিখিত হইল ঃ এই জমিদারীর প্রায় ৭৩ মাইল দীর্ঘ ও ৪৫

মাইল প্রস্থ, পরিমাণ ফল প্রায় ৩২৮০ বর্গমাইল। অধিকাংশ ভূমিই প্রচুর শস্য-শালিনী এবং অধিবাসীর সংখ্যাও অত্যন্ত অধিক। তাঁহার (মহারাজার) পুলিশ বিভাগ সম্বন্ধে বৰ্দ্ধমানের ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের ১৭৮৮ খৃঃ ১২ অক্টোবর তারিখের পত্রে প্রকাশ যে, থানাদারগণই পুলিশবিভাগের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ও রাজ্যের প্রধান শান্তি রক্ষক। তাঁহাদের অধীনে ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে, গ্রামবাসীগণের শান্তি রক্ষার নিমিত্ত এবং তাঁহাদিগকে গ্রাম সমূহের সংবাদাদি প্রদান করিবার জন্য ২৪০০ পাইক (সশস্ত্র পদাতিক) নিযুক্ত আছে। ইহারা কেবলমাত্র পুলিশের কার্যই করিয়া থাকে। তদ্ভিন্ন গ্রাম সমূহের প্রহরীর কার্য্যের জন্য স্বতন্ত্র্য জমিদারী পাইক নিযুক্ত আছে। উক্ত পাইকের সংখ্যাও অন্যূন ১৯ সহস্র হইবে। ইহারাও সৰ্ব্বদাই আবশ্যকমত পুলিশের কার্য্যের সহায়তা করিয়া থাকে।"

এখানে উল্লেখ্য, মহারাজ তেজচন্দ্র কোন ইংরাজ কর্মচারীর সঙ্গে মিশতেন না পরন্তু তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ পর্যন্ত করতেন না। এমন কি বর্ধমানের কালেক্টর সাহেবের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করতেন না। হয় তো ইংরেজ কর্মচারীদের সঙ্গে মহারাজ সৌজন্যমূলক আচরণ করলে তাঁর বিশেষ সুবিধা হত।

যে কারণে ১৭৮৮ খ্রীঃ ২৬ নভেম্বর বাকী খাজনার জন্য আরও কয়েকটি জমিদারী নিলাম হয়। তাঁর খাসদখলী জমির হিসাব না দেওয়ায় মাসিক বৃত্তিও বন্ধ করে দেওয়া হয়। মহারাজা তখন বোর্ডকে প্রার্থনা জানান, বাকী খাজনার টাকা ঐ বৃত্তি থেকে কেটে নেওয়া হোক। (*Bengal Report*)

মহারাণী বিষণকুমারী পুত্রের নিকট হতে যে মাসিক বৃত্তি পেতেন তাও যথাসময়ে পেতেন না। এইজন্য মাতা পুত্রে সময় সময় মনোমালিন্য ঘটতো। মহারাণী পুত্রের নিকট হতে কোন প্রকারেই বৃত্তির টাকা আদায় করতে না পারায়, শেষে তদানিন্তন গভর্ণর জেনারেল লর্ড কর্ণওয়ালিশ-এর নিকট আবেদন করলে, গভর্ণর জেনারেল বর্ধমানের কালেক্টর সাহেবকে ১৭৯১ খ্রীঃ ২৭শে জুন তারিখে এক পত্রে মহারাজের মাসিক বৃত্তি থেকে তা আদায় করে দেওয়ার আদেশ দেন। (*Bengal Records*)

লর্ড কর্ণওয়ালিশ ১৭৯১ খ্রীঃ ২৪ শে জুন তারিখে মহারাজকে কৌন্সিলে উপস্থিত হইবার নির্দেশ দেন। কিন্তু মহারাজা সেই নির্দেশানুসারে কলকাতায় উপস্থিত থেকেও কৌন্সিলে হাজির হন নাই। তাতে গভর্ণর জেনারেল অসন্তুষ্ট হয়ে মহারাজকে কলকাতা পরিত্যাগ করার নির্দেশ দেন এবং সমস্ত প্রাপ্য টাকা আদায় দেওয়ার আদেশ দিলেন। তখন বোর্ডের অ্যাক্টিং প্রেসিডেন্ট মিঃ ডবলিউ কাউপার মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁকে যথাযথ ব্যাপার বুঝিয়ে এবং তিনি যাতে সদাচরণ ও সকলের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করেন সে সম্বন্ধে উপদেশ দেন

এবং তিনি মহারাজের সপক্ষে তাঁর (মহারাজের) ধৃষ্টতাজনিত দোষের জন্য ক্ষমা-প্রার্থনা করে ২৭শে জুন তারিখে গভর্ণর সাহেবকে একখানি আবেদন পত্র প্রেরণ করেন। প্রার্থনা অনুসারে গভর্ণর সাহেব তাঁকে কৌন্সিলে উপস্থিত হয়ে বর্ধমান যাওয়ার অনুমতি দেন। মহারাজা কৌন্সিলে উপস্থিত হলে তাঁকে যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করেন এবং ৩০ শে জুন তারিখে গভর্ণর সাহেব নিম্নলিখিত খেলাত প্রদান করেন —

"জামা	—	১
নিমা আস্তি	—	১
বদি	—	১
গোসওয়ারী	—	১
পাগড়ি	—	১
কোমড় বন্ধ	—	১
শিরপেঁচ	—	১
৪ শত টাকা মূল্যের মতির মালা	—	১ ছড়া
৩ শত টাকা মূল্যের শিরপেঁচ	—	১

এখানে উল্লেখ্য, মহারাজের জমিদারীর যে অংশ বিক্রয় হয়েছিল সেই বিক্রীত জমিদারীতেই হুগলী, ২৪ পরগণার জমিদারী সৃষ্টি হয়।

"বীরবর কীর্ত্তিচন্দের বাহুবলে বিজিত বিদ্রোহী শোভা সিংরে জমিদারী বরদা ও চিতুয়া মহারাজ তেজচান্দ্ বাহাদুরের অনবধানতা ও অপরিণামদর্শিতার ফলে ১৭৮৯ খৃঃ বাকী খাজনার জন্য প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় হইয়াছিল। পূর্ব্বপুরুষার্জ্জিত মহৎ গৌরবের বিজয়স্তম্ভ স্বরূপ চিতুয়া হস্তচ্যুত হওয়াতেও তাঁহার চৈতন্যোদয় হয় নাই। ১৭৯৩ খৃঃ পর্য্যন্ত বাকী খাজনার জন্য একে একে এতগুলি জমিদারী বিক্রীত হইল, তথাপিও ভ্রূক্ষেপ নাই।"

"কি কুক্ষণেই ১৭৮৪ খৃঃ ৩,০৩,১৭৫ টাকা বাকী পড়িয়াছিল। উহা পরিশোধ হওয়া দূরে থাকুক, উত্তরোত্তর কিস্তি কিস্তি আরও রাজস্ব বাকী পড়িয়া, অবশেষে এতগুলি জমিদারী বিক্রয় হইয়াও আর উহা পরিশোধ হইল না। একদিকে যেমন রাজস্ব বাকী পড়িতে লাগিল, অপরদিকে তেমনি আবার খরচও বৃদ্ধি পাইতে থাকিল। কেবল রাজস্ব আদায় করিবার জন্যই পাটওয়ার চৌকীদার নগদী পাইক প্রভৃতির বেতন বার্ষিক প্রায় ৭ লক্ষ টাকা দিতে হইত। অথচ যথা সময়ে ইজারদারদিগের নিকট হইতে প্রাপ্য টাকা আদায় হইত না। মহারাণী বিষণকুমারী অন্তঃপুর বাসিনী আলা রমণী হইলেও তিনি রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা কালে, ঐ সমস্ত রাজস্ব যথাসময়ে আদায় করতঃ কোম্পানির প্রাপ্য সমস্ত টাকা পরিশোধ

করিতেন, কখনও এক কপর্দকও বাকী পড়িত না। মহারাণী অনেক বুঝাইয়াও পুত্রকে রাজকার্য্যে মনোনিবেশ করাইতে পারেন নাই। বরং তাহাতে বিপরীত ফলই হইয়াছিল। ক্রমে মাতা ও পুত্রে বিলক্ষণ মনোমালিন্য উপস্থিত হইল। মহারাজা প্রায়ই মাতার মাসিক বৃত্তি বন্ধ করিয়া দিতেন এবং তিনিও প্রতিবারেই গভর্ণর জেনারেল বাহাদুরে সমীপে আবেদন করিযা কালেক্টর সাহেবের দ্বারা মহারাজার তনখার টাকা হইতে আপনার প্রাপ্য টাকা আদায় করিয়া লইতেন।

বর্দ্ধমান প্রদেশ চিরদিনই প্রচুর শস্য শালী। মনোযোগী হইয়া রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিলে রাজস্ব কখনই বাকী পড়িবার সম্ভাবনা নাই। ১৭৮৯ খৃঃ ১৮ই সেপ্টেম্বর, স্যার জনসোর বাহাদুর সিলেক্ট কমিটির পঞ্চম রিপোর্টে লিখিয়াছেন যে ঃ যদিও বিহার প্রদেশাপেক্ষা বর্দ্ধমানপ্রদেশের পরিমাপ ফল অনেক কম বটে, কিন্তু রাজস্ব প্রায় বিহারের ৩/৪ আদায় হয়। বিহার অপেক্ষা বর্দ্ধমানের জমিদারের ক্ষমতা এবং স্বাধীনতা অনেক পরিমাণে বেশী। যদিও বর্দ্ধমান রাজ্যের বার্ষিক রাজস্ব, অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা অনেক অধিক বটে, কিন্তু প্রচুর শস্যশালী বর্দ্ধমান প্রদেশের পরিমাণ ফল প্রায় ৫ সহস্র বর্গমাইল ও তাহাতে প্রায় ৯৫ লক্ষ বিঘা জমি আছে। তন্মধ্যে কেবলমাত্র ২৮।। লক্ষ বিঘা ভূমির রাজস্ব আদায় হইয়া থাকে। যদি প্রতি বিঘা ২ টাকা হিসাবে খাজনা আদায় করা যায়, তাহা হইলে উক্ত ২৮।। লক্ষ বিঘা ভূমিতে ৫৭ লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায় হইতে পারে। তদ্ভিন্ন মালিকের দখলেও প্রায় ৫ লক্ষ ৬৮ হাজার ৭ শত ৩৬ বিঘা জমি আছে। তাহারও বিঘা প্রতি ২ টাকা হিসাবে খাজনা ধার্য্য হইলে, অন্যূন ১১ লক্ষ ৩৭ হাজার ৪ শত ৭২ টাকা উৎপন্ন হইতে পারে।

ইহাতেই দেখা যাইতেছে যে, বর্দ্ধমানে রাজ্যের রাজস্ব অপরাপর প্রদেশ অপেক্ষা অনেক পরিমাণে অধিক হইলেও, বর্দ্ধমানের পক্ষে অধিক নহে।''

আরও জানা যায় বর্ধমান প্রদেশে ধানই প্রধান শস্য এবং অধিকাংশ অধিবাসীই কৃষিজীবি। প্রদেশে যেরূপ প্রচুর পরিমাণে ধান্য উৎপন্ন হয়, মধ্যবঙ্গের অন্য প্রদেশে তদ্রূপ দৃষ্ট হয় না। কলিকাতার সন্নিকটস্থ কাশীপুর হার্টিক্লোরিও এগ্রিকলচুরেল ইনস্টিটিউশনের প্রোপ্রাইটর কলিকাতা নিবাসী শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের অসীম যত্নে ও বহুল অর্থ ব্যয়ে, বিখ্যাত সাতপুকুর উদ্যানে যে পুষ্প প্রদর্শনী মেলা হইয়াছিল, তাহাতে আমি ১৮৯৩/৯৪/৯৫/৯৬ খৃঃ বর্দ্ধমানাধিপতির রাজ্যাধিকার হইতে ৩৫৯ প্রকার, আশু, নেহলি ও হৈমন্তিক প্রভৃতি নানা জাতীয় ধান্য সংগ্রহ করতঃ প্রদর্শন করায়, দুখানি রৌপ্যপদক ও বহু নগদ অর্থ পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। বর্ধমান রাজ্যের সুযোগ্য ম্যানেজার শ্রীযুক্ত রাজা বনবিহারী কপুর সাহেব মহোদয়ের যত্নেই উক্ত ধান্যগুলিই সংগ্রহ করিতে সক্ষম

হইয়াছিলাম।"

বাকী খাজনা পরিশোধের জন্য মহারাজকে প্রলোভনসূচক পত্র লেখা হতো। ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে বোর্ড থেকে মহারাজকে একখানি পত্রে বলেন ঃ 'যদি তিনি সমুদয় বাকী খাজনার টাকা ইতিমধ্যেই পরিশোধ করিতে পারেন, তাহা হইলে, তাঁহার মাসহারা টাকাব পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হইবে।' কিন্তু তাতে কোন কাজ হলো না, খাজনা বাকী পড়তে থাকে।

প্রচুর ধন সম্পদ ও অর্থকড়ি থাকলেও তিনি পারিবারিক জীবনে সুখী ছিলেন না। তিনি প্রথমাবধি বিলাসী ও উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির ছিলেন। তাঁর ৮ জন মহিষী থাকা সত্বেও একজন বিদেশীনী রক্ষিতা ছিলেন। তাঁর মা বিষণকুমারী পর্যন্ত বলতেন পুত্র রাজবাড়ীকে হারেমে পরিণত করেছেন। তাঁর প্রথমা পত্নী মহারাণী জয়কুমারী, লাহোরের দিলারাম মেহেরার কন্যা। দ্বিতীয়া রাণী প্রেমকুমারী. পঞ্জাবের ওড়রমল মেহেরার কন্যা। ১১৭৮ সালের ৬ই আষাঢ়, ইং ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দে ১৮ই জুন তারিখে প্রেমকুমারীর জন্ম। মহারাজ তেজচাঁদের সঙ্গে তাঁর ৯ বছর বয়সে ১১৮৭ সালের ফাল্গুন মাসে, ইং ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে মার্চ মাসে বিবাহ হয়। ১২২৬ সালের ২রা অগ্রহায়ণ, ইং ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে ২৬শে নভেম্বর প্রায় ৪৮ বছর বয়সে পরলোক গমন করেন।

তৃতীয়া পত্নী রাণী সেতাবকুমারী, বর্ধমান পাকমারা পাড়ার গোপাল বাবুর মাসীমা। চতুর্থা রাণী তেজকুমারী পাটনা নিবাসী লালাবাহাদুর সিংহের ভগিনী। পঞ্চমা পত্নী রাণী কমলকুমারী লাহোর নিবাসী পরাণচাঁদ কাপুরের ভগ্নী পিতা কাশীনাথ কাপুর। তিনি জগন্নাথ দর্শনে সপরিবারে পুরী যাওয়ার পথে বর্ধমানে অবস্থান করেন। মহারাজ তেজচাঁদ কমল কুমারীর রূপে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে বিবাহ করেন। তখন হতে কাশীনাথ কাপুর সপরিবারে বর্ধমানেই বসবাস করতে থাকেন। কমলকুমারীর ১১৯১ সালের ৯ই আষাঢ় ইং ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে জুন তারিখে লাহোরে জন্ম। ৬৩ বছর বয়সে ১২৫৪ সালের ২৮শে মাঘ, ইং ১৮৪৮ খ্রীঃ ৯ই ফেব্রুয়ারী তারিখে কমলকুমারীর মৃত্যু হয়। ৬ষ্ঠ তমা পত্নী নানকী কুমারী। তিনি ফতেচাঁদ টন্ননের পুত্র পঞ্জাব রায় টন্ননের কন্যা। তাঁদের পূর্বপুরুষ পিতাম্বর টন্নন পঞ্জাব প্রদেশের দোয়াব অঞ্চল থেকে এসে বর্ধমানে বসবাস করেন। মহারাজ তেজচাঁদের ৮ জন পত্নীর মধ্যে এই ৬ষ্ঠ পত্নীই সন্তানবতী হয়েছিলেন। তাঁরই গর্ভজাত সন্তান প্রতাপ চাঁদ। ইনি ১১৯৮ সালের ১০ই কার্তিক, ইং ১৭৯১ খ্রীঃ ২৪শে অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন। তখন বর্ধমান নগরে আনন্দের জোয়ার বয়ে যায়। গভর্ণমেন্টর রীতি অনুযায়ী শিষ্টাচার প্রদর্শনার্থে ১৭৯১ খ্রীঃ নভেম্বর মাসে বর্ধমানের কালেক্টর সাহেব বাহাদুর সকৌন্সিল গভর্ণরকে এই

সংবাদ প্রদান করেন।

৭ম মহিষী উজ্জ্বলকুমারী। তিনি কটক জেলার অন্তর্গত জাজপুর নিবাসী ঘনশ্যাম মেহেতার কন্যা। এঁদের পূর্বপুরুষ ভোলানাথ মেহেতো লাহোর থেকে বর্ধমানে এসে বসবাস করেন। উজ্জ্বলকুমারী ১২১৫ সালের ১৯শে বৈশাখ, ইং ১৮০৮ খ্রীঃ ৩০শে এপ্রিল জন্মগ্রহণ করেন। ১২২৮ সালের ৩১শে বৈশাখ, ইং ১৮২১ খ্রীঃ ১২ই মে ১৩ বছর বয়সে তেজচাঁদের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। তখন তেজচাঁদের বয়স ৫৭ বছর।

এখানে উল্লেখ্য 'সেকালের কথা' সংবাদপত্রে ১ম খণ্ড পৃষ্ঠা ১৯৮ তে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, উজ্জ্বলকুমারীর গর্ভে ৩টি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। তারা অতি শৈশবে মারা যায়। ৪র্থ সন্তান মৃতবৎস প্রসব কালে তিনি ১২৩৩ সালের ১৩ মাঘ, ইং ১৮৭৭ খ্রীঃ ২৫ শে জানুয়ারী ১৮ বছর বয়সে মারা যান।

৮ম পত্নী বসন্ত কুমারী। বসন্ত কুমারী পরাণ চাঁদ কাপুরের কন্যা। কৌশলী ও কূটনীতি পরায়ণ পরাণ চাঁদ, তাঁর ভগ্নী কমলকুমারীর (তেজচাঁদের ৫ম পত্নীর) পরামর্শ অনুসারে ১১ বছরের কন্যা বসন্ত কুমারীর বিবাহ দেন, ভগ্নীপতি ৬২ বছর বয়স্ক মহারাজ তেজচাঁদের সঙ্গে। অর্থাৎ পরাণচাঁদ কাপুর একদিকে মহারাজের শ্যালক এবং অন্য দিকে নিজের শ্বশুর।

১৭৯২ খ্রীঃ আগষ্ট মাসে বর্ধমানে ভয়াভহ জলপ্লাবনে প্রজাদের অভূতপূর্ব ক্ষতি হয়। আবার ঐ বছরই যথাযথ রাজস্ব আদায় না হওয়ায় মহারাজা এই বিষয়ে বোর্ডকে সব বৃত্তান্ত জ্ঞাত করেন এবং খাজনা মকুবের আবেদন জানান। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ বোর্ড তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর করেন নাই পরন্তু বোর্ড ১৭৯৩ খ্রী বেলিয়া পরগণা ও অন্যান্য কয়েকখানি মহল বিক্রী করে প্রাপ্য অনাদায়ী টাকা আদায় করেন।

রাজবংশানুচরিত থেকে জানতে পারা যায়, "১৭৯৩ খৃঃ দশশালা বন্দোবস্তের সময় মহারাজা তেজচন্দ্র বাহাদুর ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানিকে পূর্ব্ব নির্দ্ধারিতবার্ষিক ৪০,১৫,১০৯ টাকা রাজস্ব ও পুলবন্দী অর্থাৎ বাঁধ মেরামত বাবদে ১ লক্ষ ৯৩ হাজার ৭ শত ২১ টাকা অঙ্গীকার করত ঃ বর্দ্ধমান রাজ্য বন্দোব্যস্ত করিয়া লয়েন।"

"মহারাণী বিষণকুমারী রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণকালে প্রভূত রাজস্ব দিয়াও সমস্ত জমিদারী অক্ষুণ্ণভাবে রক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু মহারাজ তেজচাঁদ স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করিবার পর দশ বৎসরের মধ্যে ক্রমে ক্রমে বাকী খাজনায় ৪,৪২,৯১৭ টাকা রাজস্বের জমিদারী কেবলমাত্র তদীয় অনবধানতা ও অপরিনামদর্শিতার ফলে তাঁহার হস্তচ্যুত হইয়াছিল। তথাপি এতাধিক রাজস্ব বঙ্গদেশের অন্য কোন রাজারই ছিল না। কথিত আছে,

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রভূত ক্ষমতাশালী দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে বঙ্গের যাবতীয় ভূপতিবর্গ আমন্ত্রিত হইয়া, তদীয় ভবনে গমন করেন। হিন্দুকূল চূড়ামণি নবদ্বীপাধিপতি অগ্নিহে' ত্রী বাজপেয়ী মহারাজ রাজেন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাহাদুর স্বয়ং গমন না করিয়া, তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র কুমার শিবচন্দ্রকে তথায় প্রেরণ করিয়াছিলেন। বৰ্দ্ধমানাধিপতি নিমন্ত্রন রক্ষার্থ স্বয়ং গমন না করায় দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ রোষ পরবশ হইয়াই মহারাজার এতাধিক রাজস্ব বৃদ্ধি করিয়া দেন। তৎকালে তাঁহারই পরামর্শে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বঙ্গের যাবদীয় রাজন্যবর্গের সহিত রাজস্বের বন্দোবস্ত করিতেন।

১৭৯৩ খৃঃ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি মহাবাজার হস্ত হইতে শান্তি রক্ষার তার উঠাইয়া লইয়া নূতন পুলিশের সৃষ্টি করতঃ স্থানে স্থানে দারোগা নিযুক্ত করিয়া, তাঁহাদের প্রতি শান্তি রক্ষার ভার অর্পণ করেন। এই সময়েই মহারাজা প্রকৃতরূপে যাবদীয় ক্ষমতা হইতে বিচ্যুত হইলেন।"

দশশালা বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হলেও রাজার কিছু সুরাহা হয় নাই। রাজবংশানুচরিতে দৃষ্ট হয়, "দশশালা বন্দোবস্ত হইল বটে, কিন্তু তৎকাল পৰ্য্যন্ত রাজ্যের কোন প্রকার সুব্যবস্থা করিতে না পারায়, উক্ত বন্দোবস্ত, মহারাজার পক্ষে বিন্দু মাত্র ফলপোধায়ক হইল না। খাজনার টাকা যেরূপ পূর্ব্বাবধি বাকী পড়িতেছিল, সেইরূপই পড়িতে লাগিল। তাঁহার প্রাক সমস্ত জমিদারীই ৫ হইতে ১০ বৎসর পৰ্য্যন্ত মেয়াদে বহুতর লোককে ইজারা বিলি করা হইয়াছিল। ঐ সকল ইজারাদারগণ, যথাসময়ে খাজনা না দেওয়াতে, রাজস্ব সম্যক্‌রূপে আদায় হইত না, সুতরাং প্রতি কিস্তিতেই খাজনা বাকী পড়িত। মহারাজা প্রাপ্য টাকা আদায় করিবার জন্য ইজারাদারগণকে কারারুদ্ধ করিলে, তাহারা কৰ্ম্মচারীগণকে হস্তগত করতঃ তাহাদের সাহায্যে কিস্তিবন্দী করিয়া নিষ্কৃতি লাভ করিত, কিন্তু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি মহারাজাকে কোন কিস্তি হইতে অব্যাহতি দিতেন না। দশশালা বন্দোবস্তের পরেও, অনেক টাকা বাকী পড়িয়া যাওয়ায়, বোর্ড হইতে মহারাজার কতকগুলি মহল বিক্রয় করিয়া একেবারে সমুদয় টাকা আদায় করিবার আদেশ হইল। তখন মহারাজা নিরুপায় হইয়া সমগ্র রাজ্য স্বীয় মাতা মহারাণী বিষণকুমারীর নামে বিক্রয় কোবালা লিখিয়া দিলেন। ১৭৯৪ খৃঃ ১০ই জানুয়ারী তারিখে বর্দ্ধমানের কালেক্টর সাহেব বাহাদুর, এই সংবাদ বোর্ডের গোচর করিলে, বোর্ড হইতে আদেশ হইল যে, যদি মহারাণী বৰ্দ্ধমান রাজ্যের সুব্যবস্থা করতঃ রাজকাৰ্য্য সুশৃঙ্খলে চালাইতে পারেন, তাহা হইলে, অনুপযুক্ত ভূম্যাধিকারী বিষয়ক আইন হইতে তাঁহাকে অব্যাহতি দেওয়া হইবে এবং মহারাজার নিকট প্রাপ্য বাকী খাজনাও তাঁহার নিকট হইতে আদায় করা হইবে। ১৭৯৪ খৃঃ ১৪ই মাৰ্চ্চ তারিখে মহারাণী, বোর্ড হইতে বাকী

খাজনার একটি বন্দোবস্ত করিয়া লইলেন। উক্ত খৃষ্টাব্দের ১৮ই মার্চ্চ তারিখে মহারাণী, কতকগুলি জমিদারী মিঃ বাটের নিকট বন্ধক রাখিয়া, বাকী খাজনার টাকা পরিশোধ করিবার অভিপ্রায়ে তদানীন্তন গবর্ণর জেনারেল সার জনশোর বাহাদুরের নিকট আবেদন করেন। তিনি তদীয় আবেদনে অনুমোদন করতঃ আদেশ করিলেন যে, যদ্যপি তাঁহার নিকট খাজনা বাকী পড়ে, তাহা হইলে তা পূর্ব্বমত তাঁহারও জমিদারী বিক্রয় করিয়া বাকী খাজনার টাকা আদায় হইবে। কিন্তু জমিদারী বন্ধক রাখিয়া আর টাকা লইতে হইল না: মহারাণী নিজ হইতে কিয়দংশ বাকী খাজানার টাকা পরিশোধ করিলেন। (*Bengal Records*)

মহারাণীর প্রতি দেহুরী মহলে উৎপন্ন সম্বন্ধীয় কাগজাদি, শীঘ্র বর্দ্ধমানের কালেক্টর সাহেবের নিকট প্রেরণ করিবার জন্য বোর্ড হইতে আদেশ হইয়াছিল। পরন্তু পুনঃ পুনঃ তাগাদা সত্ত্বেও উক্ত কাগজ দাখিল না করায়, গবর্ণর সাহেব বাহাদুর দেহুরী মহল ক্রোক করতঃ মহারাণীর নিকট হইতে কাগজ আদায় করিবার আদেশ দিলেন। ১৭৯৪ খৃঃ ২৩শে মে তারিখে বর্দ্ধমানের কালেক্টর সাহেব, স্বয়ং অম্বিকায় গমন করিয়া মহারাণীকে সবিশেষ অবগত করিলেও কোন ফল হইল না দেখিয়া, তিনি বোর্ডে আবেদন করিলেন যে, মহারাণীর নিকট হইতে দেহুরী মহলের কাগজাদি সহজে পাইবার প্রত্যাশা নাই, অতএব বাকী খাজনার জন্য উক্ত দেহুরী মহল বিক্রয় করতঃ প্রাপ্য টাকা আদায় করিবার আদেশ প্রদান করা হউক। প্রথমে দেহুরী মহল বিক্রয় করিবারই প্রস্তাব হয়। কিন্তু গবর্ণর সাহেব বাহাদুর দেহুরী মহল বিক্রয় না করিয়া অন্যান্য নিষ্কর ভূমি (যাহা দেবত্তর ব্রহ্মত্তর নহে) বিক্রয় করিবার অনুমতি করেন।

এই সময়ে মহারাজার বিলাস প্রিয়তা ও যথেচ্ছাচারিতা অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তিনি অপব্যয়ের প্রতি আদৌ দৃক্‌পাত করিতেন না। রাজধনাগারে খাজনার টাকা আমদানি হইলেই, স্বেচ্ছামত লইয়া অপব্যয় করিতেন। কর্ম্মচারীগণ তাঁহাকে কিছুই বলিতে সাহস করিতেন না। ক্রমে অত্যাচার এতদূর বৃদ্ধি হইল যে, মহারাণী অগত্যা এই সকল অত্যাচারের বিষয় গবর্ণর জেনারেল বাহাদুরের নিকট বিজ্ঞাপন করিয়া প্রতিকারের জন্য প্রার্থনা করিলেন। তাঁহার প্রার্থনানুসারে, গবর্ণর জেনারেল বাহাদুর ১৭৯৪ খৃঃ ৩০শে জুন (মুদ্রাপ্রমাদ-৩১শে জুন) তারিখে, মহারাজাকে রাজধানী পরিত্যাগ করতঃ অন্য কোন জেলায় যাইয়া অবস্থিতি করিবার আদেশ দেন। তদনুসারে তিনি কিয়ৎকাল হুগলী জেলায় গিয়া অবস্থান করেন। এই বৎসর বাকী খাজনার জন্য বেলিয়া পরগণার অপরাংশ বিক্রয় হইয়া গিয়াছিল।"

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এই সময় কেবলমাত্র বর্ধমানই নয় বাকী খাজনার দায়ে বাংলার প্রায় সমস্ত জমিদারদের জমিদারী নিলাম হয়ে যায় এবং ঐ সব জমিদারী

কিনে বহু ছোট ছোট জমিদারের উৎপত্তি হয়েছিল।

এই বছরেই আবার জল প্লাবন হওয়ায় প্রজারা মারাত্মকভাবে বিপর্যস্ত হওয়ায় খাজনা বাকী পড়েযায়। এই বাকী খাজনা উসুল করার জন্য বোর্ডের আদেশে দেহুড়ি মহল এবং মুর্শিদাবাদের সমস্ত জমিদারী নিলাম হয়ে যায়। রাজা তেজচাঁদ নিজ আবাস বাড়ি দেহুড়ি মহল ক্রেতার নিকট হতে নিজ নামে কিনে নেন। এবং গভর্ণর জেনারেলের নিকট অনুমতি নিয়ে বর্ধমানে বাস করতে থাকেন। কিন্তু তাঁর অত্যাচার কোন রকম অবদমিত না হয়ে আরও বৃদ্ধি পায়। এমন কি তাঁর রাজকর্মচারীগণ এবং পারিষদবর্গ রাজকাজে বিঘ্ন সৃষ্টি করেন ও রাজস্ব আদায়েও প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ান। তখন মহারাণী বিষণকুমারী পুনরায় গভর্ণর জেনারেলের নিকট প্রতিকারের জন্য আবেদন জানান। মহারাজ তেজচাঁদ তাঁর নিজ খরিদা দেহুড়ি মহলে মাতা বিষণকুমারী যাতে অবস্থান করতে না পারেন তজ্জন্য বর্ধমান কালেক্টর সাহেবের নিকট আবেদন করেন। মহারাণী এই বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে বর্ধমান ছেড়ে অম্বিকা কালনায় গিয়ে অবস্থান করেন।

মাতা পুত্রের এরূপ মনোমালিন্য, বছরে বছরে ভয়ঙ্কর জল-প্লাবন অর্থলোভী অকৃতজ্ঞ রাজকর্মচারীদের অসহযোগিতা সর্বোপরি মহারাজের বিলাসপ্রিয়তা ও অদূরদর্শিতায় বর্ধমান রাজ্যের শোচনীয় পরিণতির উদ্ভব হয়। এইসব অপ্রীতিকর ঘটনার পরিস্থিতিতে মহারাণী বিতৃষ্ণ হয়ে রাজকার্যে অমনযোগী হয়ে পড়েন। ফলে ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমান রাজ্যের বড় বড় জমিদারী নিলামে বিক্রী হয়ে যায়। তেলিনীপাড়ার বন্দ্যোপাধ্যায়রা, জনাই-এর মুখোপাধ্যায়রা, সিঙ্গুরের দ্বারকানাথ সিংহ, ভাস্তারার ছকু সিংহ প্রভৃতি ধনশালী ব্যক্তিগণ ঐ সব জমিদারী কিনে নেন। সেই সময় মহারাজও স্বনামে ও বেনামে কিছু জমিদারী ক্রয় করেন।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইন প্রবর্তনের ফলে বর্ধমানের জমিদারীর অবস্থা ক্রমশঃ অবনতির দিকে চলে যায়। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজ তেজচাঁদ কোম্পানির নির্দেশ অগ্রাহ্য করে পত্তনি প্রথার প্রবর্তন করেন। ফলে তাঁর অর্থাগমের পথ প্রশস্ত হয় এবং এই পত্তনি প্রথার প্রচলনের জন্য তাঁর আয় প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। এর ফলে তিনি তৎকালীন বঙ্গ দেশে সর্বশ্রেষ্ঠ ধনী হিসাবে পরিগণিত হন। পত্তনি প্রথা হলো বড় জমিদারের অধীনস্থ ছোট ছোট জমিদার, যাঁরা ঐ বড় জমিদারকে খাজনাদি আদায় দিতে বাধ্য থাকবে। সেই অনুসারে বর্ধমানের সকল পত্তনিদার বর্ধমান মহারাজের অধীন ছিল। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে মার্চ তারিখে লর্ড কর্নওয়ালিশের সময় 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' আইন প্রবর্তন হয় (*Economic Hist. of India--- R.C.Dutta*)। বর্ধমান রাজ কৌশলে জমিদারীর আয় বৃদ্ধির জন্য

দেবতাদিগের নিমিত্ত নিত্য আপরাহ্নিক ভোগ প্রস্তুত করিবার জন্য যে পাকশালা নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন, শ্রীশ্রী জগন্নাথ দেবের শ্রীমন্দিরে সমীপে কেবলমাত্র সেই চুল্লীই প্রজ্জ্বলিত হইয়া থাকে। এই ক্ষুদ্র চুল্লীটি বর্দ্ধমান রাজবংশের একটি মহান গৌরবের স্থল। (জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের পর বর্তমান পরিস্থিতি কিরূপ বলা যায় না) এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য, বাঁকানদীর পরপাড় থেকে রাধাবল্লভ বাড়ী দেবদর্শনে আসা ও জনসাধারণের যাতায়াতের জন্য বর্তমান আলমগঞ্জ সেতু নামে পরিচিত সেতুটি প্রকৃতপক্ষে রাধাগঞ্জের সেতু। এই রাধাগঞ্জের সেতুটি মহারাজ তেজচাঁদ ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে বাঁকা নদীর উপর নির্মাণ করান। সেতুগাত্রে যে শিলালিপি গ্রথিত আছে আজও তা বিদ্যমান। ঐ শিলালিপিতে উৎকীর্ণ আছে —

"সন ১২২৭ সাল, ইংরেজী সন ১৮২১ সাল।
শ্রী রাধাবল্লভাবির্ভবনসুখভরৈর্ভাস্বরে বর্দ্ধমানে
শ্রী রাধাগঞ্জঘটে, ভূজযুগমুণিভূসম্মিতেহস্মিন্ শকাব্দে।
নদ্যাং বঙ্কাভিধায়াং পথিক জনসুখং সংক্রমং গোত্রতুল্যং
ধীরশ্রী তেজচন্দ্রো বরমকৃত মহারাজরাজাধিরাজঃ।।"

গোলাপবাগের পশ্চিমাঞ্চলে তৎকালে বহু জনগণের পানীয় জলের সুবিধার্থে তাঁর পঞ্চম মহিষী কমলকুমারীর নামে মহারাজ তেজচাঁদ বাহাদুর একটি সায়র খনন করান।

মহারাজ তেজচাঁদ ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে অম্বিকা কালনায় যে রাজবাড়ী নির্মাণ করান তার সিংহদ্বার শিলালিপিতে উৎকীর্ণ শ্লোকটি হলো - -

"মুক্তাহেমপ্রবালৈ রজত দরবরৈঃ স্ফোটিকৈ রত্নসংঘৈঃ
পূগৈঃ সিন্দুর চন্দ্রৈরগুরু ঘটপট্টৈশ্চামরাদৈঃ প্রপূর্ণা।
শাকে শুভ্রাংশুবহ্নিক্ষিতিধরকুমিতে তেজচন্দ্রস্য বাজ্ঞঃ
পুর্ভূতা সাম্বিকাখ্যা সুরনগরসরিত্তীরপূর্য্যাং চকাস্তি।।"
শকাব্দা ১৭৩১।

"১৮৩২ খৃঃ চন্দ্রকোণার ঁরঘুনাথ জীউ ও ঁলালজীউর সদরখণ্ডে, মহারাজ তেজচাঁদ যে সকল গৃহাদি নির্মাণ করিয়েছিলেন তার শিলালিপিস্থ শ্লোক —

"শাকেগ্নীপ্রশ্বভূমে রঘুযদুপবটে শাসনস্নান যাত্রা
বৃন্দাতৌর্য্যত্রিকশ্রীকপিধন সুঘটী বাদ্যরাসালয়াদীন্।
কূপৌ দ্বৌ বারিগেহান্যুপলময়নবীয়ানি বৃত্যাপ্যকার্ষীৎ
সীতাকুণ্ডস্য ঘট্টং নরপতি সুকৃতী শ্রীযুতস্তেজচন্দ্রঃ।"

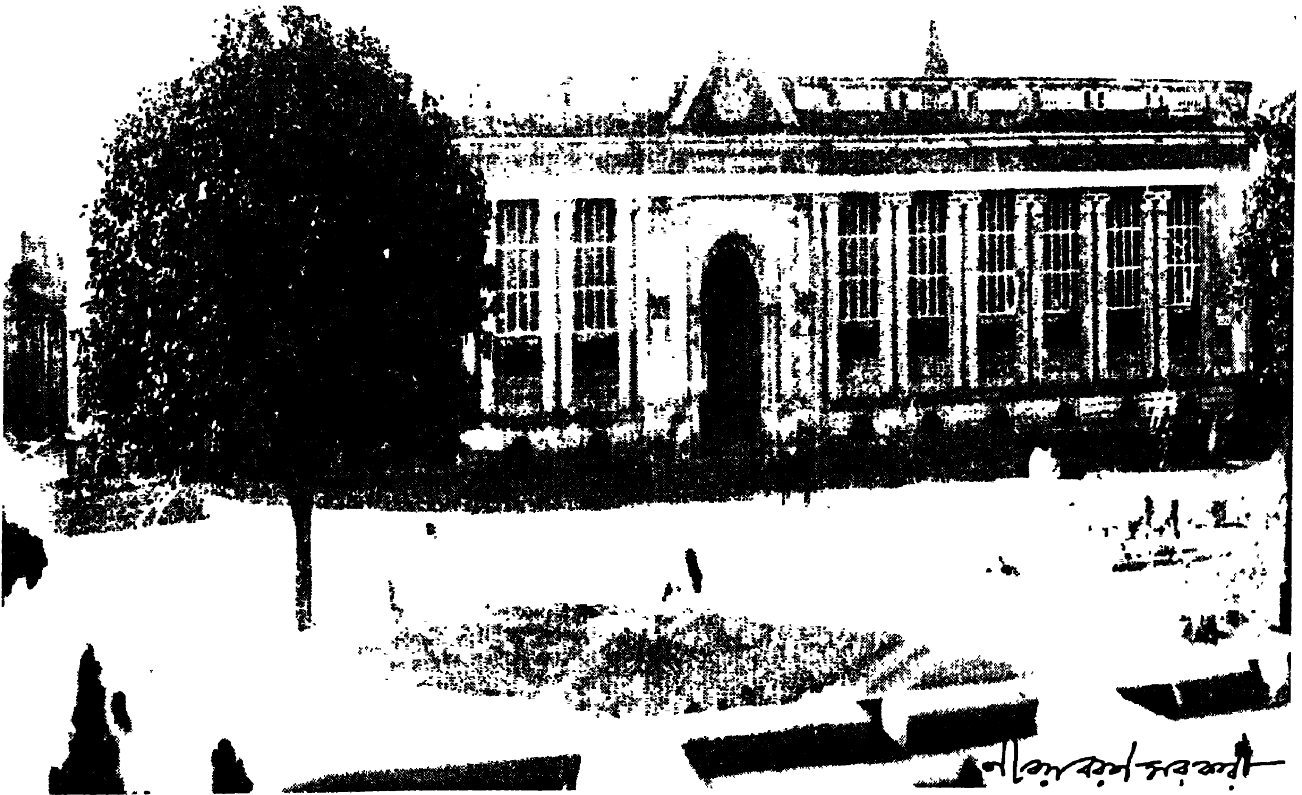
মল্লেশ্বরপুরের ঁবাটীর সদর খণ্ডের শিলালিপিস্থ শ্লোক —



মহারাজাধিরাজ তেজচাঁদ বাহাদুর



দেওয়ান পরাণচাঁদ কপূর



শতবর্ষ পূর্বের বর্ধমান রাজকলেজিয়েট স্কুল

"শাকেত্রীস্বদ্রিচন্দ্রে ধনপচনগৃহং সিদ্ধিখাতস্য খাতং
শ্রীমন্মল্লেশবাসং প্রহরিগণ গৃহং নাট্য যন্ত্রালয়ঞ্চ ঃ—
ধর্ম্মজ্ঞো ধর্ম্মগেহং নবসদৃশকৃতং সূচ্চসৌধস্তকার্ষীৎ
শ্রীমন্মেল্লেশতুষ্ট্যে নৃপবর সুকৃতী শ্রীযুতস্তেজচন্দ্র।।"

কথিত আছে এই মল্লেশ্বর শিব চন্দ্রকোণার চন্দ্রকেতু নামক রাজার প্রতিষ্ঠিত। কোন সময়ে মল্লভূমের (বিষ্ণুপুরের রাজা চন্দ্রকেতুকে যুদ্ধে পরাজিত করে মল্লেশ্বরপুর অধিকার করে দেশের মধ্যে ঘোষণা করে দিলেন ঃ আজ হতে এই দেবতা 'মল্লেশ্বর' নামে অভিহিত হলেন। অতঃপর যে ব্যক্তি এঁকে 'মল্লেশ্বর' না বলে পূর্বনাম 'চন্দ্রেশ্বর' বলবে তার শিরচ্ছেদ করা হবে। তখন থেকেই 'চন্দ্রেশ্বর' শিব, মল্লেশ্বর শিব নামেই অভিহিত।

শহর বর্ধমানে তাঁর দেব দেউল প্রতিষ্ঠাও কম নয়। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে সর্বমঙ্গলা বাড়ীর প্রাঙ্গণে আদি নাট মঞ্চের ঠিক দক্ষিণে পরপর তিনটি শিবমন্দির আছে। প্রথম ও তৃতীয় মন্দিরের শিবলিঙ্গ শ্বেতপাথরের নির্মিত আর মাঝখানের শিবলিঙ্গ কালোপাথরের। এই শিবলিঙ্গটিকে বলা হয় 'মিত্রেশ্বর'। এই মন্দিরটির নির্মাণ শৈলী অনেকটা বিষ্ণুমন্দির ধাঁচের। দুপাশের মন্দির দুটির একই রকম নির্মাণ শৈলী। রাজবংশানুচরিতের ১১৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে এই শ্বেত শিবদ্বয় মহারাজা তেজচাঁদ প্রতিষ্ঠা করেন, একটি 'রামেশ্বর' ও অপরটি 'কমলেশ্বর'। মন্দির গাত্রে শিলালিপিতে উৎকীর্ণ আছে —

"শাকে সৌম্যশিবাব্ধি সপ্তিকুমিত শ্রী মঙ্গলাসন্নিধৌ
সস্ত্রিক সুরসেবকো নরপতিঃ শ্রী তেজচন্দ্রাভিধঃ।
শ্রীরামেশ্বর শঙ্গরায় বিধিবৎ শ্রীকৃষ্ণতুষ্ট্যাপ্তয়ে
সৌমং চিত্রমলঙ্কৃতং বিরচিতং প্রসাদমেতং দদৌ।।"

এবং কমলেশ্বর শিবমন্দির-এ আছে —

"শ্রুত্যগ্নিসপ্তীন্দুমিতে শকাব্দে, শ্রীতেজচন্দ্রো নৃপতিঃ সদারঃ
প্রাদ্যদৃহং শ্রীকমলেশ্বরায়ে শানায় সৌধং সুবিচিত্রমেতৎ।।"

শ্রীশ্রী লক্ষ্মনারায়ণ জীউ মন্দির — ঁলক্ষ্মীনারায়ণ জীউ'র মন্দির রাজবাড়ীর মধ্যেই অবস্থিত। প্রকৃতপক্ষে ঁলক্ষ্মীনারায়ণ দেববিগ্রহ মহারাজ তেজচাঁদ প্রতিষ্ঠা করেন নাই। দেবমন্দিরের ভিত্তিস্থাপন করেন তাঁর পূর্ববর্তী রাজা ত্রিলোকচাঁদ। কিন্তু মন্দির নির্মাণের কাজ শেষ হওয়ার পূর্বেই তিনি পরলোক গমন করেন। পরবর্তী কাজ পুনঃ শুরু করেন তাঁর পুত্র মহারাজ তেজচাঁদ। কিন্তু মন্দির নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার আগে তিনিও ইহলোক হতে বিদায় গ্রহণ করেন। তবে শেষ করতে না পারলেও সিংহভাগ কাজ তিনি করেছিলেন।

বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি কাজের বিস্তারিত বিবরণ পরবর্তি রাজা মহ্‌তাবচাঁদের সময় আলোচিত হবে।

দুর্লভা কালী — বর্ধমানের উত্তর পশ্চিমে লাকুর্ডির পাশেই উত্তর মশান। পূর্বে এখানে দেবী আসীনা ছিলেন। বর্তমানে পৌর এলাকার পশ্চিম সীমান্তের শেষে, কাঁটরাপোতা, বিরিটিকরি গ্রামের পূর্বে দেবী দুর্লভা প্রতিষ্ঠিতা। প্রায় ২০০ বছর আগে গোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী নামে এক সিদ্ধপুরুষ পঞ্চমুণ্ডীর আসনে ধ্যনস্থ অবস্থায় আদিষ্ট হয়ে পার্শ্ববর্তী 'ডোবা' থেকে তুলে এনে দেবীকে প্রতিষ্ঠা করেন। একদিন মহারাজ তেজচাঁদ ১০৮ শিবমন্দির থেকে ফিরে আসার সময় গোকুলানন্দ ব্রহ্মচারীর আশ্রমে নামেন। তিনি ব্রহ্মচারী মহাশয়ের অলৌকিক কাজে মুগ্ধ হয়ে মায়ের জন্য সুন্দর মন্দির নির্মাণ করিয়ে দেন এবং দেবীর পূজা-আর্চা ভোগ আরতি ইত্যাদির জন্য ১০০ বিঘা জমি দান করেন।

শ্রীশ্রী রাধাবল্লভ জীউ — মহারাণী কমলকুমারীর ইচ্ছায় মহারাজ তেজচাঁদ নূতনগঞ্জ এলাকায় ১৭৪২ শকাব্দে শ্রীশ্রীরাধাবল্লভ জীউ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন।

এই মন্দির নির্মাণ শৈলী অপূর্ব। প্রথমেই সদর, সদরের উপর নহবৎখানা। এরই উপরের অংশ হচ্ছে জগমোহন। ঢুকেই সামনে কোকিল ঘর। আগে এই ঘরে অনেক কোকিল থাকত। সদরে ঢুকে পাশে আর একটি প্রবেশ পথ। বিশাল মন্দির চত্বরের চারদিকে চকমেলান দালান। বাঁ দিকের ঘরগুলিতে পূজারী ও অন্যান্য মন্দিরের কাজে নিযুক্ত লোকেদের বাসস্থান। ডানদিকের ঘরগুলি দ্বিতল। দ্বিতল ঘরের জানালাগুলি কাঠের তৈরী বিশেষ ধরণের জাল দিয়ে ঢাকা। মন্দিরের নাটমঞ্চে তখনকার দিনে সুন্দর সুন্দর অনুষ্ঠান হতো। রাজ অন্তঃপুরের পুরনারীদের অনুষ্ঠান দেখার জন্য ঐরূপ ব্যবস্থা ছিল। বাঁ দিকের ভিতরে ভোগ ঘর এবং তৎসংলগ্ন প্রতিষ্ঠিত পাকা ইঁদারা। মন্দির চত্বরের দক্ষিণে নাটমঞ্চ এবং শ্বেতপাথর বসানো চাতাল। নাটমন্দির সংলগ্ন মূলমন্দির বা গর্ভগৃহ। গর্ভগৃহের সামনে সুন্দর জলের ফোয়ারা। গর্ভগৃহের মধ্যে বিগ্রহগুলি সুন্দর সাজে সজ্জিত। কালো কষ্টি পাথরের বংশীবাদন কৃষ্ণমূর্তি পাশেই শ্বেতপাথরের শুভ্র রাধিকামূর্তি চাঁদির সিংহাসনে আসীন। অষ্টধাতুর নির্মিত ষোড়শ গোপিনী সুন্দর সাজে সজ্জিত হয়ে পরিবেষ্টন করে আছে। অষ্টধাতু নির্মিত প্যারীমোহন যুগল মূর্তি পাশে শোভা পাচ্ছেন। এই মূর্তিও শ্রীকৃষ্ণের অপর মূর্তি। এছাড়াও আছেন শ্বেত পাথরের বলরাম, রেবতী মূর্তি। অষ্টধাতুর তৈরী অষ্টসখী বিরাজমানা। আরও আছেন তিনটি শালগ্রাম শিলা তিনটি ছোট ছোট রূপার সিংহাসনে মাথায় ছত্র শোভিত এবং এক 'গরুড়' মূর্তি। গড়ুর মূর্তি ছাড়াও আছেন আরও নানা মূর্তি।

শ্রীশ্রী রাধা বল্লভ জীউ মন্দিরের প্রবেশ পথের উপরে শ্বেতপাথরে খোদিত আছে ঃ

"পঞ্চ বেদাম্ভৌধচন্দ্র-বিমিতে শাক-হায়নে।
কমলাদি-কুমারিতি শ্রুতয়া ভার্য্যায়াহন্বিতঃ।।
শ্রীমদ্‌ভগতঃ প্রীত্যৈ তেজচন্দ্র মহীপতি।
আস্তাপয়ৎ শক্তি সখং রাধাবল্লভ বিগ্রহম্‌।।"

আরও দু ছত্র বাংলা ভাষায় লেখা আছে, "১৭৪২ শকাব্দে মহিষী কমলকুমারীর সহিত মহীপতি তেজচন্দ্র শ্রীমদ্‌ভগবত প্রীত্যর্থে সশক্তি রাধা বল্লভ মূর্তি স্থাপন করিয়াছেন।" এখানে বলা প্রয়োজন, এই রাধা বল্লভ জীউ মন্দিরের গায়েই অপর মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত আছেন অন্নপূর্ণা ও রাজরাজেশ্বর শিব। এই মন্দির সংলগ্ন আছে অতিথি শালা, মেওয়াখানা, রাসমঞ্চ, গোলাবাড়ী প্রভৃতি পৃথকভাবে উল্লেখ করা হলো।

অন্নপূর্ণা ও রাজরাজেশ্বর — রাধাবল্লভ জীউ মন্দির সংলগ্ন এই অন্নপূর্ণা ও রাজরাজেশ্বর শিবমন্দির। এই মন্দিরটিও রাধাবল্লভ মন্দির ধাঁচের তৈরী। অন্নপূর্ণা মন্দিরের প্রবেশ পথের উপরে পাথরে উৎকীর্ণ আছে, " ১৭৪১ শকাব্দে মহিষী কমলকুমারীর সহিত নৃপতি কুলমান্য বর্ধমানাধিরাজ দানবীর শিবভক্ত ভূপতি তেজচন্দ্র, মহাদেব প্রীত্যর্থে সশক্তি রাজরাজেশ্বর নামক শিব·স্থাপন করিয়া ১৭৪২ শকাব্দে সর্ব্বশুভ বিধাত্রী অন্নদাত্রী অন্নপূর্ণা স্থাপন করিয়াছেন।" উক্ত লিপি থেকে বোঝা যায়, মহারাজ, ১৭৪১ শকাব্দে মন্দির নির্মাণ করে রাজরাজেশ্বর শিব প্রতিষ্ঠা এবং পর বছর ১৭৪২ শকাব্দে অন্নপূর্ণা বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন।

এই মন্দিরের প্রথমেই সদর। সদরের উপর নহবৎখানা এবং তার উপরের অংশ জগমোহন। মন্দিরে প্রবেশ করে বিরাট চত্বর। চত্বরের চারধারে চক-মেলান দ্বিতল প্রাসাদ। চত্বরের পরই সুন্দর নাট মন্দির। তারপরই দক্ষিণ মুখী গর্ভগৃহ এবং তৎ সংলগ্ন শ্বেত-পাথরের টালি বসানো সুন্দর বারান্দা।

মূলমন্দিরের তিনটি প্রকোষ্ঠ। মধ্যের প্রকোষ্ঠে শ্বেত পাথরের, রাজরাজেশ্বর, শিবলিঙ্গ। লিঙ্গোপরে রূপার অর্ধচন্দ্রশোভিত। রাজরাজেশ্বর শিবের ডান দিকের প্রকোষ্ঠে আছেন একখানি শ্বেতপাথরে খোদিত, এক চালে শ্রী শ্রী দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, গণেশ, কার্তিক, পদতলে সিংহ, অসুর প্রভৃতি মূর্তি, বামদিকের প্রকোষ্ঠে বিরাজিতা আছেন স্বয়ং সর্বশুভ বিধাত্রী অন্নদাত্রী অন্নপূর্ণা দেবী। একখানি শ্বেত পাথরে খোদাই করা এই দেবী মূর্তির দক্ষিণে মহাদেব এবং বামে ভৈরব।

নাটমন্দিরে একটি ফোয়ারা দৃষ্ট হয়। ফোয়ারাটি আসলে শ্বেত-পাথরে বেশ কারুকার্য করা অপরূপ মূর্তি মহাদেবের জটা থেকে ভগীরথের গঙ্গা আনয়নের দৃষ্টান্ত। স্তম্ভের মধ্যে আছেন দক্ষিণে সিদ্ধিদাতা গণেশ, মাঝে ভাগীরথ এবং সম্মুখে শিবের মূর্তি।

মন্দিরে প্রবেশ পথের বাম দিকে, রাজরাজেশ্বর শিবের ঠিক বিপরীত দিকে একটি ছোট উত্তরমুখী মন্দির আছে। এই মন্দির মধ্যে আছেন করজোড়ে পদ্মাসনে উপবিষ্টা ধ্যানমগ্না যোগমায়া মূর্তি। দক্ষিণমুখী রাজরাজেশ্বর ও বিপরীত দিকে এক সরলরেখায় অবস্থিতা আছেন যোগমায়া মূর্তি। এই সব দেবদেবীর নিত্যসেবার ব্যবস্থা আছে।

কমলাকান্ত কালী — মহারাজ তেজচাঁদ বৈষ্ণব ধর্মের অনুরাগী ছিলেন। কিন্তু তিনি জীবনের শেষের দিকে 'শাক্ত' ধর্মের প্রতি আসক্ত হন। এবং সাধক কমলাকান্তকে গুরুপদে অধিষ্ঠিত করেন। তার পূর্বে কমলাকান্ত পিতৃ বিয়োগের পর অম্বিকান কালনা থেকে মার সঙ্গে মাতুলালয় চান্নাগ্রামে চলে আসেন। এখানকার টোলে তাঁর শিক্ষা শুরু হয় এবং ব্যাকরণ শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করে অধ্যয়ন শেষ করেন। তারপর গ্রামেই তিনি একটি টোল খুলে অধ্যাপনা করতেন। তাঁর পাণ্ডিত্য ও অধ্যাপনার খ্যাতি, দশকর্মাদি কর্মকাণ্ড সেই সঙ্গে পূজা-অর্চনার খ্যাতিও চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তিনি এখানেই বিশালাক্ষীদেবীর পূজা সাধনা আরাধনা নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন। বিশালাক্ষীদেবীর সাধন পীঠেই তিনি সিদ্ধিলাভ করেন। কমলাকান্তের যশ-খ্যাতির কথা শুনে মহারাজ তেজচাঁদের দেওয়ান রঘুনাথ রায়ের পরামর্শে তিনি কমলাকান্তকে চান্না থেকে নিয়ে এসে ১২১৬ সালে, ইং ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁকে সভাপণ্ডিত করেন। মহারাজ কোটালহাটে ১২ (বারো) কাঠা জমি দিলেন এবং সেখানে তাঁর বাসস্থান, মায়ের মন্দির নির্মাণ করিয়ে দেন। সাধক সেই মন্দিরে কালী প্রতিমা স্থাপন করে সেখানেই বসবাস করতে থাকেন। মহারাজা পূজার জন্য বার্ষিক বরাদ্দ করেন।

ছোট দেহুড়ির শ্যামসুন্দর ও রাধাবল্লভ জীউ — এই শ্রীশ্রী শ্যামসুন্দর ও রাধাবল্লভ জীউ বিগ্রহ দুটি অম্বিকা কালনায় প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু ঐ বিগ্রহ-মন্দির গঙ্গার ভাঙ্গনের মুখে পড়ায় মহারাজ মূর্তিগুলি বর্ধমানে নিয়ে আসেন। মহারাজের সুপারী বাগানে অস্থায়ী আটচালায় স্থাপন করে বিগ্রহের পূজা অর্চনার ব্যবস্থা করেন। পরে মহারাজাদের গোয়ালবাড়ী (বর্তমান 'বিজয়চতুষ্পাঠীর' পশ্চিম গায়ে) সংস্কার করে সুন্দর মন্দিরনির্মাণ ক'রে সেখানে এই শ্যামসুন্দর ও রাধাবল্লভ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। উভয় বিগ্রহই নিমকাঠে নির্মিত কৃষ্ণ রাধার যুগল মূর্তি। এ ছাড়া এই মন্দিরে আছেন নিমকাঠের তৈরী গোপাল জীউ আরও একটি নৃত্যগোপাল জীউ। এখানে ৭টি শালগ্রাম শিলা আছেন। শ্বেতপাথরের একটি শিবও আছেন। নিত্য পূজার ব্যবস্থা আছে।

তেজগঞ্জের কালী — এই কালীমাতা মহারাজ তেজচাঁদ প্রতিষ্ঠা করেন। রাজবংশানুচরিতে উল্লেখ আছে ঃ— " বর্দ্ধমানে শ্রীশ্রী রাধাবল্লভ জীউ, অন্নপূর্ণা দেবী, ছোট দেহুড়ির শ্যামসুন্দর জীউ, তেজগঞ্জের কালী ঠাকুরাণী প্রভৃতি বহু দেব-দেবী মহারাজ তেজচাঁদ প্রতিষ্ঠা করিয়া

গিয়াছেন। ঐ সকল দেবতাদিগের পূজা ও ভোগাদির যে সুন্দর ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন তাহা আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। . . . . ভোগের প্রসাদ হইতে দেবালয়ের পূজক ব্রাহ্মণ ও ভৃত্যবর্গের ভোজনোপযোগী প্রসাদ বিতরিত হইয়াও যাহা অবশিষ্ট থাকে তদ্বারা বহুতর আগন্তুক ব্রাহ্মণ, সাধুসন্ন্যাসী ও দরিদ্রগণ প্রতিপালিত হয়।"

এই কালী মূর্তি এবং ভৈরবমূর্তি একটি পাথরে তৈরী। মূল মন্দিরের সম্মুখে অর্থাৎ দক্ষিণে নাটমঞ্চ ; নাটমন্দিরের দক্ষিণে একটি চারচালা ছোট মন্দিরের মধ্যে একটি পাথরে খোদিত একটি বৃষভ বাহন কালভৈরব মূর্তি আছেন।

বুধকালী ও নাগেশ্বর শিব — কৃষ্ণসায়রের উত্তর পশ্চিম কোণে, বর্তমান তারাবাগ আবাসনের প্রবেশ পথের ডানদিকে দুটি মন্দির আছে, একটি শিব মন্দির ও অপরটি শক্তি মন্দির। "শিব মন্দিরে কষ্ঠিপাথরে নির্মিত 'নাগেশ্বর শিব' ও শক্তি মন্দিরে কষ্ঠিপাথরেরই নির্মিত বুধকালী। মহারাজ তেজচাঁদ ১৭৩০ শকাব্দে এই দেবদেবী প্রতিষ্ঠা করেন। একটি শ্বেতপাথরে খোদিত আছে- ওঁ বুধ কালী। বর্ধমানরাজ প্রতিষ্ঠিাত শকাব্দ ১৭৩০, সাধক কমলাকান্তের শিষ্য মহারাজ তেজচাঁদ বাহাদুর।"

ভূ কালী — বর্তমানে 'কৃষ্ণসায়র পরিবেশ কাননের' প্রবেশপথের দক্ষিণ দিকে একটি দালান মন্দিরের মধ্যে কষ্টিপাথরে নির্মিত কালীমূর্তি আছেন। শোনা যায় দেবী, তেজচাঁদ বাহাদুরকে স্বপ্নে নির্দেশ দেন, " আমি এখানে ভূমিগর্ভে আছি। আমাকে উদ্ধার ক' রে এখানেই মন্দির নির্মাণ করে প্রতিষ্ঠা কর।" স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে মহারাজ সস্ত্রীক কৃষ্ণসায়রের পূর্ব পাড়ে দেবী নির্দেশিত স্থানে মাটি খুঁড়ে দেবীকে উদ্ধার করে মন্দির নির্মাণ করেন ১৭৩০ শকাব্দে। সেইজন্য দেবীকে ভূকালী আখ্যা দেওয়া হয়েছে। সম্ভবত একই সময়কালে 'বুধকালী'ও প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দিরে কষ্টি পাথরে নির্মিত মহাকাল ভৈরব, শীতলামূর্তি, মা ষষ্ঠী সিংহবাহিনী, মঙ্গলচণ্ডী, পঞ্চানন, সূর্যমূর্তি এবং নারায়ণ শিলাও আছেন। তিনি উভয় কালী ও অন্যান্য দেবদেবীর নিত্য পূজার ব্যবস্থা করে দেন। ভূকালী ও বুধকালী উভয় দেবীরই একজন পূজারী নির্দিষ্ট আছেন। মহারাজ ভূকালী সংলগ্ন ৮ কাঠা জমিতে পূজারী ব্রাহ্মণের স্থায়ী বাসস্থানের জন্য পাকা বাড়ী নির্মাণ করিয়ে দেন।

জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের ফলে, মহারাজ সেবাইতকে দেবীমন্দির, আবাসগৃহ সহ জমি দান করে দেন।

নবকৈলাশ মন্দির — *Kalna was formerly afavoured seat of the Burdwan house and most of the places of interest in the town are*

closely connected with that family (Burdwan District Gazetteers-P.196-J.C.K.P.) ব্যবসা-বাণিজ্য ব্যাপারে বর্ধমান রাজ কালনায় বসবাস করলেও দর্শনীয় স্থানগুলি রাজপরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সুসংবদ্ধ। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাজা এখানে নির্মাণ করিয়েছেন স্থাপত্য শিল্পকলার নানা নিদর্শন স্বরূপ দেউল-মন্দির, প্রতিষ্ঠা করেছেন বহু দেবদেবী এবং এই উপলক্ষে মেলা-পার্বণ উৎসবাদি প্রবর্তন। এখানকার দেবদেউল ও মন্দিরগুলির নির্মাণশৈলী ও শিল্পকর্ম ভারত তথা পৃথিবীর উন্নত শ্রেণীর মন্দির স্থাপত্যের সমকক্ষ বলা যেতে পারে। মহারাজ তেজচাঁদ প্রতিষ্ঠিত নবকৈলাশ মন্দিরও বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

অম্বিকা কালনার রাজবাড়ীর দক্ষিণ ফটকের ঠিক সম্মুখভাগে ১৭৩১ শকাব্দে, ইং ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিং এর তত্ত্বাবধানে ১০৯ এর অধিক অর্থাৎ ১১০ চূড়ার নবকৈলাশ মন্দিরটি নির্মাণ করান। মন্দিরগুলির স্থাপন বৈচিত্র অদ্ভুত। তিনটি বৃত্তাকার ক্ষেত্র, প্রথম বৃত্তাকার ক্ষেত্রে ৬৬টি মন্দিরে আছেন ৬৬টি শিবলিঙ্গ, তার মধ্যে ৩৩টি শ্বেতপাথর এবং অপর ৩৩টি কালো পাথরে নির্মিত। আর একটি বৃত্তে স্থাপিত ৪২টি মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত আছেন ৪২টি শ্বেতপাথরের শিবলিঙ্গ মূর্তি। মধ্যস্থলের বৃত্তটি একটি বিশাল ইন্দারা। এই ১০৮ টি মন্দিরে ১০৮টি চূড়া। আর দুটি মন্দির ফাঁকা। মনে হয় এই দুটি হচ্ছে মন্দিরাকৃতি প্রবেশপথ ও প্রস্থানপথ হিসাবে ব্যবহৃত হতো, যেহেতু এ দুটি মন্দিরাকৃতি, সেইজন্য ইহাদের শীর্ষেও চূড়া আছে। মন্দিরগুলির স্থাপন সজ্জা অদ্ভুত। মন্দিরে যেকোন জায়গায় দাঁড়ালে এক সঙ্গে ৫টি শিবলিঙ্গকে সম্পূর্ণ দেখা যায় অপরগুলি থাকে দৃষ্টির বাইরে। প্রতিটি মন্দির গাত্র সংলগ্ন। নবকৈলাশ মন্দিরের শিলালিপিতে উৎকীর্ণ আছে ঃ—

শাকে চন্দ্রশিবোক্ষিসপ্তিকুমিতে শ্রী তেজচন্দ্রভিধো
রাজা সূর্য্যইব স্থিরাপির্তচলচ্চণ্ড প্রতাপনলঃ
শাস্তার্ধাম পরং নবাধিকশত শ্রী মন্দিরৈর্ম্মণ্ডলং
প্রকার্ষীন্ম হৃদম্বিকাখ্যানগরে কৈলাসমেতং নবং।

শকাব্দ- ১৭৩১

District Gazetteer- J.C.K.P Page 197) তে উল্লখ আছে ঃ—

The Maharaja still keeps up a palace here and near it are series cf 109 Sivalingam similar to those at nawabhat in Burdwan. The temples at Kalna were constructed consecrated by Maharaja Tejchandra Bahadur in 1809. The outer circle consisting of 66 temples containing black and white

lingams alternately, while the inner circle has 42 temples containing white lingams only. The temples touch one another except where spaces are left for entrance into the centre. Each temple is a circular closed cell with the lingam in the centre. The worship of an hundred and eight. Phallic emblems of siva is mentioned in the Tantras as productive of great religious merit, it is said to have special efficacy in adverting certain dangers such as social degradation loss of caste, extinction of one race, and fatal disease."

সদাব্রত স্থাপন মহারাজ তেজচাঁদের একটি অতুলনীয় কীর্তি। কালনায় তিনি দুটি সত্র স্থাপন করেন। এগুলিও একপ্রকার অন্নসত্র। প্রতিদিন এই সদাব্রত প্রতিষ্ঠান থেকে অতিথিদের প্রয়োজন মত চাল, ডাল, ঘী, নূন ও সেই অনুপাতে তরিতরকারি আনাজপাতি দেওয়া হতো। এ ছাড়াও পথিকদের জন্য স্থানে স্থানে জলসত্রের সুন্দর ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। যাতে গ্রীষ্মে তাপিত পথিকদের কষ্ট না হয়। আর একটি উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থা ছিল গবাদি পশুর জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য, গুড় ও খোল দেওয়া হতো।

বিদ্যোৎসাহিতা ও গুণগ্রাহীতা ঃ—

মহারাজ তেজচাঁদ শুধু দেব প্রতিষ্ঠাই যে করেছিলেন তা নয়, নানাবিধ জনকল্যাণ মূলক কর্মও বহু করেছিলেন। তিনি প্রকৃত শিক্ষানুরাগীও ছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন ইংরেজী শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন আছে। বর্ধমানে ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য মিশনারীগণ তাঁর কাছ থেকে প্রচুর অর্থ এবং বিভিন্ন প্রকার সাহায্য পেয়েছেন। কলিকাতার হিন্দু কলেজ তাঁর কাছ হতে এক কালীন বহু অর্থ সাহায্য পেয়েছেন। এবং তিনি ঐ কলেজের পরিচালক মণ্ডলীর আজীবন সদস্য ছিলেন। বর্ধমান রাজকলেজ তাঁরই প্রতিষ্ঠা। তৎকালে কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন চার্লস-ডু-বোর্ড্যু। (১৮১৭ সালে রাজা প্রতাপ চাঁদের পিতা মহারাজ তেজচাঁদ বাহাদুর বর্ধমানে যে কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন আমি তাহার অধ্যক্ষ ছিলাম এবং তাঁর রাজত্বকাল পর্যন্ত রাজা প্রতাপচন্দ্রের শিক্ষক ছিলাম)। (বর্ধমান ইতিহাস ও সংস্কৃতি—যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী, পৃঃ ৩২৫)

মহারাজ তেজচাঁদ যেমন বিদ্যোৎসাহী ছিলেন, তাঁর অর্থানুকুল্যে যেমন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন হয়েছিল এবং পরিচালিত হয়েছিল তেমনি তাঁর পোষকতায় বহু কবি, পদকর্তা, জ্ঞানী, গুণীও ছিলেন। তাঁরা সকলেই শুধু যে বৃত্তিভোগী ছিলেন তা নয় তাঁদের সংসার প্রতিপালনের জন্য জমি জায়গা তিনি দিয়েছিলেন। অনেক শিল্পীও তাঁর পোষকতা লাভ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে সেই সময়ের বিখ্যাত চিত্রশিল্পীও রামধন স্বর্ণকার উল্লেখযোগ্য।

তাঁর অঙ্কিত ৭১ খানি মূল্যবান ধাতুখোদাই চিত্রসহ একখানি গ্রন্থ মুদ্রিত হয়েছিল। তাঁর সভায় সেকালের খ্যাতিমান পণ্ডিত বর্গ ছিলেন সভাপণ্ডিত। মহারাজ ত্রিলোকচাঁদের সভাপণ্ডিত কুবিজপুর নিবাসী শম্ভুরামের দুই পুত্র কালীকান্ত বিদ্যাবাচস্পতি ও কৃষ্ণকান্ত তর্কভূষণ প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক, মহারাজ তেজচাঁদের সভাপণ্ডিত ছিলেন সাধক কমলাকান্তও তাঁর সভাপণ্ডিত ছিলেন। দেওয়ান রঘুনাথ রায়ের পরামর্শে চান্নাগ্রাম হতে তাঁকে বর্ধমানে আনেন। মহারাজের রাজসভা অলংকৃত করতেন দুর্গাপ্রসাদ তর্কপঞ্চানন, উমাপ্রসাদ তর্কসিদ্ধান্ত ও হরিপ্রসাদ ন্যায়রত্ন (এঁরা তিনজন কালীকান্তর পুত্র)। 'গৌরচন্দ্রামৃত' 'মুক্তিদীপিকা' 'মনোদূত' প্রণেতা বড়বেলুন নিবাসী প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র ন্যায়রত্ন, 'নিকুঞ্জবিলাস', 'সূর্যশতক' 'দুর্গাশতক' প্রভৃতি প্রণেতা চাণক নিবাসী রাধাকান্ত বাচস্পতি, অলঙ্কার 'কৌস্তভ' নামে অলঙ্কারশাস্ত্রের টীকা রচনাকার মাহাতার কৃষ্ণমোহন বিদ্যাভূষণ প্রমুখ পণ্ডিত বর্গ ছিলেন রাজসভার উজ্জ্বল রত্ন। এছাড়াও বহু কবি, পদকর্তা ছিলেন মহারাজ তেজচাঁদের পৃষ্ঠপোষকতা প্রাপ্ত ও অর্থানুগৃহীতও।

দেওয়ান নন্দকুমার রায়, ইনি দেওয়ান ব্রজকিশোর রায়ের জ্যেষ্ঠপুত্র। এঁদের বাড়ী চুপী। বর্ধমানে থাকাকালীন সংস্কৃত ও ফার্সীভাষা শিখেছিলেন। শক্তিগীত রচয়িতা হিসাবে তাঁর খ্যাতি ছিল। নিদর্শন হিসাবে এঁর একটি গান এখানে উদ্ধৃত করা হলো ঃ—

"কালীপদ সরোজরাজে সহজে ভৃঙ্গ হওনা মন।
মধুরধারা বহিছে তাঁর চরণে শরণ লওনারে মন।
পদে লিপ্ত হও ত্বরায় যাও,
উদর পুরিয়া খাও না মন।।
শিরসি পদ্মে পাদ পদ্মে পদ্ম বিকশিত।
তাহে রিপু ছ জন করি চরণ ষট্‌পদ হও ত্বরিত।।
উড়িতে শক্তি নাই যদ্যপি,
তত্ত্বপথে ধাও নারে মন।।
ঈষৎ উড়ে উড়ে মায়ের পদে,
পড়ে গুণ্ গুণ্ গাওনা মন।।
যুগ্ম পদ্ম ত্যজিয়ে বদ্ধ মায়া কেতকী ফুলেতে।
তাতে কেবল ধ্বন্ধ গন্ধ মাত্র অন্ধ তত্র রেণুতে।
জড়িত পক্ষ কণ্টকে মন
তথায় বিরস হওনারে মন।।

কি সুখে রও নীরস পুষ্পে কি রস গাও কও না মন,
বিষয় শিমূল মুকুলে, মন ব্যাকুল চিত্ত,
হয়েছে ব্যর্থ অর্থ চিন্তা সতত নিত্য অর্থ ভুলেছ।
কুমার বলে ওরে ভৃঙ্গ হও না
মায়ের পাদ-পদ্মে আশা বাসা করত যাও না মন।।"

দেওয়ান নন্দকুমারের এই শাক্তগীতিটি এইজন্যই উল্লিখিত হলো যে, তিনি রাজকাজের মধ্যে থেকেও গীত চর্চা করতেন, তাতে মহারাজেরও উৎসাহ ছিল। কিন্তু তিনি মাত্র ৪/৫ বছর ঐ কাজে বৃত ছিলেন। মহারাজের শ্যালক-শ্বশুর পরাণচাঁদ কাপূরের কূট কৌশলে নন্দকুমার কর্মত্যাগ করে চুপীতে ফিরে গিয়ে সাধন ভজনে ডুবে থাকতেন। নন্দকুমারের মৃত্যুর পর তাঁর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রঘুনাথ রায় দেওয়ান হন। ইনি ধর্মনিষ্ঠ সাত্বিক ভাবাপন্ন। সাধক কমলাকান্তের সমসাময়িক। সাধকের খ্যাতির কথা শুনেই তিনি মহারাজকে পরামর্শ দিয়েছিলেন তাঁকে রাজ সভায় আসন দিতে। রঘুনাথ ছিলেন সঙ্গীতপ্রেমী। মহারাজের অনুগ্রহে তিনি দিল্লীর প্রসিদ্ধ সঙ্গীতবিদ্ আতা হোসেনকে বর্ধমানে নিয়ে আসেন। তাঁরই কাছে রঘুনাথ পশ্চিম ভারতীয় সঙ্গীতে তালিম নেন। আতা হোসেনের শিক্ষায় শিক্ষালাভ করে তিনি বাংলা গানের জগৎকে সমৃদ্ধশালী করেছেন। বলা যায় বাংলা ধ্রুপদ-অঙ্গ গানের অন্যতম পথিকৃৎ। তিনি বহু আধ্যাত্মগীত রচনা করেছিলেন। শোনা যায় তিনি প্রতিদিন সকালে একটি শ্যামা-সঙ্গীত রচনা করে তবে জলস্পর্শ করতেন এবং বিকালে রচনা করতেন শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক গীত। শ্যামা সঙ্গীতের একটি ছত্র এবং কৃষ্ণবিষয়ক গানের একটি করে উদ্ধৃতি করা হল ঃ—

১) "কবে সমাধি হবে শ্যামা চরণে।"

২) "কহে অকিঞ্চনে, শ্রীরাধাভাব জ্ঞানে
তুমি শ্যামের শ্যাম তোমার অঙ্গের ভূষণ।।"

দেওয়ান রঘুনাথ তাঁর গানে 'অকিঞ্চন' ভনিতা লিখতেন। (বর্ধমান রাজ সভাশ্রিত বাংলা সাহিত্য, আবদুস সামাদ পৃঃ৩৭)

মহারাজা তেজচাঁদ বাহাদুরের অপর এক সভাপণ্ডিত কবি সাধক কমলাকান্ত পূর্বেই তাঁর কথা উল্লেখ করেছি। তিনিও বহু শ্যামা সঙ্গীত, আগমনী রচনা করেছেন। এখানে একটি উদ্ধৃতি দেওয়া হলো —

"আর কিছু নাই শ্যামা তোমার
কেবল দুটি চরণ রাঙ্গা।"

কবি কমলাকান্ত কালী সাধক হলেও কৃষ্ণবিষয়ক গীতও রচনা করেছেন,—

"কি কুক্ষণে শ্যামচাঁদের রূপনয়নে লাগিল।
তিলেক না হেরিতে রূপ অন্তরে পশিল।।"

মহারাজ তেজচাঁদ সভাশ্রিত একটি উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকীর্তি হলো 'হরিহর মঙ্গল সঙ্গীত'। এই কাব্যটি পরাণচাঁদ কাপূরের রচিত বলে উল্লেখ থাকলেও, কাব্যটির রচনাশৈলী, শব্দ গ্রন্থন নিপুণতা, শব্দালঙ্কার প্রভৃতির ব্যবহার দেখলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় এই সুবৃহৎ কাব্যগ্রন্থটি পরাণচাঁদ কোন *Expart*-কে দিয়ে লিখিয়েছিলেন। "হরিহর মঙ্গল সঙ্গীত যথেষ্ট পাকা হাতের রচনা"—(আবদুস সামাদ পৃঃ ৬১) এই গ্রন্থেই পূর্বোল্লিখিত প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী রামধন স্বর্ণকারের ৭১ খানি ধাতুখোদাই চিত্র শোভিত আছে।

তেজচাঁদ সভাশ্রিত 'মায়াদাস' নামে একজন কবির কথা জানা যায়। তাঁর কাব্যটির নাম 'লক্ষ্মীনারায়ণ বিলাস'। এই গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে 'মহারাজ তেজচাঁদ-কমলকুমারী' মাহাত্ম্য, কথন ইত্যাদি। তবে 'মায়াদান' কবির ছদ্ম নাম—প্রকৃত নাম জানা যায় নাই।

শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর — একই সময়ে তিনজন শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর নামক কবির পরিচয় পাওয়া যায়। তবে মহারাজ তেজচাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় যে শ্রীকৃষ্ণ কিঙ্কর নাম পাওয়া যায় তিনি হলেন, হাওড়া জেলার সীমান্তবর্তী, মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত ক্ষেপুত গ্রাম নিবাসী পাঁচালীকার। তিনি "শীতলা মঙ্গল" "লক্ষ্মীর পাঁচালী" "পঞ্চাননমঙ্গল" প্রভৃতি মঙ্গলকাব্য রচনা করেন। মহারাজা তাঁকে মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল পরগণার ক্ষেপুত গ্রামের নিকটস্থ উত্তরবাড় গ্রামে বসবাসের জন্য জমি দান করেন। বলাবাহুল্য উক্ত পরগণা বর্ধমান রাজের জমিদারীর অন্তর্গত ছিল। পরবর্তীকালে মহারাজ প্রদত্ত ভূমিখণ্ডের নাম হয় কবির নাম অনুসারে 'কৃষ্ণবাটি বা 'কিষ্টবাটি'।

'শীতলামঙ্গল' কাব্যে কবি রাজার বংশ মহিমা প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ—

"বর্দ্ধমান অধিপতি কীর্ত্তিচন্দ্র নরপতি
চিত্রসেন পুত্র ধনুর্দ্ধর।
কীর্ত্তিচন্দ্র কনেষ্ঠ ভ্রাতঃ মিত্রসেন নরনাথ
ত্রিলকচন্দ্র পুত্র রাজ্যেশ্বর।।
ভকতিতে তেজচন্দ্র স্বর্গের যেন রাজাইন্দ্র
প্রতাপচন্দ্র তাঁহার নন্দন
সে রাজার রাজ্যতুটে ক্ষেপতে ক্ষেপাই পাটে
কৃষ্ণ কিঙ্কর করিল রচন।।"

'শীতল মঙ্গল' কাব্যখানি কতকগুলি পালায় বিভক্ত — লঙ্কাপূজা, বরুণপূজা, ইন্দ্রপূজা,

জাগরণ পালা, রাবণপূজা, বিভাপালা ইত্যাদি। কবির সর্বপ্রধান রচনা 'পঞ্চানন পাঁচালী'। এই পাঁচালীর উপজীব্য — মেদিনীপুরের নিঃসন্তান শৈব রাজা চন্দ্রকেতু, পঞ্চাননের বরে কীভাবে পুত্র সন্তান লাভ করলেন সেই কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে।

কবীন্দ্র অকিঞ্চন চক্রবর্ত্তী — সম্ভবত চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের সর্বশেষ কবি অকিঞ্চন চক্রবর্তী। ইনিও বর্ধমান রাজ পোষকতা প্রাপ্ত ছিলেন। 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস'—ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃঃ ৫৭৬-তে উল্লেখ আছে (অনুমিত) কবি অকিঞ্চন চক্রবর্তী তিলকচাঁদের রাজ্যকালের শেষ ভাগ থেকে তেজচাঁদ বাহাদুরের প্রথমার্ধ পর্যন্ত রাজসভায় ছিলেন। কবির উক্তি থেকেই বোঝা যায়—

"ভূপতি তিলকচন্দ্র বর্ধমানে যেন ইন্দ্র
তেজচন্দ্র তাঁহার নন্দন।
নিবাস তাঁহার দেশে চণ্ডিকামঙ্গল ভাষে
কবীন্দ্র ব্রাহ্মণ অকিঞ্চন।।

কবি অকিঞ্চন চক্রবর্তীর বাড়ী মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল থানার বেঙ্গরালি গ্রামে। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যখানি এখনও অপ্রকাশিত, তাঁর অধস্তন বংশধরগণ সেই পুঁথিখানি সযত্নে রক্ষা করে আসছেন। অকিঞ্চন চক্রবর্তীর আর একটি পুঁথিতে উল্লেখ, কেবলমাত্র তেজচাঁদের কথাই—('ঘাটালের কথা'-পৃঃ ১৯৪)

"মহারাজা তেজশ্চন্দ্র বর্ধমানে যেন ইন্দ্র
পৃথিবী পালনে যুধিষ্ঠির।
প্রতাপে প্রচণ্ড রবি সভাতে পণ্ডিত কবি
ক্ষেত্রিয় নন্দন রণধীর।।"

কবি অকিঞ্চন চক্রবর্তীর 'কবীন্দ্র' উপাধি খুব সম্ভবতঃ তিলকচাঁদ অথবা মহারাজ তেজচাঁদ প্রদত্ত বলে মনে হয়।

দ্বিজ কৃপারাম — মহারাজ তেজচাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় পাঁচালিকার দ্বিজ কৃপারামের নাম উল্লেখযোগ্য। দ্বিজ কৃপারামের বাড়ি বর্ধমানের উত্তর পশ্চিমে প্রায় ৮ মাইল দূরে 'দেবগ্রাম' নামে একটি গ্রামে। কবি তাঁর বংশ পরিচয়ে পাঁচ পুরুষের উল্লেখ করে বলেছেন —

"জটাধর ঠাকুর পুত্র নবনী ঠাকুর।
তাহার মধ্যম পুত্র কানুরাম শূর।।
তাহার তনয় সুত নাম কৃপারাম।
এই পঞ্চ পুরুষ নিবাস দেবগ্রাম।।"

দ্বিজ কৃপারামের পাঁচালি বর্ধমান জেলায় সর্বাধিক প্রচলিত ও জনপ্রিয়। তাঁর পাঁচালির প্রস্তাবনায় দেবদেবীর বন্দনা আছে। যখন যবনরা বলশালী হয়ে হিন্দুদের বিদ্রুপ-উপহাস করে, সেই সময় সত্যপীর ফকির বেশে আবির্ভূত হন।

"তাহা দেখি নারায়ণ, দুষ্ট খল নিবারণ
পীরমূর্তি হইলা আগনি।
বাহন হইল ঘোড়া পরিধান খাসা জোড়া
তীর কামটা সঙ্গের সাজনি।।"

রামানন্দ নামে মহারাজ তেজচাঁদের আর এক আশ্রিত গীতিকার পদকর্তার উল্লেখ পাওয়া যায়। আচার্য সুকুমার সেন মহাশয় তাঁর বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ডে) বলেছেন— "ইনি তেজচাঁদের পোষ্য ছিলেন।"

রামকান্ত রায় — কবি রামকান্ত রায় ছিলেন ধর্মমঙ্গল কাব্যের রচয়িতা। মহারাজা তেজচাঁদের সময়ে সমরশাহী পরগণার সেহারা (রায়না থানা) গ্রাম নিবাসী এবং তেজচাঁদের অনুগৃহীত। তাঁর রচিত কাব্য থেকেই বোঝা যায়, তাঁরা বহু পুরুষ ধরে সেহারায় বসবাস করেছেন।

"নিবাস সেহারা গ্রাম পুরুষ বিস্তর
সামিল সমরশাহি পরগণা ভিতর।।
বর্ধমান চাকলা হস্তিনা বরাবর।
শ্রীযুত তেজচন্দ্র রায় যাহার ঈশ্বর।।"

গুরুচরণ তর্কপঞ্চানন — ইনি সংস্কৃত কাব্যে বিশেষ ব্যুৎপত্তি সম্পন্ন কবি। মহারাজা তেজচাঁদের মনোরঞ্জনের জন্য তিনি 'শ্রীকৃষ্ণলীলাম্বুধি' নামে এক খানি সংস্কৃত কাব্য রচনা করেন। ইনি সাতগাছিয়া নিবাসী অসামান্য প্রতিভাধর নৈয়ায়িক পণ্ডিত জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চাননের শিক্ষাগুরু রামদুলাল তর্কবাগীশের কনিষ্ঠ পুত্র। গুরুচরণ তর্কপঞ্চান ছিলেন তেজচাঁদের বৃত্তিভোগী।

কবিয়াল হরেকৃষ্ণ দীর্ঘাঙ্গী — ইনি 'হারু ঠাকুর' নামে খ্যাত, তিনিও মহারাজা তেজচাঁদের বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতা প্রাপ্ত। বর্ধমান রাজসভায় তাঁর ছিল বিশেষ প্রতিপত্তি (ভারত সংস্কৃতির উৎসধারা—অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, প্রথম- সং, পৃঃ ৭৫৬-৫৭)। তিনি "উত্তম রচক এবং অদ্বিতীয় গায়ক ছিলেন বলিয়াই হরুঠাকুর সাধারণ লোকের মধ্যে 'কবির গুরু হরুঠাকুর' বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। (কবিরগান—ব্রজসুন্দর সান্যাল-এর প্রবন্ধ ঃ 'সাহিত্য সংহিতা' বৈশাখ সংখ্যা, ১৩১২ সাল, পৃঃ ৬০)। কবিয়াল হরুঠাকুর ছিলেন কলিকাতার সিমুলিয়ার

অধিবাসী। বিখ্যাত কবিয়াল ভবানী বেনে, ভোলা ময়রা, নীলু ঠাকুর, প্রমুখ ব্যক্তিরা ছিলেন তাঁর শিষ্য।

রামকমল কবিভূষণ— ইনি মহারাজ তেজচাঁদের পৃষ্ঠপোষক আর এক সংস্কৃতজ্ঞ কবি। রামকমল কবিভূষণ তেজচাঁদের জীবনী অবলম্বনে সংস্কৃত ভাষায় রচনা করেন 'নয়নানন্দ' নামে একটি নাটক। তাঁর রচিত আর একটি গ্রন্থ 'ভাবার্থদর্শ'। (বর্ধমানে সংস্কৃত চর্চা' প্রবন্ধ- —হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য ঃ শারদীয় বর্ধমান, ১৩৭৭, পৃঃ ৬৭) 'কবিভূষণ' উপাধি মহারাজ তেজচাঁদ প্রদত্ত বলে অনুমিত হয়। মহারাজ তেজচাঁদ এর বিদ্যোৎসাহিতা ও গুণগ্রাহিতার কথা উল্লেখ করেছি। তিনি কলকাতায় প্রেসিডেন্সী কলেজে যেরূপ অর্থ দান করেছিলেন তা অপ্রতুল নয়, যে জন্য তিনি পরিচালন সমিতির আজীবন সদস্য ছিলেন। ইংরাজী শিক্ষার জন্য উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় ও কলেজ স্থাপন করেছিলেন। তিনি সংস্কৃত শিক্ষার জন্য যে চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তা ছিল ভারত বিখ্যাত। এই চতুষ্পাঠীতে কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র, দ্রাবিড়, মিথিলা, বঙ্গদেশের নানা স্থান হতে বহু শিক্ষার্থী শিক্ষালাভের জন্য এখানে আসতেন। তাঁদের বিনা বেতনে অধ্যয়ন, থাকা-খাওয়ার সুবন্দবস্ত ছিল। এতদসংলগ্ন ছিল গ্রন্থাগার, বিপুল গ্রন্থ সম্ভারে সমৃদ্ধ, তাছাড়া ছিল অধ্যয়নাগার। অধ্যয়নাগার ছিল সুসজ্জিত, যাতে প্রতিটি বিদ্যার্থীর কোন অসুবিধা না হয়। বহু সুন্দর সুন্দর কক্ষ বিশিষ্ট ছাত্রাবাস। ছাত্রদের যাতে কোনরূপ অসুবিধা না হয় সে দিকে লক্ষ রেখেই কক্ষগুলি সজ্জিত ছিল।

মহারাজ তেজচাঁদের কীর্তি অতুলঃ—

দেব কীর্তি যেমন তিনি তাঁর নিজ জমিদারী এলাকাতেই নয়, ভারতের বিভিন্ন তীর্থস্থানে দেববিগ্রহ ও মন্দির প্রতিষ্ঠাও করেছেন অগণন। এবং সেই সঙ্গে বহু দীন দুঃখী জনের করেছেন অন্ন সংস্থান। এছাড়া তখনকার দিনে পানীয় জলের জন্য সাধারণের জন্য বড় বড় পুষ্করিণী খনন করিয়েছিলেন বহু। তিনি বুঝেছিলেন যোগাযোগ ব্যবস্থার খুবই প্রয়োজন। সেইজন্য ২৩টি রাজপথ নির্মাণ করিয়েছিলেন। এই পথগুলি ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত হয়েছিল। পথ নির্মিত হওয়ায় শহর ও গ্রাম গ্রামান্তরে যোগাযোগ সুগম হয়েছিল। পথিকদের সুবিধার জন্য পথপার্শ্বে কূপ খনন এবং অতিথিশালা স্থাপন করেন। কালনা থেকে বর্ধমান পর্যন্ত এই দীর্ঘ পথটিও তাঁর কীর্তি। বর্ধমান থেকে কালনা পর্যন্ত যে দীর্ঘ পথটি নির্মাণ করান, সেই সুপ্রশস্ত পথের পাশে ৮ মাইল ব্যবধানে একটি করে 'আড্ডা' (পান্থ শালা) নির্মাণ এবং সেই সেই স্থানে পুকুর খনন ও পাকা বাঁধানো ঘাট, ঘাটের কাছে একটি করে শিব-মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। আজও সে চিহ্ন আছে অস্থিসার হয়ে। কোথাও কোথাও পুকুর মজে গেছে, বাঁধা ঘাটের ধ্বংসপ্রাপ্ত ইটগুলিকে বুকে করে, শিব মন্দিরও আছে।

বর্ধমান থেকে কালনা যাওয়ার পথে প্রথমে দেখা যায় রাইপুরে। এখানে পুকুর চত্বরে যে শিবমন্দির আছে তার শিলালিপিতে উৎকীর্ণ আছে—

"শুম্মেম্বশ্বেন্দু শাকে বিবিধতরুগণাচ্ছন্নবদ্ধায়নং যৎ
স্বার্দ্ধক্রোশাঙ্ক সিদ্ধত্রিমিতমকৃত সৎসংক্রমৈর্যোজনান্তঃ।
বাপীবৃন্দাষ্টকেশস্বগজহয়গৃহারাম কূপাপনাদ্যং
ভূপঃ শ্রীতেজচন্দ্রঃ সকলজন সুখাদ্বর্দ্ধমানাম্বিকান্তঃ।।"

শকাব্দা ১৭৫৩।

এখান থেকে আরও কয়েক মাইল অগ্রসর হলে 'আটাঘর'। আটঘরিয়ার শিবমন্দিরে লিখিত আছে—

"শাকেহব্দেহগ্নীষুপৃথ্বিধরবিধৃগণিতে বৃক্ষমালাদ্বিপার্শ্বাৎ
ক্রোশার্দ্ধাশ্মাঙ্কিতাশ্বানলমিত সুসৃতিং সংক্রমৈ, সংপ্রচক্রে।
ভূপঃ শ্রীতেজচন্দ্রো ব্যুপবনমিলিতাং যোযনান্ত নির্ষদ্যাং
বাপী কূপে শবৃন্দাস্বগজহয়গৃহাৎ বর্দ্ধমানাম্বিকান্তঃ।।"

অম্বিকাকালনার দিকে অগ্রসর হতে থাকলে কয়েক মাইল পরেই পৌঁছানো যাবে 'কুচুট' গ্রামে। এখানে মহারাজ যে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তার গাত্রস্থ ফলকের শ্লোকটি—

"শ্রীন্বদ্রীন্দ্বক্ষশাকে সকলজনসুখাং পদ্ধতিং বৃক্ষপার্শ্বাং
স্বার্দ্ধক্রোশাঙ্কপাষাণমুনিগুণমিতাং সংক্রমৈর্যোজনান্তঃ।
বাপ্যারামেশবৃন্দাষ্টগজহয়নিজাগারকূপাপণাদ্যাং
ভূপঃ শ্রীতেজচন্দ্রোহকৃত নিজ ভবনাদম্বিকান্তাং মনোজ্ঞাং।।"

শকাব্দা ১৭৫৩।।

পথপার্শ্বস্থিত উল্লেখযোগ্য বিশ্রামাগারগুলির মধ্যে আর একটি বিশ্রামাগার সাতগাছিয়ায়। পুকুর ও শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সেখানেও যা আজও অতীতের সাক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সেই মন্দিরে লিপিবদ্ধ আছে ঃ

"শাকে শুম্মশরাশ্বচন্দ্রগণিতে বৃক্ষালি যুক্তাসৃতিং
ক্রোশার্দ্ধাঙ্কশিলামুনিত্রয়মিতাং চক্রেহত্তুতৈঃ সংক্রমৈঃ।
দেবারামসরোগজাশ্বনিজগোবৃন্দেশবেশ্মাপণাং
ভূপঃ শ্রীযুত তেজচন্দ্র নৃপতিঃ স্বীয়ালয়ান্তাম্বিকাং।।"

শকাব্দা ১৭৫৩।।

বর্ধমান শহর ছাড়াও মহারাজ তেজচাঁদ বাহাদুর, বর্ধমান জেলা, ও ভারতবর্ষের বিভিন্ন

স্থানেও দেববিগ্রহ প্রতিষ্ঠা ও তন্নিমিত্ত মন্দির নির্মাণ এবং দেবসেবা ব্যবস্থা করেন।

শ্রীক্ষেত্রধামে শ্রীকৃষ্ণ রাধিকা মন্দির প্রতিষ্ঠাঃ—

মহারাজ তেজচাঁদ বাহাদুর তাঁর ভগ্নী তোতাকুমারীর নামে শ্রীক্ষেত্রধামের শ্রীমন্দিরের সন্নিধানে শ্রীকৃষ্ণ ও রাধিকা মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন।

এছাড়া শ্রীক্ষেত্রধামের শ্রীমন্দিরের উত্তরদ্বার মধ্যে মহারাজ তেজচাঁদের অনুগ্রহীতা, পরিচারিকা খানন বিবি একটি শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন।

শ্রীক্ষেত্রধামে মার্কণ্ডেয় সরবরের উপরে মহারাজ তেজচাঁদ শ্বেতপাথর নির্মিত 'তেজেশ্বর' নামক একটি শিব স্থাপন করেন। সমাগত যাত্রীগণ ঐ মহাদেবের পূজা করে থাকেন।

১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজ তেজচন্দ্র তাঁর এক মহিষীর নামে সুন্দর বাগের দক্ষিণে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। তার শিলালিপিতে খোদিত আছে ঃ—

"শাকে যুগ্মযুগার্বকাশ্যপিমিতে রম্যেষ্টকানির্ম্মিতং
তেজচন্দ্র মহীমহেন্দ্রমহিষী শম্ভোরিদং মন্দিরম্।
রাধামাধবতুষ্টয়ে প্যদসৃজৎ লিঙ্গং তথা শাম্ভবং
প্রত্যাষ্ঠাত্তদনন্তরঞ্চ ভগবান্ প্রীণাতু হেমেশ্বরঃ।।"

শকাব্দা ১৭২২।

সুন্দরবাগের উত্তরদিকে ঁশিবমন্দিরস্থ্ শ্লোক ঃ—

"সোমঃ সোমাবতাংসো নৃপকুলতিলকঃ শ্রীযুতস্তেজচন্দ্রঃ
সৌধে রম্যাং শরণ্যং কুসুমিতলতিকাভৃঙ্গঝঙ্কার যুক্তং।
এই শ্লোকের অপরার্দ্ধ বিনষ্ট হওয়ায় কিছুই বোধগম্য হয় না।"

আনন্দবাগের ঁশিবমন্দিরস্থ্ শ্লোক ঃ—

"শ্রীতেজশ্চন্দ্রমহিষী দদাবানন্দকাননে।
শাকে পক্ষাগ্নিশৈলাব্জে মহাদেবায় মন্দিরম্।।"

আনন্দবাগের পূর্ব্বদিকস্থ্ মন্দিরের শ্লোক ঃ—

"পক্ষাগ্নিশৈলাদ্বিজরাজমানে, শাকে মহীন্দ্রোনৃপতেজচন্দ্রঃ।
প্রাদাৎশিবায়ৈকমপূর্ব্বগেহং নির্ম্মায় চানন্দবনে মনোজ্ঞং।।"

এছাড়া মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোণায় মহারাজ তেজচাঁদ রঘুনাথজীউ ও ঁলালজীউ মন্দির নির্মাণ করেন। রাজবংশানুচরিতে উল্লেখ আছে— "১৮৩২ খৃঃ চন্দ্রকোণার ঁরঘুনাথ জীউ ও ঁ লাল জীউ সদর খণ্ডে, মহারাজ তেজচন্দ্ বাহাদুর যে সকল গৃহাদি নির্ম্মাণ

করিয়াছেন, তাহার শিলালিপিস্থ শ্লোক ঃ—

"শাকেঘ্নীন্বভূমে রঘুযদুপবটেশাসন স্নানযাত্রা
বৃন্দাতৌর্য্য ত্রিকশ্রী কপি ধনসুখটী বাদ্যরাসালয়াদীন্।
কূপৌ দ্বৌ বারিগেহান্যুপলময় নবীয়ানি বৃত্যাপ্যকার্ষীৎ
সীতাকুণ্ডস্য ঘট্টং নরপতিসুকৃতী শ্রীযুত স্তেজচন্দ্রঃ।।"

মল্লেশ্বরপুরের বাটীর সদরখণ্ডের শিলা লিপিস্থ শ্লোকঃ—

" শাকেত্রীষৃদ্রিচন্দ্রে ধনপচন গৃহং সিদ্ধিখাতস্য খাতং
শ্রীমন্মল্লেশবাসং প্রহরিগণগৃহং নাট্য যজ্ঞালয়ঞ্চ ;
ধর্ম্মজ্ঞো ধর্ম্মগেহং নবসদৃশকৃতং সূচ্চসৌধস্ত্বকার্ষীৎ
শ্রীমন্মল্লেশতুষ্ট্যৈ নৃপবরসুকৃতী শ্রীযুতস্তেজচন্দ্রঃ।।"

"কথিত আছে এই মল্লেশ্বর শিব চন্দ্রকোণার চন্দ্রকেতু নামক রাজার প্রতিষ্ঠিত। কোন সময়ে মল্লভূমের (বিষ্ণুপুরের) রাজা চন্দ্রকেতুকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া মল্লেশ্বরপুর অধিকার করতঃ দেশ মধ্যে ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, অদ্য হইতে এই দেবতা 'মল্লেশ্বর' নামে অভিহিত হইবেন। অতঃপর যে ব্যক্তি ইঁহাকে মল্লেশ্বর না বলিয়া পূর্ব্ব নাম চন্দ্রেশ্বর বলিবে, তাহার শিরচ্ছেদন করা হইবে।" (রাজবংশানুচরিত পৃঃ ১১৭)

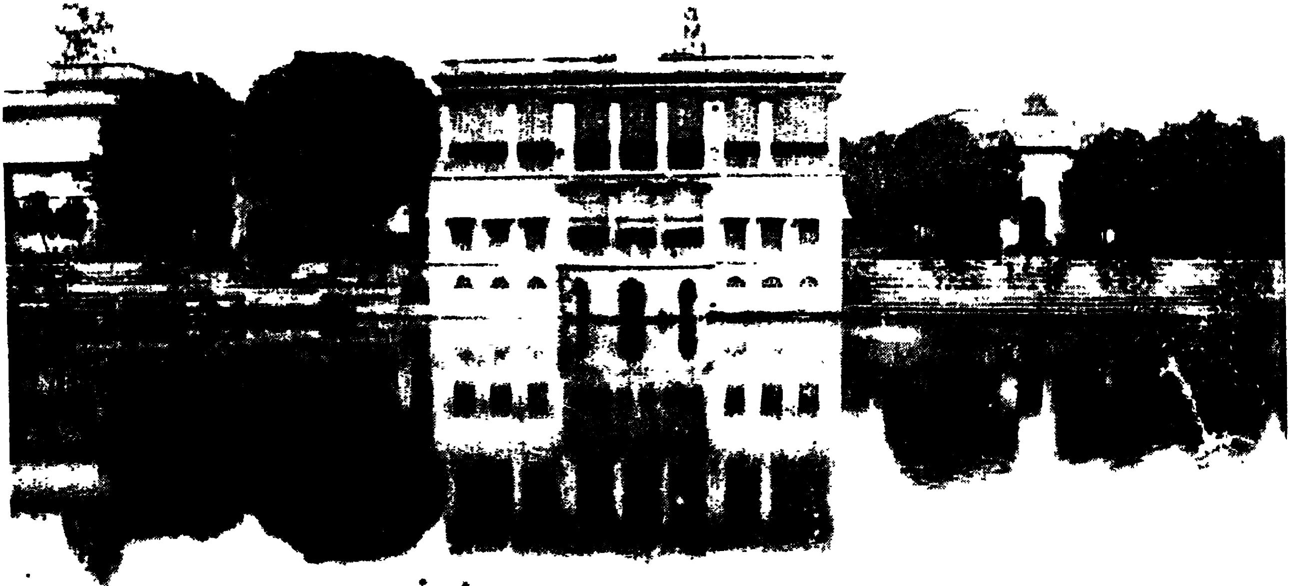
উদ্ধৃত শ্লোক থেকে বোঝা যায় মহারাজ তেজচাঁদ মল্লেশ্বরের রাজার সঙ্গে সৌহার্দ্য বজায় রাখা এবং তুষ্ট রাখার জন্য দেবালয়, নাটমঞ্চ, যজ্ঞশালা সংস্কার করে একেবারে নতুনের মত করান।

প্রকৃতপক্ষে মহারাজ তেজচাঁদের দেবকীর্তিও প্রতুল। যতদূর সম্ভব অনুসন্ধান করে যা পেয়েছি তাই লিপিবদ্ধ করছি। রাজবংশানুচরিত এর ১২০-১২১ পৃষ্ঠায় উল্লেখ পাই ঃ "অসংখ্য দেবালয় ব্যতীত, তদীয় রাজ্যাধিকারে পাঁচটি মহাপীঠস্থান বর্ত্তমান আছে। . . . . ঐ সকল স্থানের দেবদেবীর পূজাদির ব্যয় নির্ব্বাহপযোগী বিস্তর নিষ্কর দেবোত্তর ভূমি প্রদত্ত হইয়াছে। ঐ সকল মহাপীঠস্থানের তালিকা প্রদত্ত হইল।

১। অট্টহাস। জেলা বীরভূমের অন্তঃপাতি লাভপুর নামক গ্রামে দেবীর অধর-ওষ্ঠ নিপতিত হইয়াছিল। তথায় দেবী ফুল্লরা ও বিশ্বেশ ভৈরব বিরাজমান আছেন।

২। উজানি— জেলা বর্দ্ধমান, গুসকরা ষ্টেশন হইতে ৫ ক্রোশ ব্যবধানে কোগ্রাম নামক গ্রামে দেবীর কুনুই নিপতিত হইয়াছিল। তথায় দেবী মঙ্গলচণ্ডী ও কপিলাম্বর ভৈরব বিরাজমান আছেন।

৩। বহুলা— কাটোয়য়া মহকুমার অন্তঃপাতি কেতুগ্রামে দেবীর বামবাহু নিপতিত হইয়াছিল।



দিলখুশা ভবন (গোলাপবাগ)

এখানে দেবী বহুলা ও ভীরুক ভৈরব বর্ত্তমান আছেন।

৪। কাঞ্চিদেশ্—লুপলাইনের বোলপুর ষ্টেশনের ২ ক্রোশ ঈশান কোণে উত্তর বাহিনী কোপাই নদীর তীরে দেবীর কঙ্কাল নিপতিত হয়। এই স্থানে দেবী দেবগর্ভা ও রুরু ভৈরব বর্ত্তমান আছেন।

৫। ক্ষীরগ্রাম—এই স্থানে দেবীর দক্ষিণ চরণের অঙ্গুষ্ঠ নিপতিত হয়। এখানে দেবী যুগাদ্যা ও ক্ষীর খণ্ডকভৈরব বিরাজমান আছেন।

চিড়িয়াখানা — মহারাজ তেজচাঁদের একটি সৌখিন নেশা তথা পুষ্প ও পশুপক্ষী প্রীতি ছিল অতুলনীয়। বর্তমানে যেখানে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠনপাঠনের স্থান, সেই গোলাপবাগের প্রসিদ্ধি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত মহারাজ তেজচাঁদের সৌন্দর্য্যপ্রেমবে অক্ষুন্ন করে রেখেছিল। 'গোলাপবাগ' নামের সঙ্গে তার সৌসাদৃশ্য ছিল অতুলনীয়। গোলাপ বাগিচায় এত জাতীয় গোলাপ ছিল তার বর্ণনা করা যায় না, যেমন তাদের রঙ্‌বাহার তেমনি সুগন্ধ! পৃথিবীর যেখানে প্রসিদ্ধ গোলাপ, সৌরভে, সৌন্দর্য্যে, আকার বৈশিষ্ট্যে বিখ্যাত সেই সব গোলাপ গাছ সংগ্রহ করে এনে এই গোলাপ উদ্যান সাজিয়েছিলেন। ভেতরে ছিল লালমোরাম এর রাস্তা দুপাশে সাজানো কামিনী ফুলের বেড়া, অশোক নাগেশ্বরী গাছের বিথিকা, কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া দিয়ে ঘেরা বাগান। সাজানো নানা মৌসুমীফুলের কেয়ারী করে। বাগানের একটি আকর্ষণীয় এবং আশ্চর্য বস্তু বেড়াগাছের বেড়া দিয়ে ঘেরা 'মেজ' বা গোলক ধাঁধাঁ। বাইরে থেকে ভেতরে যাওয়ার প্রবেশ পথ আছে কিন্তু বাইরে আসার পথ খুঁজে পাওয়া যায় না। মজা দেখার জন্য বহু দর্শনার্থী ভেতরে প্রবেশ করে আর বাইরে আসতে পারতেন না ঘুরপাক খেতেন। পরে রাজপুরুষ এসে তাঁদের উদ্ধার করতেন। আজও বহু বিটপ সেদিনের আনন্দ-বেদনাকে বুকে নিয়ে সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

এবার আসা যাক মহারাজের জীব-জন্তু প্রেমের কথায়। বাগানের মাঝে চারদিক বাঁধানো পুকুর পুকুরটির নাম মানস সরোবর। উপর থেকে ধাপে ধাপে নেমে গেছে জল পর্যন্ত সিঁড়ি। সিঁড়িতে বড় বড় সামুদ্রিক শাঁখ ঝিনুকে ওপরের শক্ত খোলায় নানা ধরণের ছোট ফুল গাছ, আবার কোন কোনটিতে এক শ্রেণীর ছোট ছোট বাঁশ ঝাড় (১ ফুট)। পুকুরের স্বচ্ছ জলে খেলা করতো ছোট-বড় নানা রঙের মাছ, কোন কোন মাছের নাকে সোনার 'নলক' পরানো ছিল। অন্য একটি পুকুরে থাকতো দুটি কুমীর। তার কিছু দূরে বেশ উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা ইঁদারার মত স্থান। মাঝে একটা শুকনো গাছের গুঁড়ি, সেখানে থাকতো দুটি ভালুক। পৃথক স্থানে ছিল 'নীলগাই'। প্রায় মধ্যস্থলে চারদিক পাকা দেয়াল ঘেরা হরিণের আস্তানা। আস্তানার মধ্যে ছিল জলাভূমি। সেখানে নানা জাতের নানা রকমের হরিণ ছিল,

চিতল হরিণ থেকে নানা শ্রেণীর শাখা-প্রশাখা শিঙ্‌ওয়ালা হরিণ। পাখীও ছিল বহু রকমের। দেশ-বিদেশ থেকে তাদের এনে পুষে রাখতেন। বাগানের পশ্চিম প্রান্তে মোটা মোটা লোহার গরাদের রেলিং লাগানো পাশাপাশি সারি দেওয়া ঘর, সেখানে থাকতো বাঘ (রয়েলবেঙ্গল টাইগার), কেশরওয়ালা বড় বড় সিংহ। সমগ্র অঞ্চলটি পরীখা দিয়ে ঘেরা। এছাড়াও ছিল চিতাবাঘ, নেকড়ে বাঘ। আরও ছিল নানা শ্রেণীর হনুমান, সজারু, ময়াল সাপ। পাখীদের মধ্যে এ্যান্টেলার দৃষ্টি আকর্ষণ করতো, ময়ূরও ছিল, বহু অগুণতি সারস, হাঁস, পেলিক্যান প্রভৃতি পাখীর সমারোহ এবং তাঁদের বিচিত্র কাকলিতে মুখরিত হয়ে থাকতো সেই স্থান।

গোলাপবাগের একটি বিশেষ ধরণের গাছ সম্বন্ধে সম্প্রতি আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশ হয়েছিল, 'শতাব্দী বৃক্ষ' বা 'সেঞ্চুরি ট্রী' নামে একটি গাছের কথা। বলা হয়েছিল ঐ বিশেষ গাছটির বৈশিষ্ট্য হলো ১০০ বছর অন্তে একবার কুসুমিত হয়ে মরে যায়। কিন্তু গাছটি এখনও বিদ্যমান। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য 'গোলাপ বাগ' মহারাজ তেজচাঁদের সৃষ্ট সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ। মহারাজ তেজচাঁদ যাবতীয় দেবকীর্তি, বাগ বাগিচা স্থাপন যা কিছু করেছেন তা অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে। সুতরাং বলা যায় 'গোলাপ বাগ'ও সেই সময়ে স্থাপিত হয়েছিল। তেজচাঁদ পরলোক গমন করেন ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে। যদি ধরা যায় তিনি ঠিক ঐ সময়ে বৃক্ষটি রোপন করেন তা হলেও গাছটির বয়স পৌনে দুশো বছর হয়।

এই গোলাপবাগ চিড়িয়াখানাটি কলকাতার আলিপুর চিড়িয়াখানার ১০০ বছর পূর্বেই নির্মিত হয়েছিল। তখনকার বাংলায় এমন চিড়িয়াখানা আর ছিল না।

এখন আর সেই চিড়িয়া নাই পড়ে আছে 'খানা', সেই গোলাপও নাই—আছে শুধু নাম 'গোলাপ বাগ'।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সাময়িক 'সেনাবাসের' জন্য সব চিড়িয়া বর্ধমান রাজ আলিপুর চিড়িয়াখানায় দান করে দেন।

কৌতুকপ্রিয় মহারাজ তেজচাঁদ — মহারাজ তেজচাঁদ শুধু যে ন্যায় পরায়ণ প্রজানুরঞ্জক রাজা ছিলেন তাই নয় তিনি কৌতুকপ্রিয় ছিলেন। তিনি সৌন্দর্যপ্রিয়ও ছিলেন, তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ 'গোলাপবাগ' সৃজন। গোলাপবাগ কেবল তিনি আত্ম-তৃপ্তির জন্য প্রতিষ্ঠা করেন নাই, গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা বহু জনগণ আসতেন তা দেখতে, তার জন্য কোন পয়সা লাগতো না।

মহারাজের একটি অদ্ভুত খেয়ালের কথা বলা প্রয়োজন। কৃষ্ণসায়রের উত্তরপাড়ে একটি 'আড়াঘাট' নির্মাণ করান। 'আড়া' হলো মাছ ধরার জন্য বাঁশ ফাড়াই করে যেমন দরকার সেই মত সরু বা মোটা কাঠি তৈরী করে, মজবুত দড়ি দিয়ে মাদুরের মত বুনন করে

তৈরী। বর্ষাকালে সাধারণত গ্রামের চাষীবাসি মানুষজন যে জলস্রোত নালা দিয়ে কোন পুকুর বা জলাশয়ে পড়ে, সেই স্রোতের মুখে আড়াটি খাড়া করে মাটিতে পুঁতে আটক দেওয়া হয়। তার পাশে থাকে একটা চৌবাচ্চার মত গর্ত। মাছেরা স্রোতের উজানে এসে লাফিয়ে সেই গর্তে পড়ে। তখন মাছগুলি সেখান হতে তুলে আনা হয়। রাজবংশানুচরিতে উল্লেখ আছে, (পৃঃ ১৪৪) "ঐ আড়াটি এরূপ সুকৌশলে নির্ম্মিত যে, বর্ষাকালে, যখন মাঠের জল উক্ত আড়ার পয়ঃপ্রণালী দিয়া আসিয়া কৃষ্ণসাগরে পতিত হয়। সেই সময় কৃষ্ণসাগর হইতে, বিবিধ প্রকার মৎস্য উজান উঠিয়া আড়াস্থিত গর্ত্ত মধ্যে নিপতিত হয়। এই কৌতুকাবহ ব্যাপার দেখিতে অতীব আনন্দ দায়ক। আবার ঐ আড়ার সহিত নগরের অন্যান্য অনেকগুলি পুষ্করিণীর সংযোগ থাকায়, আড়া হইতে জল ছাড়িয়া, তথা হইতেও ঐরূপ মৎস্য আড়ায় আনা যাইতে পারে। এরূপ সুকৌশলে নির্ম্মিত আড়া অন্যত্র দৃষ্ট হয় না। . . . . . . বর্ষাকালে রাত্রিতে আড়া চলিবার উপযুক্ত বৃষ্টি হইলে, তিনি (মহারাজ) শয্যা ত্যাগ করতঃ তথায় গমন করিয়া, এই কৌতুকাবহ দৃশ্য দর্শনে সমস্ত রাত্রি যাপন করিতেন।"

এখানে মজার কথা এই যে, যে ব্যক্তি এই আড়া তৈরী করেছিল মহারাজা তাকে উপযুক্ত পারিশ্রমিক ছাড়াও ৫০ বিঘা নিষ্কর জমি দিয়েছিলেন।

বন্যা প্রতিরোধ ও বন্যার্তত্রাণে মহারাজ তেজচাঁদ — একটা প্রবাদ প্রচলিত ছিল —

"ওরে নদ দামোদর
তোরে নিয়ে আতান্তর।"

তৎকালে দামোর নদ ছিল বিভীষিকা। বর্ষার প্রারম্ভ কাল থেকে আশ্বিনের দুর্গাপূজার সময় পর্যন্ত, বর্ধমানের গ্রামগঞ্জ শহর সব জনগণকে সন্ত্রস্ত হয়ে থাকতে হতো বন্যার ভয়ে। দামোদরের উভয় পার্শ্বস্থ বহুগ্রাম-গঞ্জ-বন্যার জলে বিধ্বস্ত হয়ে পড়তো। "মহারাজ তেজচন্দ্ বাহাদুর দয়ার্দ্র হইয়া ১৮০০ খৃঃ ৬ই মার্চ তারিখে মিঃ মেরিয়ট নামক জনৈক ইংরাজকে দামোদর নদের উভয় কূলে সুদৃঢ় বাঁধ প্রস্তুত করিবার আজ্ঞা দেন। এই সুমহৎ কার্য্যটি সুসম্পন্ন হওয়ায়, নদীতীরবর্ত্তী বহুতর গ্রাম প্রবল বন্যার হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়াছে।" (রাজবংশানুচরিত, পৃঃ ১২০)। তেজচাঁদ যে প্রকৃত প্রজাদরদী এবং প্রজা হিতৈষী ছিলেন তা এই কর্ম হতেই বোঝা যায়। তবে স্থানে স্থানে বাঁধ বিনষ্ট হওয়ায় সেই সেই অঞ্চলের গ্রামের ক্ষতি হয়। মহারাজা অকাতরে উক্ত অঞ্চলের প্রজাদের সাহায্য করতেন। এই সাহায্য কোন পক্ষপাতদুষ্ট ছিল না।

মহারাজ তেজচাঁদ-এর সময়কার এক ভয়াবহ বন্যার বর্ণনা 'রাজবংশানুচরিত' -এ যেরূপ বর্ণিত হয়েছে তা পাঠকবর্গের অবগতির জন্য উদ্ধৃত করছি ঃ—

“সন ১২৩০ সাল ইং ১৮২৩ খৃঃ এতৎ প্রদেশে যেরুপ ভয়ঙ্কর জলপ্লাবন হইয়াছিল, এরূপ জলপ্লাবন তৎপূর্ব্বে আর কখনও হয় নাই। ইহাকেই এ প্রদেশস্থ জনগণ ৩০ সালের বন্যা ক হিয়া থাকে। ২৬ শে সেপ্টেম্বর তারিখে রাত্রে সহসা বন্যার জল বৃদ্ধি হইয়া খরস্রোতে দামোদর নদের বাঁধ ভগ্ন হয়। দেখিতে দেখিতে বিদ্যুৎবেগে সর্ব্বত্র জল প্রবেশ করতঃ সমুদয় দেশকে জলমগ্ন করিল। চতুর্দ্দিকেই অনন্ত জলরাশি ভিন্ন তিলমাত্রও আশ্রয় স্থান দৃষ্টিগোচর হয় না। কেবল অসংখ্য নরনারী বালক-বালিকা, এবং গো-মহিষাদি গৃহপালিত জন্তুগণের শবরাশি, কত শত খট্টাঙ্গাদি গৃহসজ্জাদি, গো-শকট, পালকী প্রভৃতি বিবিধ প্রকার দ্রব্য নিচয় এবং সমূলোৎপাটিত বড় বড় বৃক্ষাদি খরস্রোতে নিপতিত হইয়া বিদ্যুদ্বেগে অনন্ত জলরাশির মধ্যেই ভাসিয়া যাইতেছে। কে কাহার সাহায্য করিবে, সকলেই স্ব-স্ব, প্রাণ লইয়া ব্যতিব্যস্ত। যাহাদের বাটী ইষ্টক নির্ম্মিত, তাহারা ছাদোপরি আরোহণ করতঃ প্রাণ রক্ষা করিবার চেষ্টা করিল। তন্মধ্যে আবার যাহাদের বাটী পুরাতন ও জীর্ণ, জলস্রোতে তৎ সমূদয় নিপতিত হইয়া, উপরিস্থিত আরোহীগণকে জীবন্তই সমাহিত করিল। কাঁচা গৃহের চিহ্নমাত্র ছিল না। কত লোকই যে প্রাণের স্বার্থে, গৃহের চালে ও বৃক্ষোপরি আরোহন করিয়া পরিশেষে খরতর স্রোতে নিপতিত হওতঃ অনন্তকাল গর্ভে নিহিত হইয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। বর্দ্ধমান নগরের মধ্যেই ৭ ফিট পর্য্যন্ত জল উঠিয়াছিল। ২৯ শে সেপ্টেম্বর কলিকাতা হইতে কতকগুলি লোক নৌকারোহনে যাত্রা করিয়া একদিনেই বর্দ্ধমানে আসিয়া পৌছিয়াছিলেন। পথিমধ্যে অনন্ত জলরাশি ও মধ্যে মধ্যে এক একটি বৃক্ষের অগ্রভাগ ভিন্ন, কোথাও তিলমাত্র ভূমিও তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর হয় নাই। বন্যা প্রশমিত হইলে, লোকের দুর্দ্দশার পরিসীমা ছিল না। সকলেই নিরাশ্রয়, ও মুষ্টিমেয় অন্নের জন্য সকলেই লালায়িত। এমনকি এক মুষ্টি অন্নের জন্য মাতা ক্রোড়স্থ শিশু সন্তানকেও বিক্রয় করিয়াছিল। কত লোকই যে স্ত্রী-পুত্র বিহীন, এবং কত রমনীই যে পতি পুত্র বিহীনা হইয়য়াছিল, তাহার সংখ্যা নাই। ঈদৃশ বিপৎকালে মহারাজা তেজচন্দ্ বাহাদুর বদান্যতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি বহুল অর্থব্যয় করতঃ নিরাশ্রয়দিগের গৃহনির্ম্মাণের ব্যয় এবং অপর্য্যাপ্ত চাউল বিতরণ করতঃ বভুক্ষুদিগকে করালকাল কবল হইতে রক্ষা করিয়াছিল। ভারতবর্ষের তদানিন্তন গবর্ণরজেনারেল লর্ড আর্মহার্ষ্ট বাহাদুর মহারাজার ঈদৃশী বদান্যতার সংবাদ অবগত হইয়া তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া সহস্র ধন্যবাদ প্রদান করতঃ একখানি উৎকৃষ্ট তরবারি উপহার দিয়াছিলেন। (*Statistical account of Bengal*)

লর্ড আমহার্ষ্ট বাহাদুর ভারতবর্ষের গবর্ণরজেনারেল পদে অভিষিক্ত হইলে, মহারাজাধিরাজ তেজচাঁদ বাহাদুর তাঁহাকে একখানি অভিনন্দন পত্রসহ উপঢৌকন প্রেরণ

করায়, তিনি সানুগ্রহে তৎসমুদয় গ্রহণ করতঃ ১৮২৬ খৃঃ ১২ সেপ্টেম্বর তারিখে মহারাজাকে পারশী ভাষায় যে সম্মান সূচক পত্র লিখিয়াছিলেন তাহার বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

মোহর।

ফরজন্দ নবস্তান আজীমস্মান মসীর খাষ হুজুর ফয়েজ
মামুর বাদসা কেওয়ান বরগ। ইংলিস্তান আমীরল
ওমরা লর্ড আমহার্ষ্ট গবর্ণরজেনারেল বাহাদুর মমলেকে মহরুসা।
সাহামত্ ও আওয়ালী মরতবৎ রফয়ৎ ও ময়ালী মঞ্জিলৎ
মহারাজাধিরাজ তেজচন্দ বাহাদুর সল্লে মহল্লাহে তালা।

আমি ভরতবর্ষের গবর্ণরজেনারেল পদে অভিষিক্ত হওয়ায়, আপনি আনন্দিত হইয়া, আমাতে অভিনন্দন পত্রসহ যে উপঢৌকন প্রেরণ করিয়াছেন তাহা প্রাপ্ত হওতঃ অতীব পরিতুষ্ট হইয়া, আপনাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি, আপনি যে আমাদের হিতাভিলাষী ও রাজভক্ত তাহা আপনার পত্রপাঠে ও সদ্ব্যবহারে স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে।

১৮২৩খৃঃ ২৩ সেপ্টেম্বর। ইংরাজী স্বাক্ষর
আমহার্ষ্ট।

উন্নতমনা তেজচাঁদ— মহারাজ তেজচাঁদ প্রকৃতক্ষে মহানুভব ও দয়ালু রাজা ছিলেন। কোন রাজকর্মচারী অন্যায় ও গর্হিত কাজ করলে তাকে কর্মচ্যুত করতেন না। তিনি চিন্তা করতেন, কর্মচারীটি কর্মচ্যুত হলে তার পরিবারবর্গের দুর্গতি হবে এবং কষ্টের শেষ থাকবে না। একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করলে তা প্রতীয়মান হবে।

মহারাজা খুব পাখী ভালবাসতেন 'লাল' নামে একজাতীয় ছোট ছোট পাখী ছিল তাঁর সঙ্গী। তাদের জন্যে তিনি একটি সোনার খাঁচা তৈরী করিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি অন্তঃপুরে কি দরবারে যেখানে থাকুন ঐ লাল পাখীর খাঁচাটি সঙ্গে নিয়ে যেতেন, দেখতেন পাখীদের কোলাহল, তাদের খেলা, ঝগড়া। একদিন তিনি সভায় বসে পাখীদের খেলা দেখছেন এমন সময় একজন সভাসদ করযোড়ে মহারাজকে নিবেদন করলেন, তাঁর হুগলীর মোক্তার একলক্ষ টাকা আত্মসাৎ করে পালিয়েছে। মহারাজ তাঁর কথায় কর্ণপাত করলেন না এবং গুরুত্ব না দেওয়ায় সেই সভাসদ, মোক্তারের প্রতি মনে মনে ঈর্ষা পোষণ করতে থাকেন এবং সুযোগের অপেক্ষায় থাকেন টাকা নিয়ে মোক্তার কি করে, গোপনে তার খবর সংগ্রহ করতে থাকেন। যখন ঐ সভাসদ খোঁজ নিয়ে জানতে পারলেন, মোক্তার বাড়ী গিয়ে পুকুর খনন, শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা, সদাব্রত স্থাপন ইত্যাদি কাজ করাচ্ছেন, তখন তিনি কতকগুলি সিপাহী, একজন

হাবিলদার পাঠিয়ে মোক্তারকে ধরে আনলেন। এতসব ঘটনা মহারাজ কিছুই জানতেন না। তারপর মোক্তারকে মহারাজের কাছে হাজির করলে, তিনি বিস্মিত হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'সত্যই কি তুমি এক লক্ষ টাকা চুরি করেছ?' উত্তরে মোক্তার কোনরূপ ভয় না করে স্পষ্টই বলল— মহারাজের কাজের জন্যই সে ঐ টাকা নিয়েছে। তার পরিবারে অনেকগুলি পোষ্য; সকলেই তার পুত্র-কন্যা নয়, অনেকগুলি নিঃস্ব-অসহায় ছেলে লেখাপড়া শেখার জন্য, চাকুরীর জন্য তার আশ্রিত; তা ছাড়া এমনও সহায়-সম্বলহীনা মহিলা প্রতিবেশী আছে যাদের সাহায্য করে থাকি, তা আমার নিজ উপার্জনের টাকায় কায়ক্লেশে হয়ে যায়। তবে ঐ টাকা খরচ করেছি গ্রামে পানীয় জলের কোন ব্যবস্থা নাই, তার জন্য মহারাজেরই নামে একটি পরিষ্কার জলের পুকুর কাটিয়েছি; গ্রামের কুমারী মেয়েরা ও বৃদ্ধাদের দীপদান ও শিব পূজার জন্য শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা, অতিথিশালা স্থাপন হয়েছে কিন্তু তাতেও সব কাজ সমাধা হয় নাই। কমপক্ষে ২০০০ (দুই হাজার) টাকা এখনও প্রয়োজন। যে কাজগুলি হয়েছে তা মহাশয়ের সিপাইদের জিজ্ঞাসা করলেই জানতে পারবেন। মহারাজ তৎক্ষণাৎ দেওয়ানকে ডেকে বললেন— যেহেতু মোক্তার তার বিনা অনুমতিতে সরকার থেকে টাকা নিয়েছে, সেই হেতু তার মাসিক বেতন থেকে টাকা আদায় করতে হবে। মোক্তারের মাসিক বেতন ছিল ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা। মহারাজা চিন্তা করলেন, মাসে ৫০ টাকা করে আদায় করলে মোক্তারের পরিবার ও পোষ্যরা অনাহারে মারা যাবে। কিন্তু রাজার আদেশ নড়চড় হওয়ার নয়; তিনি সেইদিন হতেই মোক্তারের বেতন ১০০্ টাকা করলেন এবং নির্দ্ধরিত ১০০ (একশত) টাকা থেকে ৫০্ টাকা করে কেটে নেওয়া হবে। এইভাবেই মোক্তারের দণ্ড বিধান করেন। অতঃপর অভিযোগকারী কর্মচারীকে ডেকে বললেন, "দেখ! আমি মোক্তারের ত কোন দোষই দেখিতে পাইলাম না। টাকা লইয়া ঐ ব্যক্তি নিজার্থে এক কপর্দ্দকও ব্যয় করে নাই। যে জন্য ব্যয় করিয়াছে, তাহাতে অর্থের সার্থকতাই সম্পাদন হইয়াছে। আমিও অর্থ লইয়া ইহা অপেক্ষা কি সদ্ব্যয় করিতাম!" (রাজবংশানুচরিত, পৃঃ ১৪৩) মহারাজের এই কথার পর কর্মচারী মহাশয় লজ্জিত হয়ে নিরুত্তর রইলেন।

এখানেই বোঝা যায় তেজচাঁদ কত উন্নত এবং উদার মনোভাবাপন্ন ছিলেন। সভা সমক্ষে তিনি মোক্তারের দণ্ড বিধান দিলেন মহারাজকে না বলে টাকা নেওয়ার জন্য; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কি রাজার কোন দণ্ড দেওয়া হলো? না, প্রতি মাসে ৫০ টাকা হিসাবে আদায় দিলে ১০০০০০্ (এক লক্ষ) টাকা উসুল হতে কত বছর লাগবে তা তিনি ভালভাবেই বুঝতেন এবং ১৬৬ বছর কেউই জীবিত থাকবেন না।

মহারাজ তেজচাঁদ বাহাদুরের একটি বিশেষ গুণের কথা 'রাজবংশানুচরিত'এ উল্লেখ

আছে, যা তাঁর পূর্ব্ববর্তী এবং পরবর্তী রাজাদের দেখা যায় নাই; সেই বিশেষ গুণটি হলো সর্পাঘাত রোগীর চিকিৎসা। তিনি "সর্পাঘাতের অতি উ;ৎকৃষ্ট ঔষধ জানিতেন। তাঁহার অনুমতি ছিল যে, তিনি যখন যেখানে, যে অবস্থায় থাকুন না কেন, কোন সর্পাঘাতের রোগী আসিলেই যেন তাঁহাকে সংবাদ দেওয়া হয়। সংবাদ পাইবা মাত্র তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিকার করিতেন। তাঁহার প্রদত্ত ঔষধে বহু রোগী আরোগ্যলাভ করিয়াছিল।" (রাজবংশানুচরিত পৃঃ ১৪৪)

সর্পাঘাতের চিকিৎসা বিষয়ক তাঁর একখানি পুঁথি ছিল। সেই পুঁথিটি সরস্বতী পূজার সময় প্রতিমার সম্মুখে দেওয়া হতো এবং নাগপঞ্চমী তিথিতে মনসা পূজার সময়ও পুঁথিখানি পূজিত হতো। ঐ পুঁথিখানি বর্তমানে আছে কিনা জানা যায় না।

শেষাংশ

মহারাজ তেজচাঁদ ছিলেন একজন প্রকৃত মহানুভব রাজা। তাঁর কীর্তি অসীম। তিনি ছিলেন বিদ্যোৎসাহী; শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর অবদান কম ছিল না—ইংরাজী শিক্ষা ক্ষেত্রে উচ্চ ইংরাজী (H.E.) বিদ্যালয় স্থাপন; উচ্চশিক্ষার জন্য কলেজ, শিক্ষাপ্রসারে মিশনারীদের অর্থদান, কলকাতায় কলেজেও অর্থদান; অন্যদিকে সংস্কৃত শিক্ষার জন্য চতুষ্পাঠী স্থাপন যা সেই সময়ে ছিল ভারত প্রসিদ্ধ, যেখানে ছাত্ররা বিনা ব্যয়ে অধ্যয়নের সুযোগ পেত, ছাত্রাবাসে বসবাসকারী শিক্ষার্থীরা বিনা মূল্যে আহার্য পেতো।

তিনি গুণগ্রাহী নরপতিও ছিলেন। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় বহু কবি-পাঁচালীকার কবিয়াল সভা অলঙ্কৃত করতেন। তিনি তাঁর সভাশ্রিত বহু কবি, শিল্পীদের সংসার নির্বাহের জন্য জমি দান করেছিলেন এবং অনেকে তাঁর বৃত্তিভোগীও ছিলেন। কোলকাতার কবিয়াল 'হরুঠাকুর' আরও আরও অনেকে তাঁর পোষকতা লাভ করেছিলেন। প্রজানুরঞ্জন, আর্তত্রাণে তাঁর অবদান অসামান্য তা অস্বীকার করার উপায় নাই। তিনি অনেক রাজপথ নির্মাণ করিয়েছিলেন। শুধু পথ নির্মাণই নয় ,পথ পার্শ্বে পান্থ নিবাস পুষ্করিণী ও কূপ খনন এবং তত্রস্থ স্থানে শিব মন্দির স্থাপন, পীঠস্থানে মন্দির প্রতিষ্ঠা, বঙ্গদেশ (অখণ্ড) ও ভারতবর্ষের বিভিন্ন তীর্থস্থানে দেব বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা, নিত্য সেবার ব্যবস্থার মাধ্যমে বহু দুঃখী ও দীন-হীনদের অন্ন সংস্থান, কত শত নিরাশ্রিতকে ভূমিদান করে আশ্রয় দিয়েছেন তা বলে শেষ করা যায় না।

বন্যাত্রাণে মহারাজ তেজচাঁদের ত্রাণকার্যের তুলনা নাই। প্রতিবছর দামোদরের বন্যায় নদের উভয় তীর প্লাবিত হয়ে লোকের যে দুর্দশা হতো তা বর্ণনা করা দুরূহ। সেই

প্লাবন প্রতিরোধকল্পে জনৈক ইংরাজ ইঞ্জিনিয়ারকে দিয়ে বাঁধ নির্মাণ তাঁর এক অক্ষয় কীর্তি ঘোষণা করে চলেছে আজও। বর্তমানে পাঁচশালা পরিকল্পনা গ্রহণ করে বহু অর্থ ব্যয়ে সেই বাঁধকে ভিত্তি করেই কারিগরি হয়েছে, বর্ধমান সদরঘাটে পারাপারের জন্য বিরাট সেতু নির্মিত হয়েছে, তবুও সে স্মৃতি আজও বিলুপ্ত হয় নাই। তারপর '৩০-এর' বন্যা (১২৩০ সাল, ইং ১৮২৩) মহা জলপ্লাবনে কত গ্রাম, বাড়ী ঘর, গবাদিপশু, মানুষজন প্রাণ হারিয়েছিল তার কোন হিসাব নাই। মহারাজ একক সেই সমস্ত মানুষকে অন্নদান, আশ্রয়হীনকে ভূমিদান, কৃষকদের জমিদান করেছিলেন তার কোন হিসাব-নিকাশ নাই। তাঁর এই ত্রাণকাজে সন্তুষ্ট হয়ে তৎকালীন গভর্ণর জেনারেল লর্ড আমহার্ষ্ট মহারাজকে একখানি তরবারি উপহার দেন।

তেজচাঁদ বাহাদুর লোকসংস্কৃতির ধারক ও বাহক ছিলেন। তিনি যেখানে দেবকীর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সেই দেবকীর্তিকে অবলম্বন করে বিভিন্ন পার্বণ, উৎসব মেলার প্রচলন করেন। সেই উপলক্ষে রামায়ণ গান, ভাগবত পাঠ, কৃষ্ণযাত্রা, কবির লড়াই হতো বহুদিন যাবৎ, মেলায় আসতো গ্রাম্য শিল্পীদের বহু শিল্পকর্ম। এই সব পার্বণে হতো বহুজন সমাগম; তাতে লোক-শিক্ষা, লোক-সংস্কৃতি ও লোক-শিল্পের প্রচার হত, শিল্প সামগ্রীর ক্রয়বিক্রয়ে অনেক নিম্নবিত্তের অন্ন সংস্থান হত। আর ঐ দেবদেবীর ভোগের প্রসাদে বহু গরীব-দুঃখীও ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে পারতো।

মহারাজ তেজচাঁদ বিভিন্ন স্থাপত্য শিল্পেরও ছিলেন বিশেষ অনুরক্ত। অম্বিকাকালনার নবকৈলাশ মন্দির তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। স্থানে স্থানে যে সব মন্দির, দেউল, শহর বর্ধমানে রাধাবল্লভজীউ মন্দির, রাজ কলেজিয়েট স্কুল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানগুলির স্থাপত্যশৈলী, তারপর নদী পারাপারের যেসব সেতু নির্মিত হয়েছিল এবং এখনও যা বিদ্যমান তা সকলই মহারাজের স্থাপত্য শিল্পরুচির পরিচায়ক।

এই সব কীর্তিকলাপ সম্বন্ধে প্রসঙ্গত উল্লেখ্য রাজবংশানুচরিতের লেখক মন্তব্য করেছেন, তৎকালে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীর দাম খুবই কম; প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যেত। কাজেই "কিয়ৎপরিমাণে অর্থশালী হইলেই লোকে দেবতা স্থাপন, পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করতঃ . . . . দেশের হিতানুষ্ঠান করিতেন।" তিনি "১১৮৭ সালে ইং ১৭৮১ খৃঃ কাঁটোয়ার সন্নিকটস্থ কোন গ্রামে জনার্দ্দন শর্ম্মার বাটীতে দুর্গোৎসব হওয়ায় তারই খরচের ফর্দ্দ" দিয়েছেন। পূজোয় মোট খরচ হয়েছিল ৮৫ (পাঁচাশি টাকা পনেরো আনা)। শুনে মনে হয় এ যেন আজগুবি অথবা গঞ্জিকা সেবীর উপাখ্যান। ফর্দটির পঠিতব্য অংশটুকু উদ্ধৃত হলো ঃ—

প্রতিমা —	৫৲	কাপড় —	৮৲
পুরোহিতের দক্ষিণা —	৮৲	উত্তম আতব চাউল, —	২।. (২টাকা চার আনা)
ভাল চাউল ১৭ মন	৬।. (ছয় টাকা চার আনা)	কলাই	।।. (৮ আনা)
ঘৃত ১ মন	৫৲	গুড়	৬৲
ময়দা ৪ মন	২। (২টাকা চার আনা)	দধি	৫৲
ক্ষীর	৫৲	দুগ্ধ	৩৲
সন্দেশ	৭৲	চিনি	।।. (৮আনা)
তরকারিদিগর	২৲	কাষ্ঠ	২৲
তৈল ১।।. মন (দেড় মন)	২৲	নারিকেল	২৲
ফলফুলারি	১৲	লবণ	।।. (আট আনা)
মসলাদিগর	১ (১টা. ২ আনা)	পান সুপারি	১৲
চূর্ণ	১০ (২ পয়সা)	শপ ১টি	।।. (আট আনা)
চন্দন ধূপ বাবদে	।১০ (৬ আনা ২ পয়সা)	নাপিত	* * *

(১ মন = প্রায় ৩৮ কেজি। ১০ (২ প.) = ১২ ন.প., ।. (৪ আনা) = ২৫ ন.প.)

দ্রব্যমূল্যের একখানি ফর্দ-এর উল্লেখ করে হয়তো বলতে চেয়েছেন ধনবান ব্যক্তির দান খয়রাতি করা সহজ। কিন্তু সে ধারণা সম্পূর্ণ ভুল, কারণ মানুষের দরদী মন, দয়া, মহানুভবতা, বদান্যতা প্রভৃতি মনোভাব না থাকলে কখনই জনসাধারণের মঙ্গল সাধন কর্ম, দীন-দুঃখীদের দুঃখকষ্ট নিবারণ, সমাজকল্যাণ, কোন কাজই করতে পারে না; অর্থ, বিত্ত থাকলেই যে পরোপকার করবে সে ধারণা সম্পূর্ণ মিথ্যা। বর্তমানে যুগোপযোগী বহু ধনবান ও বিত্তবান লোক আছেন, দুঃখ-দারিদ্র প্রপীড়িত মানুষও আছে তাঁরা তো কই তাদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়ান না।

এমন যে, মহানুভব, দীন-দুঃখীদরদী, প্রজাহিতৈষী পরোপকারী মহারাজা তেজচাঁদ, তাঁকেও কলঙ্কিত করা হয়েছিল। তাঁর বাল্যাবস্থায় মাতা বিষণকুমারীই রাজ্য পরিচালনা করতেন। মহারাজ ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দে যখন তাঁর মাতার হাত থেকে রাজ্যভার গ্রহণ করলেন, তখন তাঁর ১৫ বছর বয়স, যৌবনের প্রভাত সময় এবং বিপুল ঐশ্বর্যের মালিক, বন্ধুবান্ধব বহু, তাঁদের প্ররোচনায় বিলাসিতায় ডুবে যান, অপরদিকে অর্থলোভী নীচাশয় রাজকর্মচারীরা সুযোগ বুঝে অর্থ আত্মসাৎ করেন। স্বার্থপর অনুচরবর্গ কুপরামর্শে তাঁকে বিবিধ আমোদ প্রমোদে মত্ত করে রাখতেন। আবার পরাণচাঁদ কাপুর, নিতান্ত দরিদ্র পরিবার থেকে এসে

রাজার বিপুল ঐশ্বর্যে প্রলুব্ধ হয়ে কিভাবে ঐসব ধনসম্পত্তির অধিকারী হওয়া যায়, সেই চিন্তায় তিনি তেজচাঁদকে নারী-সঙ্গদোষে ইন্ধন জুগিয়েছিলেন। সেই সঙ্গে পরাণচাঁদ-ভগ্নী তেজচাঁদের পঞ্চম পত্নীও যুক্ত ছিলেন। সুতরাং বলা যায়, কলঙ্ক যা তাঁর ছিল, তা প্রকারন্তরে তাঁর অঙ্গে লেপন করে দেওয়া হয়েছিল। আর বহুবিবাহ! সে তো তখনকার দিনে সাধারণ কুলীন পরিবারেও বহুবিবাহ (১০/১৫)টির বেশী প্রচলিত ছিল। রামায়ণে রাজা দশরথেরও শতাধিক মহিষী ছিলেন। সুতরাং তেজচাঁদ যে আটটি দার পরিগ্রহ করেন তাতে তাঁর অন্যায় কোথায়? তাঁর ৮ম বার বিবাহ সম্পূর্ণ ষড়যন্ত্রমূলক। কারণ, এই সময় মহারাজের ৬৩ বছর বয়স। এই বয়সে শ্যালক পরাণচাঁদ নিজ ১১ বছর বয়স্কা কন্যা বসন্ত কুমারীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ দেন। ইহাও পরাণচাঁদের কূট চক্রান্ত, তা না হলে সহোদরা ভগ্নীপতির সঙ্গে নিজ অঙ্গজা কন্যার কখনও বিবাহ দেন (১৮২৭খ্রীঃ)। ইতিপূর্বে ১৮২১ খ্রীঃ কমলকুমারী ও পরাণচাঁদের কৌশলে প্রতাপচাঁদ অন্তর্হিত, যদিও মৃত বলে ঘোষণা করা হয়েছিল।

তেজচাঁদ মহারাজা থাকলেও, মহারাণী কমলকুমারী ও পরাণচাঁদের একপ্রকার হাতের পুতুল হয়েছিলেন।

প্রসঙ্গত মহারাণী বসন্তকুমারীর সম্বন্ধে কিছু আলোকপাত করা দরকার।

বসন্ত কুমারী— বসন্ত কুমারীর জন্ম ১৮১৬ খ্রীঃ ৪ঠা ফেব্রুয়ারী। ১১বছর বয়সে যখন তাঁর বিবাহ হয় তখন তিনি নিতান্ত বালিকা-সংসার সম্বন্ধে তাঁর কোন ধারণাই ছিলনা।মহারাজ তেজচাঁদের মৃত্যুর সময়, ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর বয়স ছিল প্রায় ১৬ বছর। বসন্ত কুমারী ছিলেন অসামান্যা লাবণ্যময়ী ও রূপবতী এবং বুদ্ধিমতীও। মহারাজ তেজচাঁদ মৃত্যুর পূর্বে তাঁকে নূতন চীনাবাজারসহ কোলকাতার ও বর্ধমানের বহু স্থাবর সম্পত্তি দান করে যান। কিন্তু ২১ (একুশ) বছর বয়স না হওয়ায় সম্পত্তি ভোগ দখল করতে পারেন নাই। ২১ বছর বয়স উত্তীর্ণ হলে বসন্তকুমারী উক্ত সম্পত্তি যাতে স্বাধীনভাবে ভোগ দখল করতে পারেন তজ্জন্য সুপ্রিম কোর্টে নালিশ করেন। তাঁর হলফনামায় বলা হয়েছিল, পরাণচাঁদ ও কমলকুমারী তাঁকে প্রকারান্তরে নজরবন্দী করে রেখেছিলেন। বর্ধমানের ম্যাজিষ্ট্রেট ও জজ সাহেবের কাছে আবেদন করেও কোন ফল হয় নাই। বসন্তকুমারীর উকীল ডব্লিউ. এন. হেজর ১৮৩৯ খ্রীঃ সেপ্টেম্বর মাসে সদর দেওয়ানী আদালতে নালিশ করায় জজ সি. টুকার আদেশ দেন- – রানি তাঁর সমস্ত সম্পত্তির পরিচালনভার তিনি স্বয়ং গ্রহণ করতে সক্ষম। নগর দেওয়ানী আদালতের রায় বর্ধমানের জজ সাহেব নানা অজুহাতে স্থগিত রাখার চেষ্টা করায় তাঁকে সাসপেণ্ড করা হয়।

ঐ মামলা চলাকালীন মহারাণী বসন্তকুমারীর চীনাবাজার প্রভৃতি সম্পত্তির ভাড়া

আদায় করতেন তাঁর কর্মচারী মদনমোহন কাপুর। তিনি তাঁকে কর্মচ্যুত করে উইলিয়ম প্রিন্সেপ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ও হেজর সাহেবকে সেই দায়িত্ব প্রদান করে ১৮৩৮ খ্রীঃ ১১ জুলাই তারিখে এক নোটিশ জারী করেন। মহারানী বসন্তকুমারী বুঝতে পেরেছিলেন, অর্থগৃধ্নু পিতা লোভে ও শঠতা করে তাঁকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিতা করে রেখেছিলেন।

বর্ধমান ও কোলকাতায় মামলা তদারকির জন্য রাণী বসন্তকুমারীকে কলকাতা যেতে হতো। তখন তাঁর এটর্নি কার টেগোর এণ্ড কোম্পানীর উকিল দক্ষিনারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে প্রায়ই তাঁর দেখা সাক্ষাৎ হতো। সুপুরুষ ও সুদর্শন দক্ষিণারঞ্জনের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং বিপত্নীক দক্ষিণারঞ্জনও মহারাণীর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হন। শেষে উভয়ের মধ্যে প্রেমের সঞ্চার হয়। মোকদ্দমা তদারকির জন্য বসন্তকুমারী কোলকাতাতেই থেকে যান। সম্ভবতঃ ১৮৪৩-৪৯ খ্রীঃ-এর মধ্যে তাঁদের হিন্দু মতেই বিবাহ হয়। বিবাহের পৌরহিত্য করেন 'গুড়গুড়ে ভট্টাচার্য' ওরফে গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য। অসবর্ণ বিবাহ অসিদ্ধ হওয়ার আশঙ্কায় তখনকার পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেট বার্চ সাহেবকে সাক্ষী রেখে এই সিভিল ম্যারেজ সম্পন্ন হয়েছিল। কর্মসূত্রে নানস্থানে অবস্থান করার পর শেষজীবনে তাঁরা অযোধ্যা ও লক্ষ্ণৌ-এ বসবাস করেন। তাঁদের এক পুত্র ও দুই কন্যা সন্তান ছিল। দক্ষিণারঞ্জন ১৮৭৮ খ্রীঃ এবং বসন্তকুমারী ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন।

এঁদের ভালবাসাকে কেন্দ্র করে টমাস এডওয়ার্ড অতিরঞ্জিত করে বহু মুখরোচক সংবাদ প্রচার করেছিলেন।

দুঃখের বিষয়, মহানুভব মহারাজ তেজচাঁদ নানা ঘাত সংঘাতের মধ্য দিয়ে, প্রথম যৌবনের কলঙ্ক-মাথায় নিয়ে তিনি ইহলীলা সংবরণ করেন ১৮৩২খ্রীঃ ১৬ই আগষ্ট, বাং সন ১২৩৯ সালের ২রা ভাদ্র। সঙ্গম রায়ের বংশধর আজও অম্বিকা কালনায় রাজবাটীতে চিরশান্তির কোলে বিশ্রাম নিচ্ছেন।



উত্তরফটক (রাজবাটী, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়)

মহারাজা প্রতাপচাঁদ

প্রতাপচাঁদ (১৭৯১-১৮২১/৫৬) ঃ– বৰ্দ্ধমান রাজপরিবারের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ভাগ্য বিড়ম্বিত রাজা, প্রতাপচাঁদ। কূটচক্রী পরাণচাঁদের চক্রান্তের বেড়াজালে আবদ্ধ প্রতাপচাঁদ সেই নিগড় ছিন্ন করতে পারেন নাই। সেইজন্য পিতামহীর মৃত্যুর (১৭৯৮খ্রীঃ নভেম্বর) পর, তখন প্রতাপচাঁদের বয়স প্রায় ৮ বছর (সাত বৎসর এক মাস) বড় হ'তে হয়েছিল একজন তত্ত্বাবধায়কের তত্ত্বাবধানে, যদিও পিতা জীবিত ছিলেন।

মহারাজ তেজচাঁদের ৬ষ্ঠ মহিষী নানকীকুমারীর গর্ভজাত সন্তান প্রতাপচাঁদের জন্ম ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে অক্টোবর (বাংলা ১১৯৮ সালের ১০ই কার্তিক) তারিখে। কিন্তু তাঁর জন্মের ৩ দিন পরে মাতা নান্‌কীকুমারীর মৃত্যু হয়। কাজেই মাতৃবিয়োগের পর পিতামহী বিষণকুমারীর স্নেহে ও আদর যত্নে লালিত-পালিত হন। কিন্তু ৭বছর অতিক্রম ক'রে ৮ম বছরে পদার্পণ করলে তাঁর ভাগ্যবিপর্যয় শুরু হয়। বিষণকুমারী, মৃত্যুর পূর্বে তাঁর জমিদারী প্রতাপচাঁদকে তাঁর নামে হস্তান্তরিত ক'রে দিয়েছিলেন।

নাবালক প্রতাপচাঁদের পক্ষে গঙ্গানারায়ণ মিত্র তাঁর তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হন। মহারাণী বিষণকুমারীর জমিদারী, প্রতাপচাঁদকে হস্তান্তরকরণ, প্রথমে অস্বীকার করলেও পরে এই ব্যবস্থাকে মহারাজা তেজচাঁদ ও বর্ধমানের কালেক্টর মানতে বাধ্য হন। গভর্ণমেন্টের সহিত গঙ্গানারায়ণ মিত্রের যে পত্রাদি আদান প্রদান হয় তার থেকে জানা যায়,– প্রতাপচাঁদ মহারাণীর অধিকৃত জমিদারী সহ 'মহারাজা' উপাধি ব্যবহার করার অনুমতি লাভ করেছিলেন। প্রতাপচাঁদের পক্ষে বোর্ডকে অবগত করার জন্য গঙ্গানারায়ণ মিত্র লিখেছেন — *"Petition from Maharajadhiraj Pratap Chand Bahadur,informing the Board that his grand mother, the late Rani, left the whole of the Zamindari of Burdwan to him and praying to be allowed to pay the revenue through his agent, and enjoy his estate (7818) dated-2.01.1799"*

পরবর্তী পত্র, গঙ্গানারায়ণ মিত্র, তত্ত্বাবধায়ক বা সরবরাহকার হিসাবে বোর্ডকে জানাচ্ছেন — *"Petition from Ganganarayan Mitra, Manager (Sarbarahakar) of Maharaj Pratap Chand, informing the Board that he delivered a*

petition and a voucher (chalan) for the instalment due to the end of Kartik, together with the Rani's will, to the Collector of Burdwan, who would not accept it, and praying to be allowed to pay the money at Board's Office.(7819) dated 2.01.1799." এর উত্তরে কালেক্টর জানাচ্ছেন – *"Letter from Collector of Burdwan in reply to orders of 2nd January requiring a report upon the claim of Maharaja Pratap Chand to the Zamindari of Burdwan, in virtue of a mortgage deed (Hebanama) said to have been executed in his favour by the late Rani. (7999) Dated 9.04.1799."*

বাল্যে প্রতাপচাঁদ ঃ– মহারাজ প্রতাপচাঁদ, মহারাজ তেজচাঁদের ৬ষ্ঠ মহিষী নান্‌কীকুমারীর গর্ভজাত সন্তান। এমনি তাঁর ভাগ্য বিড়ম্বনা যে, জন্মের ৩দিন পরেই তিনি চিরকালের জন্য মাতৃহারা হন। কাজেই একমাত্র পিতামহী মহারাণী বিষণকুমারীর আদর যত্ন ও স্নেহে লালিত পালিত হন। সাত বছর বয়স অতিক্রম ক'রে অষ্টম বর্ষে পদার্পণ করলে তিনি তাঁর পিতামহীকেও হারান। বিষণকুমারীর অন্ধ স্নেহ প্রতাপচাঁদকে প্রথমাবধি উচ্ছৃঙ্খল করে তুলেছিল। ''তিনি বড় দুরন্ত ছিলেন, ঘুঁড়ি উড়াইবার সখ তাঁহার বিশেষ বলবৎ ছিল, একবার ঘুঁড়ির লক পড়িয়া তাঁহার কর্ণের উপরিভাগ কাটিয়া গিয়াছিল। একবার একটা ঘোড়া তাঁর পিঠ কামড়াইয়া মাংস তুলিয়া লইয়াছিল। সে চিহ্ন তাঁহার যাবজ্জীবন ছিল।'' ('জাল- প্রতাপ' - সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোঃ পৃষ্ঠা-১১)। তাঁর দুরন্তপণা কেহ সহ্য করতে পারতেন না। বিমাতা কমলকুমারী ও তাঁর সহোদর ভাই পরাণচাঁদ, সকল সময়ই প্রতাপচাঁদের প্রতি রুষ্ট থাকতেন। ফলে সুযোগ পেলেই তিনি পরাণচাঁদের পেছনে লাগতেন। ''জনশ্রুতি আছে যে, একদিন প্রতাপচাঁদ পরাণবাবুর পশ্চাদ্দেশে কলিকা পুড়াইয়া ছাপ দিয়াছিলেন।'' ('জালপ্রতাপ', সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা-১১)।

শিক্ষা ঃ– অত্যন্ত আদরে লালিত হয়েছিলেন বলেই প্রতাপচাঁদের বাল্য শিক্ষা প্রায়ই কিছুই হয় নাই। গোলকচাঁদ ঘোষ নামে এক ব্যক্তি তাঁকে ইংরাজী পড়াতে আসতেন। তবে তাঁর সাধারণ লেখাপড়া বিশেষ কিছু হয় নাই। তাঁর কতকগুলি মোগল দেহরক্ষী ছিল। তাদের জমাদ্দার (হাবিলদার অপেক্ষা পদমর্যাদায় উচ্চপদ) ছিল আগা আব্বাস আলি। আব্বাস আলিই তাঁকে অশ্বারোহন ও অস্ত্রচালনা শিক্ষা দিত। প্রতিদিন সকালে তাঁকে কুস্তি শিখতে হতো, তারপর সঙ্গীত শিক্ষা; পরে সাঁতার

শিক্ষা ছিল নিয়মিত কর্ম। আগা আব্বাস আলি ছায়ার মত তাঁর সঙ্গে থাকতো। তাকে সঙ্গে নিয়ে বহু দুঃসাহসিক কাজ তিনি করতেন।

স্বভাব ঃ– "প্রতাপচাঁদকে দেখিতে শ্যামবর্ণ, একহারা অথচ বলিষ্ঠ পুরুষ ছিলেন। অল্প বয়সে ভারীত্ব এতদূর জন্মিয়াছিল, যে অনেক বড় বড় লোক তাঁহার নিকট কুণ্ঠিত হইত, অথচ তাঁহার আহ্লাদ আমোদ সর্বদাই ছিল, হাসি ভিন্ন কথা কহিতেন না। লোকে বলে, তিনি ইংরেজ ঠেঙ্গাইতে আরও মজবুত ছিলেন।" ('জালপ্রতাপ' - সঞ্জীব চট্টোঃ পৃঃ- ১২-১৩)। তাঁর ধারণা ছিল, "ধোপা নাপিতের ছেলেরা এ দেশে সিবিল সার্ভেণ্ট *(Civil Servant)* হইয়া আসে। তাহাদের দাম্ভিকতা তাঁহার সহ্য হইত না।" ('জালপ্রতাপ' পৃঃ- ১৩)। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, "একবার তাঁহার সহিত পথে একজন মেজেষ্টারের (ম্যাজিষ্ট্রেট) দেখা হইয়াছিল। মেজেষ্টার সাহেব সেইসময় তাঁহার বগি একপার্শ্বে (ঘোড়ার গাড়ী) লইয়া যান নাই, কি এই রূপ একটা সামান্য ত্রুটি করিয়াছিলেন, প্রতাপচাঁদের নিকট ইহা 'বেয়াদবি' বলিয়া মনে হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ বগি হইতে মেজেষ্টারকে নামাইয়া আগাগোড়া বিতাইয়া দিলেন।" ('জালপ্রতাপ' পৃঃ- ১৩)। শোনা যায় প্রতাপচাঁদের নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা বেরিয়েছিল। ফল কি হয়েছিল জানা যায় না। কিন্তু অপরাপর সম্ভ্রান্ত ইংরেজ সাহেবরা তাঁর কাছে আসতেন, পল্টনের (সৈন্য বিভাগ) একজন বিশিষ্ট ডাক্তার স্কট সাহেব তাঁর অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। তাঁদের সঙ্গে আমোদ-প্রমোদে, পান-ভোজনে মত্ত থাকতেন। 'মেদেরা মদ' তাঁর নাকি খুব প্রিয় ছিল। তিনি যখন চুঁচুড়ায় রাজবাটীতে থাকতেন তখন দিনেমার গভর্ণর ওবারবেক সাহেব, হাজি আবু তালিব প্রভৃতি প্রধান প্রধান ব্যক্তি বর্গের সঙ্গে আমোদ আহ্লাদ করতেন। তিনি ইংরেজ সাহেবদের সঙ্গে মেলামেশার জন্য অনর্গল ইংরাজী বলতে পারতেন এবং ইংরাজীতে ভাল পত্রাদি লিখতে পড়তে পাড়তেন। প্রতাপচাঁদ অত্যন্ত তীক্ষ্মধী ছিলেন। তিনি স্পষ্টতই বুঝতে পারেন, পরাণচাঁদ তাঁদের জমিদারীর সর্বময় কর্তৃত্ব করছেন, মহারাজ তেজচাঁদ নামে মাত্র রাজা। " সেইজন্য কৌশল করিয়া পিতার নিকট হইতে সমুদয় বিষয় লিখিয়া লইয়াছিলেন।" ('জালপ্রতাপ' পৃঃ- ১৪) পরাণচাঁদ তাতে অত্যন্ত মনে মনে ক্ষুব্ধ ও ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে ওঠেন। প্রতাপচাঁদ ছিলেন অত্যন্ত মদ্যপায়ী। সেই সুযোগকে পরাণচাঁদ কাজে লাগিয়েছিলেন; পরে সে বিষয়ে আলোচনা করা হবে। তাঁর স্বভাবের আর একটি দিক ছিল, তিনি গরীব দুঃখী দরদী ছিলেন। রাজবাড়ী থেকে ভিখারীদের মুষ্টি ভিক্ষা দেওয়া হতো। তিনি তার পরিবর্তে প্রত্যেক ভিখারীকে পূর্ণ মাত্রায়

চাল, ডাল, নূন, তেল অর্থাৎ যে পরিমাণ দ্রব্য তাদের প্রয়োজন তা দেওয়ার নিয়ম করেন।

প্রকৃতপক্ষে দেখা যায় প্রতাপচাঁদ, বাল্য হতেই ভীষণ জেদী ছিলেন। যদি কেহ তাঁর বিরূপতা করতেন তিনি তাঁকে উচিত সাজা দিতেন; তিনি দীনদুঃখী দরদী ছিলেন, তীক্ষ্ম বুদ্ধি সম্পন্ন ছিলেন। তাঁর সর্বাপেক্ষা দোষ, তিনি পানাসক্ত ছিলেন। দেব-দ্বিজে তাঁর ভক্তি ছিল। প্রতাপচাঁদ শাক্ত সাধক কমলাকান্তের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন; তাঁকে আন্তরিক ভক্তি-শ্রদ্ধা করতেন।

প্রতাপচাঁদের রাজ্য প্রাপ্তি ও পরিচালনা ঃ— ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রতাপচাঁদ পিতার নিকট রাজ্য বা জমিদারীর ভার গ্রহণ করেন। প্রতাপচাঁদকে সকলেই 'ছোট রাজা' বলতেন। তিনি অতি দক্ষতার সঙ্গে রাজকার্য পরিচালনা করেন। পূর্বেই বলা হয়েছে তিনি মুষ্টি ভিক্ষার পরিবর্তে ভিখারীদের খুন্নিবৃত্তির মত চাল, ডাল, প্রভৃতি দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। পূর্বে কোষাগারে অর্থ সঞ্চয় হতো না। প্রতি লাটে খাজনা দেওয়ার সময় টাকা কর্জ করতে হতো। তিনি আমলাদের সতর্ক করে দেন তাতে চুরি অনেক কমে যায়। তিনিই প্রথম নিয়ম করেন, টাকা আদায় মাত্র 'হৌজে' ফেলে দিতে হবে। এই প্রথায় অর্থ ক্রমে ক্রমে জমতে থাকে।

তৎকালে নিয়ম ছিল, প্রতি মাসে রাজস্ব সূর্যাস্তের পূর্বে গভর্ণমেন্টকে দিতে হতো। সমুদয় রাজস্ব ঠিক সময়ে দিতে না পারলে জমিদারী নিলাম হয়ে যেত। মহারাজ প্রতাপচাঁদ চিন্তা করতে থাকলেন এই ব্যবস্থার পরিবর্তন অবশ্যই করণীয়।

যাইহোক, ১৮১৬ খ্রীঃ মে মাসে, গভর্ণরজেনারেল বাহাদুর, মহারাজ প্রতাপচাঁদের সম্মানার্থে নিম্নলিখিত খেলাত প্রদান করেন। —

জামা	—	১	মাতরমালা ১ ছড়া	—	১১৫০
নিমা আস্তিন	—	১	শিরপেঁচ ১ টি	—	৫০০
বদি	—	১	হস্তী ১ টি	—	৮০০
গোস্ওয়ারী	—	১	ঝালরদার পাল্কী ১ খানি	—	১৮০০
শিরপেঁচ	—	১	হস্তীর ঝুল ১ খানি	—	৬২৫
পাগড়ি	—	১	ঢাল ও তলওয়ার ১ দফা	—	৯৫
কোমড় বন্দ	—	১			
৭ পারচা	মূল্য — ৫০০ টাকা				৪৯৭০

অতঃপর মহারাজ প্রতাপচাঁদ দেখলেন, ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত

প্রকৃতপক্ষে কোন ফলপ্রদই হয় নাই। মাসে মাসে নির্দিষ্ট সময় মধ্যে রাজস্ব আদায় দিতে না পারলে জমিদারী নিলাম হয়ে যায়; ফলে চিরস্থায়ী হওয়া দূরে থাক, ক্রমান্বয়ে চার বছরের বেশী স্থায়ী হচ্ছে না। বর্ধমান মহারাজের জমিদারী বিশাল ও রাজস্ব বহু টাকা; পত্তনিদারগণ যথা সময়ে খাজনা না দিলেও মহারাজকে তা যে কোন প্রকারে গভর্ণমেণ্টকে টাকা পরিশোধ করতে হতো। মহারাজ প্রতাপচাঁদ বোর্ডকে এই প্রকার রাজস্ব আদায়ের প্রথার ক্রটি বিচ্যুতির উল্লেখ করে, বছরে ৪কিস্তিতে খাজনার টাকা দেওয়ার কথা বলেন এবং বাকী খাজনার জন্য জমিদারের জমিদারী নিলাম করে তা পরিশোধ করার ব্যবস্থা আছে; তেমনি পত্তনিদারদের খাজনা বাকীর জন্য, তাদের জমি নিলাম করে খাজনা আদায় করার ক্ষমতা জমিদারদেরও থাকবে। এক্ষণে মহারাজের আবেদনে উল্লিখিত কারণগুলি পর্যালোচনা করে গভর্ণমেণ্ট ১৮১৯ খ্রীঃ অষ্টম আইন *(Regulation act VIII of 1819)* প্রণয়ণ করেন। ইহা আইন সিদ্ধ হওয়ায় বর্ধমানের রাজার উপকার হয়, তাই নয়, তৎকালে বঙ্গের সমস্ত জমিদারদের জমিদারী স্থায়ী ভাবে রক্ষিত হয়। মহারাজ প্রতাপচাঁদের বুদ্ধিমত্তায় জমিদারীর স্থায়ী বিধি ব্যবস্থা হলেও তিনি বেশীদিন সিংহাসনে আসীন থাকতে পারেন নাই; ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁকে সিংহাসন ফেলে চলে যেতে হয়েছিল। এই অল্প সময়ে বর্ধমান ষ্টেশনের উত্তরে একটি ব্যবসা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে ঐ অঞ্চলটি 'বাজেপ্রতাপপুর' নামে খ্যাত। সর্বমঙ্গলা দেবালয়ের সম্মুখে যে রাস্তাটি বরাবর জি-টি রোডে গিয়ে মিশেছে; সেই রাস্তার পাশেই তিনি একটি দেবালয় স্থাপন ক'রে সেখানে একটি শিব প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে সেটি 'প্রতাপেশ্বর শিব' নামে খ্যাত।

পরাণচাঁদ কপূরের কথা ঃ– এক্ষণে, পরাণচাঁদ কপূর যে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকবেন তা অবিশ্বাস্য। তিনি সুচতুর, দুই ভাই বোনে (মহারাজ তেজচাঁদের ৫ম মহিষী কমলকুমারী) সুযোগ সন্ধানের চেষ্টায় ছিলেন। তৎপূর্বে, লালাপরাণচাঁদের রাজ পরিবারে অনুপ্রবেশের কথা বলা প্রয়োজন।

লাহোর নিবাসী কাশীনাথ কপূর, স্ত্রী এবং দুই কন্যা কমলকুমারী, অম্বিকা ও পুত্র পরাণচাঁদ সমভিব্যাহারে শ্রীশ্রী জগন্নাথ দর্শনোদ্দেশে বর্ধমানে উপনীত হন। সেইসময় উক্ত পরিবারের সঙ্গে মহারাজ তেজচন্দ্রের পরিচিতি ঘটে। কমলকুমারী অসামান্যা রূপলাবণ্যময়ী ছিলেন; তাঁর রূপে মুগ্ধ হয়ে মহারাজ তাঁকে বিবাহ করেন।



মহারাজা প্রতাপচাঁদ



মহারাজ তেজচাঁদের এবং মহারাজ প্রতাপচাঁদের গুরু সাধক কবি কমলাকান্ত

তদবধি রাজানুগ্রহে কাশীনাথ কপূর সপরিবারে বর্দ্ধমানেই বসবাস করেন। কাশী[illegible] কন্যা অম্বিকা বিবির বিবাহ হয় বর্দ্ধমানে বসবাসকারী গোপালচন্দ্র মেহেরার সঙ্গে। অম্বিকা বিবির কন্যা আনন্দকুমারীর সঙ্গে প্রতাপচাঁদের বিবাহ হয়। সুতরাং মহারাজ তেজচাঁদ ও তৎপুত্র প্রতাপচাদ উভয়ের সঙ্গেই পরাণচাঁদ কপূরের যোগসূত্র ছিল। বলা যেতে পারে এই যোগ সূত্র ধরেই পরাণচাদ কপূর বর্দ্ধমান রাজের দেওয়ানী পদ প্রাপ্ত হন।

পরাণচাঁদের কূট কৌশল ঃ— পরাণচাঁদ কপূর সাধারণ পরিবারের সন্তান। তিনি বর্দ্ধমান রাজ পরিবারের ধনশালীতায় প্রলুব্ধ হয়ে তা করায়ত্ত করায় সচেষ্ট ছিলেন। মহারাজ তেজচাঁদের এক মাত্র বংশধর প্রতাপচাঁদকে সরাতে পারলে, পরাণচাঁদ এই বিশাল জমিদারীর সর্বেসর্বা হতে পারবেন।

পিতাপুত্র বিবাদ ঃ— মহারাজ তেজচাঁদ ছিলেন পরম বৈষ্ণব তাঁর পানদোষ [illegible] না। প্রতাপচাঁদ ছিলেন শাক্ত কমলাকান্তের অত্যন্ত অনুরক্ত। পরাণচাঁদ মহারাজকে বোঝালেন, কমলাকান্তের প্রভাবে [illegible] প্রতাপচাঁদ মদ্যপায়ী হয়েছেন। তখন মহারাজ কমলাকান্তের প্রতি অত্যন্ত [illegible], তাকে অত্যন্ত অশ্রদ্ধা করেন; প্রতাপের [illegible] হয় না, পিতা সাধকের প্রতি [illegible] অন্যায় আচরণ করেন, এই ঘটনাকে অবলম্বন করেই পিতা পুত্রের মধ্যে বাদ বিসম্বাদ হতে থাকে, শেষে উভয়ের মধ্যে বাক্যালাপ [illegible] বন্ধ হয়ে যায়। পরাণচাঁদ নানা প্রকারে মহারাজ তেজচাঁদকে সাধক কমলাকান্তের প্রতি তীক্ষ্ণভাবে বিদ্বিষ্ট [illegible] করে তোলেন এবং একদিন সাধককে অসম্মান করেন, রুষ্ট হয়ে তিনি মহারাজকে নির্বংশ হওয়ার অভিশাপ দেন।

দ্বিতীয় চক্রান্ত — প্রতাপচাঁদ [illegible] মদ্যপায়ী ছিলেন এবং তিনি সঙ্গীত পিপাসুও ছিলেন। পরাণচাঁদ কপূর, প্রতাপচাঁদের বন্ধুদের মাধ্যমে তাঁকে প্রচুর পরিমাণে [illegible] ও পশ্চিমদেশীয় কোন সুগায়িকা আনিয়ে তাঁকে কাঞ্চনগর বারদ্বারী প্রাসাদে আমোদ প্রমোদে মত্ত রাখেন।

তৃতীয় চক্রান্ত — প্রতাপচাঁদের বিমাতা, মহারাণী কমলকুমারী (তেজচাঁদের ৫ম মহিষী) বিষ প্রয়োগে তাঁর মৃত্যু ঘটাতে চেষ্টা করেছিলেন।

মহারাণী কমলকুমারীর শেষ চক্রান্ত— যেদিন পশ্চিম দেশীয়া সুগায়িকা আনাইয়া প্রতাপচাদকে বিলাস ভবনে মত্ত রাখা হয়। সেদিন রাত্রের ঘটনা; অন্দরে প্রতাপচাঁদের

কক্ষটি ফুলশয্যার ঘরের মত সাজানোর নির্দেশ দেন মহারাণী কমলকুমারী। ঐ দিন নাকি মহারাজের বিবাহ-বার্ষিকী। অধিক রাতে সকলের অলক্ষে মহারাণী কমলকুমারী ঐ কক্ষের শয্যায় গিয়েছিলেন। এই সমস্ত কিছুই মহারাজ তেজচাঁদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে কমলকুমারী করেছিলেন। তৎপরে রাত্রির শেষ যামে প্রায় মত্ত অবস্থায় প্রতাপচাঁদ বিলাসভবন থেকে তাঁর ঘরে পালঙ্কে গিয়ে শয্যাগ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে কমলকুমারী লুক্কাইত স্থান হ'তে বহির্গত হয়ে প্রতাপচাঁদের শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। প্রতাপচাঁদ তৎক্ষণাৎ গুরু কমলাকান্তের নিকট গিয়ে সকল বৃত্তান্ত প্রকাশ করে প্রায়শ্চিত্তের বিধান চান। এই পরিপ্রেক্ষিতে উল্লেখ্য "হুগলী কোর্টে সাক্ষ্য দানের সময় প্রতাপচাঁদ কোন প্রকারেই তাঁর প্রকৃত অপরাধের উল্লেখ না করলেও তাঁর জবানবন্দীতে পাওয়া যায় – 'ক্রমে অধিক মদ খাইতে লাগিলাম। শেষে অদৃষ্টদোষে গুরুতর পাপগ্রস্ত হইলাম। তখন কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্যের নিকট স্ব-কৃত মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত কি, জিজ্ঞাসা করায়, তিনি ব্যবস্থা দিলেন, এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত তুষানল; তাহা অশক্তে চতুর্দ্দশ বৎসর অজ্ঞাতবাস।' এখন প্রশ্ন জাগে যে মহাপাপটি কোন শ্রেণীভুক্ত। একদিকে বিশাল জমিদারীর মালিক হওয়ার সম্ভবনা এবং পাপ ব্যক্ত না করার জন্য অপর দিকে চরম দারিদ্র্য ও লাঞ্ছনা অপেক্ষা করে আছে; অথচ পৈত্রিক সম্পত্তি ও জমিদারীর জন্য মামলা দায়ের করেও তিনি তা প্রকাশে অনিচ্ছুক। এক্ষেত্রে প্রায়শ্চিত্তের বিধান ('মনুসংহিতা' ১০৪-৫/১১) হতে অনুমান করা যায় যে, অপরাধটি গুরু পত্নীগামী/বা বিমাতৃগামী এই পরিপ্রেক্ষিতে অনুমান করা যায়, কমলকুমারীর যোগাযোগে ও হীন চক্রান্তের দ্বারা তিনি গৃহত্যাগ করতে বাধ্য হন, অবশ্য তেজচন্দ্রের অজ্ঞাতসারে এটি ঘটেছিল। সম্ভবতঃ সুরাপানে মত্ত অবস্থায় কমলকুমারী কর্ত্তৃক প্রতারিত হয়ে প্রতাপচাঁদ শাস্ত্রের বিধান অনুসারে গৃহত্যাগ করতে বাধ্য হন। তিনি অন্যান্য দোষে দোষী হলেও নারীঘটিত কোন দুর্বলতা ছিল না।" ('জালপ্রতাপ' -সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পৃঃ- ১১৯)।

প্রতাপচাঁদ চিন্তা করতে থাকলেন, এই চক্রান্ত থেকে কি ভাবে রক্ষা পাওয়া যায়। এমন সময় মহারাজ প্রতাপচাঁদকে খবর দিলেন, পরাণচাঁদের একটি কনিষ্ঠ পুত্র ভূমিষ্ঠ হয়েছে। প্রতাপচাঁদ এ সংবাদ শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মন্তব্য করেছিলেন "পরাণচাঁদের এই পুত্রটি অষ্টম গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছে; এ বালক নিশ্চয়ই রাজা এবং বর্দ্ধমানের রাজসিংহাসনই প্রাপ্ত হইবে। আমার কাল পূর্ণ হইয়াছে, শীঘ্রই আমাকে এ সংসার পরিত্যাগ করিতে হইবে।" ('রাজবংশানুচরিত' পৃঃ ১৩৩) পরাণচাঁদের

এই পুত্রটি ১৮২০ খ্রীঃ ১৭ই নভেম্বর তারিখে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

প্রতাপচাঁদের অন্তর্ধান রহস্য ঃ— প্রতাপচাঁদ স্পষ্টই বুঝতে পারেন, বর্দ্ধমানে অবস্থান তাঁর পক্ষে নিরাপদ নয়। পরাণচাঁদ ও বোন কমল কুমারী (মহারাণী) যে ভাবে চক্রান্তের জাল বিস্তার করেছে তা ছিন্ন করা সম্ভব নয়। মহারাজ তেজচাঁদের দুর্বলতাই তার প্রধান কারণ। যাইহোক, প্রতাপচাঁদ ১৮২০ খ্রীঃ এর প্রথম দিকে ছদ্মবেশে বর্দ্ধমান থেকে নিরুদ্দেশ হ'য়ে যান। ঐ বছরই ফেব্রুয়ারী মাসে কলকাতায় বাবু রামরত্ন মল্লিকের পুত্রের বিবাহ সভায় উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু ছদ্মবেশে থাকা সত্বেও সকলে তাঁকে চিনতে পেরেছিলেন। তখন সেখানে তিনি অধিকক্ষণ না থেকে বরকে একটি হীরের আঙটি উপহার দিয়ে পুনরায় নিরুদ্দেশ হয়ে যান। খবরটি মহারাজ তেজচাঁদ জানতে পেরে পুত্রের খোঁজে চারদিকে লোক পাঠান। বহু অনুসন্ধানের পর এক মুসলমান কর্মচারীর তৎপরতায় রাজমহলে তাঁর সন্ধান পান। সেখান থেকে তিনি তাঁকে বর্দ্ধমানে ফিরিয়ে আনেন। (তথ্য সূত্র, 'জালপ্রতাপ' - সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পৃঃ-১১৯)। তৎকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত না হওয়ায় পুনঃ নিরুদ্দেশে যাওয়ার পরিকল্পনা করতে থাকেন।

১৮২০ খ্রীঃ নভেম্বর মাসে পরাণচাঁদের নবজাতককে দেখে আসার পর ডিসেম্বর মাসে, সন ১২২৭ সালের পৌষ মাসে একদিন বারদ্বারী বিলাসভবনে বন্ধুদের সঙ্গে কয়েকটি নবাগতা সুকণ্ঠী গায়িকার গানের মজলিসে রাত্রি যাপন করে প্রত্যূষে অন্তঃপুরে যান। পরের দিন বেলা ১০টায় বাইরে খবর আসে প্রতাপচাঁদ অত্যন্ত অসুস্থ। হাকিম আসগর আলি ঔষধ ও লঘু পথ্যের ব্যবস্থা করলেন। পরের দিন একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে। এবার প্রতাপচাঁদ এমনই অসুস্থ হয়ে পড়েন যে কোন চিকিৎসায় ফল হলো না। মহারাজ তেজচাঁদ কলকাতা থেকে বড় ডাক্তার আনিয়ে চিকিৎসার কথা বলেন; কিন্তু তাতে তিনি অস্বীকৃত হন। তিনি পিতা, মহারাজা তেজচাঁদের অজ্ঞাতসারে পালকীতে অম্বিকা কালনা যাত্রা করেন। প্রতাপের অন্তর্হিত হওয়ার এই হলো দ্বিতীয় কৌশল। এই কৌশলটি মানকরের প্রসিদ্ধ চিকিৎসক রাজবল্লভ কবিরাজের পরিকল্পিত। উপস্থিত অসুখের তিন মাস পূর্বে রাজবল্লভ কবিরাজ প্রতাপচাঁদের সঙ্গে দেখা করে বলেছিলেন, তাঁর (কবিরাজের) দিন শেষ হয়ে এসেছে, এবার তিনি অম্বিকায় যাবেন এবং সেখানেই গঙ্গা যাত্রা করবেন। সুতরাং প্রতাপচাঁদ অসুস্থ হলে যেন কালনায় গমন করেন। তৎপরে কবিরাজ মশায় এর নির্দেশ অনুসারেই

তিনি কালনা যাত্রা করেন। এই ভাবে চ'লে যাওয়ার গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো, মহারাণী কমলকুমারীর শেষ চক্রান্ত যা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রতাপচাঁদ কালনা রওনা হয়ে গেছেন এই সংবাদ পাওয়া মাত্র মহারাজ তেজচাঁদও পুত্রের উদ্দেশ্যে অম্বিকা-কালনা যাত্রা করেন, সঙ্গে কোন পুরমহিলা ছিলেন না। কালনায় তিন দিন অবস্থান করার পর ''পুনরায় পীড়া বৃদ্ধি হইতে লাগিল। অন্তর্জলি করার ইচ্ছায় ১২২৭ সালের ২১শে পৌষ (ইং ১৮২১ খ্রীঃ ৩রা জানুয়ারী) রাত্রি দেড়প্রহরের সময় তাঁহাকে গঙ্গা তীরস্থ করা হইল। গঙ্গার ঘাটে কানাত দিয়া তন্মধ্যে তাঁহার অন্তর্জলি করা হইল, সজ্ঞানে তাঁহার গঙ্গালাভ হয়।'' ('রাজবংশানুচরিত' পৃঃ- ১৩৭)। ঘাশীরাম পুরোহিত তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করেন।

এখানে উল্লেখ করা যাক, প্রতাপচাঁদ কোর্টে জজ সাহেবকে কি জবানবন্দী দিয়েছিলেন। ''...........................কমলাকান্ত ভট্টাচার্য ব্যবস্থা দিলেন, এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত তুষানল; তাহা অশক্তে চতুর্দ্দশ বৎসর অজ্ঞাতবাস। তিনি এই সঙ্গে বলিয়াছেন যে এরূপ ভাবে অজ্ঞাতবাস করিবে যে, সকলেই জানিবে --তুমি মরিয়াছ।.................পীড়ার ভান করিয়া কালনায় গেলাম। কালীপ্রসাদকে বলা ছিল সে ভাউলিয়া লইয়া ঘাটে থাকিবে এবং সংকেত সূচক শাখ বাজাইবে; শঙ্খ ধ্বনি শুনিয়া বিকার রোগীর ন্যায় ব্যবহার করিতে লাগিলাম। এরপর অন্তর্জলি যাত্রার ব্যবস্থা হইলে, গঙ্গার পাড়ে আনীত হইলাম। শীতকালের রাত্রে রাজবাড়ীর লোকেরা তাঁবুতে ছিল, সেই অবসরেই নিঃশব্দে সাঁতার দিয়া ভাউলিয়ায় উঠি এবং রাত্রি শেষে সেটি মুর্শিদাবাদের উদ্দেশে যাত্রা করে।'' ('জালপ্রতাপচাঁদ' পৃঃ ১২৪/২৫)।

যাইহোক, যে প্রকারেই হোক, প্রতাপচাঁদের অন্তর্জলি কার্য সম্পন্ন হয়। কিন্তু সর্বাপেক্ষা লক্ষণীয় ব্যাপার এই যে, তৎকালে সেখানে তাঁর দুই পত্নী জ্যেষ্ঠা প্যারীকুমারী এবং কনিষ্ঠা পত্নী আনন্দকুমারী কেহই উপস্থিত ছিলেন না। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন সুতরাং সে প্রশ্নও ওঠে না।

এখানে তাঁর পত্নীদের কথা বলা প্রয়োজন। প্যারীকুমারী মুর্শিদাবাদ নিবাসী টোড়লমল মেহেরার কন্যা, জন্ম ১২০১ সালের ১লা আশ্বিন এবং ১২৬৯ সালে, ২৭ মাঘ (ইং ১৮৬৩, ৮ই ফেব্রুয়ারী) পরলোক গমন করেন। কনিষ্ঠা পত্নী আনন্দকুমারীর কথা পূর্বেই বলা হয়েছে; তিনি হলেন পরাণচাঁদ কপূরের ভাগিনেয়ী (কমলকুমারীর বোন অম্বিকাবিবির কন্যা); জন্ম ১২১১ সালের ২৮শে পৌষ, ইং

১৮০৫ খ্রীঃ ১০ই জানুয়ারী এবং মৃত্যু ১২৭৯ সাল, ২রা পৌষ ইং ১৮৬৮ খ্রীঃ ১৫ই ডিসেম্বর।

অন্তর্জলির পরের ঘটনা — "সেই রাত্রেই বৃদ্ধ মহারাজা তেজচন্দ্ বাহাদুর অম্বিকা হইতে বর্দ্ধমান যাত্রা করিলেন। রাজবাটীতে উপনীত হইয়াই, তিনি ধনাগার খাজনাখানা, তোশাখানা, মহাফেজখানা প্রভৃতি হস্তগত করিয়া স্বয়ং রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন।" (রাজবংশানুচরিত, পৃঃ- ১৩৮)। "প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, প্রতাপের মৃতদেহ তেজচন্দ্রকে বা তাঁর রাণীদের দেখানো হয় নাই।" (জালপ্রতাপঃ পৃঃ- ১২০)। এখানে বক্তব্য, তেজচাঁদ অম্বিকায় উপস্থিত থাকলেও গঙ্গাঘাটে, যেখানে প্রতাপকে কানাত দিয়ে বেষ্টনীর মধ্যে রাখা হয়েছিল, সেখানে ওর উপস্থিতির কথা জানা যায় না; আর সেইসময় তাঁর দুইরাণী ও পুরনারীরা কেহই অম্বিকা-কালনায় গমন করেন নাই।" মৃত্যু হলে সে যুগে উইল সম্পাদন করা ও দত্তক গ্রহণ (নিঃসন্তানের ক্ষেত্রে) করার প্রথা ছিল।........বর্দ্ধমান রাজবংশের আরও প্রথা ছিল যে, কোন ব্যক্তির মৃত্যুর পর তাঁর ভস্ম, সমাজগৃহ নির্মাণপূর্বক রক্ষিত হত; কিন্তু তেজচন্দ্রের মৃত্যুর পর সমাজ নির্মিত হলেও প্রতাপচাঁদের সমাজ দেখা যায় না। ঐ সময় একটা জনপ্রবাদ ছিল যে, প্রতাপচাঁদ মরে নাই -- অন্ধকারে নীরবে রাত্রে নৌকাযোগে পলায়ন করেছে। এ বিষয়ে তেজচন্দ্র অস্বাভাবিক ভাবে নিরুত্তর ছিলেন। তিরোধানের সময়ে প্রতাপচাঁদের বয়স ছিল ২৯ বৎসর ২মাস ১৩দিন।" (জালপ্রতাপ, পৃঃ- ১২০)।

ইত্যাদি বৃত্তান্ত হতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, প্রতাপচাঁদ আদৌ পরলোক গমন করেন নাই; পরাণচাঁদ ও কমলকুমারীর বেড়াজাল থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য এবং পাপের প্রায়শ্চিত্ত নিমিত্ত ১৪ বছর অজ্ঞাতবাসে যাওয়ার ইচ্ছায় তিনি ঐরূপ কৌশল অবলম্বন করেন। এই কৌশলকর্মের প্রথম পরামর্শ দাতা মানকরের রাজবল্লভ কবিরাজ যিনি প্রতাপচাঁদের অন্তর্জলীর পূর্বেই ১২২৭ সালের কার্তিক মাসে অম্বিকাতে পরলোক গমন করেন। দ্বিতীয় পরামর্শদাতা ছিলেন তাঁর গুরু, প্রায়শ্চিত্তের বিধান দাতা, সাধক প্রবর কমলাকান্ত।

প্রতাপ-পত্নীদ্বয়ের অবস্থা ঃ— প্রতাপের অন্তর্জলির রাত্রেই তেজচাঁদ বর্দ্ধমান রওনা হন এবং বর্দ্ধমানে ফিরে নিজে রাজকার্য পর্য্যবেক্ষণ করেন, তবে পরাণচাঁদ কপূর এর কুপরামর্শ ও কুমন্ত্রণায় "তেজচন্দ্র পুত্রবধূদ্বয়ের প্রতি অত্যন্ত অসদ্ব্যবহার শুরু

করেন। ('জালপ্রতাপ', পৃঃ- ১২০) এবং কিরূপ ব্যবহার করেছিলেন তা পুত্রবধূদ্বয়ের উক্তি হতে বোঝা যায়, "আমারদের স্বামীর মৃত্যুর পরদিবস পূর্ব্বাহ্নে আমরা যখন শোকার্ণবে মগ্না ছিলাম তখন আমারদের শ্বশুর, মহারাজ তেজশ্চন্দ্র আমারদিগকে অত্যন্ত দুঃখিনী ও অনাথা দেখিয়া আপনি ভৃত্যসমভিব্যাহারে আসিয়া আমারদের অন্তঃপুরে প্রবেশ পূর্ব্বক আমাদের যাবৎ আভরণ ও যে বহুমূল্য সম্পত্তি ছিল সমুদয় কাড়িয়া লইলেন এবং আমারদের স্বামী যে নিজ প্রকোষ্ঠে বাস করিতেন তাহা সম্পূর্ণরূপে লুঠ করতঃ যে সকল লওয়াজিমা ও নগদ যাহা পাইলেন তাবৎ লইয়া গেলেন এবং কাগজপত্র বাহিরে যে সকল বিষয় ছিল তাহা আপনার চাবিতে বন্দ করিয়া গেলেন। তৎসমকালে মহারাজ তেজশ্চন্দ্রের শ্যালক প্রাণচন্দ্রবাবু তাঁহার সঙ্গে যোগ করিয়া বাটীর অন্যান্য স্থানে যে সকল জহরাৎ ও প্রকারান্তর বহুমূল্য দ্রব্য যাহা পাইলেন তাহা আমাদের অসম্মতিতেই লইলেন এবং এই সকল অত্যাচার ব্যাপার আমারদের ঁপ্রাপ্ত স্বামীর ইউরোপীয় কর্ম্মকারক ক্লারমণ্ড ও ফরনেণ্ড সাহেব স্বচক্ষে দেখিলেন। এই সকল দৌরাত্ম্য হইলে পরে আমরা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট নালিশ করিলাম.............।"('জালপ্রতাপ', পৃঃ-১৫৮)।

অতঃপর প্যারীকুমারী ও আনন্দকুমারী স্বামীর সম্পত্তির সত্বাধিকার পাওয়ার জন্য আদালতে অভিযোগ করেন। জজ আদালতে, পত্নীদ্বয় ডিক্রী পান। "১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে জুন তারিখে বর্দ্ধমান হতে প্যারীকুমারী ও আনন্দকুমারী কর্ত্তৃক কলিকাতাস্থ গভর্ণরজেনারেলের সেক্রেটারী হোল্ট ম্যাকেঞ্জীকে লিখিত পত্র হতে জানা যায় যে, তেজচাঁদ ও পরাণচাঁদ, বিধবাদ্বয়কে নানা ভাবে উৎপীড়িত করেছিলেন। বর্দ্ধমানের জজ ও ম্যাজিষ্ট্রেট জে-আর-হ্যাচিনসন, কালেক্টর এলিয়ট, রেজিষ্টার এড্‌মণ্ড মলোচি ও সেনাবাহিনীর ব্রিগেডিয়ার প্রতাপচাঁদের পত্নীদ্বয়ের প্রতি সহানুভূতি দেখালেও হুগলীর জজ ওগিলি তেজচন্দ্রের পক্ষ সমর্থন করে প্রতাপচাঁদের নামে হুগলী জেলার জমিদারী অন্যায় ভাবে তেজচন্দ্রকে দেবার আদেশ দেন (৬ই এপ্রিল, ১৮২১ খ্রীঃ)। ঐ বৎসরের ১০ই নভেম্বর প্রতাপচাঁদের পত্নীরা সুপ্রিম কোর্টে তেজচন্দ্রের বিরুদ্ধে নালিশ করেন ('জালপ্রতাপ' পৃঃ- ১২০)। "কিন্তু বিচার শেষ হইবার পূর্ব্বেই মহারাজ পুত্রবধূদ্বয়কে বিবিধপ্রকারে প্রবোধ প্রদান করতঃ তাঁহাদিগের প্রচুর পরিমাণ মাসিক বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়া, মোকদ্দমা আপোষে নিষ্পত্ত করিয়া লইলেন। ('রাজবংশানুচরিত', পৃঃ- ১৩৮)।

সন্ন্যাসীবেশে প্রতাপের প্রত্যাবর্তন ঃ– দশরথ পুত্র রামের ন্যায় চতুর্দ্দশ বছর

অজ্ঞাত বাসের পর ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে এক সন্ন্যাসী শহরের কেশবগঞ্জ নামক পান্থনিবাসে উপস্থিত হন। তাঁর আকৃতি প্রতাপচঁ দের সদৃশ। কিছুক্ষণ পর সন্ন্যাসী গোলাপবাগে উপস্থিত হন; তিনি ভিতরে প্রবেশ না করে গেটের কাছে ব'সে থাকেন। গেটের নিকট গোপীনাথ ময়রা নামে এক বৃদ্ধ দোকান করত। বৃদ্ধ, সন্ন্যাসীকে দেখিবামাত্র বলে উঠল, 'আমাদের ছোট মহারাজ।' সন্ন্যাসী চেয়ে দেখলেন, গোপীনাথ গলায় কাপড় দিয়ে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম ক'রে যোড়হাতে দাঁড়িয়ে আছে। দেখতে দেখতে বহুলোক সন্ন্যাসীর চারপাশে জমায়েত হল। সন্ন্যাসী ক্রমে বারদ্বারী রাজবাটীতে প্রবেশ করে চারদিক ঘুরে দেখতে লাগলেন; বহুদিন মেরামত হয় নাই, কোথাও কোথাও চূণকাম খসে গেছে। এদিকে শহরে বিদ্যুৎবেগে খবর ছড়িয়ে পড়েছে 'ছোট মহারাজ' এসেছেন। নগরবাসীদের আনন্দের সীমা নাই। কাতারে কাতারে লোক তাঁকে দেখতে আসছে। সন্ন্যাসী তাদের কাছে আত্মপরিচয় দিয়ে বললেন, তিনিই প্রতাপচাঁদ। ''আমি বাস্তবিক মরি নাই, কোন মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য হঠযোগদ্বারা মৃত্যুর ভাণ করিয়া কিয়ৎকালের জন্য নিরুদ্দেশ হইয়াছিলাম, এক্ষণে কাল পূর্ণ হওয়ায় প্রত্যাগমন করিয়াছি।''('রাজবংশানুচরিত', পৃঃ- ১৫৩)।

এক্ষণে প্রতাপচাঁদের অন্তর্ধানের পরের ঘটনা কিছু বলা প্রয়োজন। প্রতাপচাঁদ ১৮২১ খ্রীঃ ৩রা জানুয়ারী (সন ১২২৭, ২১শে পৌষ) অন্তর্ধান করেন। মহারাজ তেজচাঁদ, উজ্জ্ব লকুমারী নাম্নী এক বালিকার পাণি গ্রহণ করেন (১২২৮ সাল, ৩১শে বৈশাখ, ইং ১৮২১ খ্রীঃ ১২ই মে)। আবার ১২৩৩ সালের, ১লা ফাল্গুন, পরাণচাঁদের ৭ বছরের পুত্র চুণিলাল (মহ্‌তাব্‌চাঁদ) কে দত্তক গ্রহণ এবং এক সপ্তাহ পরে ঐ বছর ৮ই ফাল্গুন পরাণচাঁদ কন্যা বসন্তকুমারীকে বিবাহ করেন। এই সব অসম্ভবনীয় কাজের জন্য জনগণ পরাণচাঁদের উপর অশেষ প্রকার রুষ্ট হয়েছিল। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজ তেজচাঁদের পরলোক গমন। নাবালক মহারাজের তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে পরাণচাঁদই রাজ্যের সর্বেসর্বা।

সুতরাং সকল নগরবাসী ও প্রজাবৃন্দের নিকট তাদের প্রিয় 'ছোটরাজা' প্রতাপচাঁদের প্রত্যাবর্তন কতখানি উল্লাসের তা বলে বোঝানো যায় না। আনন্দোচ্ছ্বাসে তারা গান বেঁধেছে —

''শোন ভাই শোন শোন মজার কথা।
হায় হায় রাজবাড়িতে কাণ্ড বেধেছে।
পরাণবাবু হয়ে কাবু

হাবুডুবু খেতেছে।।
ছোট রাজা প্রতাপচাঁদ
পেতেছে এক নূতন ফাঁদ,
চোদ্দ বছর পরে রাজা
সাধু হয়ে ফিরেছে।
মরেননি শিব আছেন বেঁচে
যোগে ছিলেন মহাযোগী,
দেশত্যাগের জন্যে তিনি
হয়েছিলেন মহারোগী।
চোদ্দ বছর নানান দেশে
ঘুরে ফিরে সাধুর বেশে
বর্ধমানে এসে শেষে
রাজ্যটা যে চেয়েছে।
নিজের বোনকে রাণী করে,
ভাইপোকে তার করল ছেলে
মেয়ে হ'ল পিসির সতীন,
পুত্ররূপে ভাইকে পেলে।
এ সব মজাই বর্ধমানে,
দেখবে না আর কোন খানে,
রাজ্য খানা পাবার তরে, অনেক ফাঁদ পেতেছে।।"

রাজবাটীর অনেক পুরনো আমলা সন্ন্যাসীকে দেখতে আসেন। কুঞ্জবিহারী ঘোষ নামে একজন বৃদ্ধ কর্মচারী (মুহুরী) সন্ন্যাসীকে দেখে এসে পরাণচাঁদের মধ্যমপুত্র তারাচাঁদকে খুশী হয়ে বলল, "বাবু! আর দেখতে হবেনা, আমাদের ছোট মহারাজ সত্যই।" খবর শোনা মাত্রই রুষ্ট হয়ে, পিতা পরাণচাঁদকে খবরটা জানালেন। প্রথমত, খবর শুনেই কুঞ্জবিহারীকে পদচ্যুত ক'রে সঙ্গে সঙ্গে রাজবাটী থেকে বহিষ্কার করলেন। দ্বিতীয়ত, "তৎক্ষণাৎ পরাণবাবু কতকগুলি লাঠিয়াল পাঠাইলেন। লাঠিয়ালরা সন্ন্যাসীকে দামোদর পার করাইয়া দিয়া আসিল।" ('জালপ্রতাপ', পৃঃ- ১৬)

অগত্যা, সন্ন্যাসী ঘুরতে ঘুরতে বিষ্ণুপুর রাজবাড়ীতে উপস্থিত হলেন। সেই সময় বিষ্ণুপুরের রাজা ছিলেন ক্ষেত্রমোহন সিংহ। তিনি সন্ন্যাসীকে প্রতাপচাঁদ বলে চিনতে পারলেন এবং তাঁকে যথেষ্ট আদর যত্ন করেন। দু-তিন মাস বিষ্ণুপুরে থাকার

পর, ক্ষেত্রমোহনের পরামর্শ অনুযায়ী বাঁকুড়ার ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট গিয়ে প্রতাপচাঁদ তাঁকে সব বৃত্তান্ত জানিয়ে পুলিশ সাহায্য নিয়ে বর্দ্ধমানে উপস্থিত হলে পরাণচাঁদের লাঠিয়ালরা কিছু করতে পারবে না। সন্ন্যাসী প্রতাপচাঁদ বাঁকুড়া পৌঁছে সরাসরি ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের বাংলোয় না গিয়ে সরকারী সার্কিট হাউসের কাছে একটি তেঁতুল গাছের তলায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইতিমধ্যে রাজা ক্ষেত্রমোহনের মুখে প্রতাপচাঁদের ফিরে আসার খবর শুনে চারদিকে রাষ্ট্র হয়ে গেছে, সন্ন্যাসীবেশে প্রতাপচাঁদ ফিরে এসেছেন। তেঁতুলতলায় তাঁকে দেখার জন্য সেখানে কাতারে কাতারে লোক জমায়েত হয়। সেইসময় 'সাঁওতাল বিদ্রোহ' চলছিল। ম্যাজিস্ট্রেট এলিয়ট সাহেব তাঁকে বিদ্রোহী সন্দেহে একশত দর্শনার্থী সহ গ্রেপ্তার করেন। খবরটি কলকাতায় প্রতাপচাঁদের বন্ধুমহলে ছড়িয়ে পড়ে। তখন কোন সহৃদয় বন্ধু কলকাতা থেকে একজন ইংরেজ উকীল বাঁকুড়ায় পাঠালেন। তিনি ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের নিকট গ্রেপ্তারী ওয়ারেন্টের নকল চাওয়ায় ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বললেন "কোন ওয়ারেন্ট হয় নাই, আমার হুকুমই ওয়ারেন্ট"-(জালপ্রতাপ পৃঃ- ৮৫)। অতঃপর উকীল সাহেব, মক্কেলের অপরাধের কারণ জেনে দরখাস্ত করায়,-" ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব হাসিয়া বলিলেন, "আমরা মফঃস্বলে চার্জ লিখি না; তোমার মক্কেলের অপরাধ অবশ্য আছে, তাহা পূর্বে বলা রীতি নহে," ("জালপ্রতাপ", পৃঃ- ৮৫)। সুতরাং উকীল সাহেব কলকাতা ফিরে গেলেন।

প্রায় আট মাস পর বাঁকুড়া থেকে সন্ন্যাসীকে হুগলীর জেল হাজতে পাঠানো হল। হুগলী জেল-হাজতে পাঠানোর কারণ হিসাবে জানা যায় — "বর্দ্ধমানে প্রতাপচাঁদের সপক্ষে বহু সাক্ষী থাকার ভয়ে কয়েক লক্ষ টাকা উৎকোচ স্বরূপ ব্যয় করে হুগলী কোর্টে মামলাটি স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। বর্দ্ধমানের ম্যাজিস্ট্রেট জেমস্ বেলফোর ওগিলবি ৩,০০,০০০/ (তিন লক্ষ) টাকা উৎকোচ গ্রহণ করে মামলাটি বর্দ্ধমানের পরিবর্তে হুগলীতে স্থানান্তরিত করেন। হুগলী জেলার জজ কার্টিস সাহেবও যে উৎকোচের দ্বারা বশীভূত হয়েছিলেন৹ তার প্রধান প্রমাণ হল তিনি সাক্ষ্য গ্রহণের পূর্বেই বিচারের ফলাফলের ইঙ্গিত প্রকাশ করেছিলেন। কোন কৌঁশলি নিযুক্ত করতে না দিয়ে একতরফা বিচারে ৬ মাস জেল এবং মুক্তির পর ৪০,০০০ (চল্লিশ হাজার) টাকা পরিমাণে এক বছরের জন্য 'ফেলজামিন' দিতে হুকুম হয়। কলিকাতাস্থ নিজামত আদালতে এই রায়ের বিরুদ্ধে আপীল করা হলেও জেলা জজের রায় বহাল থাকে। প্রতাপচাঁদ স্বীয় অপরাধ জানতে চাওয়ায় জজসাহেব উত্তর দিয়েছিলেন যে, আসামী

আলোক শা ওরফে কৃষ্ণলাল ব্রহ্ম চারী এবং তার অপরাধ হল, সে নিজেকে প্রতাপচাঁদ বলে প্রচার করে লোক জোটাচ্ছে ও শান্তিভঙ্গ করছে।" ('জালপ্রতাপ', পৃঃ- ১২১)। যাই হোক সন্ন্যাসীকে নিরস্ত হতে হলো। যথারীতি তাঁর ৬ মাস জেল এবং এক বছরের ফেল জামিন দিতে হলো।

নির্দ্দিষ্ট সময় অন্তে প্রতাপচাঁদ জেল থেকে যে দিন মুক্ত হন সেদিনের দৃশ্য বর্ণনাতীত। তাঁর প্রতি, কি সাধারণ প্রজা, কি মান্য-গণ্য বিশিষ্ট ব্যক্তি, সকল মানুষের শ্রদ্ধা, ভালবাসা, যে কিরূপ ছিল, উদ্ধৃত অংশটি হতে অন্ততঃ কিছু প্রতীয়মান হয়,- "১৮৩৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে যে দিবস খালাস পাইলেন সে দিবস হুগলীতে মহাসমারোহ হইল। কলিকাতা হইতে বিস্তর সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁহাকে লইতে আসিয়াছিলেন। পরদিবস অর্দ্ধোদয় যোগ ছিল, সেই উপলক্ষে বর্দ্ধমান ও বাঁকুড়ার বিস্তর লোক হুগলী ও ত্রিবেণীতে আসিয়াছিল; তাহারাও ঐ সমারোহে যোগ দিল। পঞ্চকোটের রাজা ও বিষ্ণুপুরের রাজা উভয়েই যোগ উপলক্ষে আসিয়াছিলেন এবং উভয়েই জেলখানার দ্বারে উপস্থিত হইলেন। এই অঞ্চলের ধনবানেরা দেশী ও ইংরেজী বাদ্য, হাতী, ঘোড়া, রেসালা ইত্যাদি লইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। যখন জেলখানা হইতে জাল রাজা বহির্গত হইলেন তখন হাতীর উপর নহবত বাজিয়া উঠিল, দূরে কাড়ানাকাড়া বাজিতে লাগিল,................তিন চারি দল ইংরেজী বাদ্য বাজিয়া উঠিল। সকলে জাল রাজাকে মহাসম্ভ্রমে সুখাসনে বসাইলেন, বাহকেরা সুখাসন স্কন্ধে তুলিল, চারিজন বালক চামর ব্যজন করিতে লাগিল। শত শত পতাকা দুলিতে দুলিতে আগে আগে চলিতে লাগিল। নগর প্রদক্ষিণ করিয়া শেষে কলের জাহাজে উঠিয়া রাজা কলিকাতায় আসিলেন।" (জালপ্রতাপ, পৃঃ- ২০, ২১)

প্রতাপচাঁদ কলকাতায় অবস্থানকালে রাধাকৃষ্ণ বসাকের বাড়ীতে থাকতেন। কয়েক মাস থাকার পর কলকাতার সম্পত্তির জন্য সুপ্রিমকোর্টে নালিশ মোকর্দমা শুরু হল।

তখন বর্দ্ধমান রাজসিংহাসনে নাবালক মহ্‌তাব্‌চাঁদ্ (তেজচাঁদের দত্তক পুত্র/ পরাণচাঁদের অঙ্গজ) আসীন। তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে পরাণচাঁদ কপূর মোকদ্দমার জবাব দেওয়ার জন্য মদনমোহন কপূরকে পাঠিয়ে দিলেন।

এদিকে কলকাতার বিশিষ্ট ও প্রধান ব্যক্তিগণের জবানবন্দীতে তাঁরা সকলেই স্বীকার করলেন বাদী প্রকৃতপক্ষে রাজা প্রতাপচাঁদ, নকল নহেন। তারপর বর্দ্ধমান অঞ্চলে সাক্ষ্য প্রয়োজন হওয়ায় উকীলের পরামর্শে তিনি বর্দ্ধমান আসা মনস্থ

করেন, কিন্তু কলকাতা নিবাসী যাঁরা, তাঁর জামিন ছিলেন, তাঁরা এক বছর উত্তীর্ণ না হলে কোথাও যাওয়া উচিত হবে না ব'লে তাঁকে নিষেধ করলেন। সুতরাং প্রতাপচাঁদকে এক বছর অপেক্ষা করতে হয়। তবে উকীলের যুক্তি একা বর্দ্ধমান যাওয়া ঠিক হবে না, সুতরাং আত্মরক্ষার নিমিত্ত ডেপুটি গভর্ণর আলেক্‌জাণ্ডার রশ সাহেবের নিকট ১৮৩৮ খ্রীঃ, ১৫ই ফেব্রুয়ারী দরখাস্ত করা হলে সেক্রেটারী তা নামঞ্জুর করেন। পত্রের মর্ম উদ্ধৃতি করা হল ঃ—

"Extract from petition dated 15th. February 1838.

Your memorialist prays, therefore, that your Honour will be graciously pleased to grant to him (through the proper channel) such means of safeguard to protect his person and life, from any eventual insult or danger, during the time he may be obliged to stay at Burdwan."

সেক্রেটারীর জবাব— *The prayer of this petition can not be complied with.*

(Signed)

Fred. Jas. Halliday.

Offg. Secy. to the Govt. of Bengal.

Fort William.
March, 5. 1838

নিতান্ত দরখাস্ত মঞ্জুর না হওয়ায় প্রতাপচাঁদ কিছু ভাবনা চিন্তা না করে নিঃশঙ্ক চিত্তে ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ, মাসে কালনা দিয়ে বর্দ্ধমান আসা সুবিধা হবে বিবেচনা করে নৌকা পথে রওনা হন। সীঙ্গুরের শ্রীনাথ বাবু (নবাব বাবু) প্রমুখ প্রধান প্রধান ব্যক্তি সঙ্গী হন, তাঁরা গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড হয়ে বর্দ্ধমান আসেন। প্রতাপচাঁদের নৌবহরে নিজের জন্য একখানি পিনেস, সঙ্গীদের জন্য কয়েকখানি বজরা, চাকরদের জন্য পানসী, তাছাড়া রান্না-বাটনার নৌকা, স্নানের নৌকা, গায়কদের নৌকা, তাঞ্জামের নৌকা প্রভৃতি নিয়ে পঞ্চাশ খানি নৌকা ছিল। তাঁর কৌন্সিলি ও উকীল কেহই সঙ্গে আসতে পারেন নাই। তাঁদের অপেক্ষায় চুঁচুড়ায় নৌকা নোঙর করে, অপর পারে প্রায় আট দিন ছিলেন। সেখানে নিকটস্থ ফরাসী, মোগল, যাঁহারা থাকতেন তাঁরা এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের বহু লোক তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে যান।

এদিকে প্রতাপচাঁদের কালনার পথে বর্দ্ধমান আসার খবর চারদিকে রাষ্ট্র হয়ে গেছে। ওখান থেকেই কালনার পুলিশ তাঁর পিছু নেয়। তাঁর সঙ্গে কে কে দেখা করতে আসছেন, কালনার জমাদ্দার সে খবর পাঠাতে থাকে। গভর্ণমেণ্ট আগে থাকতেই বর্দ্ধমানের ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে সংবাদ পাঠিয়েছেন, জালপ্রতাপ কালনা হয়ে বর্দ্ধমান যাচ্ছেন, আর সেই সঙ্গে একটি গোপন পত্রও পাঠিয়ে দেন। পত্র পাঠ করেই ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব, কি করতে হবে তা ঠিক করেই রেখেছিলেন।

যাইহোক ১৮৩৮ খ্রীঃ ১৫ই এপ্রিল (২রা বৈশাখ, ১২৪৫ সাল) তারিখে জালপ্রতাপ কালনা পৌঁছে দুজন মোক্তারকে বর্দ্ধমান পাঠালেন। তাঁরা বর্দ্ধমান গিয়ে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে এই বলে দরখাস্ত করলেন, "প্রতাপচাঁদ কালনায় পৌঁছিয়াছেন, তাঁহার ইচ্ছা বর্দ্ধমানে আইসেন। কিন্তু হুজুরের অভয় না পাইয়া আসিতে সাহস করেন না।" ('জালপ্রতাপ', পৃঃ- ২৩)। তাঁরা দরখাস্ত নিয়ে উপস্থিত হতেই ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব দরখাস্ত না দেখেই তাঁদের দুজনকে জেলে পাঠিয়ে দিলেন এবং কালনার দারোগাকে সেই সঙ্গে হুকুম দিলেন "জমায় জমিয়তনষ্ট হইতে দিবে না, যদি জালরাজা হুকুম মাত্রেই আপনার সঙ্গীদের বরখাস্ত না করে, তবে তাহাকে গ্রেপ্তার করিবে।" ('জালপ্রতাপ', পৃঃ- ২৩)। তিনি কালনার গীর্জার পাদরি এলেকজাণ্ডার সাহেবকে অনুরূপ পত্র লেখেন, জালপ্রতাপের গতিবিধি, লোক লস্কর ইত্যাদি গোপনে অনুসন্ধান করে তাঁকে জানাতে।

ইতিপূর্বে পরাণচাঁদ প্রতাপের আসার সংবাদ শুনে, পিয়ারীলাল নামে একজন খবরজ্ঞ ব্যক্তিকে কালনায় পাঠান। ঐ ব্যক্তি কালনায় এসে সেখানকার প্রত্যেক দোকানদার, ব্যবসায়ীকে নিষেধ করে দেন, কেউ কোন জিনিস যেন জালরাজার লোককে বিক্রী না করে। এবং গোপনে একজন খ্রীষ্টানকে হস্তগত করে বলে দেন, পাদরির জালরাজার তল্লাস করতে যাওয়ার কোন প্রয়োজন নাই, উক্ত খ্রীষ্টান ব্যক্তি সব খবর সংগ্রহ করে তাঁকে জানালে পর তিনি ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে তা জানাবেন।

অপর দিকে মোক্তার দু'জনের কোন খবর না পেয়ে ৬ দিন পর প্রতাপ ঘাটে নৌকা ভিড়াতে বলেন। ২০শে এপ্রিল, (৯ই বৈশাখ,১২৪৫ সাল) প্রতাপের পিনেস পাথুরিয়া মহল ঘাটে ভিড়ল। তাঁর সঙ্গের একটি নৌকায় তাঞ্জাম ও বাহক ছিল। রাজা সকাল ৮টার সময় ঘাটে নামলেন। সঙ্গে তাঞ্জাম নিয়ে বাহকরাও নামল। রাজা তাঞ্জামে উঠলেন, একজন ভৃত্য তাঁর ডান পাশে একখানি তরবারি রেখে গেল। তরবারি

ক্ষত্রিয় রাজাদের এক প্রকার প্রতীক; "একজন ছাতি ধরিল, দ্বিতীয় একজন আফতাগি[illegible] ধরিল, অপর দুইজন চামর করিতে লাগিল, পাঁচ ছয় জন আশা সোটা ধরিল.... তাঞ্জামের দুই পার্শ্বে দুইজন আবদালি তাঞ্জাম ধরিয়া যাইতেছিল," (জালপ্রতাপচাঁদ পৃঃ- ২৩, ২৫)।

রাজা আসছেন শুনে, পাথুরিয়া মহল ঘাট থেকে রাস্তার দু'পাশে কাতারে কাতারে লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল।

পরাণচাঁদের লোক পিয়ারালাল ছুটতে ছুটতে থানায় গিয়ে [illegible]। দারোগাকে বললেন, "সর্বনাশ হইল, শীঘ্র আসুন।" দারোগা [illegible] "ভয় কি এই আমি চলিলাম কাহার সাধ্য এখানে গোল [illegible]" (জালপ্রতাপচাঁদ পৃঃ- ২৪)। [illegible] দারোগা যতই আস্ফালন করুক আর, জমাদার চৌকিদার, বরকন্দাজ সহ [illegible] বদাকার মোষের মত বিশাল দল নিয়ে [illegible] রাজাকে প্রতিরোধ করার জন্য [illegible] উপস্থিত হন কিন্তু তাঁকে বাধা দেওয়া হয়। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আচমকা [illegible] রাজাকে সেলাম করিয়া [illegible] দাঁড়াইলেন। ...... [illegible] দুই পার্শ্বে দুইজন আবদালি তাঞ্জাম ধরিয়া যাইতেছিল, [illegible] [illegible] ছইয়া [illegible] (জালপ্রতাপচাঁদ, পৃঃ- ২৪-২৫)। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] দারোগাদের [illegible] দরকার ছিল না, ম্যাজিস্ট্রেট [illegible] এই রকম [illegible] লোকদের দারোগা নিয়োগ করতেন তবে ভাইস, লেখা বা [illegible] সেখানে একজন মুন্সি থাকত। সুতরাং [illegible] [illegible] ("Whilst clad, the very Darogah of [illegible] the constituted authority who can neither read nor write ... in relation to the 'Nizamut' incident" (জালপ্রতাপ, পৃঃ- ২৬)। [illegible] মানুষ [illegible] দারোগা ছিলেন [illegible] [illegible] [illegible] বিছু [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করতে থাকল। এইরকম পরিবেশে [illegible] [illegible] [illegible] উঠলেন।

এই ঘটনা সম্বন্ধে পাদরি আলেক্‌জাণ্ডার সাহেব ম্যাজিষ্ট্রেটকে বিভ্রান্তিকর রিপোর্ট পাঠালেন। কারণ এই ঘটনার তিনি প্রত্যক্ষদর্শী নন, পরাণচাঁদের প্রেরিত লোক, পিয়ারালাল নিযুক্ত খ্রীষ্টান ব্যক্তির প্রদত্ত সংবাদ। পাদরি ম্যাজিষ্ট্রেটকে জানালেন, "একশত তরবারধারী আর দুই শত সড়কিওয়ালা লইয়া প্রতাপচাঁদ কালনা প্রদক্ষিণ করিয়া গিয়াছে। রাজবাটীর প্রতি তাহার লক্ষ্য ছিল। সুদক্ষ দারোগার জন্য কিছু করিতে পারে নাই। ছয় হাজার কি আট হাজার লোক জমিয়াছিল। যদি প্রতাপচাঁদকে শীঘ্র দমন করা না হয় তবে বোধ হয় একটা দাঙ্গা উপস্থিত হইবে।

My Dear Sir,

Protap Chund has just gone on board his boat, after parading the whole length of Kalna in a Tonjohn with a drawn sword in his own hand, attended by upwards of a hundred swordsmen and double that number of stickmen. The concourse was altogether 6,000 or 8,000. He appeared to be intent on the Rajbarry. But your active Darogah prevented him The aspect of things, I think, threatens an affray, if he is not checked soon.

I am & C.A.Alexander.

প্রতাপচাঁদকে পুনঃ গ্রেপ্তারের চেষ্টা ঃ— ম্যাজিষ্ট্রেট ওগলবি সাহেব প্রতাপচাঁদকে গ্রেপ্তারের জন্য এক প্রকার মতলব করেই রেখেছিলেন; তবে পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এর বিনা অনুমতিতে কিছু করতে পারতেন না। এখানে বলা প্রয়োজন, তৎকালে সমগ্রবাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার একজন মাত্র পুলিশ সুপার থাকতেন, তাঁর নির্দেশ অনুসারে ম্যাজিষ্ট্রেটকে কাজ করতে হতো; সেই সময় পুলিশ সুপার ছিলেন স্মিথ সাহেব। তিনি ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে, জাল রাজাকে গ্রেপ্তার করার হুকুম দেন নাই, "জাল রাজা যদি তাঁর লোকদের বিদায় না করে, তবে তাহার নিকট হইতে ফেলজামিন লইতে পার।" ('জালপ্রতাপ', পৃঃ- ২৫)। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এর নির্দেশের সার অংশের উদ্ধৃতি দেওয়া হলো ঃ—

(Extract from Superintendent's letter, No.400, dated 28th. April, 1838.) "4th. The conduct of the claiment of the Burdwan Raj, appears to me to be of such a dangerous nature, so insulting to the family in posession,

that I think there is every reason to apperhend a serious affray.

5th. Considering the tendency of his acts to tumult and riot, I am of opininon, that you will be fully justified in requiring to disband his array, and to behave himself like a good and quiet subject, and on his refusal to obey or evasion of your orders, I think you will be fully justified in calling on him to furnish good security to keep the peace.

6th. It will be necessary previous to the adoption of such a measure to take evidence of his having assembled such a body of men, and of the tendency of their conduct to break the peace." ('জালপ্রতাপ', পৃঃ- ২৬)।

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পরামর্শ অনুসারে পূর্বেই পরোয়ানা জারি করেছিলেন। তদনুসারে জাল রাজা তাঁর কোন্ কোন্ লোকদের চলে যেতে বলবেন তা জানতে চাইলে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তাঁর কথায় কান না দিয়ে একবারে তাঁকে গ্রেপ্তার করার জন্য ধুরন্ধর নাজির আসাদ আলিকে পাঠিয়ে দিলেন। এই সুযোগে পরাণচাঁদ কপূর রাধামোহন সরকারের সঙ্গে বহু লাঠিয়াল পাঠালেন। এখানেই ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব নিশ্চিন্ত হ'তে পারলেন না। তিনি ৩য় রেজিমেণ্টের ক্যাপটেন লিট্‌ল্‌কে পল্টন নিয়ে কালনায় আসার কথা বললেন। জজ সাহেব সংবাদ পেয়ে খুশি হ'য়ে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে একটি কার্তুজপূর্ণ পিস্তল এবং তাঁর সঙ্গী ডাক্তার চিক সাহেবকেও একটি অনুরূপ পিস্তল দিলেন। তাঁরা উভয়েই কালনা পৌঁছলেন। ক্যাপ্টেন লিট্‌ল্‌ও রাত্রি দ্বিপ্রহরে সৈন্য সহ কালনা পাদ্রী সাহেবের আবাস স্থলে উপস্থিত হলেন। সেই রাত্রেই ম্যাজিষ্ট্রেট ওগলবি সাহেব ও চিক সাহেব পিস্তল হাতে দারোগা আর নাজিরকে নিয়ে ঘাটে গেলেন সেখান থেকে তিনি ক্যাপটেন লিট্‌ল্‌কে খবর পাঠালেন, "বিনা যুদ্ধে প্রতাপকে গ্রেপ্তার করা কঠিন। অতএব আপনি স-সৈন্য সত্বর আসুন।" ('জালপ্রতাপ', পৃঃ- ২৭)।

প্রতাপচাঁদ গ্রেপ্তার ঃ— গঙ্গার মধ্যস্থলে একটি পিনিস্ নঙ্গর করে আছে, তার পেছনে চার-পাঁচখানি বজরা, তার পরে কতকগুলি পানসি। রাত্রি তৃতীয় প্রহর। চারদিক অন্ধকার। কোন নৌকা বা বজরায় আলো জ্বলে নাই। মাঝিরা নৌকার ছাদে; ভদ্রলোকেরা ভিতরে। সকলেই নিদ্রিত। সেই সময় ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব ও ক্যাপটেন লিট্‌ল্ সাহেবের পিস্তল হ'তে নৌকা লক্ষ্য করে গুলি ছুটল। সঙ্গে সঙ্গে

সৈন্যরা বন্দুকগুলি গুলিবর্ষণ করতে লাগল। নৌকার ছাদে নিদ্রিত মাঝি-মাল্লাদের মধ্যে ১৮ জন নিহত, কারও হাত-পা ভাঙ্গল; গঙ্গায় লাফিয়ে পড়ল অনেকে। পিছনের বজরা থেকে, নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের পৌত্র নরহরিচন্দ্র (কনিষ্ঠ পুত্র ঈশানচন্দ্র রায়ের পুত্র) লাফ দিয়ে জলে পড়লেন, পিনিস থেকে প্রতাপচাঁদও গঙ্গায় লাফিয়ে পড়লেন। এঁরা উভয়ে গঙ্গা পার হয়ে শান্তিপুরে উঠে কোথাও লুকিয়ে থাকলেন। রাতে ঘুমন্ত অবস্থায় অতর্কিত আক্রমণে বিভ্রান্ত হয়ে জলে লাফিয়ে পড়া ছাড়া প্রাণ রক্ষার আর কোন উপায় ছিল না।

যুদ্ধ শেষ। যুদ্ধ বললে ভুল হবে, একতরফা আগ্নেয় অস্ত্র নিয়ে ডাকাবাজি। তারপর সঙ্গে সঙ্গে নাজির আসাদ আলি, দারোগা মহিবুল্লা দলবল নিয়ে লুঠতরাজ আরম্ভ করল। রাজার সোনার ছাতা, সোনার [illegible], সোনার সোটা, সোনার আড়ানি। নৌকায় অস্ত্র-শস্ত্রের মধ্যে পাওয়া গেল [illegible]টি তরবারি, [illegible]টি বন্দুক, একটি [illegible] পিস্তল। প্রসঙ্গতঃ, পাট্টী সাহেব ম্যাজিস্ট্রেটকে যে রিপোর্টে পাঁচ-সাত শত অস্ত্রশস্ত্রধারী লোক [illegible] আছে [illegible], তা সম্পূর্ণ মিথ্যা; সুতরাং [illegible] খানি তরবারি কি [illegible] বন্দুক [illegible] বেশী পাওয়া সম্ভব নয়। নাজির আসাদ আলি [illegible] তরবারি [illegible] [illegible] সাহেবকে [illegible] সিপাহীরা [illegible] যুদ্ধ করিয়া, [illegible] [illegible] উদ্ধার করিয়াছি [illegible] [illegible] হইয়াছে [illegible] [illegible]

[illegible] নির্দোষ তীর্থযাত্রী [illegible] [illegible] পুলিশ গ্রেপ্তার [illegible] প্রতাপচাঁদ [illegible] শান্তিপুরে [illegible] পড়লেন [illegible] ২৯৪ জনকে গ্রেপ্তার করে বর্ধমান জেলখানায় [illegible] বন্দী [illegible] [illegible] ছিল [illegible] [illegible] প্রকার [illegible] [illegible] পারবেন [illegible] সিপাহী সেনা [illegible] [illegible] ম্যাজিস্ট্রেটের [illegible] [illegible] একজন উকিল হুগলী জেলার [illegible] [illegible]



মহারাজ প্রতাপচাঁদ

এই পূর্ণাঙ্গ প্রতাপচাঁদের চিত্রটি দেশ পত্রিকার সৌজন্যে প্রাপ্ত

হ'য়ে বৰ্দ্ধমান আসছিলেন। পথেই ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তাঁকে গ্রেপ্তার করেন; কারণ দর্শান, উকীল সাহেব একজন *Treason* (রাজদ্রোহী)।

পরে পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ২৪শে মে, ১৮৩৯ খ্রী, পত্র নং ৫২৭ তে ধৃত আসামীদের সম্বন্ধে বলেন, *"Persons accused of being conspirators against the Government and of resistance to the constituted authorities."* (তথ্যসূত্র- 'জালপ্রতাপ')। যাই হোক, প্রতাপচাঁদের পরিচিত, বন্ধুবান্ধব যাকেই সামনে দেখতে পাওয়া গেল তাকেই পুলিশ গ্রেপ্তার করল।

এই ভাবে গ্রেপ্তার পর্ব একপ্রকার সমাধা হল। এই সময় কলকাতার 'হরকরা' 'কোরিয়ার' প্রভৃতি কয়েকটি পত্র পত্রিকা ম্যাজিষ্ট্রেট ওগলবি সাহেব, ক্যাপটেন লিট্‌ল্ এর প্রশংসা করে লেখেন। কোন একজন ভদ্রলোক 'হরকরা' পত্রিকায় সত্য ঘটনা উত্থাপন করে উক্ত 'প্রশংসার' তীব্র প্রতিবাদ করেন।

এদিকে ডবলিউ- ডি- শ সাহেবের কেরাণী জয়নারায়ণ চন্দ্র এফিডেবিড ক'রে শ' সাহেবের খালাসের জন্য সুপ্রীমকোর্টের পরোয়ানা বার করেন। সেই পরওয়ানা ম্যাজিষ্ট্রেট ওগলবি সাহেব প্রথমে গ্রাহ্যই করেন নাই, পরে তা প্রকাশ পাওয়ায়, বিপদের আশঙ্কায় জামিন নিয়ে শ'সাহেবকে মুক্ত করেন। শ'সাহেব কলকাতা পৌঁছেই ম্যাজিষ্ট্রেট ওগলবি সাহেবের বিরুদ্ধে খুনের নালিশ করেন। এ নিয়ে খুব হুলুস্থুল কাণ্ড ঘটে গেল। কলকাতার ম্যাজিষ্ট্রেট ওহনলন সাহেব জামিন নিয়ে ওগলবি সাহেবকে দায়রায় সোপর্দ করলেন। কিন্তু মামলায় উপযুক্ত সাক্ষ্য প্রমাণ না পাওয়ায়, জজসাহেব আসামী ওগলবি সাবেবকে খালাস করে দেন।

প্রতাপের দুরবস্থা ঃ— পূর্বে বলা হয়েছে, প্রতাপচাঁদ আর নরহরিচন্দ্রকে শান্তিপুরে গ্রেপ্তার ক'রে কালনা থেকে হুগলী পাঠানো হয়েছিল। প্রতাপচাঁদকে হুগলী পাঠানোর আগে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নির্দেশে তাঁদের দুজনকেই ছোট জীর্ণ মলিন কাপড় পরিয়ে "দুই চারিবার গ্রাম প্রদক্ষিণ করান হইয়াছিল।" ('জালপ্রতাপ', পৃঃ- ৩৫)। কিন্তু রাজার এই অবস্থা কেহ দেখে নাই। "গ্রামে কেহই ছিল না। দোকান বন্ধ, হাট বন্ধ, পথে লোকজন আর চলে না, বৃদ্ধা ভিখারিণীরা পর্য্যন্ত কুঁড়ে ফেলিয়া পলাইয়াছিল। যাহারা ছিল তাহারা কেবল পরাণবাবুর দলস্থ।............সেই ক্ষুদ্র বস্ত্র পরাইয়া জাল রাজাকে পদব্রজে হুগলী পাঠানো হইল।...............তাঁহাকে নিরাহারে পথ চলিতে হইল। যেখানে সিপাহীরা অন্নপাক করিত, জাল রাজা সেইখানে বসিয়া

আপনার হাত কড়ি নাড়িতেন, আর দেখিতেন। একদিন একটি সিপাহীর দয়া হইল, সে ব্যক্তি আপনার পয়সায় দুটি চাল আনিয়া দিল। জাল রাজা সেদিন গুরুতর আহার করিলেন। ন-সরাই নামক স্থানে পৌঁছিলে, বিস্তর লোক তাঁহাকে দেখিতে আসিল। 'হরকরা' সম্পাদক বলেন, আট হাজার লোকের ন্যূন নহে। তাহাদের মধ্যে অনেক স্ত্রীলোক প্রতাপের নিমিত্ত অঞ্চলে করিয়া মিষ্টান্ন আনিয়াছিল। যাহারা খাদ্য বা পয়সা আনিয়াছিল, তাহারা কেহই প্রতাপকে দিতে পারিল না। সিপাহীদের তাড়নায় কেহ তাঁহার নিকট আসিতেও পারিল না।"('জালপ্রতাপ', পৃঃ- ৩৫, ৩৬)। ৫ই মে, ১৮৩৮ খ্রীঃ তারিখে হুগলীতে পৌঁছলেন। হুগলী জেলখানায় একটি ছোট্ট কক্ষে তাঁকে রাখা হলো, দেওয়া হলো একখানি কম্বল। দু'জন সার্জেন আর ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব নিজে সঙ্গে করে প্রতাপচাঁদকে হুগলী থেকে আলিপুর জেলে রেখে আসেন।

সামুয়েল সাহেবের উদ্যোগ ঃ— এখানে বলা প্রয়োজন, সেই সময় হুগলীর ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন সামুয়েল সাহেব। প্রতাপচাঁদ যখন সন্ন্যাসী বেশে বৰ্দ্ধমান আসেন (১৮৩৫ খ্রীঃ) তখন এই সামুয়েল সাহেব বৰ্দ্ধমানের ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। পরাণচাঁদের কাছে তিনি প্রতাপচাঁদ সম্বন্ধে সবিশেষ শুনেছিলেন। সেই অবধি জালরাজা, তাঁর কাছে একজন জুয়াচোর। এখন তিনি তাঁকে নিজের এক্তিয়ারে পেয়েছেন। সামুয়েল সাহেব প্রমাণ সংগ্রহের জন্য এখানে সেখানে পত্র লিখতে থাকেন। তিনি বৰ্দ্ধমানে পরাণচাঁদকেও পত্র লেখেন। তারপর দিন কতকের জন্য লেষ্টার সাহেবের হাতে চার্জ দিয়ে অনুপস্থিত থাকেন। তখন জালরাজা, পরাণচাঁদকে লিখিত পত্রের নকলের জন্য লেষ্টার সাহেবকে দরখাস্ত করেন। পত্রের নকলও প্রস্তুত হয়েছিল, কিন্তু সামুয়েল সাহেব ফিরে আসায় তা জাল রাজাকে দিতে দেন নাই। এক্ষণে, যাঁরা সাক্ষী ছিলেন তাঁদের কথা কিছু উল্লেখ করা যাক।

গভর্ণমেন্টের সাক্ষী ঃ— সি. টি. ট্রাওয়ার, এইচ. টি. প্রিন্সেপ, জেম্‌স্ প্যাটল্, মিঃ হাচিনসন, আদালতের জজ, জন বিচর, ডি. এ. ওবারবেক, বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর, গ্রেগরী হারক্লট্‌স্। এখানে উল্লেখ্য, ই. এ. সামুয়েল সাহেব, ২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৮৩৮ খ্রীঃ দ্বারনাথ ঠাকুরকে সাক্ষী সংগ্রহের জন্য চিঠি লেখেন। তাঁর তৎপরতা দেখে মনে হয়, "ওগলবি অপেক্ষা তাঁর ঘুষের পরিমাণ কম ছিল না।" ('জালপ্রতাপ', পৃঃ- ১২২) পত্রখানি নিম্নে উদ্ধৃতি করা হলো ঃ—

"Hooghly, Sept. 24, 1838.

My dear Dwarkanath,

I was disappointed at your non-arrival, as I think you could speak more decidedly than any of the other witnesses to the man's non-identity, but it is not of much consequence. I have no objection to make a bargain with you. I will let you off altogether, if you will procure me the names of half a dozen good respectable witnesses from Boranagore, who know him as Kristolall. I dare say you could do this through Kali Nath Roy Chowdhury, Mothooranath Mookerji or any of your own servants. Let me know what you say to this. What scoundrel that Buddinath Roy is! If had know his character, I would rather have gone without evidence altogether than have had his.

*Remember I must have the evidence from Boranagore within a week or so. Persuade Mothooranath also to come. His **hoormut** and **izzut** shall be **hureck soorut se bahal.***

yours truly,

E.A. SAMUELLS."

পরাণচাঁদ তরফের সাক্ষী ঃ— রাজা বৈদ্যনাথ রায়, রাধামোহন সরকার, বসন্তলাল বাবু, মোহনলাল বাবু, ভৈরবনাথ বাবু, নন্দলাল বাবু।

আসামীর সাক্ষী ঃ— *ডাক্তার রবার্ট স্কট্, *জন রিডালে, *মিসেস হেরিয়াট কিটিং, *মিসেস সফিয়া ক্রেন, *ফ্রানসুয়া সুলিমান, *হাজি আবু তালেব, *গোলকচন্দ্র ঘোষ. *গোপীমোহন পরামাণিক (ময়রা), *আমীরউদ্দীন আমেদ, *ডেভিড হেয়ার,*রাজাক্ষেত্রমোহন সিংহ, *জামকুড়ির রাজা জয়সিংহ, *কুঞ্জবিহারী ঘোষ, *সরকারী উকিলের আপত্তিতে প্রতাপের মাতুলকে সাক্ষী দিতে দেওয়া হয় নাই; রাজবাড়ীর হ্যালিডে সাহেবকে সামুয়েলের আপত্তিতে আনা হয় নাই। সামুয়েল ও লিটলের ভয়ে তেলেনীপাড়ার রাধামোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সাক্ষী দিতে পারেন নাই।

প্রতাপের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ ঃ— হুগলী জজকোর্টে প্রতাপচাঁদের মামলার শুনানি হয়েছিল ২০শে নভেম্বর ১৮৩৮ খ্রীঃ। তৎপূর্বে বলা প্রয়োজন, প্রতাপচাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ কি? মামলাটি বর্দ্ধমান কোর্টে না হয়ে হুগলী কোর্টে কেন গেল?

প্রথম অভিযোগ, অলোক শা তরফে কৃষ্ণলাল ব্রহ্মচারী মৃত রাজা প্রতাপচাঁদ বাহাদুরের নাম গ্রহণ করেছে।

দ্বিতীয় অভিযোগ, প্রতাপচাঁদের নাম ব্যবহার ক'রে কলকাতা ট্রেজারীর দেওয়ান রাধাকৃষ্ণ বসাকের নিকট জবরদস্তি করে অর্থ গ্রহণ।

তৃতীয় অভিযোগ, বেআইনি ভাবে অস্ত্র সংগ্রহ করে কালনায় লোক জমায়েত করেছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, এই অভিযোগ সম্বন্ধে কোন জবানবন্দী লওয়া হয় নাই, অথচ অভিযোগ থেকে গেল।

এখন, প্রতাপচাঁদের বিচার বর্দ্ধমান আদালতে না হ'য়ে হুগলী আদালতে উঠল কেন? জবাবে নিশ্চিত করে বলা যায়, উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে হুগলী আদালতে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। কারণ সম্বন্ধে আলোচনা গুলির উপস্থাপনা করা যাক। তথ্যসূত্রগুলি 'জালপ্রতাপ' থেকে গৃহীত হলো ঃ—

১) প্রতাপচাঁদকে প্রথমবার গ্রেপ্তার করা হয়েছিল বাঁকুড়ায়। সুতরাং তাঁর বিচার হওয়া উচিত ছিল বাঁকুড়াতে। সেই সময় বাঁকুড়া ছিল বর্দ্ধমানের অন্তর্গত; বলা হতো, 'পশ্চিম বর্দ্ধমান জেলা'। তাহলে মামলার বিচার হওয়া উচিত ছিল বর্দ্ধমান জজসাহেবের আদালতে। বর্দ্ধমান আদালতে বিচার হলে সমগ্র বর্দ্ধমানের জনগণ প্রতাপের সপক্ষে সাক্ষী দিত। কারণ হিসাবে উল্লেখ করা যায়— পরাণচাঁদ প্রচুর অর্থ ঘুষ দিয়েও কোন সাক্ষীকে প্রতাপের বিরুদ্ধে একটি কথাও বলানো যায় নাই। উপায়ন্তর না দেখে, পরাণচাঁদ, বর্দ্ধমান, হুগলী'র ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব, জজ সাহেব ও সরকারী আমলাদের কছু লক্ষ টাকা উৎকোচ দিয়ে মামলাটি স্থানান্তরের ব্যবস্থা করেন।

২) দ্বিতীয়বারে বিচারের সময় চাঁর্জ দাখিল করা হ'য়েছিল; প্রতাপচাঁদ হাঙ্গামা বাধাবার জন্য কালনায় হাজার হাজার লোক জমায়েত করেছিলেন। এক্ষেত্রে দেখা যায়, হাঙ্গামা ঘটেছিল বর্দ্ধমান জেলার কালনা শহরে অথচ প্রতাপচাঁদ সহ সাতশ' লোককে হুগলীতে চালান দেওয়া হয়। তার কারণ পাওয়া যায় না। ('জালপ্রতাপ', পৃঃ- ১২৩)।

৩) পরাণচাঁদের ভয় ও দুর্বলতা ছিল,— যদি বর্দ্ধমান জজ-আদালতে মামলার শুনানি হয় তা হলে বর্দ্ধমানের বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং রাজবাড়ীর কর্মচারীবৃন্দ এমনকি

অন্তঃপুরের মহিলারাও স্বেচ্ছায় প্রতাপচাঁদের সপক্ষে সাক্ষী দেবেন।

৪) বর্দ্ধমানে কেস চলতে থাকলে প্রতাপচাঁদের পক্ষে অর্থসংগ্রহ করা সহজ হবে। কিন্তু অন্যত্র সেই সুযোগ-সুবিধা থাকবে না।

৫) জমিদারীর অধিকার সংক্রান্ত বিষয়ে মামলার নিষ্পত্তি হওয়া উচিত ছিল বর্দ্ধমান অথবা কলকাতার দেওয়ানী আদালতে, আর এই মামলার প্রতিপক্ষ ছিলেন মহ্‌তাব্‌চাঁদ অথবা কমলকুমারী। অথচ সুকৌশলে বিনা কারণে সরকার স্বত্ঃ প্রণোদিত ভাবে প্রতাপচাঁদকে দু'বারই ফৌজদারী মামলার আসামী করেন। মামলাটির গতিবিধি লক্ষ্য করলে বোঝা যাচ্ছে এটি সরকারী মামলা; পরাণচাঁদ সাক্ষী সংগ্রহ থেকে যাবতীয় খরচ খরচা চালাচ্ছেন কার স্বার্থে? এখানে একটি বিশেষ তাৎপর্য, তৎকালে খাজনা বা রাজস্ব নির্দিষ্ট তারিখে সরকারে জমা না পড়লে পরের দিনেই তা নিলামে উঠতো। এক্ষেত্রে ভূমি রাজস্ব জমা পড়ল না; অথচ বাকী খাজনায় জমিদারী নিলাম হলো না কোন এক অজ্ঞাত কারণে।

অতঃপর দায়রার কার্যপ্রণালী প্রভৃতি এবং উভয় তরফের সাক্ষীদের বক্তব্য উপস্থাপিত করা হচ্ছে।

দায়রা সোপর্দ্ ঃ— হুগলীর ম্যাজিষ্ট্রেট ই. এ. সামুয়েল ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে প্রতাপচাঁদের মোকর্দমা আরম্ভ করেন। এদিন তিনি এজলাসে বসে প্রতাপচাঁদকে বললেন, "তুমি নিজের নাম গোপন করে অসৎ অভিপ্রায়ে 'প্রতাপচাঁদের নাম গ্রহণ করেছ।' সেইজন্য তোমাকে আসামী করা হয়েছে।"

সামুয়েল সাহেব জাল রাজার এই অপরাধের উল্লেখ করায় প্রতাপচাঁদের উকিল জানতে চাইলেন, এই মামলার ফরিয়াদী কে? তদুত্তরে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব জবাব দিলেন, "গভর্ণমেণ্ট ফরিয়াদী।" এই কথায় সকলেই অবাক হলেন। প্রতাপচাঁদের নাম ব্যাবহার করায় পরাণচাঁদেরই সমূহ ক্ষতি, কিন্তু তিনি নালিস করিলেন না, তা হ'লে গভর্ণমেণ্টের কিজন্য এত দায়? এছাড়া আরও একটি ব্যাপার; ওগলবি সাহেব খুনের মামলার আসামী হয়েও জামিনে খালাস পেলেন অথচ প্রতাপচাঁদের নাম গ্রহণ করায় তাঁর জামিনে খালাস হলো না, চার মাস হাজত বাস করতে হলো। এ নিয়ে নানা জনে নানা মত প্রকাশ করতে থাকে।

সামুয়েল সাহেব বর্দ্ধমান থেকে প্রায় সকল আসামীকেই আনিয়েছিলেন; তাদের মধ্যে দায়রায় সোপর্দ করলেন সাত জনকে।—

(১) প্রথম আসামী জাল রাজা। (২) মোক্তার রাধাকৃষ্ণ ঘোষাল (যিনি বর্দ্ধমান

ম্যাজিস্ট্রেটের গেটের কাছে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন)। (৩) হাফেজ ফতে উল্লা। (৪) সাগরচন্দ্র ধর। (৫) কালীপ্রসাদ সিংহ। (৬) জুমন খাঁ। (৭) রাজা নরহরিচন্দ্র।

সামুয়েল সাহেব প্রমাণ স্বরূপ, বর্দ্ধমান রাজবাড়ী থেকে প্রতাপচাঁদের তৈল চিত্রটি আনিয়ে এজলাসের পাশে একটি ঘরে রেখেছিলেন। এই তৈলচিত্রটি অঙ্কন করেছিলেন সেই সময়কার একজন প্রখ্যাত ইংরাজ চিত্রকর জর্জ চিনারী। তিনি দেশী বিদেশী বহু বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের তৈল চিত্র অঙ্কন করেন। প্রতাপচাঁদের চিত্রটি তিনি এঁকেছিলেন। প্রতাপের অনুরোধে তাঁর সম উচ্চতা বিশিষ্ট এবং পোষাক পরিচ্ছদ, দেহের বর্ণ প্রভৃতি একবারে নিখুঁত যাতে হয় সেই মত ক'রে। বলাবাহুল্য প্রতাপের তৈলচিত্রটি একেবারে জীবন্তরূপ হয়েছিল।

যাইহোক, সামুয়েল সাহেব তিনটি বিষয়ের প্রমাণ নিয়ে জাল রাজাকে দায়রায় সোপর্দ করেন। বিষয় তিনটি হলো ঃ (১) জালরাজাকে সনাক্ত করার বিষয়, (২) প্রতাপচাঁদের প্রকৃত মৃত্যু হয়েছে কিনা। (৩) জালরাজা গোয়ারির কৃষ্ণলাল কিনা। এই সঙ্গে তিনি আর একটি চার্জ আনেন যে, সত্যই কালনায় জমিয়ৎবস্ত হয়েছিল কিনা। যদিও এই চার্জটি সম্বন্ধে কোন সাক্ষীর জবানবন্দী লওয়া হয় নাই।

দায়রার কাজ ঃ— ২০শে নভেম্বর তারিখে মোকর্দমার দিন ধার্য হয়। জজ সাহেব কার্টিস, উক্ত তারিখে সাক্ষীদের কোর্টে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিলেন। এদিকে হ্যালিডে সাহেব, গভর্ণমেন্ট পক্ষ সমর্থন করার জন্য বিগনেল সাহেবকে পাঠান। তিনি ছিলেন পাঁচশত টাকা বেতনভুক্ ডেপুটি লিগ্যাল রিমেম্বনসার। নির্দিষ্ট দিনের পূর্বেই অর্থাৎ ১৯শে নভেম্বর উপস্থিত হওয়ায় ধার্যদিনের পরিবর্তে ১৯ তারিখে মোকর্দমার কাজ শুরু হয়। তখন কৌন্সলি মর্টন সাহেব প্রতাপচাঁদের পক্ষ সমর্থন করার জন্য জজ সাহেবের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করায়, তিনি গভর্ণমেন্ট তরফের উকিল বিগনেল সাহেবের তাতে কোন আপত্তি না থাকায় তিনি কৌন্সলিকে অনুমতি দিলেন।

কৌন্সলি মর্টন সাহেব, আদালত কক্ষে প্রবেশ করে জজ সাহেবকে জানালেন, আসামী শারীরিক অসুস্থ আছেন, তাঁর বসার জন্য কোন ব্যবস্থা করার অনুমতি দিলে ভাল হয়। জজ সাহেব তাঁকে চেয়ার দেওয়ার হুকুম দিলেন। মোকর্দমা শুরু হলো।

প্রথমে, ফৌজদারি হতে এই মোকর্দমা সংক্রান্ত যে রোবকারি এসেছিল, তা মনসারাম দেওয়ানজী পড়তে আরম্ভ করেন। এখানে মনসারাম দেওয়ানজী সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। মনসারাম মিত্র আরামবাগ থানার তিরোল গ্রামের বাসিন্দা।

বর্দ্ধমান কালেক্টরের পেশকার ছিলেন। জালপ্রতাপচাঁদ মামলায় তিনি পরাণচাঁদের পরামর্শদাতা ও ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। তাঁর আরও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা হলো, মামলায় মিথ্যা সাক্ষী দেওয়া ও সাক্ষী জোটানো। এতে তাঁর প্রচুর অর্থ উপার্জন হতো।

বেলা ১১ টার সময় তিনি রোবকারী পড়তে শুরু করেন, বেলা দেড়টার সময় পড়া শেষ হয়। তারপর বর্দ্ধমানের ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব সাক্ষীদের যে জোবানবন্দী পাঠিয়েছিলেন তা' পড়তে আরম্ভ করলে জজ সাহেব বললেন, এখানে যখন জোবানবন্দী নেওয়া হচ্ছে তখন আর সাবেক জোবানবন্দী পড়ার দরকার নাই। কিন্তু, মনসারাম মিত্র বললেন, "তাহা হইতে পারে না; এ সমুদয় পাঠ করা আবশ্যক। ফৌজদারির সমুদয় কাগজপত্র না পড়িলে আসামীদের ফেরেবি কিরূপে বুঝা যাইবে।" ('জালপ্রতাপ', পৃঃ-৪৯)। সুতরাং জজ আর কোন আপত্তি করিলেন না। দেওয়ান মনসারাম যা ইচ্ছা সব প'ড়ে শোনালেন। তারপর চার্জ পড়লেন—

(১) আলোক শা ওরফে কৃষ্ণলাল ব্রহ্ম চারী, মৃত মহারাজাধিরাজ প্রতাপচাঁদ বাহাদুরের নাম ব্যবহার করেছে।

(২) সেই নাম ব্যবহার ক'রে ট্রেজারীর দেওয়ান রাধাকৃষ্ণ বসাককে ঠকিয়ে তাঁর কাছ থেকে টাকা নিয়েছে।

(৩) বেআইনি ভাবে কালনায় বিস্তর লোক জমিয়ৎবস্ত করিয়াছে।" ('জালপ্রতাপ', পৃঃ-৪১)

আসামী নিরপরাধী বলে জবাব দিয়েছিলেন। সে দিন আর কোন কাজ হয় নাই। তবে, প্রতাপচাঁদ যে লিখিত জবাব দিয়েছিলেন তা দু'দিন পর অর্থাৎ ২১শে নভেম্বর আলোচিত হয়। সেই সম্বন্ধে জজ সাহেব বলেন, " আমার বোধ হয়, জাল রাজার একটা আপত্তি সঙ্গত। এই মোকর্দ্দমা দেওয়ানির বিচার্য্য, ফৌজদারির নহে। অন্ততঃ জুরি কিম্বা আর একজন জজের সঙ্গে বসিয়া বিচার করা কর্ত্তব্য। কিন্তু আমি কি করিব? আমার আপত্তি আমি গভর্ণমেণ্টে জানাইয়াছিলাম, গভর্ণমেণ্ট তাহা শুনেন নাই। সুতরাং আমার উপর যেরূপ হুকুম, আমি তাহাই করিতে বাধ্য।" ('জালপ্রতাপ', পৃঃ- ৪১)।

সোনাক্তকরণ ঃ— হুগলীর ম্যাজিষ্ট্রেট আসামী সম্বন্ধে দায়রায় সোপর্দ করার প্রথম বিষয় সোনাক্তকরণ। প্রথম পর্য্যায়ে গভর্ণমেণ্টের সাক্ষী গ্রহণ করা হয়।

*ট্রাওয়ার সাহেব ***(C. T. Trower)*** বললেন ঃ— "আমি ১৮০৮ খ্রীঃ হইতে

১৮১৭ খ্রীঃ পর্যন্ত বর্দ্ধমানের কালেক্টর ছিলাম। প্রতাপকে বিলক্ষণ চিনিতাম। অপর ঘরে যে ছবি আছে, তাহা দেখিবামাত্র প্রতাপকে মনে পড়ে। কিন্তু এই আসামীকে দেখিলে প্রতাপকে মনে পড়ে না। যতদূর আমার স্মরণ হয়, তাহাতে এ ব্যক্তিকে কোন মতেই প্রতাপ বলিয়া বিশ্বাস হয় না .... আসামী কোনক্রমেই রাজা প্রতাপচাঁদ নহে।"

*প্রিন্সেপ সাহেব (***H. T. Princep,*** গভর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী)— ইনি গভর্ণমেণ্টের পক্ষের দ্বিতীয় সাক্ষী; বললেন ঃ– "আমি প্রতাপকে চিনিতাম। ১৯ বৎসর কি ২০ বৎসর যাহাকে দেখি নাই, তাহার আকৃতি স্মরণ থাকে, প্রতাপের আকৃতি আমার সেই রূপ স্মরণ আছে। আসামীকে প্রতাপচাঁদ বলিয়া মনে হয় না। *(I should say that he was not Protap Chand)*। প্রতাপ বেঁটে ছিলেন, এ লোকটা লম্বা। অপর ঘরে ছবির সঙ্গে এই ব্যক্তির সাদৃশ্য নাই।"

*প্যাটল সাহেব (***James Pattle,*** বোর্ডের মেম্বর) এর উক্তি, "১৮১৩ খ্রীঃ আমি কলিকাতায় যাই। প্রতাপ আমার সহিত সেখানে দেখা করিতে যান। কয়বার গিয়াছিলেন স্মরণ নাই। যে ছবি দেখিলাম, ঐ ছবির সঙ্গে আসামীর কোন সাদৃশ্য দেখিতে পাইলাম না।"

*হাচিনসন সাহেব ***(Mr. Hutchinson)*** ইনি পূর্বে বর্দ্ধমানের এ্যাক্টিং জজ ছিলেন। এই সময় তিনি সদর দেওয়ানী আদালতের জজ; বললেন, "আসামীকে আমি চিনি না। এ ব্যক্তি প্রতাপচাঁদ নহে। এ ব্যক্তি অনেক লম্বা ও স্থূলকায়।"

*প্রিন্স দ্বারকানাথ – এবার একজন কলকাতার সম্ভ্রান্ত পরিবারের বিশিষ্ট খ্যাতিমান নাগরিক এবং প্রতাপচাঁদের বন্ধু, তিনি জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারের 'বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর' সর্বহারা বন্ধুর জন্য কেমন সাক্ষী দিয়েছিলেন তা তাঁর স্বউক্তিতেই দেখা যাক। —"প্রতাপচাঁদের সঙ্গে আমার বড় বন্ধুতা ছিল, তিনি ওয়াটরলুর যুদ্ধের পর একবার কলিকাতায় রোসনাই দেখিতে আসিয়া আমার বাটীর নিকট কান্তবাবুর বাটীতে ছিলেন। সেই সময় আমার সঙ্গে তাঁহার প্রথম আলাপ হয়।"

এখানে ওয়াটরলুর যুদ্ধ প্রসঙ্গে বলা আবশ্যক; ১৮১৫ খ্রীঃ ওয়াটরলু'র যুদ্ধে নেপোলিওন ব্রিটিশদের হাতে চূড়ান্ত পরাজয়ে, ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ সহ সর্বত্র ব্রিটিশ উপনিবেশগুলিতে মহা আড়ম্বরে বিজয়োৎসব পালিত হয়েছিল। সেই সূত্রে কলকাতায়ও জাঁকজমক সহ সেই উৎসব পালিত হয়; সেই উপলক্ষে প্রতাপচাঁদ কলকাতা গিয়েছিলেন। এবার ফিরে আসা যাক বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুরের কথায়।–

"তিনি গভর্ণমেণ্ট হাউসের রোসনাই দেখিতে যান, আমি তাঁর সঙ্গে যাই। প্রতাপ কখনো কলিকাতার তাঁতি কি বেনের বাড়ী যান নাই। তিনি কেবল আপনার সমযোগ্য লোকের বাড়ি যাইতেন— রাজা গোপীমোহন আর আমার বন্ধু রামমোহন রায়ের বাটী যাইতেন। আমি এই আসামীকে চিনি না, এ ব্যক্তি নিশ্চয় প্রতাপ নহে। ওগলবির মোকর্দ্দমায় যখন এ আসামী সুপ্রীম কোর্টে সাক্ষী দিয়াছিল, তখন আমি ইহাকে দেখিয়াছিলাম। ঐ সময় এ ব্যক্তি আমাকে চিনিয়াছিল, কিন্তু এ ব্যক্তি আমাকে চিনিলে কি হইবে, আমি ত উহাকে চিনি নাই। ওয়াটরলু লড়াইয়ের সময় হইতে আমার চেহারার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া থাকিবে। তাহার পূর্বে যে, আমায় দেখিয়াছে, সেই আমায় চিনিতে পারে। মেজেষ্টার সাহেব আমায় যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার নকল কে চুরি করিয়া আনিয়াছে, আমি সে চোর ধরিতে চেষ্টা করিতেছি।" সাক্ষী বিনা সওয়ালে চিঠি সম্বন্ধে কথাগুলি বললেন। দায়রায় এসে বললেন, "প্রতাপের যে ছবি, এই আদালতে দেখিলাম তাহার সঙ্গে এই আসামীর বিলক্ষণ মিল আছে। আমি ঠিক বলিতে পারি না যে, এ আসামী প্রতাপচাঁদ কি না, তবে আমার বোধ হয় ইনি প্রতাপচাঁদ নহেন।" এই সাক্ষ্য দিয়ে ফেরার পথে হুগলী ঘাটে পথচারী মানুষ তাঁকে ধিক্কার দিয়েছিল, মেছুনীরা আঁশবটি নিয়ে তাড়া ক'রে এমন কি তাঁর মাথায় গুগলি শামুক ঢেলে দেয়।

এত বড় গণ্যমান্য ব্যক্তি প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর, তাঁর বন্ধু রাজা প্রতাপচাঁদ মহ্‌তাবের বিরুদ্ধে যে সাক্ষ্য দেবেন তা' কল্পনাও করা যায় না। তাঁর কাছে বন্ধুত্ব অপেক্ষা অর্থই বড় বলে প্রতীয়মান হলো। "জনশ্রুতি যে, দ্বারকানাথ জালপ্রতাপচাঁদ মামলায় সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য পরাণবাবুও মহ্‌তাব্‌চাঁদের নিকট প্রচুর অর্থ লাভ করেছিলেন।" ('জালপ্রতাপচাঁদ' পাদটিকা পৃষ্ঠা-৯১)।

*রাধাকৃষ্ণ বসাক – ইনিও একজন সরকারী সাক্ষী। তিনি বললেন, "আমি ছয় মাস ইহাকে কলিকাতায় আমার আপনার বাটীতে রাখিয়াছিলাম। সেখানে ডাক্তার হ্যালিডে একদিন আসিয়া আমাকে বলিয়াছিলেন, 'ইনি নিশ্চয়ই প্রতাপচাঁদ, তাহার কোন সন্দেহ নাই।' রাজা গোপীমোহন দেব বলিয়াছেন, 'এ ব্যক্তি সত্যই প্রতাপচাঁদ।' মহারাজা রণজিৎ সিংহের সৈন্যাধ্যক্ষ জেনারেল এলার্ড 'আমায় বলিয়াছিলেন, তাহার কথায় আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে। আমি একা ইহাকে টাকা কর্জ্জ দিই নাই আরও অনেকে দিয়াছেন, দুই-এক জন ইংরেজও দিয়াছেন। কত টাকা বলিতে পারি না– ষোল হাজার হবে। ইহাকে সত্যই প্রতাপচাঁদ মনে করিয়া টাকা দিয়াছি। ইহাকে আমি চিনিতাম

না।'' ('জালপ্রতাপ', পৃঃ- ৪৫)। রাধাকৃষ্ণ বসাক আর একটি কথা বলেছিলেন, 'রাজা বৈদ্যনাথের সঙ্গে এই আসামীকে হুগলীর জেলে দেখিতে আসিয়াছিলাম।'

অতঃপর পরাণচাঁদের তরফের সাক্ষীদের পর্যায়ে আসা যাক। তাঁর তরফের প্রথম সাক্ষী রাজা বৈদ্যনাথ রায়। ইনি পাথুরিয়াঘাটার জমিদার, রাজা সুখময় রায়ের দ্বিতীয় পুত্র।

*বৈদ্যনাথ রায় সাক্ষী দিলেন, ''প্রতাপের সঙ্গে আমার দুইবার সাক্ষাৎ হইয়াছিল একবার গভর্ণর জেনারেলের দরবারে, আর একবার একটা বিবাহ বাটীতে। সেখানে রাজা ছদ্মবেশে গিয়েছিলেন। (রামরত্ন মল্লিকের পুত্রের বিবাহ সভায়) এই আসামী রাজা প্রতাপচাঁদ নহে। আমি কাহারও নিকট বলি নাই যে, ঐ ব্যক্তি নিশ্চয়ই প্রতাপচাঁদ।'' ('জালপ্রতাপ', পৃঃ- ৪৫)।

রাজা বৈদ্যনাথ রায় আদালতের বাইরে আসা মাত্র লোকে তাঁর গায়ে ধূলা ছুঁড়তে লাগল। এছাড়া; রাধামোহন সরকার, এঁর সঙ্গে পরাণচাঁদ কালনায় একদল লাঠিয়াল পাঠিয়েছিলেন; বসন্তলাল, রাজবাড়ীর কর্মচারী; মোহনলাল, রাজবাড়ীর হাতীশালার দারোগা; ভৈরবনাথ, পরাণচাঁদের শ্যালক-ভগ্নিপতি; নন্দলাল পরাণচাঁদের কুটুম্ব প্রভৃতি সকল সাক্ষীরই একই কথা 'আসামী প্রতাপচাঁদ নহে।'

অতঃপর আসামীপক্ষের সাক্ষীদের সাক্ষ্যদান সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাক। আসামী পক্ষের প্রথম সাক্ষী, *37th. Madras Native Infantry*'র ডাক্তার রবার্ট স্কট এর উক্তি— ''আমি ১৮১৫ খ্রীঃ হইতে ১৮১৭ খ্রীঃ পর্য্যন্ত বর্দ্ধমানে ছিলাম, আমি রাজা প্রতাপচাঁদকে ভাল চিনিতাম, তাঁহার সঙ্গে আমার বিশেষ বন্ধুতা ছিল। এই আসামী সেই প্রতাপচাঁদ। জেলখানায় গিয়া ইহার সর্ব্বাঙ্গের চিহ্ন বিলক্ষণ করিয়া দেখিয়াছি, সকল চিহ্ন মিলিয়াছে। ১৮১৭ খ্রীঃ ইহার গালের ভিতর একখানি ঘা হইয়া শোষ হয়, আমি তাহা ভাল করি। সে ঘায়ের দাগ অদ্যাবধি রহিয়াছে।'' তারপর তিনি নিজের সম্বন্ধে ও অন্য দু'একটি ঘটনার কথা আসামীকে জিজ্ঞাসা করেন। ''আমি কি করিয়া বেড়াইতাম? আসামী বলিল, 'একটি পিস্তল লইয়া পথে পথে কুকুর মারিয়া বেড়াইতে।' আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, এই সময় দেওয়ানী জেলে কি একটা গোলমাল হইয়াছিল? আসামী উত্তর করিল, 'বুলার সাহেব রঘুবাবুকে জেলে পাঠাইয়াছিলেন। রঘুবাবু বিষ খাইয়া মরিয়াছিলেন। তুমি তার দেহ চিরে বিষের কথা বলিয়াছিলে।' এ সকল কথাই সত্য।''

*জন রিডলি– ইনি আসামী পক্ষের দ্বিতীয় সাক্ষী। তিনি বললেন, ''আমি প্রতাপচাঁদকে

চিনিতাম। আমি ১৮১৫ খ্রীঃ হইতে ১৮১৭ খ্রীঃ পর্য্যন্ত বর্দ্ধমানে ছিলাম। ......আমি ইহাকে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত দুই একটি কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, ইনি সে সকল কথার যথার্থ উত্তর দিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, আপনার নিকট কখন কিছু আমি বিক্রয় করিয়াছিলাম কি না? আসামী বলিলেন যে, 'একবার একটি সোনার ঘড়ি বিক্রয় করিয়াছিলে।' আর একটি কথা জিজ্ঞাসা করিলাম যে, রাজবাটীর সিপাহীদের সঙ্গে প্রোবিন্‌সাল্ সিপাহীদের যে বিবাদ হয়, তাহা কিরূপে মিটিয়াছিল? তাহাতে আসামী বলেন, 'রেবিনিউ বোর্ড হুকুম দেন যে, রাজবাটীর সিপাহীরা সবুজ পোষাক পরিবে, তাহাতেই সে বিবাদ ভঞ্জন হয়।' এ সকল প্রকৃত তথ্য।''

*মিসেস হেরিয়াট কিটিং— আসামীকে দেখে বললেন, ''আমি প্রতাপচাঁদকে চিনিতাম, আসামী সেই প্রতাপচাঁদ। নিশ্চয়ই আমার বয়স তখন ষোল বৎসর, তখন আমি ইহাকে অনেকবার আমার পিতার বাটীতে ও অন্যত্র দেখিয়াছি।''

*সাক্ষী মিসেস সফিয়া কেন বললেন, ''আমি প্রতাপচাঁদকে ভালরূপে জানিতাম, আসামী নিশ্চয়ই প্রতাপচাঁদ।

*চন্দননগর বাসিন্দা জাতিতে ফরাসী ফ্রানসুয়া সুলিমান বললেন, ''আমি প্রতাপচাঁদকে চিনি, আমি সর্ব্বদাই চুঁচুড়া যাইতাম, সেখানে প্রতাপচাঁদকে দেখিয়াছি। একবার নীলকুঠী ক্রয় করিবার নিমিত্ত তাঁহার নিকট আট দশবার যাতায়াত করিয়াছিলাম। এই আসামী সেই প্রতাপচাঁদ। অদ্য আমার সঙ্গে দেখা হওয়ায় আমাকে ইনি চিনিতে পারিলেন এবং নীলকুঠী বিক্রয় সম্বন্ধে কথা বলিলেন।''

*ডাক্তার জুলিয়ান নাইটার্ড। ফরাসডাঙ্গায় (চন্দননগরের অংশ) ফরাসী ভাষায় জবানবন্দী দিলেন ঃ–''আমার বয়স ৭৯ বৎসর। আমি এখনও ভাল দেখিতে পাই। এই আসামীকে চিনি, ইনি বর্দ্ধমানের রাজা, ইহার নাম স্মরণ নাই, ইহাকে আমরা ছোটরাজা বলিতাম। আমি সেদিন জেলখানায় ইহাকে দেখিতে গিয়াছিলাম, আসামী আমাকে দেখিবামাত্র চিনিয়াছিলেন।''

আর একজন বিদেশী, আসামী পক্ষের সাক্ষী, ডেভিড হেয়ার সাহেব, তিনি স্কটল্যাণ্ডের লোক; তাঁর জোবানবন্দী এখানে উদ্ধৃতি করা হলো। ঃ—

''আমি রাজা প্রতাপচাঁদকে চিনিতাম। তিনি যখন কলিকাতায় ছিলেন, ১৮১৭ কি ১৮১৮ খ্রীঃ ছয় সাতবার আমার সঙ্গে তাহার দেখা সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তাঁহার সঙ্গে এই আসামীর বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে। পার্শ্বের ঘরে যে ছবি আছে, তাহা আমি দেখিয়াছি। সেই ছবির পার্শ্বে আসামীকে একবার এদিকে একবার ওদিকে দাঁড় করাইয়া

দেখিয়াছি, তাহার সঙ্গে আসামীর নাক, চোখ, অবয়ব বিলক্ষণ মিলে। বিশেষত ছবির বাম দিকে আসামীকে দাঁড় করাইলে আরো মিলে, আসামীর চিবুক ও নিম্ন ঠোঁটের নীচে যে গর্ত্তের মত আছে তাহাও মিলে। ....আসামী ঠিক প্রতাপের মত উচ্চ। অদ্য প্রাতে জেলখানায় আসামীর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। সেই সময় দুই এক বিষয়ে কথাবার্ত্তা হয়। আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, রামমোহন রায়কে স্মরণ আছে কি? প্রথমে আমি রামমোহন রায়ের সঙ্গে প্রতাপচাঁদের সহিত আলাপ করিতে যাই, ...তাহা স্মরণ হইল। তখন তিনি আমাকে বলিলেন যে, 'তুমি সেইদিন একটা বন্দুকের মত বাক্স করিয়া একটি দূরবীন লইয়া গিয়াছিলে আর একটা খাঁচায় দুইটা পাখী লইয়া গিয়াছিলে। আমরা একত্রে ছাদে গিয়া কথা কহি।'— এ সকল কথা প্রকৃত। দূরবীন প্রায় ৪০ ইঞ্চি লম্বা ছিল, তাহাও আসামীর স্মরণ আছে। আমার বিশ্বাস যে, এই আসামী প্রতাপচাঁদ বটে। আমি আর একটিবার পানিহাটি গ্রামে একটি নাচের নিমন্ত্রণে আসামীকে দেখিয়াছিলাম, ইহার মুখের ওপরভাগ দেখিয়াই বোধ হইয়াছিল, এ ব্যক্তিকে আমি চিনি। কিন্তু তখন ইহার দাড়ি ছিল বলিয়া ভাল চিনিতে পারি নাই, তাহার পর ওগিলবির মোকর্দ্দমায় ইহাকে আমি সুপ্রীমকোর্টে সাক্ষী দিতে দেখি, দেখিয়াই ইহাকে প্রতাপচাঁদ বলিয়া আমার বোধ হইয়াছিল। সেইখানেই এই কথা আমি কৌন্সলি লিট সাহেবকে বলি। আমি অনেকদিন জনরব শুনিয়াছিলাম যে, প্রতাপের মৃত্যু সম্বন্ধে কিছু সন্দেহ আছে।"

এ ছাড়া, জন মার্শালি, ফ্রেডারিক থিয়ার্শ প্রমুখ বিদেশী সাক্ষীরা সুস্পষ্ট ভাবে বলেন, আসামী নিশ্চয়ই ছোটরাজা প্রতাপচাঁদ। তারপর যাঁরা প্রতাপচাঁদকে সনাক্ত করা বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন তাঁদের বক্তব্য এখানে উদ্ধৃতি করা হলো।—

*হাজি আবু তালেব। ইনি চুঁচুড়ায় বসবাসকারী একজন মোগল, সওয়াল মতে বললেন, "আমি প্রতাপচাঁদকে ভালরূপে চিনিতাম। আসগর আলি নামে একজন হাকিম তাঁহার বাটীতে থাকিত, আমি রাজবাটীতে গিয়া সেই আসগর আলির নিকট চিকিৎসাশাস্ত্র শিখিতাম। সুতরাং প্রতাপচাঁদকে বিলক্ষণ চিনিতাম।.........এই আসামী সেই রাজা। আমি পূর্বে রাজার চক্ষে যে দাগ দেখিয়াছিলাম, আসামীর চক্ষে সেই দাগ দেখিয়াছি।"

*গোলকচন্দ্র ঘোষ। সালিখা নিবাসী। ইনি প্রতাপচাঁদের গৃহশিক্ষক ছিলেন। তিনি বললেন, "আমি কিছুদিনের জন্য ছোটরাজাকে ইংরাজী পড়াইয়াছিলাম। তাঁহাকে অনেকবার দেখিয়াছি, তাঁহাকে আমি চিনি, এই আসামী ছোট মহারাজ।"

*গোপীমোহন পরামাণিক। ইনি বললেন, ''আমি জাতিতে ময়রা, আমার বয়স ৮৬ বছর, গোলাপবাগের গেটের কাছে আমার দোকান আছে। এই আসামীদের মধ্যে আমি কেবল মহারাজা প্রতাপচাঁদ বাহাদুরকে চিনি। যখন ইনি বর্দ্ধমানে প্রথম ফিরিয়া আসিলেন, তখন আমি ইঁহাকে গোলাপবাগে দেখিয়াছিলাম। আমি মিষ্টি লইয়া ইহাকে খাইতে দিয়াছিলাম। পূর্বে শুনিয়াছিলাম ছোট মহারাজা মরেন নাই, মৃত্যুর ভান করিয়া পলাইয়াছিলেন, তীর্থযাত্রায় গিয়েছিলেন।''
*রামধন বাগ্দীর জোবানবন্দী। ''আমি পলতার ঘাটমাঝি। এই আসামী মহারাজকে চিনি ষোল সতর বৎসর ধরিয়া আমি তেলিনীপাড়ার রামধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাউলের মাঝি ছিলাম। ভদ্রেশ্বরে রামধন বাবুর একখানি বাগান ও বৈঠকখানা ছিল। সেইখানে মহারাজা মধ্যে মধ্যে যাইতেন, একদিন কি এক রাত সেখানে থাকিতেন ইহা আমি দেখিয়াছি।''
*আগা আব্বাস। ইনি একজন বলিষ্ঠ মোগল। বডিগার্ড স্বরূপ রাজবাটীতে থাকতেন। আগা আব্বাস আলি সর্বদা প্রতাপের সঙ্গে ছায়ার মত বেড়াতেন। তিনি বললেন, ''এই আসামী রাজা প্রতাপচাঁদ। সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই।''
*আমীর উদ্দিন আমেদ। ইনি চুঁচুড়া নিবাসী। তিনি বললেন, ''আমি প্রতাপচাঁদকে চিনিতাম।.......... চুঁচুড়ায় আসিলেই আমি দেখিতে পাইতাম। এই আসামী সেই প্রতাপচাঁদ।''
*রাজা ক্ষেত্রমোহন সিংহ। ইনি বিষ্ণুপুরের রাজা; সাক্ষ্য দিলেন, ''আমার পিতার নাম মহারাজা চৈতন সিংহ, নিবাস বিষ্ণুপুর। তেজচাঁদ বাহাদুরের সহিত আমার বিশেষ বন্ধুতা ছিল। আমি বর্দ্ধমানে সর্ব্বদা যাইতাম, এক একবার গিয়া দুই মাস করিয়া থাকিতাম। আসামী নিশ্চয়ই তেজচন্দ্র বাহাদুরের পুত্র প্রতাপচাঁদ। পূর্ব্বে আমি প্রতাপের পলায়ন বার্ত্তা শুনিয়াছিলাম। সাত-আট বৎসর হইল, লাহোর নিবাসী আমার একজন পাঠান দ্বারবান স্বদেশ হইতে প্রত্যাগমন করিয়া আমাকে বলিয়াছিল, 'আমি পূর্ব্বে রঞ্জিত সিংহের পুত্র খড়ক সিংহের সহিত প্রতাপচাঁদকে এক হাতীতে চড়িয়া যাইতে স্বচক্ষে দেখিয়াছি।' আসামী তিন বৎসর হইল, একবার আমার বাটীতে গিয়াছিল। আমি যত্নপূর্ব্বক ইহাকে তথায় তিন মাস রাখি। সেইজন্য বাঁকুড়ার মেজেষ্টার আমাকে দেড় বৎসর আটক রাখেন, আর বিস্তর অপমান করেন।''
*রাজা জয়সিংহ। ইনি জামকুড়ি নিবাসী। এজেহার দিলেন, ''আমি বিষ্ণুপুরের রাজগোষ্ঠী, আমি আসামীকে চিনি, ইনি প্রতাপচাঁদ।''

*হাকিম আলিউল্লা বলিলেন, " আমি আসামীকে চিনি, ইনি প্রতাপচাঁদ। পূর্বে ইঁহার চিকিৎসা আমি করিয়াছি।"

*কুঞ্জবিহারী ঘোষ। ইনি রাজবাটীর কর্মচারী ছিলেন। তিনি বললেন, "আমি আসামীকে চিনি। আসামী আমার সাবেক মুনিব প্রতাপচাঁদ, ইনি যখন প্রথম গোলাপবাগে আসেন. আমি উহাকে চিনিয়াছিলাম এবং পরাণবাবুর পুত্র তারাচাঁদকে বলিয়াছিলাম। সেইজন্য আমার রাজবাটীর চাকুরি যায়।"

পিটার এমার সাহেব, ফ্রেজার সাহেব, নাজির গোলাম হোসেন, আগা ইস্পাহানী ও স্বরূপচন্দ্র গোস্বামী প্রভৃতি আরও অনেকে আসামীর পক্ষে জোবানবন্দী দিলেন। প্রতাপচাঁদের মাতুল একদিন এসেছিলেন কিন্তু জজ সাহেবের আপত্তি থাকায় তাঁর জোবানবন্দী হয় নাই। অবশ্য তাঁর পিসি তোতাকুমারী ও দুই স্ত্রী সমন পেয়েছিলেন কিন্তু সাক্ষী দেন নাই।

মাতুলকে সাক্ষী দিতে না দেওয়ায় প্রতাপচাঁদ বিরক্তি প্রকাশ করলে উকিল সাহেব বললেন, "সোনাক্ত সম্বন্ধে যে প্রমাণ আমরা দিয়াছি, এ মোকর্দ্দমার পক্ষে তাহাই যথেষ্ট।.................আমি যাহা দেখিতেছি, তাহাতে আর পাঁচ হাজার সাক্ষী আপনাকে সোনাক্ত করিলেও জজ সাহেবের মত ফিরিবে না। আপনি প্রতাপচাঁদ কি না, এ কথার বিচার দেওয়ানি আদালতে ভিন্ন এখানে হইবে না। এখানে সে বিচার হইলেও কোন ফল দর্শিবে না, এখানকার বিচারে আপনি রাজত্ব পাইবেন না, আপনাকে আবার দেওয়ানিতে নালিশ করিতে হইবে।....."('জালপ্রতাপ', পৃঃ- ৫১) জোবানবন্দী এক প্রকার শেষ হলো দায়রায় সাতজন আসামী সোপর্দ হয়েছিল। প্রতাপচাঁদ ছাড়া অন্য ৬ জনের কোন প্রমাণাদি না থাকায় জজ সাহেব তাদের খালাস দেন।

এখন উভয় পক্ষের সাক্ষীদের জোবানবন্দীর আলোচনা ক'রে জজ সাহেব আসামীর বিরুদ্ধে, অপরদিকে কাজী মন্তব্য করলেন, 'ফরিয়াদীর সাক্ষ্য প্রমাণ এমন জোরাল নয় যাতে আসামীকে শাস্তি দেওয়া যেতে পারে।' সুতরাং বলা যেতে পারে, যেমন করে হোক প্রতাপচাঁদকে মৃত প্রতিপন্ন করা; এই হলো জজ সাহেবের মানসিকতা।

প্রতাপচাঁদ প্রকৃতই কি মৃত ?— প্রতাপচাঁদের মৃত্যু প্রমাণ করার জন্য রাজবাটী থেকে রাধামোহন সরকার, বসন্তলালবাবু, ভৈরববাবু নন্দবাবু প্রভৃতি পনেরো জন ব্যক্তি একই রকম সাক্ষ্য দিলেন;– তাঁরা প্রত্যেকেই হুবহু একই কথা বলে গেলেন, "এদিকে প্রতাপচাঁদ পালঙ্কে শুইয়া হাতী ঘোড়া ধন ধান্য দান করিতে লাগিলেন।

দান করা হইলে পর তাঁহাকে অন্তর্জলি করা গেল। তাঁহার পা মোহনবাবু জলে ডুবাইয়া ধরেন। প্রতাপচাঁদের মৃত্যু হইলে ঘাসিরাম তাঁহার মুখাগ্নি করেন। বাবলা ও চন্দন কাষ্ঠে প্রতাপের শবদাহ হয়।'' ('জালপ্রতাপ', পৃঃ- ৫২)। বলা বাহুল্য সাক্ষীরা রাজবাটীর কর্মচারী ও পরাণচাঁদ বাবুর আত্মীয় কুটুম্ব। এই সাক্ষীদের জোবানবন্দী জজ সাহেব সম্পূর্ণ সত্য বলে গণ্য করেন।

প্রতাপচাঁদ জজকে বললেন, '' পরাণের আত্মীয় কুটুম্বের কথায় নির্ভর করিয়া কেন আমার মাথা খাও! প্রতাপের মরণের সময় পরাণের কুটুম্ব ব্যতীত কি আর কেহ ছিল না? প্রতাপের ও তো কুটুম্ব, আমলা, চাকর, সকলেই ছিল, কই তাহাদের একজনকেও ত ডাকা হয় নাই।'' ('জালপ্রতাপ', পৃঃ- ৫৩)। তিনি আরও বলেন বিমাতা মহারাণী কমলকুমারী আমার পরম শত্রু, আমার বয়স ১৬/১৭ তখন তিনি দুইবার আহারের সঙ্গে বিষ দেন। একবার তাহা ফেলিয়া দিই, আর একবার একটা ইঁদুরকে খাইতে দিই। ইঁদুরটি তাহা খাইয়া তৎক্ষণাৎ মরে। শেষ অবধি আমার অন্ন আমি স্বতন্ত্র পাক করাইতাম। পরাণ আর বসন্তলালবাবু আমার সর্ব্বনাশ করিবার নিমিত্ত সহস্র ফাঁদ পাতিতেন, আমি তাহা কৌশলে উদ্ধার হইতাম।''('জালপ্রতাপ', পৃঃ- ১২৪)। জজ, প্রতাপের কথায় কান না দিয়ে, রায়-এ লিখলেন ঃ—

"The proof here is of the strongest description of the testimony of the fact; viz the deposition of the witness (fifteen in number) named in the margin, who have sworn positively to the death and cremation and who are consistant in their narrative of the attendant particulars, their testimony would appear to be conclusive." ('জালপ্রতাপ', পৃষ্ঠা- ৫২/৫৩)।

জজ সাহেব কৃত সঙ্কল্প ছিলেন যেমন করেই হোক প্রতাপচাঁদকে সাজা দিতে হবে; তাই নানা প্রকার কৌশল অবলম্বন করেছিলেন। এখন তিনি, জাল রাজা, গোয়াড়ির কৃষ্ণলাল ব্রহ্মচারী কি না প্রমাণের জন্য সাক্ষীদের জোবানবন্দী নেওয়া ব্যবস্থা করেন।

প্রতাপচাঁদ কি গোয়াড়ীর কৃষ্ণলাল?— রাজা প্রতাপচাঁদকে কৃষ্ণলাল ব্রহ্মচারী প্রতিপন্ন করায় জজ সাহেব বহু সাক্ষী যোগার করেছিলেন। যাঁরা সাক্ষী দিতে এসেছিলেন, তাঁরা হলেন, যশোহরের ফকিরচাঁদ তেওয়ারী (কৃষ্ণলালের মামা), ঈশ্বরচন্দ্র তেওয়ারী (মাতুল পুত্র), মহেশ পণ্ডিত ,(বর্দ্ধমান জেলার রায়না গ্রামের অধিবাসী), রামচাঁদ মিত্র (বর্দ্ধমান কালেক্টরীর মুহুরী), রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (খ্রীষ্টান);

প্রেমচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায় (নদীয়া জেলার ফৌজদারী নাজির); পাদরি ডিয়ার সাহেব *(Revd. W. J. Deere)* প্রভৃতি ২১ জন সাক্ষী ও গোয়ারির অন্যান্য সাক্ষী যারা ছিল তাদের জোবানবন্দী লওয়া হয় নাই। সাক্ষীদের উক্তিতে প্রতাপচাঁদ যে 'কৃষ্ণলাল ব্রহ্মচারী' তা প্রমাণিত হয় নাই।

"উভয় পক্ষের প্রমাণাদি দেখিয়া কাজি সাহেব রায় দিলেন যে, আসামী কৃষ্ণলাল ব্রহ্মচারী নহে। কৃষ্ণলালের আত্মীয় উল্লেখে যাহারা জোবানবন্দী দিয়াছে তাহাদের কথা বিশ্বাসযোগ্য নহে।" (জালপ্রতাপ, পৃঃ- ৬৪)।

জজ সাহেব বুঝেছিলেন, জাল রাজা যে কৃষ্ণলাল— এ কথা ভাল প্রমাণ হয় নাই; তা সত্ত্বেও তিনি রায়ে লিখলেন যে, জালরাজা যে কৃষ্ণলাল তা একরকম প্রমাণ হয়েছে। তা ছাড়া তার অকাট্য প্রমাণের কোন প্রয়োজন নাই। " প্রতাপচাঁদের মৃত্যু ও তাহার শব দাহ যখন বিশেষরূপে প্রমাণ হইয়া গিয়াছে, তখন এই আসামী কৃষ্ণলাল প্রমাণ না হইলেও কিছু ক্ষতি নাই।" (জালপ্রতাপ, পৃঃ- ৬৪)। *"Combining all their testimonies I can not avoid the conclusion that the prisoner's identity is sufficiently estableshed by a preponclerance of evidence above whatever has been adduced to impeach it.Evidence in such a matter cannot be expected to amount to absolute demonstration. Some dimness, and it may be doubt, will abscure the recital now of details which occured at a remote date. But circumstances considered, I look upon the proofs as being on the whole satisfactory. It is true that in the main point the law-Officer reject the evidence on the grounds that there are several descrepancies, which I admit, in the averments made by the witnesses who sewears to the prisoner's identity with Kristo Lal. For the reasons which I have stated above, it appears to me, the identity is established by tolerably good, or I may say, sufficient evidence, although it may not be so satisfactory and decisive as the testimony to the Rajah's death. But I have a remark to make on this subject. After the prosecutor had proved the death and cremation of Rajah Protap Chunder, it was, I think in no way incumbent on him to show who the prisoner really is. So long as the death, cremation, and non-identity*

remain, as I regard them firmly estableshed, it would have been matter of no moment to the case had he failed to prove that the prisoner is Kristo Lal."---Extract from No.3 of the Calender for September, 1838 ('জালপ্রতাপ', পৃষ্ঠা– ৬৫)।

কালনায় জমিয়তবস্ত ঃ— পূর্বেই বলা হয়েছে, ''এ সম্বন্ধে কোন প্রমাণ মেজেষ্টারীতে লওয়া হয় নাই।............স্বয়ং জজ সাহেব বলিয়াছিলেন যে, 'কালনার জমিয়তবস্ত অতি সামান্য ব্যাপার। তথাপি কয়েকজন সাক্ষীর জোবানবন্দী লওয়া হইল। নাজির আসাদ আলি আর দারোগা মহিবুল্লা প্রধান সাক্ষী। তাঁহারা অনেক কথা বলিলেন।'' ('জালপ্রতাপ', পৃঃ- ৬৫)। সুতরাং দেখা যায় জজ ইচ্ছা মত রায় দিলেন যে, কালনার জমিয়তবস্ত প্রমাণ হয়েছে।

এক্ষণে দেখা যাচ্ছে জজ সাহেব ও কাজী সাহেবের ঐক্যমত হতে না পারায় মামলাটি নিজামত আদালতে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। নিজামত আদালতের রায়ে মৃত মহারাজা প্রতাপচাঁদের নাম ব্যবহার করায় আসামী অলক শা ওরফে প্রতাপচাঁদ ওরফে কৃষ্ণলাল ব্রহ্ম চারীর ১০০০/-(এক হাজার) টাকা জরিমানা অনাদায়ে ছয়মাস কারাদণ্ডের হুকুম হয়। এই রায়ের বিরুদ্ধে প্রতাপচাঁদ আপীল করায় বিচারপতি ব্রাডন সাহেব *(W. Braddon)* এবং টকর সাহেব *(C. Tucker)* একত্রে রায় দেন— *"The court further remark, that as they have judicially pronounced the petitioner not to be the Maharajah Protaub, they can not in future, receive any petitions or applications from him under that name and title."---Extract from order dated 19th. July 1839.* এই হুকুমই প্রতাপচাঁদের সর্বনাশের প্রধান কারণ হয়েছিল। এই আদেশ বলে প্রতাপচাঁদ– ওরফে কৃষ্ণলাল– ওরফে অলক শা কোন নামেই দেওয়ানী আদালতে দরখাস্ত করতে পারবেন না আর করলেও তা' গ্রাহ্য হবে না। প্রতাপচাঁদ, প্রিভিকাউন্সিলে আপীল করার জন্য জজ সাহেবদের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করলে তা তাঁরা অনুমতি দেন নাই। যাঁরা মামলা চালাবার জন্য টাকা কর্জ দিয়েছিলেন, তাঁরা স্পষ্ট বুঝতে পারলেন, সরকার যে কোন কৌশলে প্রতাপচাঁদকে জমিদারী থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত করলেন; অতঃপর আর কেহ তাঁকে টাকা দিলেন না। জেলেই তাঁকে যেতে হলো।

স্বার্থান্বেষীদের চক্রান্তে রাজা হয়েও যিনি আজ রাজ্য হারা, পথে পথে যাঁকে

ভিখারীর মত ঘুরে বেড়াতে হয়েছে, মিথ্যা অপবাদে যাঁকে জেলখানার অন্ধকূপে নিদারুণ কষ্টে দিন কাটাতে হয়েছে, যাঁর আর্জি আদালত শুনতে চায় নাই, সেই কথাগুলি, যতগুলি সংগৃহীত হয়েছে তা লিপিবদ্ধ করা হল।

জাল রাজার নিজ কথা ঃ— প্রতাপচাঁদের রাণীদের সাক্ষী দেওয়ার ব্যাপারে, "লোকে যে যাহাই বলুক, আমরা শুনিয়াছি, যে রাণীরা সপিনা পাইয়া স্থির করিয়াছিলেন যে, "আসামীকে যদি বাস্তবিক আমরা ছোট মহারাজ বলিয়া চিনিতে পারি, তথাপি সে কথা আমরা মুখে আনিতে পারিব না; আসামীকে স্বামী বলিয়া স্বীকার করিলে পোড়া লোকে বলিবে যে, বৈধব্য ঘুচাইবার নিমিত্ত রাণীরা মিথ্যা বলিয়াছে। এবং হয় ত সেই কারণে জজ সাহেবও আমাদের কথা গ্রাহ্য করিবেন না। সুতরাং আমরা স্বামী পাইব না। তবে কেন কলঙ্কের পসরা মাথায় লইব? এইজন্য প্রথমে তাঁহারা অস্বীকার করেন।"

পরে রাজা যখন শুনলেন রাণীরা জোবানবন্দী দেবার দরখাস্ত করেছেন, তখন প্রতাপচাঁদের সন্দেহ হয়, তিনি শা সাহেবকে জিজ্ঞাসা করেন, "কাহার দ্বারা এ দরখাস্ত আসিয়াছে এবং সে ব্যক্তি কোথায় বাসা করিয়াছে। এই সকল তদন্ত করা আবশ্যক। শা সাহেব তদন্ত করে জানিলেন যে পরাণবাবুর লোক এই দরখাস্ত আনিয়াছে, এবং পরাণবাবুর মোক্তারের বাসায় সে ব্যক্তি অবস্থিতি করিতেছে। জাল রাজা উকীলকে বলিলেন যে, 'এবার পরাণের অনুরোধে রাণীরা সাক্ষী দিতে সম্মত হইয়াছেন।' সে অনুরোধের অর্থ যে, তাঁহারা আমাকে সনাক্ত না করেন। কিন্তু কি জানি? স্ত্রীজাতি! আমায় দেখিয়া যদি তাঁহারা সে অনুরোধ ভুলিয়া যান, তাহা হইলে তাঁহাদের পথে দাঁড়াইতে হইবে। আমার অদৃষ্টে যাহা ছিল তাহা হইয়া গিয়াছে, আবার তাঁহাদের কপাল কেন ভাঙ্গি? তাঁহারা এখন সুখে আছেন, সুখে থাকুন। আমি তাঁহাদের সাক্ষ্য চাহি না।' কিন্তু জজ সাহেব বিপরীত ভাবিলেন; তিনি বিবেচনা করিলেন যে; আসামী নিশ্চয়ই জাল, তাই সে ভয় পাইয়াছে। রাণীরা কখনই মিথ্যা বলিবে না, এ কথা আসামী এখন বুঝিয়াছে।"

হুগলীর কাজি, জাল প্রতাপচাঁদের কাছে তাঁর চোদ্দ বছর অজ্ঞাত বাসের সময় তিনি কোথায় কোথায় ছিলেন জানতে চাইলে, পরের দিন তিনি কাজি সাহেবকে একখানি লিখিত তালিকা দেন।—

"কালনা হইতে পলাইয়া কালীপ্রসাদ আর আমি মুর্শিদাবাদ ও ঢাকা হইয়া

ব্রহ্মপুত্র নদে গিয়া তীর্থ স্নান করি। তাহার পর চন্দ্রশেখরে যাই। সেখান হইতে আদ্দিনাথ দর্শন করিতে যাই। তথায় একবছর থাকি। তাহার পর যৈন্তেশ্বরী ও ত্রিপুরেশ্বরী দর্শন করিয়া বানেশনাথ মহাদেবের নিকট এক বৎসর থাকি। সেখান হইতে পশ্চিমাঞ্চলে যাই। কাশী, প্রয়াগ, চিত্রকূট, অযোধ্যা, বৃন্দাবন, মথুরা, কুরুক্ষেত্র, পুস্কর, প্রভাস, বদ্রিকাশ্রম, হরিদ্বার, হিঙ্গুলাক্ষ, জ্বলামুখী পর্যটন করি। পঞ্জাবে গিয়া লাহোর, অমৃতেশ্বর প্রভৃতি ভ্রমণ করি, শেষে কাশ্মীরে যাই। কাশ্মীরে ছয় বৎসর থাকি। কাশ্মীর হইতে আমি বাঙ্গালায় প্রত্যাবর্তন করিয়া প্রথমে কালীঘাটে (কলিকাতা) যাই, তাহার পর বর্দ্ধমানে উপস্থিত হই; সেখানে গোলাপবাগে আমাকে অনেকে চিনিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিল। আমার একখানি ইয়াদাস্ত বহি ছিল। যে দিন যেখানে গিয়াছিলাম, সেখানে যাহা আশ্চর্য্য দেখিয়াছি তাহা সকলই ইয়াদাস্তে লিখিয়া রাখিয়াছি। এলিয়াট সাহেব বাঁকুড়ায় যখন আমায় গ্রেপ্তার করেন তখন সেই ইয়াদাস্তখানি কাড়িয়া লন। বিস্তর মিনতি করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা আর ফিরিয়া পাইলাম না।''

''যদি আমি বাস্তবিক মরিতাম, তাহা হইলে কি আমার ত্যক্ত সম্পত্তির কোন বন্দোবস্ত করিয়া যাইতাম না? সামান্য লোকে সামান্য সম্পত্তির নিমিত্তে পোষ্যপুত্র লইবার অনুমতি দিয়া যায়, অথবা দানপত্র লিখিয়া যায়। কিন্তু আমার এত ধন, এত সম্পত্তি আমি কি কোন একটা বন্দোবস্ত করিয়া যাইতে পারিতাম না? আমি পীড়িত হইয়া ত অনেকদিন ছিলাম, আমার বাক রোধ হয় নাই। গঙ্গাযাত্রা করিলেও ত আমি অনেকদিন কালনায় ছিলাম; যদি সত্যই আমি মরিব এরূপ হইত, তাহা হইলে আমি কি পোষ্যপুত্রের অনুমতি দিয়া যাইতাম না? অথবা একখানা দানপত্র কি উইল করিয়া যাইতাম না? এ সকল করিবার সময় ত যথেষ্ট ছিল?'' ('জালপ্রতাপ',পৃঃ- ৬৭/৬৮)। এই হলো প্রতাপচাঁদের স্ব-উক্তি।

প্রসঙ্গ অন্য— এখানে অন্য একটি প্রসঙ্গে আসা যাক। ১৪ বছর অজ্ঞাতবাস সময়ে পঞ্জাবে অবস্থান কালে 'পঞ্জাবকেশরী' রণজিৎ সিংহের সঙ্গে প্রতাপচাঁদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। বর্দ্ধমান জেলার শ্রীখণ্ড নিবাসী কবি অনুপচন্দ্র দত্ত প্রণীত 'প্রতাপচন্দ্র লীলারস প্রসঙ্গ সঙ্গীত' কাব্যগ্রন্থ থেকে জানা যায়, রণজিৎ সিংহ প্রতাপচাঁদের সঙ্গে পরিচিত হ'য়ে বিশেষ মুগ্ধ হন; তখন তিনি তাঁর হাতে (প্রতাপচাঁদ) দেওয়ান সুদয়াল সিংহের কন্যা রজনকুমারীকে সমর্পণ করেন। ইহাই প্রতাপচাঁদের তৃতীয় বিবাহ। এবং তাঁদের 'মুলুকচন্দ্র' নামে একটি সন্তানও ছিল।

"তনয়া রজনকুমারী রামে সমর্পণ করি
জগজনে জানাই ভজন
বিলম্বের কার্য্য নাই অবিলম্বে চল যাই
তাঁর ঠাঁই হইগো ভাজন।।
লইয়া কুমারী সঙ্গে স্ত্রী পুরুষ নানা রঙ্গে
নানা উপহার ভারে ভার।
শুভযাত্রা শুভক্ষণ গত মাত্র দরশন
ঘুচিল মনের অন্ধকার।।
কুমারীরে করে ধরি রামে সমর্পণ করি
দেওয়ানের প্রেয়সী চতুরা
বলেন লক্ষ্মী সঁপিলাম মনঃ প্রাণ সাধিলাম
ধনুর্ভঙ্গ মিথিলার ধারা।।"

পাঞ্জাবে কিছুকাল বসবাসের পর তিনি দিল্লীর বাদশাহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পথে গয়া, কাশী, নেপাল, বিরাট ও মুর্শিদাবাদ হয়ে উত্তররাঢ়ের পথে শ্রীখণ্ড গ্রামে তাঁর আগমন ঘটে। এই সময় গয়ায় অবস্থান কালে তাঁর প্রথমা স্ত্রী প্যারীকুমারীর সঙ্গে অপ্রত্যাশিত ভাবে দেখা হয়। বর্ণনাটি উদ্ধৃতি করা হলো।—

প্যারীকুমারীর সঙ্গে গয়ায় প্রতাপের সাক্ষাৎ—

" প্রতাপচন্দ্র বিরহে প্যারীকুমারী ব্যাকুল।
গয়াভূম যাব বলি করিলেন তুল।।
* * * * * * * * *
মনেতে বাসনা রূপ করি দরশন।
শিবিকা সোয়ারি হয়ে করিলেন গমন।।
* * * * * * * * *
প্যারীকুমারী পথে চলেন যখন।
স্বরূপাঙ্গ ছদ্মবেশী পথেতে মিলন।।
কেশ বেশ মাথা ভুষ রাকা চন্দ্রমুখ।

হেরি রূপ চমৎকার দূরে মনোদুখ।।
অট্টহাসি মৃদুভাষী ক্ষণেতে মগন।
প্রতাপে প্রতপ্ত (?) নাস্তি মুখে উচ্চারণ।।
বার বার বাক্যে সার শুনি সিমন্তিনী।
কি করি ব্যবস্থা মনেতে অনুমানি।।
বুধগণের বিধিবাক্য মনে ঐক্য করি।
ফল্‌গু নদী তীরে বসি প্যারীকুমারী।।
প্রতাপচাঁদ জীবিতমান পিণ্ড দিতে নাই।
গয়াভূমে এই কথা সবারে জানাই।।
পিণ্ডদান না করিয়া রাণী ফিরে যান।
গয়াভূমে একথার লোকে করে গান।।

* * * * * * * *

পুনঃ আসি প্রতাপচাঁদ সন্ন্যাসীর বেশ।
কহিতেছেন বিবরণ বচন শ্লেষ।।
চতুর্দ্দশ বর্ষ গতে স্বদেশে, গমন।
হইলে দুষ্ট দলন হইবে মিলন।।
ইঙ্গিতে আশ্বস্তা হয়েন প্যারীকুমারী।
কহিলেন ইচ্ছা যেবা কর বনচারী।।
তব মনোবাঞ্ছা যে বা অন্যথা কি হয়।
এত কহি স্বপ্রদেশে গমন নিশ্চয়।
বর্দ্ধমান প্রবেশেন প্যারীকুমারী।
গয়ার বৃত্তান্ত কহেন করিয়া চাতুরী।।
না করেন পিণ্ডদান অনেকে জানিল।
সুস্পষ্ট হইয়া কথা অস্পষ্ট রহিল।।

প্রসঙ্গটি এখানেই শেষ করা গেল। এক্ষণে আসা যাক শেষ বিচারের পাতায়। মানুষের সৃষ্ট আইনে তিনি জেল-হাজত বাসের পর বর্ধমানে ফিরে আসার দ্বার তাঁর কাছে চিররুদ্ধ। কলকাতায় চাঁপাতলায় এসে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। তারপর কলুটোলায় গোবিন্দ পরামাণিকের বাড়ীতে দু'-তিন মাস ছিলেন। তারপর তিনি

শ্যামপুকুর পল্লীতে আসেন। সেখানে কিছুদিন বসবাস করেন। সেই সময় লাহোরে ইংরেজদের সঙ্গে শিখদের বিবাদ শুরু হয়। শিখদের সঙ্গে এই যুদ্ধে, ইংরেজদের ধারণা, প্রতাপচাঁদ শিখদের সঙ্গে জড়িত। প্রতাপচাঁদ ইংরেজদের গতিবিধি বুঝে, চন্দননগরের বড়াইচণ্ডীতলায় ফরাসীদের আশ্রয়ে এসে কয়েক বছর থাকেন। পরে, শ্রীরামপুরে সন্ন্যাস-জীবন যাপন করে সাত বছর অবস্থান করেন। এখানে তাঁর বহু শিষ্য-শিষ্যা হয়েছিল। তিনি প্রত্যহ ইংরাজী, বাংলা সংবাদপত্র পড়তেন। সেইসময় শিক্ষিত ব্যক্তি যাঁরা থাকতেন, তাঁদের ফরাসী রাজনীতি, রুশদেশীয় রাজনীতি পরিষ্কাররূপে বুঝিয়ে দিতেন। অনেকে বলতেন, "*European politics*'এ 'সাধুবাবার' বিশেষ অধিকার আছে।" বেদান্ত শাস্ত্রেও তাঁর যথেষ্ট পাণ্ডিত্য ছিল। দু'-একজন অধ্যাপকও তাঁর নিকট বেদান্তের কথা শুনতে আসতেন। মৃত্যুর আট-দশ মাস পূর্বে, ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে কলকাতার উত্তরে বরাহনগরে চলে আসেন। এই সময় তাঁর শোচনীয় পরিণতি উপস্থিত হয়; একদিকে তাঁর অর্থকষ্ট অপর দিকে স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে। ভগ্ন স্বাস্থ্য নিয়েই তিনি মাত্র দু'-চারজন সঙ্গী সহ 'ময়রাডাঙ্গা' পল্লীতে উঠে আসেন। এখানেই ১৯শে তাঁর জীবন দীপ নিভে যায়। তাঁর জন্য চোখের এক বিন্দু অশ্রুপাতের কেহ ছিল না। সঙ্গমরায় এর শেষ কুলদীপ গঙ্গায় চিরতরে ভেসে গেল।

পদকর্তা প্রতাপচাঁদ ঃ— মহারাজ প্রতাপচাঁদ ছিলেন সাধক কমলাকান্তের শিষ্য। ভাগ্য বিড়ম্বনায় তিনি রাজ্যহারা হয়ে, কখনও সাধুসন্তদের সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়েছেন আবার নিরাশ্রয় হয়ে অন্যের আশ্রয়ে সাময়িক ভাবে দিন কাটাতে হয়েছে, শেষে কারাজীবনেও তাঁকে থাকতে হয়েছে। কারাবাসের পর 'সত্যনাথ' নামে সন্ন্যাস জীবন যাপন ক'রে ধর্মচর্চায় জীবনের অবশিষ্ট দিন কাটিয়েছেন।

সাধক কমলাকান্তের শিষ্য হিসাবে প্রতাপচাঁদের অন্তরে ভক্তিধারা প্রবাহিনী ছিল। তিনি যতদিন বর্দ্ধমান রাজভবনে ছিলেন, ততদিন তিনি সুষ্ঠু রাজ্য পরিচালনা ও প্রজানুরঞ্জন করেও ভক্তি গীতি রচনা করতেন। কিন্তু তাঁর সমগ্র পাণ্ডুলিপি, গ্রন্থ, রাজবাড়ীতে পাওয়া যায় নাই; হয়তো সংরক্ষণের চেষ্টাও হয় নাই। ডঃ আবদুস সামাদ রচিত 'বর্দ্ধমান রাজসভাশ্রিত বাংলা সাহিত্যে' গ্রন্থে দেখা যায় ডঃ সামাদ, প্রতাপচাঁদের রচিত দু'টি ভক্তি-গীতি উদ্ধার করেছেন। সেই দু'টি এখানে উদ্ধৃতি করা হলো।—

একটি শ্যামাসঙ্গীত বিষয়ক—

আর কারে ডাক্‌বো মাগো,
ছাওয়াল কেবল মা'কে ডাকে।
আমি অ্যামন ছেলে নই মা তোমার,
ডাকবো মাগো যাকে তাকে।
শিশু যে মা বই বলে না,
মা বই তো শিশু জানে না,
মা ছাড়া কভু থাকে না,
আমি থাক্‌বো দেখে কাকে।।
মা যদি সন্তানে মারে
শিশু কাঁদে 'মা-মা' করে,
ঠেলে দিলে গলা ধরে, কাঁদে মা যত বকে।
জগত জননী হও, পুত্র-ভার মাগো লও
মাগো আবদার সও,
তাইতে তনয় তোমায় ডাকে।।

* *

দ্বিতীয়টিকে বলা যেতে পারে অধ্যাত্মগীতি—

তোমা বিনে কিবা সুখ আছে মন এ জগতে।
তুমি ধ্যান তুমি জ্ঞান, তুমি মাত্র আরাধিতে।
পদ নাহি বাঞ্ছা করে অন্য স্থানে যাইতে
কর নাহি স্পৃহা করে তব দ্রব্য ব্যতীতে।
কর্ণ নাহি বাঞ্ছা করে অন্য কথা শুনিতে।
রসনা বাসনা করে তব গুণ গাইতে।
হৃদয় চাহে তোমারে প্রেম আলিঙ্গণ দিতে
নয়ন চাহে সতত তব মুখ দেখিতে।

অতঃপর মহারাজা প্রতাপচাঁদ পর্ব এখানেই সমাপ্ত।

হিজ হাইনেস মহারাজাধিরাজবাহাদুর মহ্‌তাব্‌ চাঁদ

(১৮৩২-১৮৭৯)

মহারাজ তেজচাঁদের পরলোক গমনের পর "মহ্‌তাবচাঁদ বাহাদুর বিপুল ধনরাশিপূর্ণ ধনাগার ও সুবিশাল সমৃদ্ধশালী বর্দ্ধমান রাজ্যের উত্তরাধিকারী হইলেন। মহারাণী কমলকুমারী ও তদীয় ভ্রাতা পরাণচাঁদ বাবু গবর্ণমেন্ট হইতে নাবালক মহারাজার অভিভাবক ও বর্দ্ধমান রাজ্যের অছি হইলেন।" (রাজবংশানুচরিত- পৃঃ ১৪৫)। এই সময় মহারাজ মহ্‌তাব্‌চাঁদের বয়স ছিল মাত্র ১২ বছর। এতদিনে পরাণচাঁদের মনোবাসনা পূর্ণ হয়।

মহারাজ তেজচাঁদের একমাত্র পুত্র ছিলেন প্রতাপচাঁদ। অবশ্য মহারাজের ৭ম মহারাণী উজ্জ্বলকুমারী একটি "মৃত পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন (রাজবংশানুচরিত-পৃঃ ১২৬।) ৬ষ্ঠ মহারাণী নানকীকুমারীর গর্ভজাত সন্তান প্রতাপচাঁদ ছাড়া আর কোন মহারাণীরই সন্তানাদি ছিল না। কাজেই প্রতাপচাঁদকে কোনপ্রকারে সরাতে পারলে যে কোন উপায়ে এই বিশাল সম্পত্তি পরাণচাঁদ কাপুর নিজ অধিকারে আনবেন। পরাণচাঁদ তখন দেওয়ান।

১৮২০ খ্রীঃ ১৭ই নভেম্বর পরাণচাঁদ কাপুরের কনিষ্ঠ পুত্র 'চুনিলাল' জন্মগ্রহণ করলে প্রতাপচাঁদকে খবর দেওয়া হয়। প্রতাপচাঁদ তাকে দেখতে এসে উপস্থিত বয়স্য নন্দলাল বাবু, বসন্তলালবাবু ও ভৈরবলাল বাবুদের বলেছিলেন, "পরাণচাঁদের এই পুত্রটি অষ্টম গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, ... এই বর্দ্ধমানের রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হইবে। আমার কাল পূর্ণ হইয়াছে, শীঘ্রই আমাকে এ সংসার পরিত্যাগ করিতে হইবে।" সত্যই তিনি এক বছর পরে ১৮২১ খ্রীঃ রাত্রির অন্ধকারে সুকৌশলে অন্তর্হিত হন। তা না হলে চক্রান্তকারীদের হাতে নিহত হতেন। এক্ষণে তেজচাঁদের আর কোন বংশধর থাকলো না। প্রকারান্তরে কমলকুমারী ও পরাণচাঁদ চুনিলালকেই দত্তক হিসাবে গ্রহণ করার জন্য তেজচাঁদকে বলা হয়। অনোন্যপায় তেজচাঁদ ১৮২৭ খ্রীঃ ১১ই ফেব্রুয়ারী (১২৩৩ সালের ১লা ফাল্গুন তারিখে) ৭ বছর বয়স্ক চুনিলালকে দত্তক গ্রহণ করেন। তার এক সপ্তাহ পর ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে তাঁর ১১ বছর বয়স্ক কন্যা বসন্তকুমারীর মহারাজ তেজচাঁদের সঙ্গে বিবাহ দেন। ১৮৩২ খ্রীঃ মহারাজ তেজচাঁদ পরলোক গমন করেন। এই চুনিলাল কাপুরই মহারাজাধিরাজ 'মহ্‌তাব্‌চাঁদ' নামে খ্যাত।

তৎকালীন নিয়মানুসারে সিংহাসনে আরোহণ করলেই রাজা হওয়া যায় না, ভারতেশ্বরের স্বীকৃতির প্রয়োজন হয়। কাজেই মহারাণী কমলকুমারী তদানিন্তন ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারেল লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক বাহাদুরকে মহারাজ তেজচাঁদের পরলোক প্রাপ্তির

সংবাদ দেন এবং তাঁর কমিশনার সাহেব মাধ্যমে মহ্‌তাব্ চাঁদের জন্য 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি ও খেলাত প্রদানের অনুরোধ জানিয়ে পত্র দেন। তদুত্তরে প্রথম চিঠিতে উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক জানান— (বাংলা প্রতিলিপি) প্রদত্ত হলো ঃ

" বর্দ্ধমানের

শ্রীমতী কমলকুমারী

সমীপে।

মদীয় বন্ধু,

১২৩৯ সালের ২রা ভাদ্র তারিখে আপনার মাননীয় পরলোকগত পতি মহারাজাধিরাজ তেজচন্দ্ বাহাদুরের শোচনীয় মৃত্যু সংবাদ, ১৮৩২খৃঃ ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে প্রাপ্ত হইয়া, যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইলাম। বিধাতার অখণ্ডনীয় লিপি অতিক্রম করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে, ইহা অবশ্যই আপনি বিশেষভাবে অবগত আছেন বলিয়াই, আমি ঈদৃশী শোকাবস্থাতেও আপনাকে শোক পরিহার করতঃ অন্যান্য রাজপরিবারবর্গকে প্রবোধ প্রদান করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি।

আপনাকে সান্ত্বনাসূচক খেলাত প্রদান করিবার জন্য, গত ৭ই তারিখে আপনার মোক্তার আমাকে আপনার অভিপ্রায় অবগত করায়, এবং আমাদ্বারা আপনার বাসনা পূর্ণ হওয়া অতীব আনন্দ দায়ক বলিয়া, মথুরানাথ মল্লিকের সহিত আপনার সান্ত্বনাসূচক খেলাত প্রেরণ করিবার ব্যবস্থা করা হইল।

ফোর্ট উইলিয়ম — আপনার অকৃত্রিম বন্ধু

২২শে আগষ্ট, ১৮৩৩। — ডব্‌লিউ বেণ্টিঙ্ক

গবর্ণর জেনারেল।

To Maharani Kamal Kumari of Burdwan

My friend,

It was with sentiments of real concern that I perused your letter delivered on the 15th of September 1832 announcing the demise of your late respected husband Maharaja Dhiraj Tejchand Bahadur, which sorrowful event took place on the 2nd of Bhadra 1239. You must be fully aware that there is no evading the decrees of providence, and I would therefore recommend you to stifle your own grief on this melancholy occasion and afford consolation to the other members of your family.

It is gratifying to me to be the means of fulfilling your wishes. I

therefore readily comply with your request preferred by your mukhtar on the 7th Instant that a khelat of condolence may be conferred on you, and it will accordingly be given for transmision ot Mathura Nath Mullik.

I remain,

Your sincere friend

Fort William *Sd.W. BENTINK*

22 August, 1833 *Governor General*

দ্বিতীয় পত্র কমিশনার সাহেব মারফৎ প্রদত্ত পত্রের উত্তর ঃ—

"বর্ধমানের শ্রীমতী মহারাণী কমলকুমারী

সমীপে।

মদীয় বন্ধু,

অস্থায়ী কমিসনার মিঃ মুলেট সাহেবদ্বারা আপনার প্রেরিত পত্রখানি প্রাপ্ত হইলাম। আমাদ্বারা আমার বন্ধুবর্গের ন্যায়সঙ্গত কোন প্রিয় কার্য্য সাধিত হইলে, আমি প্রকৃতই আনন্দানুভব করিয়া থাকি। আপনার অনুরোধ অনুসারে আপনার দত্তক পুত্রকে উপাধি ও খেলাত প্রদানে সম্মানিত করিতে, আমি অনুমোদন করিতেছি।

তদনুসারে আমি মহ্‌তাব্‌চাঁদকে 'মহারাজাধিরাজ বাহাদুর' উপাধি প্রদান করিয়াছি। খেলাত প্রস্তুত হইলেই আপনার নিকট প্রেরিত হইবে এবং অস্থায়ী কমিসনার সাহেবকে আপনার দত্তক পুত্রের স।হত সাক্ষাৎ করতঃ উহা প্রদান করিবার জন্য অনুরোধ করা হইবে।

ফোর্ট উইলিয়ম, আপনার অকৃত্রিম বন্ধু

৩০শে আগষ্ট, ১৮৩৩। ডব্‌লিউ বেণ্টিঙ্ক

গবর্ণর জেনারেল।

To Maharani Kamal Kumari of Burdwan

My friend.

I have received your letter forwarded by the officiating Commissioner Mr. Mullett and as it ever affords me real pleasure of evince my consideration to be the means of gratifying my firends when it can be done with propriety I comply with your request that your adopted son may be ho ored with a Khilat and Titles.

I have accordingly conferred upon him the Title of Maharaja Dheeraj

Mahatab Chand Bahadur, as soon as the Khilat is prepared it will be transmitted to you, and the officiating commissioner will be requested to invest your adopted son with it accordingly.

I remain,

Your sincere friend

Fort William — *Sd.W. BENTINK*

30 August, 1833 — *Governor General*

একদিকে মহারাণী কমলকুমারী, গভর্ণর জেনারেলের নিকট হতে মহ্‌তাব্‌চাঁদের জন্য 'মহারাজাধিরাজ' হিসাবে স্বীকৃতি আদায় এবং অপরদিকে বালক রাজার শিক্ষার ব্যবস্থাও করতে থাকেন। তখন মহারাজ তেজচাঁদ বাহাদুরের সময়কার মোক্তার হরিনাথ-এর মৃত্যু হলে মহারাণী মথুরানাথ মল্লিককে মোক্তার (প্রতিনিধি) হিসাবে নিয়োগ করার জন্য গভর্ণমেন্টের সেক্রেটারী ডবলিউ. এইচ. মেকনটন সাহেবকে অনুরোধ জানালে তিনি তা মঞ্জুর করেন।

যাইহোক মহ্‌তাব্‌চাঁদ অল্প দিনের মধ্যেই ইংরাজী শিক্ষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন ও সুখ্যাতি পান বলে, চার্লস এডওয়ার্ড ট্রিবিলিয়ান সাহেব ও রেভারেণ্ড ডেলবি মহাশয়ের মা কতকগুলি ইংরাজী বই তাঁকে পুরস্কার দেন। ইতিমধ্যে মহ্‌তাবচাঁদ তৎকালীন ভারত গভর্ণমেন্টের কাছ থেকে উপাধি ও খেলাত পান। রাজবংশানুচরিতে যেমন লিখিত আছে—"১৮৩৩ খৃঃ ১৪ই অক্টোবর মহারাজা মহ্‌তাব্‌চাঁদ বাহাদুর ভারতবর্ষের মহামান্য গভর্ণর জেনারেল লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক বাহাদুরের প্রদত্ত 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি সম্বলিত সনন্দ ও নিম্নলিখিত খেলাত প্রাপ্ত হয়েন।

জামা	— ১		মতির মালা — ১ছড়া —	১৮০০
নিমা আস্তিন	— ১		শিরপেঁচ ও তেগা	১৫০০
পাগড়ি	— ১			৩৩০০
বদি	— ১			
গোসওয়ারী	— ১			
কোমড় বন্দ	— ১			
শির পেঁচ	— ১			
মূল্য	— ৪৫০			

ঐ সঙ্গে মহারাণী কমলকুমারীও উক্ত গভর্ণর জেনারেল বাহাদুরের নিকট হইতে নিম্নলিখিত

খেলাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

শাল ১ জোড়া	—	১১০০৲
ঢাকাই মলমল	—	৪২৲
গুলবদন ১ খান	—	৮৲
		১১৫০৲

মহারাজা মহ্‌তাব্‌চাঁদের প্রথম সনদ ও খেলাত এই। সেই সঙ্গে কমলকুমারীরও প্রথম খেলাত ইহাই।

মহ্‌তাব্‌চাঁদ ১২ বছর বয়সে যখন জমিদারীর মালিক হন তখন জমিদারীর অবস্থা শোচনীয়। তাঁর নাবালক অবস্থায় পরাণচাঁদ জমিদারী দেখাশুনা করা কালীন 'প্রতাপচাঁদ' সংক্রান্ত মামলায় প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন। উদ্দেশ্যই ছিল প্রতাপচাঁদকে নকল প্রতিপন্ন করা এবং তার জন্য প্রভূত অর্থ খরচ করে যাতে তাঁকে জমিদারী থেকে লুপ্ত করা যায়; যে জন্য রাজস্ব জমা দিতে না পারায় জমিদারীর কিছু অংশ বিক্রীর ব্যবস্থা করেন। শেষে সমগ্র জমিদারীকে 'কোর্ট অব্ ওয়ার্ডস'-এর অধীন রেখে একজন কমিশনার নিয়োগ করে বর্ধমান পাঠান।

এখন পর্যন্ত মহারাজাধিরাজ মহ্‌তাব্‌চাঁদ প্রাপ্ত বয়স্ক নন, সেইজন্য রাজ্যভার তিনি গ্রহণ করতে পারেন নাই। তাঁর সাংসারিক বা পারিবারিক জীবনের কথা আলোচিত হচ্ছে।

পারিবারিক জীবন ঃ— রাজবংশানুচরিত পৃঃ ১৫১-তে লিপিবদ্ধ আছে, "১৮২৯ খৃঃ ২৮শে ফেব্রুয়ারী সন ১২৩৫ সালের ৮ই ফাল্গুন তারিখে পঞ্জাব প্রদেশস্থ সরহিন্দ নিবাসী জওলানাথ কপূরের পুত্র প্যারালাল কপূরের কন্যা নয়নকুমারীর সহিত মহারাজা মহ্‌তাব্ চন্দ্ বাহাদুরের প্রথম বিবাহ হয়।" তবে রাজবংশানুচরিতে পৃঃ ১৫১-তে তাঁর জন্ম তারিখ ইত্যাদি বৃত্তান্ত থেকে জানতে পারা যায়। "১৮২২ খৃঃ ১০ মার্চ্চ সন ১২২৮ সাল ২৯ শে ফাল্গুন তারিখে মহারাণী নয়নকুমারী জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৪০ খৃঃ ২৭ শে জুন, সন ১২৪৭ সালের ৪ঠা আষাঢ় তারিখে একটি কন্যা প্রসব করিয়া ৭ দিবস মধ্যেই পরলোক গমন করেন।" সুতরাং উক্ত উদ্ধৃতাংশ থেকে প্রতীয়মান হয়, মহারাজ তেজচাঁদের জীবিতকালেই মাত্র ৯ বছর বয়সে, ৭ বছরের কন্যা (পাত্রী) নয়ন কুমারীর বিবাহ হয় এবং ১৮ বছর বয়সে একটি কন্যা সন্তান প্রসব করে ১৮৪০ খ্রীঃ ৪ জুলাই (২৭ জুন থেকে ৭ দিন মধ্যে) তারিখে তিনি ইহলীলা সংবরণ করেন। ঐ কন্যাই শ্রীমতী ধনদেয়ীদেবী বিবিজী। পিতার স্নেহের দুলালী ধনদেয়ীদেবী পিতামহীর আদরযত্নে প্রতিপালিতা হন।

আদরের রাজনন্দিনী ধনদেয়ীদেবীর ৭ বছর বয়সে ১৮৪৭ খ্রীঃ ১লা এপ্রিল, সন

১২৫৩ সালের ২০ শে মাঘ তারিখে পাটনা নিবাসী গঙ্গারাম মেহেরার পুত্র গোপীনাথ মেহেরার শুভ পরিণয় হয়। কিন্তু সুখ তাঁর ভাগ্যে থাকে নাই, বিবাহের ৬ বছর পর ১৮৫৩ খ্রীঃ ১৩ জুলাই, সন ১২৬০ সালের ২৭ শে আষাঢ় গোপীনাথ মেহেরা পরলোক গমন করলে, ১৩ বছর বয়সের বিধবা ধনদেয়ীদেবী বর্ধমানেই বসবাস করতে থাকেন।

মহারাজাধিরাজ মহ্তাব্চাঁদ ২৪ বছর বয়সে ১৮৪৪ খ্রীঃ ২৪ জুন, সন ১২৫১ সালের ১২ই আষাঢ় তারিখে অযোধ্যার বেরুচ নিবাসী কেদারনাথ নন্দের কন্যা নারায়ণকুমারীর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে নিবন্ধ হন। তখন নারায়ণকুমারীর বয়স ১১ বছর। ১৮৩৩ খ্রীঃ ৫ই জুন নারায়ণকুমারীর জন্ম।

অতঃপর কেদারনাথ নন্দে কন্যার বিবাহের পর সপরিবারে বর্ধমানেই বসবাস করতে থাকেন। কেদারনাথ নন্দের কনিষ্ঠ পুত্র অর্থাৎ মহারাণী নারায়ণকুমারীর সর্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা লালা জানকী প্রসাদ নন্দের দৌহিত্র হরগোবিন্দ খান্না। হরগোবিন্দ খান্নার জ্যেষ্ঠ পুত্র অবনীনাথকে ধনদেয়ীদেবী, অতি শৈশবকাল হতেই নিজ সন্তানের মত স্নেহ-ভালবাসায় লালন-পালন করতেন। তিনি ঐ ছেলেটিকে ১২৯২ সালের ২রা আষাঢ় তারিখে 'দত্তক পুত্র' হিসাবে গ্রহণ করেন। তখন হতেই ঐ ছেলের নাম দেওয়া হয় লালা অবনীনাথ মেহেরা। ধনদেয়ী দেবীর পদবী 'মেহেরা' সেইজন্য অবনীনাথেরও পদবী দেওয়া হয় 'মেহেরা'। অবনীনাথ মেহেরা বড় হলে, জানকী প্রসাদ নন্দের অগ্রজ, বংশগোপাল নন্দের কন্যার সঙ্গে ১২৯৮ সালের ২৯শে বৈশাখ তাঁর বিবাহ হয়। এখন ধনদেয়ীদেবী কথঞ্চিৎ সুখে সংসার যাপন করেন।

মহ্তাব্চাঁদ স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করার ৪ বছর পর ১৮৪৮ খ্রীঃ ৯ই ফেব্রুয়ারী, সন ১২৫৪ সালের ২৮শে মাঘ কমলকুমারী পরলোক গমন করেন। রাজবাড়ীর নিয়মানুযায়ী অম্বিকা কালনাতেই তাঁর সমাজ প্রতিষ্ঠা করা হয়। মহারাজ মহ্তাব্চাঁদ মাতা কমলকুমারীকে ভয় ও ভক্তি করতেন, তাঁর আদেশ-উপদেশ সব সময়ই মেনে চলতেন। কলমকুমারী মিতব্যয়িনী ও গৃহকর্ম নিপুণা রমনী ছিলেন। তিনি যা মাসিক বৃত্তি পেতেন তা তিনি সম্পূর্ণ খরচ করতেন না, মৃত্যুকালে পুত্রের জন্য তিনি বিপুল অর্থ রেখে যান। সেই অর্থে শহরের মধ্যে এই সুবিশাল রাজভবন নির্মাণ করান বর্তমানে যা রাজবাড়ী নামে প্রসিদ্ধ। অবশ্য এখন আর সেই সৌন্দর্য মণ্ডিত রাজবাড়ী নাই, বিভিন্ন অংশে খণ্ডিত হয়েছে। মহারাণী কমলকুমারীর সাধারণ গ্রাম্য পরিবারের মত পুরনো ঘী, পুরনো গুড়, পুরনো তেঁতুল সংগ্রহ করে রাখতেন। কারণ রাজবাড়ীর বৈদ্য-কবিরাজদের প্রয়োজনে দিতে পারতেন। ঐ সব উপকরণে ঔষধ প্রস্তুত করে সাধারণের জন্যও ব্যবহার করতে পারতেন।

দীর্ঘদিন পরেও মহারাজ মহ্‌তাব্‌চাঁদের কোন পুত্র-সন্তানাদি না হওয়ায় তাঁর মহিষী মহারাণী নারায়ণকুমারীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা বংশগোপাল নন্দে (জানকী প্রসাদ নন্দের অগ্রজ) এর একমাত্র জ্যেষ্ঠ পুত্র ব্রহ্মপ্রসাদ নন্দেকে ১৮৬৬ খ্রীঃ ১৯শে মার্চ, সন ১২৭২ সালের ৭ই চৈত্র তিনি দত্তকপুত্র হিসাবে গ্রহণ করেন। দত্তকপুত্রের নাম হয় 'আফ্‌তাব্‌চাঁদ মহ্‌তাব্‌'। দত্তক গ্রহণের পর সেইদিনই তিনি একখানি 'উইল' প্রস্তুত করেন। উক্ত 'উইলে'র শেষে উল্লেখ আছে—

''অপরাপর রাজন্যবর্গের এবং আমার বংশানুগত নিয়মানুসারে মদীয় বংশে ভবিষ্যতে জ্যেষ্ঠ পুত্রই স্থাবর অস্থাবর যাবদীয় সম্পত্তি ও রাজউপাধি প্রাপ্ত হইবেন। অন্যান্য পুত্রগণ কেবল ভরণপোষণের উপযুক্ত মাসিক বৃত্তি প্রাপ্ত হইবেন। জমিদারী কিম্বা অপর কোন সম্পত্তি কখনই বিভাগ হইবে না। কিন্তু পিতা বর্তমানে যদি অপুত্রক অবস্থায় জ্যেষ্ঠ পুত্রের লোকান্তর হয়, অথবা যাহাতে শাস্ত্রানুসারে জলপিণ্ড প্রদানে অনধিকারী হয়, এরূপ কোন ব্যাধিগ্রস্ত হয়েন, তাহা হইলে তৎকনিষ্ঠ পুত্রই সমস্ত সম্পত্তি ও রাজউপাধির অধিকারী হইবেন। অবশিষ্ট পুত্রেরা যথোপযুক্ত মাসিক বৃত্তি পাইবেন। পরন্তু আমার বংশে স্ত্রী কন্যা অথবা স্বসম্পর্কীয়া কোন স্ত্রীলোক কিম্বা জ্ঞাতি বর্ত্তমানে দৌহিত্র উত্তরাধিকারিত্ব সূত্রে রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইবেন না।'' (রাজবংশানুচরিত পৃঃ ১৬৩)

উইলের এই অংশ থেকে স্পষ্টতঃ বোঝা যায়, মহারাজ মহ্‌তাব্‌ চাঁদ জ্যেষ্ঠাধিকার নিয়মের পক্ষপাতি ছিলেন এবং বর্ধমান রাজবংশে বহুপূর্ব হতেই জ্যেষ্ঠাধিকার নিয়ম প্রচলিত ছিল।

এখানে উল্লেখ্য, মহারাজ প্রতাপচাঁদ অন্তর্হিত হলেও তাঁর দুই মহিষী বর্ধমান রাজ অন্তঃপুরেই থাকতেন। প্রতাপচাঁদ অন্তর্ধান করার পর তাঁর মহিষীদ্বয় মাত্র প্রতাপচাঁদের সম্পত্তিরই সত্বাধিকার পাওয়ার জন্য আদালতে অভিযোগ করেছিলেন। জজ সাহেব প্রতাপচাদ মহিষীদের সপক্ষে রায় দেন। কমলকুমারী ও পরাণচাঁদ কাপূরের প্ররোচনায় মহারাজ তেজচাঁদ উচ্চতম আদালতে (সুপ্রীম কোর্ট) আপীল করেছিলেন। উচ্চতম আদালতের রায় যে প্রতাপমহিষীদের সপক্ষে যাবে, বুঝতে পেরে ''বিচার শেষ হওয়ার পূর্বেই মহারাজা পুত্রবধূদ্বয়কে বিবিধ প্রকারে প্রবোধ দান করতঃ, তাঁহাদিগের প্রচুর পরিমাণ মাসিক বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়া, মোকদ্দমা আপোষে নিষ্পত্তি করিয়া লয়েন।'' (রাজবংশানুচরিত পৃঃ ১৩৮) তদ্বধি তাঁরা বর্ধমান রাজবাটীতেই অবস্থান করে আসছেন। কমলকুমারী ও পরাণচাঁদ কপূর সদাচরণ না করলেও মহ্‌তাব্‌চাঁদ কখনও তাঁদের অসম্মান করেন নাই। তাঁরা মহারাজ মহ্‌তাব্‌চাঁদকে যখন যা অনুরোধ করতেন তা তিনি যত্ন সহকারে প্রতিপালন করতেন।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, মহারাজ মহ্‌তাব্‌চাঁদ, তাঁর শ্যালক পুত্র আফ্‌তাব্‌চাঁদ (ব্রহ্ম প্রসাদ নন্দে)কে দত্তক গ্রহণ করেছেন। আফ্‌তাবচাঁদের জন্ম তারিখ জানতে পারা যায় নাই। এক্ষণে, ১৮৭৭ খ্রীঃ ১৪ জানুয়ারী তারিখে দিল্লী নিবাসী লালা-লক্ষ্মীনারায়ণ খান্নার ৮ বছরের কন্যা বেনদেয়ীর সঙ্গে আফ্‌তাব্‌চাঁদের বিবাহ দেন। "বিবাহের পর হইতেই মহারাজা তদীয় নব বৈবাহিক শ্রীযুক্ত লালা লক্ষ্মীনারায়ণ খান্নাকে যথোপযুক্ত-মাসিক বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়া বৰ্দ্ধমানেই বাস করাইলেন। এইরূপে মহারাজা মহ্‌তাব্‌চন্দ্‌ বাহাদুর ও তদীয় কীর্ত্তিমান পূর্ব্ব পুরুষগণ, পশ্চিম প্রদেশীয় বহুতর ক্ষত্রিয়কে বৈবাহিক সূত্রে এতদ্দেশে আনয়ন করতঃ তাঁহাদের মাসিক বৃত্তি ও বাসোপযোগী আবাসবাটী প্রদান করিয়া বৰ্দ্ধমান ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে বাস করাইয়া গিয়াছেন। . . . . ." (রাজ বংশানুচরিত পৃঃ ১৭৮) এখানে উল্লেখ্য, আফ্‌তাব্‌ চাঁদের সঙ্গে বেনদেয়ী দেবীর বিবাহ ব্যাপারে সমস্যা দেখা দেয়। তৎপূর্বে, বলা প্রয়োজন, আফ্‌তাব্‌চাঁদের ১২ বছর বয়ক্রম কালে মহ্‌তাব্‌চাঁদ দিল্লীতে সম্ভ্রান্ত পরিবারে পাত্রীর সন্ধান করছিলেন, কিন্তু বর্ধমান রাজপরিবার অধুনাপন্থী এবং এই পরিবারে কন্যা সম্প্রদান করলে কন্যার পিতাকে সমাজচ্যুত হয়ে থাকতে হবে। কাজেই অনেকেই বর্ধমান রাজ পরিবারে কন্যা সম্প্রদান করতে রাজি হন নাই। শেষ পর্যন্ত লক্ষ্মীনারায়ণ খান্না নামে এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, বংশ মর্যাদা রক্ষার জন্য তাঁর ৮ বছরের কন্যা বেনদেয়ী দেবীকে আফতাবচাঁদের হস্তে সম্প্রদান করতে মনস্থ করেন। কিন্তু গোঁড়া ক্ষেত্রী মহল ব্যাপারটি জানতে পেরে বাধার সৃষ্টি করেন এবং তাঁদের পরামর্শে লক্ষ্মীনারায়ণ খান্নার স্ত্রী কোকাদেবী, কন্যাকে নিয়ে পিত্রালয়ে চলে যান। তখন লক্ষ্মীনারায়ণ খান্না, মেয়েকে নিজের কাছে রাখার জন্য কোর্টে মামলা দায়ের করেন। তাতে কেবলমাত্র তিনি তাঁর কন্যাকে নিজের কাছে রাখতে পারার অধিকার পান, স্ত্রীকে নন। কারণ, স্ত্রী কোকাদেবী স্বামীর বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ আনেন। অভিযোগের প্রধান কারণ ছিল, বর্ধমান রাজপরিবার অধুনাপন্থী এবং বিদেশী বিধর্মীয় সংস্পর্শী, সেই পরিবারে কন্যা সম্প্রদান করলে সমাজচ্যুত হওয়ার আশঙ্কা আছে। লক্ষ্মীনারায়ণ খান্না পুনরায় মামলা করেন। কোর্ট, কোকাদেবীর অভিযোগ নাকচ করে লক্ষ্মীনারায়ণ খান্নার সপক্ষে রায় দেয়। তখন, দিল্লীতে কন্যার বিবাহের আয়োজন করলে বিঘ্ন ঘটার আশঙ্কায় লক্ষ্মীনারায়ণ খান্না আত্মীয় স্বজন সহ সপরিবারে অতি গোপনে বর্ধমান চলে আসেন। মহ্‌তাব্‌ চাঁদ, তাঁদের জন্য পৃথক বাড়ীর ব্যবস্থা করেছিলেন, সেখানেই তাঁরা ওঠেন। মহারাজ তাঁদের মাসিক খরচের জন্য প্রথমে ১০০ টাকা পরে ২০০ (দুইশত) টাকা করে বরাদ্দ করেন। অতঃপর মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণ বাবুর জন্য গৃহ নির্মাণ করাইয়া দেন। অতঃপর আফ্‌তাব্‌চাঁদের সঙ্গে, লক্ষ্মীনারাযণ কন্যা বেনদেয়ী দেবীর বিবাহ হয়। ("নগর

বর্ধমানের দেবদেবী', নীরদবরণ সরকার — পৃঃ ৭৭, ৭৮)

পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে, মহারাজ মহ্‌তাব্‌চাঁদের একমাত্র কন্যা ধনদেয়ী দেবী নিঃসন্তান অবস্থায় মাত্র ১৩ বছর বয়সে বিধবা হন। তিনি যে তারিখে অর্থাৎ সন ১২৯২ সালের ২ রা আষাঢ় তারিখে একটি দত্তক গ্রহণ করেন এবং সেই তারিখেই তিনি শ্রীশ্রী ধনেশ্বরী দেবী মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

অতঃপর ধনদেয়ী দেবী সমস্ত সম্পত্তি অর্পণনামা দৃষ্টে দেবত্র করে দেন এবং রেজিষ্টার্ড উইল বলে দত্তকপুত্র অবনীনাথ মেহেরা মালিক হন। ধনদেয়ীদেবী ব্যক্তিগতভাবে একটি ট্রাষ্ট কমিটি গঠন করেন এবং ঐ ট্রাষ্ট কমিটি "শ্রী শ্রী ধনেশ্বরী দেবী ট্রাষ্ট কমিটি' নামে পরিচিত। ঐ উইলে আরও উল্লেখ আছে, বংশের জ্যেষ্ঠ পুত্র যিনি থাকবেন তিনিই হবেন ঐ ট্রাষ্ট কমিটির ম্যানেজিং সেবাইত।

উইলের সর্ত অনুসারে অবনীনাথ মেহেরার মৃত্যুর পর তাঁর তিন পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ভোলানাথ মেহেরা ম্যানেজিং সেবাইত নিযুক্ত হন এবং দেব সেবার কাজ পরিচালনা করেন। বর্তমানে "শ্রী শ্রী ধনেশ্বরী দেবী ট্রাষ্ট কমিটি"র ম্যানেজিং সেবাইত হিসাবে শ্রী অমরনাথ মেহেরা নিযুক্ত আছেন। (নগর বর্ধমানের দেবদেবী—নীরদবরণ সরকার, পৃঃ ৯১)

১৮৩৯ খ্রীঃ এখন মহারাজ মহ্‌তাব্‌চাঁদ সাবালক। তিনি সন ১২৪৬ সালের (১৮৩৯ খ্রীঃ) ২রা চৈত্র তারিখে কোলকাতায় তদানিন্তন ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারেল-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। গভর্ণর বাহাদুর তাঁকে নিম্নলিখিত খেলাত প্রদান করেন—

তেগা শিরপেঁচ	—	১	বর্দি	—	১
গোসওয়ারা	—	১	ছাতা	—	১
কলগা	—	১	আড়ানী	—	১
মতির মালা	—	১	হস্তী	—	১
পাগড়ি	—	১	হাওদা	—	১
জামা	—	১	ঘোড়া	—	১
নিমা আস্তিন	—	১	ঢাল	—	১
কোমড় বন্দ	—	১	তলওয়ার	—	১
ঝালরদার পালকী	—	১			১৭ দফা

মহ্‌তাব্‌চাঁদের রাজ্যভার গ্রহণ — মহারাজ মহ্‌তাব্‌চাঁদ সাবালক হলেও পরাণচাঁদ পূর্বের মতই রাজকাজ দেখাশুনা ও পরিচালনা করতেন। মহারাজ ২৪ বছর বয়সে ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করেন। এবং তিনি স্বয়ং রাজকার্য পরিচালনা করতে থাকেন।



হিজ-হাইনেস্ মহারাজাধিরাজ বাহাদুর মহাতাবচাঁদ



মহারাজা মহ্তাবচাঁদের বিধবা কন্যা ধনদেয়ী দেবী

ভারত গভর্ণমেন্টের আদেশ অনুসারে ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজ মহ্তাব্চাঁদ ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের তোপখানা থেকে ৬ পাউণ্ডের ১০ টি কামান ক্রয় করে নিয়ে আসেন। মহারাজ মহ্তাব্চাঁদ যে সময় রাজসিংহাসনে আসীন, সেই সময় ভারতবর্ষ ব্রিটিশ শাসনাধীন। সুতরাং দেশের ছোট-বড় সকল জমিদারকেই ইংরেজ আনুগত্য মেনে নিতে হতো এবং তদানিন্তনকালে যে সব জমিদার সাফল্যের চরম শিখরে উন্নীত হয়েছিলেন তাঁরা সকলেই ইংরেজদের অনুগত ছিলেন। মহারাজ মহ্তাব্চাঁদ তার ব্যতিক্রমী ছিলেন না। তিনি বিভিন্ন সময়ে ইংরাজদের সহযোগিতা করেছিলেন।

১৮৫৫ খ্রীঃ সাঁওতাল বিদ্রোহের সময় মহারাজ মহ্তাব্চাঁদ ইংরাজ গভর্ণমেন্টকে সাহায্য করেছিলেন। সৈন্য পাঠানোর জন্য গাড়ীর ব্যবস্থা, প্রয়োজনানুসারে খবরাখবর আদান-প্রদান-এর জন্য ৯ জন অশ্বারোহী সওয়ার নিযুক্ত করেছিলেন। তারা বর্ধমান থেকে বীরভূম, বীরভূম থেকে কাটোয়া, এখান হতে বহরমপুরের সংবাদ আদান-প্রদান করতো। সৈন্যদের জন্য ৮টি হাতী, ১৬খানি গোরুরগাড়ীরও ব্যবস্থা করেন।

১৮৫৭ খ্রীঃ সিপাহী বিদ্রোহের সময়ও মহ্তাব্চাঁদ ব্রিটিশদের নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন। উক্তপ্রকার সাহায্য ছাড়াও "২২শে জুন থেকে ২২শে জুলাই পর্যন্ত, বর্ধমান নগর রক্ষার্থে ২০ জন মানোয়ারী সৈন্য নিযুক্ত করেছিলেন। অকস্মাৎ কোন বিপদ উপস্থিত হইলে বর্দ্ধমানস্থ্ যাবদীয় ইংরাজগণের নিরাপদে অবস্থিতির জন্য রাজবাটীর একাংশে স্থান প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন। তন্মধ্যে যাঁহাদিগের বন্দুক ছিল না, তাঁহাদিগকে আত্মরক্ষার্থ স্বয়ং বন্দুক প্রদান করিয়াছিলেন। . . . . রাস্তার পুলিশ প্রহরিগণের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য, আমার নিমিত্ত গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্করোডে পানাগড় হইতে চৈতখণ্ড পর্য্যন্ত ১০ই জুলাই হইতে ১৩ই আগষ্ট পর্য্যন্ত ঘোড়ার ডাকের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন।" এচ্-বি, লফোর্ড, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট। (রাজবংশানুচরিত পৃঃ ১৫৭-১৫৮)

এচ্-বি, লফোর্ড-এর চিঠি উদ্ধৃত হইল ঃ—

From H.B. Lawford Esqr.

Magistrate of Burdwan.

To the Commissioner of Circuit

Burdwan Division.

Burdwan the 20th October 1857.

Maharaja Dhiraj Mahatab Chand Bahadur, Raja of Burdwan has lent 8 Elephants for the use of the troops and 16 Bullock carts for the same

purpose. He has placed at my disposal 9 Sowars to be stationed on the road between Burdwan and beerbhom, and Burdwan and Cutwa, to convey intelligence of any thing that might occur at either Beerbhom or Berhampore. He employed 20 European sailors to guard the town of Burdwan from 22nd June to the 22nd July, and he prepared a part of his Rajbari for the use of the European residents of Burdwan, in case anything should occur to necessitate their retreting there. He also supplied fire-arms for the use of theose European residents in the station who have none of their own, and on the mutiny of the troops at Hazaribagh and Purulia he offered to entertain 50 European pensioners to guard the station. He also laid a horse-dawk between Panagar and Chitkhand on the Grand Trunk Road from the 10th July ot 13th August to enable me to look after the road police.

Sd. H.B.Lawford

Magistrate

মহ্‌তাব্‌চাঁদ, ইংরাজদের সঙ্গে সহযোগিতা করা এবং অনুগত হওয়ার জন্য ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারেল তাঁকে ভারতবর্ষের 'ব্যবস্থাপক সভার' সদস্য নির্বাচিত করেন। ১৮৬৪ খ্রীঃ ৪ঠা নভেম্বর তারিখে উক্ত সভায় উপস্থিত থাকার জন্য ভারত সরকারের সেক্রেটারী তরফ থেকে ১ খানি ও হোম ডিপার্টমেন্টের আণ্ডার সেক্রেটারী ১ খানি পত্র দিয়েছিলেন। পত্র দুটির অনুবাদ প্রদত্ত হলো ঃ— ('রাজবংশানুচরিত' থেকে উদ্ধৃত)

নম্বর ১১৩২

কর্ণেল এচ. এম. ডুরেণ্ড. সি. বি.

ভারত গভর্ণমেন্টের সেক্রেটারীর নিকট হইতে।

বর্দ্ধামানাধিপতি অনারেব্‌ল্ মহারাজাধিরাজ মহ্‌তাব্‌চন্দ্‌ বাহাদুর

সমীপে

ফোর্ট উইলিয়ম ১লা নভেম্বর ১৮৬৪।

ফরেন ডিপার্টমেন্ট

জেনারেল।

মহাশয়!

আগামী ৪ঠা নভেম্বর শুক্রবার বেলা ১১ ঘন্টার সময় কলিকাতাস্থ গভর্ণমেন্ট হাউসে আইনাদি প্রস্তুত করণার্থ

ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন হইবে। অতএব আপনাকে উক্ত সভায় উপস্থিত হইবার জন্য, মহামান্য ভাইসরয় ও মহামান্য গভর্ণর জেনারেল বাহাদুরের মন্ত্রীসভার আদেশানুসারে অত্রসহ তদীয় আদেশ লিপি প্রেরণ করিতেছি।

বিগত সভার সদস্যবর্গের ন্যায় অল্প দিনের জন্য সদস্য মনোনীত না হইয়া এবারে স্থায়ীরূপে সদস্য মনোনীত হইবে বলিয়াই, মহামান্যের সভায় স্থির হইয়াছে।

আপনার আবশ্যকীয় ব্যয় নির্ব্বাহার্থে দশ সহস্র টাকা রক্ষিত আছে। পরন্তু কলিকাতা হইতে যাতায়াতের যাবদীয় ব্যয় আপনাকেই নির্ব্বাহ করিতে হইবে।

ফোর্ট উইলিয়ম, বশম্বদ

১লা নভেম্বর, ১৮৬৪ এচ. এম. ডুরেণ্ড

ইণ্ডিয়া গভর্ণমেন্টের সেক্রেটারী

No. 1132

From Coll. H.M.Durand C.B.

Secy. to the Government of India.

To the Honorable Maharaja Dhiraj

Mahatab Chand Bahadur

Maharaja of Burdwan.

Dated Fort William the 1st November 1864.

Sir,

I am directed by His Excellency the Viceroy and Governor General in Council to transmit the accompanying summons to attend a meeting of the Council of the Governor General for making laws and Regulations to be held on Friday the 4th of November next at 11 A.M. at the Council Chamber in the Government house Calcutta.

His Excellency in Council expects that the stay of the native members will not be limited to a few days as was the case with some of the members last session---the attendance should be continuous.

I am to add that an allowance in full of Rs. 10,000 is provided for your expenses --- all other expenses of travelling to and from Calcutta must be borne by yourself.

I have the honor to be,

Sir

Your most Obdt. Servant

H.M.Durand

Secy. to the Government of India.

দ্বিতীয় পত্রখানি, যা আণ্ডার সেক্রেটারী পাঠিয়েছিলেন তারই মর্মার্থ —

নং ৫০৬৩।

ফোর্ট উইলিয়ম।

হোম ডিপার্টমেন্ট

লেজিসলেটিভ

১লা নভেম্বর ১৮৬৪।

আইনানুসারে ক্ষমতাপ্রাপ্ত গভর্ণর জেনারেলের মন্ত্রিসভা, আইন ও ব্যবস্থাদি প্রস্তুত করণার্থ ১৮৬৪ সালের ৪ঠা নভেম্বর বেলা ১১ ঘন্টার সময় কালিকাতাস্থ্ গভর্ণমেন্ট হাউসে গবর্ণর জেনারেল বাহাদুরের মন্ত্রিসভার অধিবেশনের স্থান নির্দ্দেশ করায় বর্দ্ধামানাধিপতি হিজ হাইনেস মহারাজাধিরাজ মহতাবচাঁদ বাহাদুরকে উক্ত সময়ে সভায় উপস্থিত হইবার জন্য সমন প্রদান করা হইল।

গবর্ণর জেনারেল বাহাদুরের মন্ত্রিসভার

আদেশানুসারে

আর্থার মোয়েল।

ইণ্ডিয়া গবর্ণমেন্টের অস্থায়ী আণ্ডার সেক্রেটারী।

No 5063

Fort Willam

Home Department.

Legislative.

The 1st. November 1864

The Governor General in Council under the Authority vested in him by the Act 24 and 25 Vic, C., 67 having appointed Friday the 4th of November 1864 at 11 A.M. at the time, and the Council Chamber in Government House Calcutta, as the place for a meeting of the Council of the Governor General for the purpose of making Laws and Regulations under the

provisions of the said Act, your Highness Maharajah Dhiraj, Mahatab Chand Bahadur, Maharaja of Burdwan, are hereby summond to the said meeting at the time and place aforesaid.

By order of the Governor General

in Council

Arthur Moell

Offg. Under Secy. to the Government of India.

No.4094

To Maharaja Dhiraj Mahatab Chand Bahadur, Maharaja of Burdwan.

My Friend,

I have heard with much gratification of your exemplary munificence towards the poor and famine stricken in Burdwan. Accept, my friend. my cordial thanks for the assistance which you have so generously given to your afflicted fellow creatures at a season of ternble distress.

I remain,

Your sincere friend;

J. Laurence

Governor General.

To Maharaja Dhiraj

Mahatab Chand Bahadur.

My friend,

The Private Secretary to His Excellency the Viceroy having intimated that you are about to pay a visit to Delhi, I am glad to welcome you within this province, and trust that every needful effort will be made to promote your comfort during your stay within it.

Lahore *I remain*

8th January 1868

Your Science friend;

** * **

Lieutenant Governor of the Punjab and its dependencies.

Victoria Raj (Crest)

Victoria by the grace of God of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, Queen, Defender of the faith to our Right trusty and well beloved councillor Edward George Fitzalan Howard (commonly called Lord Edward Gorge Fitzalan Howard) Deputy to our Right Trusty and Right Entirely Beloved cousin Henry Duke of Norfolk Earl Marshal and our hereditary marshal of England Greeting whereas Maharaja Dhiraj Mahatab Chand Bahadur of Burdwan late one of the members of the council of our Viceroy and Governor General of India, an India subject of our Realm of an ancient and noble family distinguished for its loyalty to our Indian Government has expressed his anxious desire of having granted to him the right of Armorial Bearings to be duly registered under our Royal authority together with supporters thereto and we being desirous to evince towards him a mark of our Royal favor for the Loyalty displayed by his family towards our Government of India and for preserving in perpetuity the remembrance of his service know that we of our princely grace and special favour have given and granted unto him the said Maharaja Dhiraj Mahatab Chand Bahadur of Burdwan our Royal Licence and authority that he and his descendents may bear the armoral Ensigns --- following that is to say an ancient Hindustani shield between in chief a crescent and in base two swords in saltire points downwards and for Crest on a wreath a Horse's head cauped around the neck a Riband and pendent therefrom and Escutcheon charged with a Lotus flower and for motto, Deo credito Justitiam colito and although the privilege of bearing supporters be limited to the peers of our Realm the Knights of our Order and other occasions for special

service yet in order to give a further testirrony of our approbation of the services performed by him we are graciously pleased to give and grant unto the said Maharaja Dhiraj Mahatab Chand Bahadur of Burdwan our Royal Licence and Authority that he may bear the suporters following that is to say on either side a Horse reguardant around the neck a Riband and pendent therefrom an Escutcheon charged with a Lotus flower and that such supporters may be borne and used by the heirs male of his body who shall succeed him in title of Maharaja of Burdwan.

Our will and pleasure therefore is that you Edward George Fitzalan Howard (commonly called Lord Edward George Fitzalan Howrah) Deputy of our said Earl Marshal to whom the cognizance of matters of this nature doth properly belong do require and command that this our concession and especial mark of our Royal favour begistered in our College of Arms to the end that our officers of Arms and all others upon occasion may take full notice and have knowledge thereof and for so doing this shall be your warrant.*

Given to our court at St. James's this Twenty fourth day of April 1868 in the thirty first year of our Regn.

BY HER MAJESTY'S COMMAND

Sd. Gatharne Hardy

Recorded in the College of Arms London pursuant to a warrant from the Deputy Earl Marshal of England.

Sd. Albert Co. Woods,

Lancaster & Register.

Licence granting Armorial Bearings and Supporters to the Maharaja of Burdwan.

(2) Licence granted

24th December, 1868

Chas. Geo. Young Garter.

&

Robert Laurie Clarence

(3) Licence Granted

26th December, 1868

Chas. Geo. Young Garter.

বলাবাহুল্য, এদেশের যাঁরা সম্ভ্রান্ত ও মহোচ্চবংশীয় খ্যাতি প্রতিপত্তি সম্পন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত, তাঁদের মধ্যে বর্ধমানের মহারাজাধিরাজ মহ্‌তাব্‌চাঁদই সর্বপ্রথম ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্যপদ প্রাপ্ত হন। সেই সময় উক্ত সভার সদস্যপদে থাকাকালীন বছরে ১০০০০ (দশ হাজার) টাকা হিসাবে তিন বছরে এককালে ৩০,০০০ (ত্রিশ হাজার) টাকা আবশ্যকীয় খরচ হিসাবে পান। হিজহাইনেস মহারাজ মহ্‌তাব্‌চাঁদ সেই ত্রিশহাজার টাকা কোলকাতার আলিপুর চিড়িয়াখানা নির্মাণের জন্য দান করেন।

পত্তনি প্রথার প্রবর্তন হয়েছিল মহারাজ তেজচাঁদের সময়। মহারাজা বিলাসী উচ্ছৃঙ্খল ছিলেন এবং তাঁকে প্ররোচিত করা হয়েছিল। অসৎ সঙ্গদোষ ছিল, অসৎ রাজকর্মচারী প্রভৃতি নানা কারণে রাজস্ব বাকী পড়ে। তখন ৪২ লক্ষ টাকার উপর বাৎসরিক রাজস্ব ছিল। তদুপরি প্রজাদের নিকট হতে খাজনা আদায় হতো না। সুতরাং পত্তনি ব্যবস্থা না দেওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। এসব মহারাজ তেজচাঁদ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

মহারাজ মহ্‌তাব্‌চাঁদ যখন জমিদারী প্রাপ্ত হন, তখন ইংরাজ আধিপত্য বেশ সুদৃঢ়। কাজেই ইংরাজদের আনুগত্য স্বীকার করা ছাড়া উপায় ছিল না। মহাতাব্‌চাঁদের বিরাট অন্যায় হয়েছিল, 'সাঁওতাল বিদ্রোহ' ও 'সিপাহী বিদ্রোহের' সময় ইংরাজদের সহযোগিতা করা। সেইসময় এমন কোন রাজশক্তি ছিলেন না যাঁরা সকলে সমবেত হয়ে ইংরাজদের বাধা দেন। তাঁর পূর্ববর্তী রাজগণ, পার্শ্ববর্তী দুই একজন জমিদারদের সহযোগিতায় ইংরাজদের বাধা দিয়েছিলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁদের রুখতে পারেন নাই। সুতরাং বলা যেতে পারে নিজ জমিদারী বা রাজ্য রক্ষা করতে হলে ইংরাজ অনুগত হওয়া ছাড়া উপায় ছিল না । এবং অনুগত হওয়ার জন্যই তিনি বিশেষ সম্মানিত ব্যক্তি হিসাবে পরিগণিত হয়েছিলেন, এ তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার। তবে তিনি জনসাধারণের মঙ্গলজনক বহু কাজ করেছিলেন।

১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয়, তখন মহ্‌তব্‌চাঁদ বিভিন্ন স্থানে অন্নসত্র খোলেন, বহুস্থানে সদাব্রত স্থাপন করেন, এখান থেকে দুর্দশাগ্রস্ত গরীব দুঃখীদের চাল, ডাল, তদুপযুক্ত তরিতরকারী, নূন, তেল সবই দেওয়া হতো এবং যেখানে মহারাজের যত দেবালয় ছিল

সেইসব দেবালয়ে অন্নভোগের বরাদ্দ বাড়িয়ে দেন। দেবালয়ের অন্নভোগেও দুর্ভিক্ষে ক্ষুৎপীড়িত সাধারণের ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে পারতো। এইভাবে তিনি দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের রক্ষা করেছিলেন। মহারাজ মহ্‌তাব্‌চাঁদের এই কাজের জন্য তদানীন্তন ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারেল স্যার জন লরেন্স তাঁকে নিজ হাতে পত্র লেখেন। তার বঙ্গানুবাদ দেওয়া হলো -- (রাজবংশানুচরিত পৃঃ ১৬২)

নং ৪০৯৪।

বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ মহ্‌তাব্‌চাঁদ বাহাদুর

সমীপে

কলিকাতা।

২০শে এপ্রেল ১৮৬৭।

প্রিয় বন্ধো!

বর্দ্ধমান প্রদেশের নিঃস্ব ও দুর্ভিক্ষ-পীড়িত ব্যক্তিদিগের প্রতি আপনার অনুকরণীয় দয়া ও দাক্ষিণ্যের বিষয় শ্রুত হইয়া আমি অতীব পরিতুষ্ট হইয়াছি। বন্ধো! ঈদৃশ ভয়ঙ্কর বিপদকালে, স্বদেশীয় দরিদ্রদিগের প্রতি আপনার এতাদৃশী মহীয়সী বদান্যতা সন্দর্শনে সাদরে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

আপনার অকৃত্রিম বন্ধু

জন পেরেন্স

গবর্ণর জেনারেল।

মহারাজ মহ্‌তব্‌চাঁদ সদগুণের অধিকারী ছিলেন বলেই তিনি সকলের নিকট সম্মান পেতেন। ''মহারাজার বহুল সদগুণ, অসাধারণ দানশীলতা ও অক্ষুন্ন রাজভক্তির পরিচয় পাইয়া ভারত গবর্ণমেন্ট তাঁহাকে অতিশয় সম্মান করিতেন।'' (রাজবংশানুচরিত, পৃঃ ১৬৪)

মহারাজা মহ্‌তাব্‌চাঁদের প্রশংসার্হ কাজও বদান্যতার জন্য ''১৮৬৮ খৃঃ মহামহিমান্বিতা শ্রীশ্রীমতী ভারতসম্রাজ্ঞীর আজ্ঞানুসারে লণ্ডনস্থ 'কলেজ অব্ আর্‌মস্', ইংলণ্ডস্থ কাউন্সিলের এড্‌ওয়ার্ড জর্জ ফিটজেলেন হাওয়ার্ড, আরল মার্শেল হেনরি ডিউক অব্ নর্ফোক, প্রভৃতির সম্মতিক্রমে গ্যাফরাইল হার্ডি, চার্লস জর্জ ইয়ং গার্টার, রবার্টলরি অব্ ক্লেরেন্স প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের, ও সর্ব্বোপরি মহামহিমান্বিতা শ্রী শ্রীমতী ভারত সম্রাজ্ঞীর স্বাক্ষরিত মহোচ্চ সম্মান-সূচক রাজচিহ্ন (*Armorial Bearings*) সংরক্ষণের সনদ প্রাপ্ত হয়েন। ঐ সম্মান চিহ্ন (*Court of Arms*) একখানি পুরাকালীন হিন্দুস্থানী ঢাল, তন্নিম্নে ২ খানি তরবারি উপরে অর্দ্ধচন্দ্র, সর্ব্বোপরি একটি অশ্বের মুখ, তাহার গলদেশে নীল বর্ণের ফিতায় আবদ্ধ একখানি পদক ও তন্মধ্যে একটি পদ্মপুষ্প। দুই পার্শ্বে দুইটি

ঘোটক এবং তাহাদের গলদেশে ঐরূপ ফিতায় আবদ্ধ ২ খানি পদক লম্বমান, নিম্নে ইংরাজী অক্ষরে (*Deo credito Justitiam colito*) অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সদ্বিচার কর, এই শ্লোকটি লেখা আছে। এই মহোচ্চ সম্মান চিহ্ন বংশপরম্পরায় ব্যবহার করিবার ক্ষমতা সনন্দে প্রদত্ত হইয়াছে। মহারাজার প্রাসাদ সমূহে এবং যাবদীয় মূল্যবান দ্রব্যে উক্ত চিহ্ন বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই সুবৃহৎ সনন্দখানির কিয়দংশের প্রতিলিপি প্রদত্ত হইল।

সর বারনার্ড বর্ক. সি. বি., এল. এল. ডি. মহোদয় কৃত পিয়ারেজ ও বোরোনেটেজ অব্ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া নামক গ্রন্থে মহারাজার যেরূপ বংশ পরিচয় ও রাজচিহ্ন (*Court of Arms*) প্রদত্ত হইয়াছে, নিম্নে তাহার অনুবাদ এবং তাহার প্রতিলিপি প্রদত্ত হইল।
বর্দ্ধমান।

BURDWAN



Mahatab Chand Maharaj Udhiraj Bahadur, of Burdwan, Bengal, originally of Kotlle in Lahore, 6.17 Nov. 1820;s. to the title and raj after the death of his father the Moharaj Udheraj Tej Chand Bahadur, 16 Aug. 1832; m, 1 st, 18 Feb. 1829, Noin Coonwaree, dau. of piara Laul, originally of Sirhind, in puttiala. She was b. 10 March, 1822; d. 24 June, 1840; and had issue.

Dhundaee Moharaj Coonwaree, of Burdwan, b. 17 June, 1840; m. 20 March, 1847. Lala Gopeenauth Mehra (son of Lala Gungaram Mehra of Patna), b. 6 Dec. 1829, d. 10 July 1853.

He m. 2ndly, 24June, 1844, Nurain Daee, now Nurain Coonwaree Moharanee Udherancee, of Burdwan, dau. of Lala Kedarnauth, of Beirach, in Oude, b. 5 June, 1833, and has issue.

Aftab Chaund Mahatab Bahadur Moharaj Koonwar, of Burdwan, son and heir-at-law by adoption, b. 8 Aug. 1860.

Arms-Az., an ancient (Hindoostane) shield, ppr., between in chief, a crescent arg., and in base two swords, in saltire, points downwards also ppr.

Crest-An iron-grey horse's head, couped, around the neck a riband, az., and pendent there from an escutcheon of the last, charged with a lotus flower, ppr.

Supporters-On either side an iron-grey horse, reguardant,. around the neck a riband, gu., and pendent therefrom an escutcheon of the last, charged with a lotus flower, ppr.

Motto-Deo credito justitiam colito.

Residences - Mohtab Munzell (Rajbaree), Daroolbuhar (Dilkosha), Mohtab Museer (Krishun saugore), Burdwan; Rajbaree, Chinsurch; Rajbaree. Culna; Rose Bank and Woodlands, Darjeeling; and The Retrear, Kurseong.

বঙ্গপ্রদেশস্থ বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ মহ্‌তাব্‌চন্দ্‌ বাহাদুরের পূর্বপুরুষগণের আদি নিবাস লাহোর নগরস্থ কোটলী মহল্লা। তিনি ১৮২০ খৃঃ ১৭ই নভেম্বর তারিখে জন্মগ্রহণ করতঃ তদীয় পিতা মহারাজাধিরাজ তেজচন্দ্‌ বাহাদুরের পরলোক গমনের পর ১৮৩২ খৃঃ ১৬ই আগষ্ট তারিখে পিতৃপদ ও সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়েন। ১৮২৯ খৃঃ ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে সর্‌হিন্দ প্রদেশস্থ পাতিয়ালার পূর্ব্বনিবাসী প্যারালাল কপূরের কন্যা নয়নকুমারীর পাণিগ্রহণ করেন। ১৮২২ খৃঃ ১০ই মার্চ্চ তারিখে নয়নকুমারীর জন্ম এবং ১৮৪০ খৃঃ ২৪ শে জুন তারিখে তাঁহার মৃত্যু হয়।

তদীয়া কন্যা রাজকুমারী ধনদেয়ী ১৮৪০ খৃঃ ১৭ই জুন তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৪৭ খৃঃ ২০শে মার্চ্চ তারিখে পাটনা নিবাসী গঙ্গারাম মেহেরার পুত্র গোপীনাথ মেহেরার সহিত ইহার পরিণয় হয়।

১৮২৯ খৃঃ ৬ই ডিসেম্বর তারিখে গোপীনাথের জন্ম এবং ১৮৫৩ খৃঃ ১০ই জুলাই তারিখে তাঁহার মৃত্যু হয়।

১৮৪৪ খৃঃ ২৪শে জুন তারিখে মহারাজা অযোধ্যা প্রদেশস্থ বেরুচ নিবাসী লালা কেদারনাথের কন্যা নারায়ণ দেয়ীর পাণিগ্রহণ করেন। তিনিই এক্ষণে বর্দ্ধমানের মহারাণী অধিরাণী নারায়ণকুমারী। ইনি ১৮৩৩ খৃঃ ৫ই জুন তারিখে জন্মগ্রহণ করেন।

তদীয় দত্তক পুত্র মহারাজকুমার আফ্‌তাব্‌চাঁন্দ্‌ বাহাদুর ১৮৩০ খৃঃ ৮ই আগষ্ট তারিখে জন্মগ্রহণ করেন।

বংশমর্য্যাদাসূচক চিহ্ন (*Arms*)

একখানি পুরাকালীন হিন্দুস্থানী ঢাল, তন্মধ্যে
অর্দ্ধচন্দ্র, অধোগ্র ২ খানি তরবারি নিয়ে অবস্থিত।

সম্ভ্রম সূচক আভরণ (*Crest*)

একটি ঘোড়ার মুখ, তাহার গ্রীবা দেশে ফিতা দ্বারা
আবদ্ধ একখানি পদক, তন্মধ্যে একটি পদ্ম পুষ্প।

মর্য্যাদা সূচক চিহ্নের উভয় পার্শ্বস্থ জন্তু (*Supporter*)

দুই পার্শ্বে দুইটি ঘোড়া, তাহাদের গলদেশে ফিতা
দ্বারা আবদ্ধ পদক ও তন্মধ্যে পদ্ম পুষ্প।

শ্লোক (*Motto*) ঈশ্বরের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সদ্বিচার কর।

বাসস্থান (*Residences*)—

বর্দ্ধমান মধ্যে মহ্‌তাব্‌ মঞ্জিল (রাজবাটী) দারুলবাহার
(দিলখোসা) মহ্‌তাব্‌ মসীর (কৃষ্ণসাগর), চুঁচুড়া রাজবাটী,
কালনা রাজবাটী, রোজব্যাঙ্ক (দারজিলিং), রিট্রীট (খরসান)।

১৮৬৯ খৃঃ মহারাজা প্রাইভেট এনট্রী অর্থাৎ বিশেষ চিহ্নিত ব্যক্তিগণ যে দ্বার দিয়া গবর্ণমেন্ট হাউসে প্রবেশ করেন, সেই দ্বার দিয়া গবর্ণমেন্ট হাউসে প্রবেশ করিবার অধিকার প্রাপ্ত হয়েন। ঐ সম্বন্ধে মহামান্য গবর্ণর জেনারেল বাহাদুরের মিলিটারি সেক্রেটারি বাহাদুর, মহারাজাকে যে পত্র লিখেন, তাহার বঙ্গানুবাদ নিম্নে ও প্রতিলিপি প্রদত্ত হইল —

মিলিটারি সেক্রেটারি অফিস

কলিকাতা, ২১ শে ডিসেম্বর, ১৮৬৯।

মহাশয়!

মহামান্য ভারতরাজ প্রতিনিধির আজ্ঞানুসারে আপনাকে অবগত করিতেছি যে, তিনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আপনাকে

সম্মানিত দ্বার দিয়া গবর্ণমেন্ট হাউসে প্রবেশাধিকার প্রদান করিলেন।

বশম্বদ

বর্দ্ধমানের মহারাজা মহ্‌তাব্‌চন্দ্‌ বাহাদুর।

এন. বি. লরহি, মেজর। মিলিটারি সেক্রেটারি।

No. 867

Military Secretary's Office

Calcutta 21st December 1869.

Sir,

I am directed to intimate to you that His Excellency the Viceroy has been pleased to grant you the privilege of Private Entree to Government House.

I have the honor to be

Sir

Your most obedient Servant

Maharaja Mahatab Chand
Bahadur of Burdwan

N.B Laurhe, Major
Military Secretary
to the Viceroy.

মহারাজাধিরাজ মহ্‌তাব্‌চাঁদ নিজের (আত্মপ্রচারের) জন্য দু-চারজন নিজের পেটাও লোকদের বদান্যতা দেখিয়েছেন তা নয়, দুর্ভিক্ষপীড়িত, দীন-দুঃখী, অনাথ আতুর সকলের জন্য এক জায়গায় নয় নানা স্থানে অন্নসত্র, সদাব্রত এবং যেখানে যেখানে তাঁর পূর্বপুরুষগণ দেবমন্দির স্থাপন করে গেছেন সেই সব দেব-বিগ্রহের ভোগের বরাদ্দও বাড়িয়ে দিয়েছিলেন যাতে ভুখা মানুষজন ভোগের অন্নে ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে পারে।

ইত্যাদি প্রকার সৎকর্মের জন্যই তৎকালীন ইংরাজ সরকার মহারাজকে সর্ব্বোচ্চ সম্মানে সম্মানিত করেছেন।

মহারাজাধিরাজ মহ্‌তাব্‌চাঁদ, মহারাজ তেজচাঁদের অঙ্গজপুত্র প্রতাপচাঁদের মহিষীদের ভক্তিশ্রদ্ধা করতেন এবং তাঁদের অনুগত ছিলেন। তাঁরা যখন যা করতে বলতেন তিনি তা যত্নের সঙ্গে সম্পন্ন করতেন। রাজবংশানুচরিত পৃঃ ১৫৮ তে উল্লেখ আছে ঃ—

"বর্দ্ধমান হইতে ৪ ক্রোশ ব্যবধানে শাকটিগড় (শক্তিগড়) গ্রামে, (এখন ঐস্থানে ষ্টেশন স্থাপন হইয়াছে) আদৌ জলাশয় না থাকায়, জলাভাবে পথিকগণের অত্যন্ত ক্লেশ হইত। ঐ গ্রামটি গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের উপরে

অবস্থিত। তৎকালে রেলপথ না থাকায়, পথিকগণ ঐ পথেই নিরন্তর গতায়াত করিত। মহারাজা তদীয় ভ্রাতৃবধূ, মহারাজা প্রতাপচন্দ বাহাদুরের জ্যেষ্ঠা মহিষী মহারাণী প্যারীকুমারীর অভিপ্রায় অনুসারে, দশ সহস্র মুদ্রা ব্যয় করতঃ ঐ স্থানে একটি বিশাল সরোবর খনন ও একটি দেব মন্দির প্রস্তুত করাইয়া তাঁহা (প্যারীকুমারী) দ্বারা প্রতিষ্ঠা করাইয়া দেন। উক্ত পুষ্করিনীটি খনন করায় পথিকগণের যে কত উপকার হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই।" উক্ত স্থানে প্রতিষ্ঠিত দেবমন্দিরে মহারাজ মহ্‌তাব্‌চাঁদ যে 'শিলালিপি' নির্মাণ করিয়েছিলেন তাতে মহারাণী প্যারীকুমারীরই নাম উৎকীর্ণ আছে।—

"দত্ত্বা লোকহিতায় সাগরসমাৎ শোভাবিতাং দীর্ঘিকাং
রাজাধীশপ্রতাপচন্দ মহিষী প্যারীকুমারী মূদা।
শাকাব্দে ভুজদন্তি বাজিকুমিতে কৃত্বা মঠং সুন্দরম্
রাধাবল্লভতুষ্টয়ে মৃগগতে সূর্য্যে হারায়াদদৎ।।"

শকাব্দা ১৭৮২।

এছাড়া, কেবলমাত্র বর্ধমান জমিদারীর মধ্যে দেব বিগ্রহ-মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তা নয়, বৃন্দাবন ধামেও বহু দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মহারাণী প্যারীকুমারীর নামে। শুধু প্রতিষ্ঠা করেই কাজ শেষ হয় নাই, তাঁদের পূজা অর্চনা, দেবসেবা ও ভোগের ব্যবস্থাও করেন এবং সেই ভোগের অন্নে বহু দীন-দুঃখী, সাধুসন্ত ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে পারতো।

১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে দুর্ভিক্ষের পর ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ম্যালেরিয়া দেখা দেয় মহামারীর আকারে। ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব এত দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল তা কল্পনা করা যায় না। বর্ধমান, হুগলী জেলার বহু গ্রাম ম্যালেরিয়ার করাল গ্রাসে জনশূন্য হয়ে পড়েছিল। মহারাজা মহ্‌তাব্‌চাঁদ চিকিৎসা ও পথ্যের জন্য অকাতরে অর্থব্যয় করেছিলেন। দীন দরদী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়, সেবা ব্রতী ডাঃ গঙ্গানারায়ণ মিত্র-দের মহারাজ কমলসায়র অঞ্চলে ত্রাণশিবির ও চিকিৎসাশিবির খোলার জন্য ছেড়ে দিয়েছিলেন। তাঁরা বর্ধমানের বিভিন্ন বস্তী অঞ্চল ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল ঘুরে ঘুরে চিকিৎসা ও পথ্যের ব্যবস্থা করতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়, গভর্ণমেন্টের নিকট চিকিৎসক ও ঔষধের জন্য আবেদন জানান। গভর্ণমেন্ট বহু চিকিৎসক নিয়োগ ও দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপনকরেন। এদিকে মহ্‌তাব্‌চাঁদও বর্ধমান, হুগলী, চুঁচুড়ার স্থানে স্থানে নিজ ব্যয়ে দাতব্য চিকিৎসালয়, ঔষধ-পথ্যের সুব্যবস্থা করেন। এছাড়া চিকিৎসালয়ের খরচ নির্বাহের জন্য মহারাজ বেঙ্গল গভর্ণমেন্টকে এককালে ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা দেন। বলাবাহুল্য মহারাজ মহ্‌তাব্‌চাঁদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সাহায্যে অসংখ্যব্যক্তির প্রাণ রক্ষা হয়েছিল।

মহারাজের বদান্যতা সম্বন্ধে সরকারী রিপোর্টে যা মন্তব্য করা হয়েছে, সেগুলি

উল্লেখ করার প্রয়োজন আছে। তিনি *Self propaganda*-র জন্য একাজ করেন নাই, প্রকৃতপক্ষে আর্ত ও পীড়তের সেবার জন্যই অর্থব্যয় করেছিলেন। এই সম্বন্ধে বর্ধমানের তৎকালীন কমিশনার সাহেব ১৮৭০ খ্রীঃ ৪ঠা এপ্রিল বেঙ্গল গভর্ণমেন্টকে যে রিপোর্ট পাঠান তার ২৫ স্তম্ভে যা লিখিত আছে তার বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হলো (রাজবংশানুচরিত পৃঃ ১৬৯-১৭০) —

"আমি সর্ব্বান্তঃকরণে নিরতিশয় বাধিত হইয়া লিখিতেছি যে, বৰ্দ্ধমানাধিপতি হিজহাইনেস মহারাজা বাহাদুরের অসীম বদান্যতায় আমরা তাঁহার নিকট চির-ঋণী হইয়াছি।

গত বৎসর মেলেরিয়া পীড়িত লোকদিগের চিকিৎসার্থে বৰ্দ্ধমানে যতগুলি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করা হয়, তাহার প্রায় সমুদয় ব্যয় মহারাজার প্রদত্ত অর্থেই নির্ব্বাহ হইয়াছিল। আমি ভরসা করি, বঙ্গেশ্বর মহারাজার ঈদৃশী দানশীলতার পরিচয় ভারত - রাজ প্রতিনিধিকে জ্ঞাপন করিবেন। তাঁহার ঈদৃশ মহত্ত্বের বিষয় সাধারণে প্রশংসার সহিত বিজ্ঞাপিত হউক, যেন অন্যান্য ধনবান জমিদারগণ তাঁহার এই মহদ্দৃষ্টান্তের অনুকরণ করেন।"

বর্ধমান বিভাগের কমিশনারের রিপোর্ট পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্গীয় সরকার ভারত-রাজপ্রতিনিধিকে যে রিপোর্ট প্রেরণ করেন, তার ১২ স্তম্ভে উক্ত বিবরণ উল্লিখিত হয়েছে। তদুত্তরে লেফ্‌টেনেন্ট গভর্ণমেন্ট মহারাজকে ধন্যবাদ জানিয়ে যে পত্র দিয়েছিলেন তার বঙ্গানুবাদ এইরূপ ঃ—

"বৰ্দ্ধমানাধিপতি মহারাজ সমীপে"

প্রিয় মহারাজা!

গত শীতকালে বৰ্দ্ধমান ও হুগলী জেলায় ভয়ঙ্কর মেলেরিয়া জ্বরে পীড়িত ব্যক্তিদিগের চিকিৎসার্থে আপনার অসীম দানশীলতার পরিচয় সকৌন্সেল মহামান্য গবর্ণর জেনারেল বাহাদুর অবগত হইলে আপনাকে তদ্বিষয় বিজ্ঞাপিত করিবার জন্য আমি ইণ্ডিয়া গবর্ণমেন্ট কর্তৃক আদিষ্ট হইয়াছি। আমিও এই অভিনব সুযোগ প্রাপ্তে পরমাহ্লাদে আপনাকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। আপনারই অসাধারণ দান হইতে পীড়িতগণের ঔষধ ও পথ্যের যাবদীয় ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়াছিল বলিয়া, অন্য কোন প্রকার ক্লেশদায়ক উপায় অবলম্বনে অর্থ সংগ্রহ করিতে হয় নাই।

ফোর্ট উইলিয়ম — প্রিয় মহারাজা

১৯ মে, ১৮৭০ — আপনার চির বিশ্বস্ত, ডবলিউ গ্রে।

To

Maharaja of Burdwan

My dear Maharaja,

I have much pleasure in informing you that I have received intimation from the Governor of India to convey to you the acknowledgments of the Government General in Council for your munificent charity in connexion with the operation undertaken last cold season for the relief of the inhabitants. of Hoogly and Burdwan who are suffering from the severe epidemic fever which has for some time past been attended with such serious consequence to those Districts. I am glad to have this fresh opportunity of expressing my own high sense of the prompt liberality by which you enable at once to make every provision necessary for a thoroughly organized system of medical and food relief to those fever stricken people without having recourse to the revenues of the estate at a time when those revenues could ill bear any unusual demand on them.

Fort William, *I remain,*
The 19th May / 70 *My dear Maharaja,*
Yours faithfully,
W. Gray.
Monday
3-1-70

তৎকালে সুচারু সেচ ব্যবস্থা না থাকায় যে অঞ্চলে খরা অনাবৃষ্টি হতো সেই অঞ্চলে বা প্রদেশে অজন্মা ও দুর্ভিক্ষ দেখা দিত। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষের পর ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। তখনও মহারাজের অকৃপন দানে অসংখ্য গরীব-দুঃখীর প্রাণ রক্ষা হয়েছিল।

"করুণ হৃদয় মহারাজাধিরাজ মহ্‌তাব্‌চন্দ্‌ বাহাদুর নিজব্যয়ে, চুঁচুড়া, কালনা ও বৰ্দ্ধমানের স্থানে স্থানে, অন্নসত্র ও তৎসঙ্গে দুর্ভিক্ষপীড়িত ব্যক্তিগণের চিকিৎসার্থে দাতব্য চিকিৎসলয় সমূহ স্থাপন করতঃ অকাতরে অন্ন ও ঔষধ বিতরণে অসংখ্য দরিদ্রের প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। প্রত্যহ প্রতি অন্নসত্রের প্রতি পংক্তিতে, এককালে এতাধিক লোক বসিয়া আহার করিত যে, পংক্তির এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত, পরিবেষণ কারিদিগকে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিলেও তাহাদের শ্রুতিগোচর হইত না বলিয়া, কোন দ্রব্যের প্রয়োজন হইলে, বিভিন্ন বর্ণের সাঙ্কেতিক পতাকার সঙ্কেতে অন্ন ব্যঞ্জনাদি আনয়ন করা হইত। পরে দুর্ভিক্ষ প্রশমিত

হইলে, দরিদ্রগণকে পাথেয় ও বস্ত্র প্রদান করিয়া বিদায় করেন।" (রাজবংশানুচরিত পৃঃ ১৭৪) সেই সময় দেশে বিভিন্ন স্থানে খরা, বন্যা, মহামারী মাঝে মাঝে ভয়াবহ আকারে দেখা দিত। সেইজন্য ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারেল একটি রিলিফ কমিটির সদস্য হিসাবে মহারাজাধিরাজ মহ্তাব্চাঁদ বাহাদুরকে গ্রহণ করেন। এ সম্বন্ধে ভারতগভর্ণমেন্ট মহারাজাকে যে পত্র দিয়েছিলেন তার বঙ্গানুবাদ নীচে উদ্ধৃত করা হলো —

গভর্ণমেন্ট হাউস,

১৪ জুন, ১৮৭৪।

প্রিয় মহারাজা!

অনাবৃষ্টি নিবন্ধন দেশের যে যে স্থানে বিপদের সম্ভাবনা আছে, তত্রস্থ দরিদ্রদিগের সাহায্যার্থে অর্থ সংগ্রহের নিমিত্ত একটি দাতব্য সভা স্থাপনের সময় উপস্থিত। বঙ্গবাসিদিগের কোন প্রকার আপৎ উপস্থিত হইলেই আপনি পূর্ব্বাপর গভর্ণমেন্টের যেরূপ সাহায্য করিযাছেন, তদ্দৃষ্টেই আমি ভরসা করি আপনি এই সভার একজন সভ্য হইবেন।

সার জর্জ ক্যাম্বেল আপনাকে সভার উদ্দেশ্য অবগত করিবেন।

আপনার অকৃত্রিম বন্ধু

নর্থ ব্রুক।

আরও, আর্ত-পীড়িতের ত্রাণ কাজের কথা বলা প্রয়োজন। মহারাজাধিরাজ মহ্তাব্চাঁদের পরদুঃখকাতরতা ও বদান্যতা নিজ রাজ্যের বা জেলার মধ্যেই যে সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়, সুদূর দক্ষিণ ভারতেও তা বিস্তৃত ছিল। সব থেকে বড় কথা হলো নিজ জমিদারী জেলা প্রদেশ ছাড়াও ভারতবর্ষের যে কোন প্রদেশে বা রাজ্যে যখনই কোন দুর্যোগ-দুর্ঘটনা ঘটেছে সেখানেই মহারাজ মহ্তাবচাঁদ আর্তের সেবায় অকাতরে দান করেছেন। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজ প্রদেশে (বর্তমানে চেন্নাই) ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ হলে মহ্তাব্ চাঁদ এককালীন দশ হাজার টাকা বেঙ্গল গভর্ণমেন্ট মাধ্যমে পাঠান। তদুত্তরে বঙ্গগভর্ণমেন্ট প্রাপ্তি স্বীকার করে মহারাজকে জানান —

দারজিলিং

৮ই সেপ্টেম্বর ১৮৭৭

প্রিয় মহারাজা!

মাদ্রাজের দুর্ভিক্ষ-পীড়িত ব্যক্তিগণের আনুকুল্যার্থে, আপনার প্রভুত দানের সংবাদ প্রাপ্তি মাত্রেই আমি টেলিগ্রাফদ্বারা মহামান্য ভাইসরয়কে তৎসংবাদ অবগত করায়, তিনিও টেলিগ্রাফ দ্বারা তাহার যে প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়াছেন, তাহাব একখণ্ড প্রতিলিপি অত্রসহ সহ আপনাকে প্রেরণ করিলাম।

প্রিয় মহারাজা আপনার অকৃত্রিম বন্ধু

এসলি. ইডেন।"

গভর্ণর জেনারেল বাহাদুর-এর টেলিগ্রাফের প্রতিলিপির বঙ্গানুবাদ —

সারভিস মেসেজ

বাঙ্গালোর — দারজিলিং

এস.সি.বেলীর — লেফটেনেন্ট গভর্ণমেন্ট

নিকট হইতে — সমীপে

মাদ্রাজ সাহায্যভাণ্ডারে বর্দ্ধমানাধিপতি দশ সহস্র টাকা চাঁদা প্রদান করায় সংবাদ অবগত হইয়া ভাইসরয় অতিশয় আনন্দিত হইয়াছেন এবং মহারাজকে তাঁহার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইবার নিমিত্ত আপনাকে অনুরোধ করিয়াছেন।

ট্রু কপি

ডবলিউ পামার

রেজিষ্ট্রার।"

মহারাজ মহ্‌তাব্‌চাঁদ লক্ষ্য করেছিলেন দুঃস্থ ও দরিদ্রের চিকিৎসার কোন সুব্যবস্থা নাই। এই অসুবিধা দূর করার জন্য, 'শ্যামসাগর' সরোবরের তীরে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন এবং রাজকর্ম্মচারী ও ভৃত্যবর্গের চিকিৎসার্থে রাজবাটীর মধ্যে একটি স্বতন্ত্র দাতব্য ঔষধালয় স্থাপন করেন। এতদ্ভিন্ন কালনায় একটি দাতব্য চিকিৎসালয়, কটকজেলার (উড়িষ্যা) অন্তর্গত কুজঙ্গ ইষ্টেটে একটি এবং মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত সুজা মুঠা পরগণায় একটি করিয়া দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়া দরিদ্র মানুষজনের বিশেষ কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন।" (রাজবংশানুচরিত পৃঃ ১৮৬) উক্ত গ্রন্থ হতে আরও জানতে পারা যায় মহারাজ "অনেকগুলি সুযোগ্য কবিরাজ ও হাকিম নিযুক্ত করতঃ তদ্দ্বারা বহু ব্যয়ে দেশীয় ঔষধ ও তৈলাদি প্রস্তুত করাইয়া রাখিতেন এবং কাহারও আবশ্যক হইলে তৎক্ষণাৎ তাহা প্রদান করিতেন। পুরাতন ঘৃত, পুরাতন গুড় আদি দেশীয় দুর্লভ মহৌষধ সকল বিতরণার্থে প্রস্তুত থাকিত। .... প্রতি বৎসরই নিয়মিত সময়ে গব্যঘৃত ও গুড় ক্রয় করিয়া মৃত্তিকা মধ্যে প্রোথিত করা হইত। যে সময় উহা প্রোথিত হইত তাহার সন ও তারিখ পাত্রের গায়ে খোদিত থাকিত।" বলা বাহুল্য এই সমস্ত কিছুই প্রজা সাধারণের জন্য সংগৃহীত হতো। দাতব্য চিকিৎসালয়গুলির ব্যয় মহারাজ নিজেই নির্বাহ করতেন। অন্যান্য চিকিৎসালয়গুলির বর্তমান কেমন অবস্থায় আছে বলা সম্ভব নয়। তবে বর্ধমান শ্যামসায়রের তীরে প্রতিষ্ঠিত দাতব্য চিকিৎসালয়টি আজকের 'বিজয় চাঁদ হসপিটাল ও মেডিকেল কলেজ' পরিবর্তিত

পরিবর্ধিত ও রূপান্তরিত হয়েছে।

একবার, মহারাজ মহ্‌তাব্‌চাঁদের সময়, শ্রীক্ষেত্র ধামে 'মার্কণ্ডেয়' নামে যে বিশাল পুষ্করিণী আছে তার জল শুকিয়ে যায়। ঐ পুষ্করিণীর জল, হাজার হাজার তীর্থযাত্রী, স্থানীয় জনগণ, জগন্নাথ দেবের ভোগ রন্ধন প্রভৃতি বহু কাজে ব্যবহৃত হত। মহারাজ মহ্‌তাব্‌চাঁদ ঐ দুঃখ কষ্ট দূর করার জন্য "দশ সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়া উক্ত সরোবরে জল উৎসেচন করতঃ ইষ্টক নির্মিত পয়ঃপ্রণালী প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছেন। এক্ষণে বর্ষাকালে উক্ত পয়ঃপ্রণালী দ্বারা মাঠ হইতে প্রভূত জলরাশি আসিয়া সরোবর পরিপূর্ণ করিয়া রাখে।" (রাজবংশানুচরিত পৃঃ ১৯৩-১৯৪)

পেন্সন প্রথা ঃ—

এ পর্যন্ত যত রাজন্যবর্গ ও বড়-ছোট জমিদার বা প্রাদেশিক শাসন-কর্তাগণ কেহই তাঁদের প্রতিপালিত রাজকর্মচারীদের ভবিষ্যৎ জীবনের আধার বা অন্নসংস্থানের কথা চিন্তা করেন নাই অথবা তাঁদের ভাবনা-চিন্তার বহির্ভূত ছিল সে সব চিন্তা। মহারাজা মহ্‌তাব্‌চাঁদ ছিলেন এ বিষয়ে বিশেষ দূরদর্শী। তিনি চিন্তা করতেন, কর্মচারী যাঁরা অক্ষম হয়ে শেষ বয়সে অবসর গ্রহণ করবেন, তাঁদের ভবিষ্যৎ জীবন কিভাবে অতিবাহিত হবে। এই সব ভাবনা চিন্তা করে বিদায়ী কর্মচারীদের 'পেন্সন' দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। "তদবধি কত লোকই যে, শেষাবস্থায় পেন্সন প্রাপ্ত হইয়া আজীবন মহারাজকে আশীর্ব্বাদ করতঃ নিশ্চিন্তে জীবন লীলা সমাপন করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। কোন কর্ম্মচারী পেন্সন লইলে অথবা গতাসু হইলে মহারাজা তাঁহার পুত্রকেই পিতৃপদ প্রদান করিতেন। যদি পুত্রটি নিতান্ত বালক কিম্বা সুশিক্ষিত না হইত, তাহা হইলে তাহার প্রতিনিধি স্বরূপ তাঁহার কোন আত্মীয়কে উক্তপদে নিযুক্ত করিয়া তদ্দ্বারাই বালকের শিক্ষাদি সম্পন্ন করাইয়া লইতেন এবং বালককেও কিছু কিছু মাসিক বৃত্তি প্রদান করিতেন।" (রাজ বংশানুচরিত পৃঃ ১৮৮, ১৮৯)

বহিরাঞ্চলে জমিদারী বৃদ্ধি ঃ—

একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে 'যার লাঠি তার মাটি'। তৎকালে রাজ-রাজারা একরকম আগ্রাসী নীতিতেই রাজ্য বৃদ্ধি করতেন, এমন কি মহ্‌তাব্‌চাঁদের পূর্ববর্তীগণও জমিদারীর আয়তন বাড়িয়েছিলেন এইভাবেই। মহারাজাধিরাজ মহ্‌তাব্‌চাঁদ তাঁর জমিদারীর সীমা এইভাবে বৃদ্ধি করেন নাই। অন্যরাজাদের মত যুদ্ধ করে রাজ্য অধিকার করেন নাই —অন্তত পক্ষে এ পর্যন্ত যা জানা গেছে। "তিনি অনেকগুলি ভূ-সম্পত্তি ক্রয় করিয়া রাজ্যের বহুল আয় বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন। উড়িষ্যা প্রদেশস্থ কটক জেলার অন্তর্গত কেল্লাকুজঙ্গের রাজার সমগ্র রাজ্য, মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত সুজামুঠার রাজা গোলকেন্দ্রের সমস্ত জমিদারী,

দারর্জিলিং খরসানের বহুতর নিষ্কর জমি তৎকর্ত্তৃকই ক্রীত হইয়াছিল। কুজঙ্গ ও সুজামুঠা ক্রয় করিয়া তাহার পূর্ব্বতন রাজাদিগের প্রতিষ্ঠিত দেবতাদির পূজা ও দুর্গোৎসবাদি যাবদীয় নিত্যনৈমিত্তিক কার্য্য নিজরাজসরকার হইতে পূর্ব্ববৎ যথা নিয়মে সুসম্পন্ন হইবার বিহিত ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। কোন ধনবান ও সম্ভ্রান্ত বংশীয় কেহ কালবশে নিঃস্ব হইয়া মহারাজার আশ্রয় গ্রহণ করিলে, তিনি তাঁহাকে অত্যন্ত সমাদর ও অনুকম্পা করিতেন। সুজামুঠার রাজা গোলকেন্দ্র নারায়ণ রায়ের শোচনীয় দুরবস্থা দৃষ্টে তাঁহার স্বচ্ছন্দে ভরণপোষণোপযোগী মাসিক বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছিলেন। কুজঙ্গের রাজার বিমাতাদ্বয় এবং সুজামুঠার রাজরাণী নিজ রাজসরকারের প্রদত্ত বৃত্তি প্রাপ্তে দিনপাত করিতেন।'' (রাজ বংশানুচরিত পৃঃ ১৮৮)

বিদ্যোৎসাহি ও গুণগ্রাহী মহ্‌তাব্‌চাঁদ — বর্ধমানে তৎকালে কোন উচ্চবিদ্যালয় ছিল না। পূর্ববর্তী মহারাজদের প্রতিষ্ঠিত টোল ছিল, সেখানে সংস্কৃত শিক্ষা দেওয়া হতো। তিনি স্পষ্টতই বুঝেছিলেন ইংরাজী শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন। এতন্নিমিত্ত বালকদের জন্য সর্বপ্রথম একটি অবৈতনিক উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় এবং হিন্দু বালিকাদের জন্য একটি পৃথক বিদ্যালয় স্থাপন করেন।

মহারাজ মহ্‌তাব্‌চাঁদ ছিলেন প্রকৃত সাহিত্যানুরাগী। তাঁর রাজসভায় বহু প্রথিতযশা পণ্ডিত ছিলেন। তারকনাথ তত্ত্বরত্ন, রামতনু তর্ক সিদ্ধান্ত, ব্রজেন্দ্রকুমার বিদ্যারত্ন, পদ্মলোচন ন্যায়রত্ন, অঘোরনাথ তত্ত্বনিধি, প্রভৃতি নানা শাস্ত্র-বিশারদ দেশ বিখ্যাত পাণ্ডিত গণ, চিকিৎসা শাস্ত্র বিশারদ কমল কবিভূষণ, ভোলানাথ কবিরাজ প্রভৃতি বঙ্গদেশ প্রসিদ্ধ চিকিৎসকগণ, বাদ্যবিশারদ উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সঙ্গীত নিপুন সুপ্রসিদ্ধ গায়ক যদুনাথ ভট্ট, রাজকার্যকুশল তারকনাথ সেন, শম্ভূচন্দ্র ঘোষ, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, চন্দ্রশেখর দেব প্রভৃতি অমাত্যবর্গ রাজসভা উজ্জ্বল করে রাখতেন।

তাঁর সময়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের যাতায়াত ছিল। বিধবা বিবাহ আন্দোলনে বিদ্যাসাগরের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন মহারাজ মহ্‌তাবচাঁদ। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁকে '*First Man of Bengal* ' আখ্যা দিয়েছিলেন। মহারাজা প্রভূত অর্থ ব্যয়ে মূল বাল্মীকি-রামায়ণ, ব্যাস বিরচিত মহাভারত, হরিবংশ, চাহার দরবেশ, সিকন্দরনামা, মসনবী আলাও প্রভৃতি বহু গ্রন্থ, বাংলায় অনুবাদ করিয়ে বিনামূল্যে বিতরণের ব্যবস্থা করেছিলেন। ১২৬৫ সালে, বৈশাখ মাস হতে রামায়ণ অনুবাদ করতে আরম্ভ করেন রাজসভাপণ্ডিত বিপ্রদাস তর্কবাগীশ ও উমাকান্ত ভট্টাচার্য। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসের মাঝামাঝি রামায়ণের আদিকাণ্ডের পদ্যানুবাদ প্রকাশিত হয়। অনুবাদের ১০০ খানি সৌজন্য

কপি বিতরণের দায়িত্ব দিয়েছিলেন "ভাস্কর" সম্পাদক গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশের উপর। রামায়ণ অনুবাদের সামান্য অংশ উদ্ধৃত করা হলো—

"অসম্ভব কর্ম্ম এই সাগর বন্ধন।
কিরূপে করিল দশরথের নন্দন।।
ভয়ঙ্কর রত্নাকরে বাঁধি কপিচয়।
বাহু বিস্তারিলা বিধি বধিতে নিশ্চয়।।
প্রথমতঃ হরিসেনা করি পরিমাণ।
পশ্চাৎ করিব আমি যা হয় বিধান।।
অতএব বলি শুন হে শুক সারণ।
মায়ায় বানর রূপ করিয়া ধারণ।।
প্রবেশ করহ গিয়া সেনার ভিতরে।
বল সংখ্যা পরীক্ষিয়া আসিবে সত্বরে।।"

বলা বাহুল্য 'রামায়ণ' ও 'মহাভারত' কোন একজন পণ্ডিত অনুবাদ করেন নাই। আশুতোষ শিরোরত্ন, অঘোর নাথ তত্ত্বনিধি, উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, অভয়াচরণ তর্ক পঞ্চানন, তারকনাথ তত্ত্বরত্ন, ব্রজেন্দ্র কুমার বিদ্যারত্ন, গোপালধন চূড়ামণি, রামতনু তর্কসিদ্ধান্ত, শ্যামাচরণ তত্ত্ববাগীশ, সারদা প্রসাদ জ্ঞাননিধি প্রমুখ পণ্ডিতবর্গ অনুবাদ কাজে যুক্ত ছিলেন।

মহারাজ মহ্‌তাব্‌চাঁদ রামায়ণ ও মহাভারতের সম্পূর্ণ অনুবাদ দেখে যেতে পারেন নাই। তাঁর সময়কালে রামায়ণের 'কিষ্কিন্ধা কাণ্ড' পর্যন্ত এবং মহাভারতের 'আদি পর্ব' থেকে 'শান্তি পর্ব' পর্যন্ত অনুবাদিত হয়েছিল। অবশিষ্ট খণ্ডগুলি মহারাজ আফ্‌তাব্‌চাঁদের সময় সমাপ্ত হয়।

সংস্কৃত কাব্য ছাড়াও উর্দু, ফার্সী গ্রন্থেরও অনুবাদ করিয়েছিলেন। 'হাতেম তাই' পুস্তক খানি ফার্সী ও উর্দু উভয় ভাষাতেই প্রচলিত ছিল। উর্দু ভাষায় রচিত কাহিনীটি ১৮৬০ খ্রীঃ (১২৬৭ সাল) এবং ফার্সী ভাষায় রচিত কাহিনীটি ১৮৬১ খ্রীঃ (১২৬৮ সালে) অনুবাদ করেন রাজ সভাস্থ পণ্ডিত মুন্সী মহম্মদী ও গোলাম রব্বানি। অনুবাদগুলি দেখে দিয়েছিলেন দুর্গানন্দ কবিরত্ন এবং তারকনাথ তত্ত্বরত্ন দ্বারা সংশোধিত হয়েছিল। উর্দু ভাষার প্রখ্যাত কবি মীর হ্‌সন রচিত 'মসনবি' অনুবাদ করেছিলেন মুন্সী মহম্মদী, গোলাম রব্বানি ও দুর্গানন্দ কবিরত্ন এই তিন পণ্ডিত মিলিতভাবে পদ্যানুবাদ করেন। 'সেকেন্দর নামা' কাব্য কাহিনীটি মহারাজ মহ্‌তাব্‌চাঁদের খুব প্রিয় ছিল। পারস্য ভাষায় লিখিত পুস্তক থেকে অনুবাদ করেন মুন্সী মহম্মদী ও রামতারণ তর্কবাগীশ। 'চাহার দরবেশ' উর্দুসাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য

কাহিনী। চারজন দরবেশ-এর চিত্তাকর্ষক কাহিনী নিয়ে মীর অম্মন গ্রন্থটি রচনা করেন। রাজসভাপণ্ডিত ব্রজেন্দ্রকুমার বিদ্যারত্ন বইখানি বাংলায় অনুবাদ করেন এবং অঘোরনাথ তত্ত্বনিধি উহা পরিমার্জিত করেন। অনুবাদিত সমগ্র পুস্তকটি মহারাজ মহ্‌তাব্‌চাঁদ দেখে গিয়েছিলেন কিন্তু পুস্তকাকারে মুদ্রিত অবস্থায় দেখে যেতে পারেন নাই, প্রকাশের ৬ বছর পূর্বেই তিনি দেহ রাখেন। মহারাজ আফ্‌তাব্‌চাঁদের সময় ১৮৮৫ খ্রীঃ অব্দে প্রকাশিত হয়।

মহারাজ মহ্‌তাব্‌চাঁদ রাজসভা থেকে বিভিন্ন গ্রন্থ, মহাকাব্য প্রভৃতি বঙ্গানুবাদ করিয়ে প্রকাশ ও প্রচার করার ব্যবস্থা করেন। তা ছাড়া স্ত্রী জাতির ধর্মশিক্ষা বিষয়ক পুস্তকও প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। বিভিন্ন পুরাণ, উপনিষদ থেকে শ্লোক সংকলন করে সভাপণ্ডিত পদ্মলোচন ন্যায়রত্ন মহাশয়কে দিয়ে অনুবাদ ও সম্পাদনা করে 'পতিব্রতোপদেশ' নামে একখানি ছোট ধর্মপুস্তক প্রকাশ করেন। পুস্তিকাটির প্রকাশকালে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ। অতঃপর মহারাণী নারায়ণকুমারীর নির্দেশে অপর একখানি ধর্মপুস্তক ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকখানির শাস্ত্রবচনগুলি সংকলন করেছিলেন সভাপণ্ডিত রামতনু তর্কসিদ্ধান্ত এবং বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা করেছিলেন পণ্ডিত তারকনাথ তত্ত্বরত্ন। পুস্তকটির নাম 'পতি ভক্তি প্রদায়িনী' ইহাও স্ত্রী-শিক্ষা বিষয়ক।

রাজসভা থেকে প্রকাশিত আরও একটি পুস্তকের কথা বলা প্রয়োজন বলে মনে করি। পুস্তকটিকে সাহিত্য পদমর্যাদা দেওয়া যায় কিনা তা সাহিত্যিকদের বিচার্য, তবে ইতিবৃত্তের উপাদান হিসাবে পুস্তকটিকেও বাদ দেওয়া যায় না। কারণ বিষয়বস্তু সামান্য হলেও তা ইতিহাসের উপাদান। পুস্তকের নাম 'পাকরাজেশ্বর, বিশ্বেশ্বর তর্কালঙ্কার প্রণীত, প্রথম মুদ্রিত হয়েছিল ১৮৪৩ খ্রীঃ। পরে গৌরী শঙ্কর তর্কবাগীশের সম্পাদনায় ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে পুনর্মুদ্রিত হয়। বইখানি বেশ সমাদৃত হয়েছিল। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজ মহ্‌তাব্‌চাঁদের মহাপ্রয়াণের পূর্বে পরবর্তী সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে মহারাজাধিরাজ বিজয়চাঁদের সময়েও পুস্তকখানি পুনঃ প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকে খাদ্যবস্তুর গুণাগুণ সম্বন্ধেও আলোচিত হয়েছে। বইখানি সমস্ত স ত্ত্ব গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশকে মহারাজ দান করেন।

পুস্তকখানিতে অন্নব্যঞ্জন, পিঠাপুলি পায়স, নানা প্রকার মিষ্টান্ন, নোন্‌তা খাবার, আচার, চাটনী, পানীয় পর্যন্ত বস্তুর প্রস্তুত প্রণালী ও গুণাগুণ বর্ণিত হয়েছিল।

বর্ধমান মহাতাব্‌ চাঁদের নির্দেশে এবং আনুকূল্যে রাজসভা থেকে প্রকাশিত একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হলো 'ভ্রম বিনাশ'। গ্রন্থটি ব্রাহ্মধর্মের প্রচার গ্রন্থ। পৌত্তলিকতাবাদী হিন্দুদের ঈশ্বরোপাসনার ভ্রান্তি দেখিয়েছেন। বিভিন্ন শাস্ত্র বিশেষ করে শ্রুতি শাস্ত্র থেকে শ্লোক চয়ণ

করে বঙ্গানুবাদ, ব্যাখ্যা ও সম্পাদনা করেন সভাপণ্ডিত অঘোরনাথ তত্ত্বনিধি। গ্রন্থটির প্রকাশ কাল ১৭৯১ শকাব্দ (১৮৬৯ খৃঃ)। আর একখানি, সমাজ নীতি শাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থ 'প্রশ্নোত্তর-মালা' প্রকাশিত হয়েছিল। পুস্তকটির প্রথম খণ্ড প্রকাশ হয়েছিল ১৭৯৫ শকাব্দে (১৮৭৩ খ্রীঃ) এবং দ্বিতীয় খণ্ডটি মুদ্রিত হয়ে প্রকাশ হয় ১৮৭৯ খ্রীঃ। গ্রন্থখানির সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি মহারাজ মহ্‌তাবচাঁদ দেখেছিলেন। রাজবাড়ীর ছাপাখানায় গ্রন্থটির ছাপার কাজ চলছিল, অসমাপ্ত মুদ্রণ অবস্থাতেই মহারাজ ঐ বছর ২৬শে অক্টোবর পরলোক গমন করেন। 'প্রশ্নোত্তর মালা' কিরূপ ছিল তার নিদর্শন দেওয়া হলো —

প্রশ্নোত্তর মালার নিদর্শন

'প্রশ্নোত্তর-মালা' গ্রন্থের উপজীব্য ছিল হিন্দুশাস্ত্র নির্দেশিত কতকগুলি সামাজিক আচার ও করণীয় কর্তব্য সম্বন্ধীয়। প্রশ্নগুলির উদ্ভাবক মহারাজ মহ্‌তাবচাঁদ বলেই অনুমিত হয়। ইতিপূর্বে রাজসভায় এই ধরণের কোন বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচিত হয় নাই। মহারাজ মোট ৪৬ টি প্রশ্ন একসঙ্গে প্রশ্নপত্রের আকারে দেশের স্বনামধন্য ৫৬ জন পণ্ডিতের কাছে পাঠানো হয়েছিল। এই বিষয়ে উত্তরদানে বর্ধমান রাজসভার পণ্ডিতবর্গও অংশগ্রহণ করেছিলেন। প্রশ্ন ও তার উত্তর যে যে পণ্ডিতগণ দিয়েছিলেন তাঁদের নাম, নিবাস সহ উত্তর নীচে প্রদত্ত হলো। এই প্রশ্নোত্তরবিধি খুবই কৌতুকাবহ। তার মধ্যে কিছু কিছু অংশ দৃষ্টান্ত স্বরূপ উদ্ধৃতি করা হল।

প্রশ্নোত্তরমালার প্রথম খণ্ডের প্রথম প্রশ্ন ছিল ঃ

"দেবতা গুরু গুরুপত্নী পিতা মাতা শ্বশুর শ্বাশুড়ি এবং স্বামী এক স্থানে থাকিলে স্ত্রী জাতি অগ্রে কাহাকে প্রণাম করিবে এবং ক্রমে ক্রমে কাহাকে কাহাকেই বা প্রণাম করা বিধেয়?"

পণ্ডিত মহাশয়গণ কে কে কী উত্তর দিয়েছেন, তা নিম্নরূপ তালিকাকারে প্রকাশ করা হয়েছে।

		১ম	২য়	৩য়	৪র্থ	৫ম	৬ষ্ঠ	৭ম	৮ম
ব্রজকুমার বিদ্যারত্ন (বর্ধমান)	ঃ	দেবতা	গুরু	গুরুপত্নী	পতি	মাতা	পিতা	শ্বশুর	শ্বাশুড়ী
রামতনু তর্কসিদ্ধান্ত (বর্ধমান)	ঃ	গুরু	দেবতা	গুরুপত্নী	পতি	মাতা	পিতা	শ্বশুর	শ্বাশুড়ী
তারকনাথ তর্করত্ন		গুরু	দেবতা	পতি	পিতা	মাতা	শ্বশুর	শ্বাশুড়ী	গুরুপত্নী
মৃত্যুঞ্জয় শিরোমণি (ভাটপাড়া)		স্বামী	গুরু	গুরুপত্নী	দেবতা	পিতা	মাতা	শ্বশুর	শ্বাশুড়ী
রমেন্দ্র শিরোমণি (ভাটপাড়া)		দেবতা	স্বামী	মাতা	পিতা	গুরু	গুরুপত্নী	শ্বাশুড়ী	শ্বশুর

রমাপতি তর্কভূষণ	ঃ	পতি	দেবতা	গুরু	গুরুপত্নী	শ্বশুর	শ্বাশুড়ী	পিতা	মাতা
(কাশিমবাজার)									
রাধাকৃষ্ণ ত্রিপাঠী	ঃ	দেবতা	গুরু	পিতা	(পরে যথাযোগ্য শ্বশুরাদি প্রণম্য)				
(বৃন্দাবন)									
রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন	ঃ	পতি	গুরু	দেবতা	গুরুপত্নী	শ্বশুর	শ্বাশুড়ী	পিতা	মাতা
(খাগড়া)									
ঠাকুরদাস বিদ্যারত্ন									
রামলাল শিরোমণি									
কৃষ্ণচন্দ্র তর্করত্ন	ঃ	গুরু	গুরুপত্নী	দেবতা	স্বামী	শ্বশুর	শ্বাশুড়ী	পিতা	মাতা
রামযাদব তর্কসিদ্ধান্ত									
(খাগড়া)									
রামগোপাল তর্কালঙ্কার									
কালীকান্ত বিদ্যারত্ন									
শ্রীরাম শিরোমণি	ঃ	স্বামী	গুরু	দেবতা	গুরুপত্নী	শ্বশুর	শ্বাশুড়ী	পিতা	মাতা
শ্যামাচরণ বিদ্যানিধি									
(মুর্শিদাবাদ, সৈদাবাদ,									
কাদাই)									
দুর্গাপ্রসন্ন শর্মা	ঃ	গুরু	দেবতা	গুরুপত্নী	পতি	পিতা	মাতা	শ্বশুর	শ্বাশুড়ী
(বিল্বপুষ্করিণী)									
অর্ধচন্দ্র বিদ্যারত্ন	ঃ	গুরু	দেবতা	পতি	শ্বশুর	শ্বাশুড়ী	মাতা	পিতা	গুরুপত্নী
(সমুদ্রগড়)									
অন্নদাপ্রসাদ তর্করত্ন	ঃ	পতি	দেবতা	গুরু	গুরুপত্নী	শ্বশুর	শ্বাশুড়ী	মাতা	পিতা
(সমুদ্রগড়)									
হরিশচন্দ্র ন্যায়রত্ন									
গোলকনাথ শিরোমণি	ঃ	পতি	গুরু	দেবতা	মাতা	গুরুপত্নী	শ্বশুর	শ্বাশুড়ী	পিতা
কালীচন্দ্র শর্মা									
(সৈদাবাদ)									
দুর্গাদাস ন্যায়রত্ন	ঃ	গুরু	গুরুপত্নী	দেবতা	পতি	শ্বশুর	শ্বাশুড়ী	পিতা	মাতা
(পূর্বস্থলী)									
কৃষ্ণনাথ ন্যায় পঞ্চানন	ঃ	গুরু	গুরুপত্নী	দেবতা	পতি	শ্বশুর	শ্বাশুড়ী	পিতা	মাতা
দণ্ডীর সভাপণ্ডিতগণ									

রামধন বিদ্যালঙ্কার ঃ দেবতা গুরু গুরুপত্নী স্বামী শ্বশুর শ্বাশুড়ী মাতা পিতা

শম্ভুচন্দ্র ভট্টাচার্য

তারাপ্রসন্ন তর্করত্ন

ক্ষুদিরাম ন্যায়ভূষণ

গঙ্গাধর বিদ্যারত্ন

নীলকমল ভট্টাচার্য

দিনাজপুরের মহারাণী

শ্যামামোহিনীর সভাপণ্ডিতগণ

হরমাথ চূড়ামণি ঃ দেবতা গুরু গুরুপত্নী পিতা মাতা শ্বশুর শ্বাশুড়ী পতি

যদুনাথ ন্যায়রত্ন ঃ (এঁরা সকলেই বলেছেন দেবতাকে প্রণামের পর একযোগে সকলকেই প্রণাম
(দিনাজপুর) করা কর্তব্য। পৃথকভাবে করলে উল্লিখিত ক্রমানুসারে)

বৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য

গঙ্গানারায়ণ ভট্টাচার্য ঃ দেবতা গুরু গুরুপত্নী পতি শ্বশুর শ্বাশুড়ী পিতা মাতা
(দিনাজপুর)

শশিভূষণ স্মৃতিরত্ন ঃ পতি গুরু গুরুপত্নী দেবতা মাতা পিতা শ্বশুর শ্বাশুড়ী
(নড়াইল)

লক্ষ্মীকান্ত শর্মা ঃ পতি গুরু দেবতা গুরুপত্নী শ্বশুর শ্বাশুড়ী পিতা মাতা
(বহিরর্গাছী)

দুর্গাদাস ন্যায়রত্ন ঃ গুরু গুরুপত্নী দেবতা স্বামী শ্বশুর শ্বাশুড়ী মাতা পিতা
(অম্বিকা)

ভবনাথ তর্কালঙ্কার ঃ দেবতা গুরু গুরুপত্নী স্বামী শ্বশুর শ্বাশুড়ী পিতা মাতা
(অম্বিকা)

কান্তিচন্দ্র তর্কবাচস্পতি ঃ দেবতা গুরু গুরুপত্নী স্বামী শ্বশুর শ্বাশুড়ী পিতা মাতা
(অম্বিকা)

হরিশ্চন্দ্র বিদ্যালঙ্কার ঃ ঐ
(অম্বিকা)

বিশ্বম্ভর ন্যায়বাগীশ ঃ ঐ
(অম্বিকা)

শিবনাথ বিদ্যাবাচস্পতি ঃ দেবতা পরে সকলে এককালীন প্রণম্য, পৃথকভাবে নয়।
(নবদ্বীপ)

মধুসূদন ন্যায়রত্ন ঃ পতি গুরু দেবতা শ্বশুর শ্বাশুড়ী মাতা পিতা গুরুপত্নী
(নবদ্বীপ)

হরমোহন চূড়ামণি ঃ ঐ
(নবদ্বীপ)

লক্ষ্মী মিশ্র পাঠাজী (কাশীধাম)	ঃ	দেবতা (ইনি লিখেছেন, পশ্চিমদেশীয় স্ত্রীজাতি পিতা-মাতাকে প্রণাম করে না এবং সকলের সামনে লজ্জাবশত স্বামীকে প্রণাম করতে পারে না। তবে দেবতাকে প্রণাম করার পর মনে মনে স্বামীকে প্রমাম করা কর্তব্য।)
জগন্নাথধামের ৬ জন পণ্ডিতের উত্তর	ঃ	দেবতা গুরু গুরুপত্নী পিতা মাতা শ্বশুর শ্বাশুড়ী (এঁদের মতে স্ত্রীজাতি উল্লিখিত ব্যক্তিগণের সমক্ষে আসতে পারে না। তাহলে কেমন করে প্রণাম করবে?)
হরিশচন্দ্র পণ্ডিত	ঃ	(এঁর উত্তর, প্রথমে সকলকে এককালীন প্রণামের পর সকলকে পৃথকভাবে প্রণাম করবে। কিন্তু সেক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমটি ইনি উল্লেখ করেন নি।)
শিবচরণপ্রসাদ পণ্ডিত (দিল্লী)	ঃ	দেবতা পিতা মাতা গুরু গুরুপত্নী শ্বশুর শ্বাশুড়ী পতি
ক্ষেত্রপাল স্মৃতিরত্ন (কলকাতা)	ঃ	দেবতা গুরু গুরুপত্নী স্বামী শ্বশুর শ্বাশুড়ী মাতা পিতা

উল্লিখিত উত্তরসমূহ বিচার করে মহারাজাধিরাজ মহতাবচন্দ বাহাদুর তাঁর নিজস্ব মন্তব্য পেশ করেছেন। তাঁর রায়ের পেছনে যুক্তি দেখানো হয়েছে।

মহতাব্‌চন্দ্‌ বাহাদুরের মতে প্রথম প্রণম্য দেবতা। কারণ দেবতা সকল গুরুজনেরই প্রণম্য। শাস্ত্রে স্বামী ও গুরুকে দেবতুল্য বলে নির্দেশ করা হয়েছে। সুতরাং এতে দেবতার সর্বশ্রেষ্ঠত্বই প্রতিপাদিত হচ্ছে। তাছাড়া মানবমনের স্বাভাবিক প্রবণতাই হচ্ছে মানুষ অপেক্ষা দেবতায় ভক্ত্যাধিক্য। অতএব দেবতাই প্রথম প্রণম্য।

দ্বিতীয় প্রণম্য স্বামী। যদিও কোনো কোনো শাস্ত্রে আছে স্ত্রী জাতির কাছে দেবতার চেয়ে বড় স্বামী, তথাপি দেবতার চেয়ে মানুষ কখনই শ্রেষ্ঠতর হতে পারে না বলে মনে হয়।

তৃতীয় প্রণম্য গুরু। দেবতার পদ গুরু কর্তৃক প্রদর্শিত হয় বলেই গুরু শ্রেষ্ঠ। সুতরাং দেবতার আগে গুরুকে প্রণাম করা সঙ্গত বলে মনে করা যায় না।

চতুর্থ প্রণম্য শ্বশুর। কারণ বিয়ের পর স্ত্রীজাতি গোত্র্যন্তরিত হয়ে পতিগোত্রে গমন করে এবং স্বামীর অর্ধাঙ্গিনী হিসাবে স্বামীর প্রণম্য ব্যক্তিই স্ত্রীরও প্রণম্য। সেজন্য পিতামাতার আগে শ্বশুরকে প্রণাম করা কর্তব্য।

পঞ্চমত শ্বশুরের পরে প্রণম্যা শ্বাশুড়ী।

ষষ্ঠত পিতা। মাতার আগে পিতা, কারণ পিতা মাতারও পরম গুরু। শ্রী রামচন্দ্র মাতার নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করে পিতৃ-আদেশে বনবাসে গিয়েছিলেন। পরশুরাম পিতার আদেশে মাতার মস্তক ছেদন করেন। আবার বলরাম শ্রীকৃষ্ণ একত্রস্থিত বসুদেব ও দেবকীর মধ্যে প্রথমে প্রণাম করেন বসুদেবকে। সুতরাং শাস্ত্রের দৃষ্টান্তও উক্ত অভিমতকে সমর্থন করছে।

সপ্তমত মাতা। শেষত প্রণম্যা গুরুপত্নী। কোনো কোনো পণ্ডিত অবশ্য গুরুর আগেই গুরুপত্নীকে প্রণামের কথা বলেছেন। কিন্তু শাস্ত্রে আছে গুরুপত্নীও গুরুর মতোই মাননীয়া। অর্থাৎ এতে গুরুর শ্রেষ্ঠত্বই প্রতিপন্ন হচ্ছে।

পিতামাতাকে গুরুপত্নীর আগেই প্রণাম করা কর্তব্য, কেননা গুরুপত্নী হচ্ছেন গুরুর তুল্য, কিন্তু পিতামাতা সাক্ষাৎ দেবতাস্বরূপ।

উক্ত মন্তব্যের শেষাংশে মহতাবচন্দ লিখছেন, উল্লিখিত বিচার কেবলমাত্র বাংলাদেশের স্ত্রীজাতির উপর প্রযোজ্য, পশ্চিমদেশীয় স্ত্রীজাতির পক্ষে নয়। কেননা পশ্চিমদেশীয়া মহিলাদের মধ্যে পিতামাতাকে প্রণাম করার প্রথা নেই। উক্ত দেশীয়গণ লক্ষ্মীস্বরূপাকন্যার প্রণাম গ্রহণ করেন না।

পশ্চিমা ক্ষত্রিয় ও সারস্বত ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় গুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করেন না। সামাজিক নানা ব্যাপারে বাঙালীদের সঙ্গে পশ্চিমদেশীয়দের প্রথাগত পার্থক্য আছে। তবে যদি কখনো তাদের মধ্যে প্রশ্নে-লিখিত পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে, তবে একই প্রণাম-বিধি অনুসরণীয়।

উত্তরমালার উপর দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাবে মহ্‌তাব্‌চন্দ নিজের রাজসভা-পণ্ডিতদের অভিমতও পুরোপুরি মেনে নেন নি।

প্রশ্নোত্তরমালা প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় প্রশ্নটি প্রায় একই পরিস্থিতিতে পুরুষজাতির কর্তব্য নির্ধারণ বিষয়ে। এখানে প্রথম প্রশ্নের শ্বশুর-শ্বাশুড়ী অবশ্য অনুপস্থিত।

দ্বিতীয় প্রশ্নে পণ্ডিতমণ্ডলীর উত্তরসমষ্টি নিম্নরূপ ঃ

১।	দেবতা	৩১	গুরু	২৪						
২।	দেবতা	১৫	গুরু	২৮	পিতা	১	মাতা	১	গুরুপত্নী	৯
৩।	দেবতা	৯	পিতা	২	মাতা	৭	গুরুপত্নী	৩৬		
৪।	গুরু	২	পিতা	৩৬	মাতা	১৩	গুরুপত্নী	৩		
৫।	পিতা	১৫	মাতা	৩৩	গুরুপত্নী	৬				

উক্ত প্রশ্নে মহতাবচন্দ বাহাদুরের নিজের উত্তর হল, পুরুষ প্রণাম করবে যথাক্রমে ঃ দেবতা, পিতা, মাতা, গুরু ও গুরুপত্নীকে। যুক্তি প্রথম উত্তরের অনুরূপ।

প্রথম খণ্ডের আর একটি প্রশ্ন ঃ পঞ্চ পিতার (জনক, উপনেতা, বিদ্যাদাতা, অন্নদাতা, ভয়ত্রাতা) মধ্যে যদি সকলেই প্রণম্য হন, তবে সর্বাগ্রে কে এবং পরে পরেই বা কারা? শ্বশুর, শ্বাশুড়ী, জ্যাঠাইমা, খুড়া, খুড়ীমা, পিসেমশায়, পিসীমা, মামা, মামীমা, মেসোমশায়, মাসীমা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রী যদি বয়সে ছোট হন, তবে তাঁদের পা ছুঁয়ে প্রণাম করা চলে কিনা? স্বামীর ছোট বোন বয়সে বড়ো হলে স্ত্রী জাতি তাঁকে কিভাবে সম্মান করবেন? জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার

স্ত্রী বয়সে ছোট হলে তাঁকে কীভাবে সম্মান জানাতে হবে?

এই প্রশ্নটি একটু ভিন্ন ঃ 'শিক্ষাগুরু নীচজাতীয় হইলে তাঁহাকে প্রণাম করিতে পারা যায় কি না? এই প্রশ্নে পণ্ডিতদের সকলেরই উত্তর এক ঃ 'প্রণম্য নহেন, কিন্তু সম্মাননীয়।' মহতাবচন্দের উত্তর — প্রণম্য না হলেও অভ্যুত্থানাদিরূপ সম্মান অর্থাৎ উঠে দাঁড়িয়ে সম্মান জ্ঞাপন করতে হবে এবং জাতিবিশেষকে (অর্থাৎ মুসলিম শিক্ষাগুরুকে) সেলামাদি করা কর্তব্য।

অপর এক প্রশ্নে আছে, নাড়ী ছেদনকারিণী ধাত্রীমাতা ও শৈশবে স্তন্যদানকারিণী পালিকা মাতার মধ্যে কে অধিক মান্যা? এঁরা উভয়েই নীচজাতীয়া হলে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদির প্রণম্যা কিনা?

এই প্রশ্নেও প্রায় সকলেরই ঐকমত্য ঘটেছে—'প্রণম্য নহেন, কিন্তু মাননীয়া।' কয়েকজন দূর থেকে অভিবাদন করার কথা বলেছেন। মহারাজ বাহাদুরও প্রায় অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করেছেন।

আর এক প্রশ্ন ঃ যদি কোনো ব্যক্তি নীচকুলে অথবা বর্ণসঙ্কর কুলে নিজ কন্যার বিবাহ দেয়, তবে তার জাতিনাশে তার অন্যান্য পুত্রের জাতিনাশ হয় কিনা এবং তার মৃত্যুতে ঐ পুত্রদের অশৌচ হবে কি না?

এই সব প্রশ্নে হ্যাঁ-না দুরকম উত্তরই পাওয়া গেছে। তবে 'হ্যাঁ'-য়ের সংখ্যাই বেশী।

এই প্রশ্নটির বিষয় ধূমপান। এই প্রশ্নে আছে, গুড় প্রভৃতি দ্রব্য দ্বারা প্রস্তুত তামাক এবং গুড় বর্জিত চুরুটের ধূমপান, এ দুয়ের মধ্যে কোন্‌টি দোষাবহ, কোন্‌টি অদূষণীয়? অথবা উভয়ই দূষ্য?

এই প্রশ্নে সবচেয়ে সুন্দর উত্তর দিয়েছেন ভাটপাড়ার শ্রীরাম শিরোমণি মহাশয়। তাঁর মতে শিষ্টজনের পক্ষে উভয়বিধ ধূমপানই দূষণীয়।

ব্রজকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয় লিখেছেন, তাম্রকূট ধূমপান অধিকতর দূষণীয়। এই দলের ব্যতিক্রম নবদ্বীপের মধুসূদন ন্যায়রত্ন এবং হরমোহন চূড়ামণি। এঁরা বলেছেন, উক্ত দুই প্রকারের মধ্যে কোনো প্রকার ধূমপানই দূষণীয় নয়, কারণ ধূমপান দন্তরোগনাশক এবং মন্ত্রসিদ্ধির কারণ।

মহারাজের মন্তব্য ঃ গুর দ্বারা প্রস্তুত তামাক দূষণীয়, কিন্তু চুরুট যদি গোধূমচূর্ণাদির লেই না দিয়ে বৃক্ষাদির নির্যাস দ্বারা প্রস্তুত হয়, তবে তার ধূমপানে কোন দোষ দেখতে পাওয়া যায় না। লক্ষ্য করার বিষয়, ধূমপানের স্বাস্থ্যঘটিত ক্ষতির বিজ্ঞানসম্মত কারণটি কেউ খতিয়ে দেখেন নি।

প্রশ্নোত্তরমালা (দ্বিতীয় খণ্ড) ঃ

মহারাজের মহাপ্রয়াণ ঘটলে বিধবা রাজমহিষী নারায়ণ কুমারী দেবীর আদেশে বাকী অংশ মুদ্রিত হয়ে অগ্রহায়ণ মাসে বইটি প্রকাশ লাভ করে। আখ্যাপত্রের প্রতিলিপি দেওয়া হল ঃ

"প্রশ্নোত্তরমালা / দ্বিতীয় ভাগ / বর্দ্ধমানাদি মহামহীশ্বর হিজ্‌হাইনেস্ স্বর্গীয় মহারাজাধিরাজ / মহ্‌তাবচন্দ্ বাহাদুরের আদেশানুসারে / প্রকাশিত/ বর্দ্ধমান অধিরাজ যন্ত্রে শ্রী পুরুষোত্তমদেব চট্টরাজ দ্বারা / মুদ্রিত ও প্রচারিত / শকাব্দা ঃ ১৮০১।"

প্রশ্নোত্তরমালা দ্বিতীয় ভাগে আছে ৪১টি প্রশ্ন। বইটির দ্বিতীয় ভাগটিও প্রথমভাগের অনুরূপ পদ্ধতিতেই ছাপা। এখানে উত্তরদাতা পণ্ডিতের সংখ্যা ৪৪। অনেকে সংস্কৃতভাষাতেও উত্তর দিয়েছেন।

দ্বিতীয় ভাগের প্রশ্নগুলি, বিশেষত ঈশ্বরবিষয়ক প্রশ্নগুলি ব্রাহ্ম দৃষ্টিকোণ থেকে নিক্ষিপ্ত এবং প্রশ্নগুলির দুঃসাহসিক প্রত্যক্ষতাগুণ সবিশেষ গুরুত্ব দাবী করে। এখানে সামাজিক আচার-আচরণঘটিত প্রশ্ন নেই বললেই হয়, মুখ্য স্থান লাভ করেছে ঈশ্বরজিজ্ঞাসা। তাছাড়া পরলোক, মোক্ষ, উপাসনাপদ্ধতি বিষয়ক প্রশ্নও কিছু আছে। আছে পৃথিবী, আকাশ, বায়ু প্রভৃতির সৃষ্টিরহস্য সম্পর্কিত প্রশ্ন। সর্বোপরি প্রকৃতিবিজ্ঞান, প্রেততত্ত্ব, জন্মান্তরবাদ, বিবর্তনবাদ ইত্যাদি বিচিত্র বিষয়ে মহতাবচন্দের দুরন্ত অনুসন্ধিৎসার পরিচয় এখানে প্রকাশ পেয়েছে।

কিছু প্রশ্নোত্তর এখানে আলোচিত হল। প্রথম প্রশ্নটি ছিল এই ঃ "পরমেশ্বর স্তুতি বা নিন্দাতে তুষ্ট কিংবা রুষ্ট হন কি না?"

এই প্রশ্নের উত্তরদাতা পণ্ডিতদের নাম, ধাম, প্রদত্ত উত্তরের ভাষা ও সংক্ষিপ্ত উত্তর নাচে তালকাকারে প্রকাশ করা হল ঃ

উত্তরদাতা পণ্ডিতের নাম	নিবাস	উত্তরের ভাষা	উত্তর
১। রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন	বহরমপুর, খাগড়া	বাংলা	তুষ্ট / রুষ্ট হন না।
২। কাশীচন্দ্র তত্ত্ববাগীশ ভট্টাচার্য	শালিখাগ্রাম, পাবনা জেলা	ঐ	হন। তুষ্ট হলে শুভ ফল, অন্যথায় অশুভ ফল দান করেন।
৩। ঈশ্বরচন্দ্র ন্যায়রত্ন	মালিয়াপাড়া রাজবাটী	সংস্কৃত	ঐ
৪। রাখাল দাস অধিকারী	চন্দননগর	বাংলা	হন না। কারণ কোনো বাক্যই তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না।

৫।	নৃসিংহ তর্কপঞ্চানন	মালিয়াপাড়া রাজসভা পণ্ডিত	সংস্কৃত	হন না। তবে আত্মোৎকর্ষ বিধানের জন্য নিন্দা না করাই কর্তব্য।
৬।	গোপালচন্দ্র ন্যায়বাগীশ	শালিখা	বাংলা	এও হয়, ওও হয় গোছের অস্পষ্ট উত্তর।
৭।	শ্রীনাথ দেব	পাড়াতল	সংস্কৃত	তুষ্ট / রুষ্ট হন।
৮।	দুর্গাদাস	অম্বিকা-কালনা	ঐ	হন না। কারণ তিনি গুণাতীত।
৯।	হরনাথ চূড়ামণি	দিনাজপুর	ঐ	ঐ
১০।	কিশোরীমোহন শর্মা	দিনাজপুর নিত্যধর্মবোধিনী সভার পণ্ডিত	ঐ	ঐ
১১।	পূর্ণানন্দ গঙ্গাধর	গুপ্তিপাড়া আশ্রম,	ঐ	ঐ
১২।	রামতনু তর্কসিদ্ধান্ত	বর্ধমান	বাংলা	হন না। তবে স্তব করলে সত্ত্বগুণের এবং নিন্দায় তমোগুণের উদ্রেক হয়।
১৩।	চন্দ্রশেখর বসু	ভবানীপুর কলকাতা	বাংলা	হন না।
১৪।	দুর্গাদাস বিদ্যারত্ন	বিল্বপুষ্করিণী	সংস্কৃত	ঐ
১৫।	তারকনাথ তত্ত্বরত্ন	বর্ধমান রাজসভাপণ্ডিত	ঐ	ঐ
১৬।	অঘোরনাথ তত্ত্বনিধি	ঐ	বাংলা	ঐ
১৭।	শ্রীকান্ত তর্কভূষণ	আমাদপুব	সংস্কৃত	ঐ
১৮।	মাধবচন্দ্র তর্কভূষণ	সোনামুখী বাঁকুড়া জেলা	ঐ	ঐ
১৯।	হরচন্দ্র তর্কভূষণ	পাত্রসায়ের বাঁকুড়া জেলা	ঐ	তুষ্ট / রুষ্ট হন।
২০।	দেবপ্রতিপালক সাধু	বর্ধমাননিবাসী	বাংলা	হন না।
২১।	বিহারিলাল সাধু	অম্বিকা-কালনা	ঐ	হন না। তবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য স্তব করা উচিত। এতে সুখলাভের সম্ভাবনা।

২২।	রাধানাথ শর্মা	বড়শুল বর্ধমান জেলা	ঐ	হন না। তবে স্তবে সুকৃতি লাভের সম্ভাবনা।
২৩।	ব্রজকুমার বিদ্যারত্ন	বর্ধমান রাজসভা	ঐ	ঐ
২৪।	রুক্মিণীকান্ত দেবশর্মা	বাঁকিটোন	সংস্কৃত	হন। দৃষ্টান্ত প্রহ্লাদ ও শিশুপাল।
২৫।	মধুসূদন ভট্টাচার্য তর্কপঞ্চানন	বহির্গাছি নদীয়া	ঐ	হন না। তবে স্তবে সুকৃতি, নিন্দায় দুষ্কৃতি। অতএব নিন্দা না করাই কর্তব্য।
২৬।	শ্রীনাথ তর্করত্ন	জাড়া, মেদিনীপুর	ঐ	হন, আবার হন না— দুদিক রাখা উত্তর।
২৭।	প্রিয়নাথ বিদ্যারত্ন	হেগোলকুড়িয়া, কলকাতা	ঐ	ঐ
২৮।	বৈকুণ্ঠনাথ ন্যায়রত্ন	কালেশ্বর	ঐ	সাকার পক্ষে হন, নিরাকার পক্ষে হন না।
২৯।	যদুনাথ ন্যায়রত্ন	দিনাজপুর	বাংলা	হন।
৩০।	আনন্দচন্দ্র চূড়ামণি	নাড়াজোল রাজবাটী	ঐ	হন না। তবে উপাসকের নিজ কল্যাণের জন্য নিন্দা না করাই কর্তব্য।
৩১।	বেণীমাধব ন্যায়রত্ন	তেলিবেড়িয়া	বাংলা	হন না। দেশের রাজার দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেছেন, ঈশ্বর প্রশংসায় তুষ্ট হলে অন্যায়কারীও স্তবের দ্বারা স্নেহই পাবে। ফলে পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে।
৩২।	ধর্মদাস বিদ্যারত্ন	নড়ড়া	সংস্কৃত	হন। যেমন ইন্দ্রের স্তবে তুষ্ট হয়ে বৃত্রবধে সাহায্য, আবার শিশু-পালের নিন্দায় ক্রুদ্ধ।
৩৩।	ইন্দ্রনাথ [illegible] তর্কচূড়ামণি	পড়ীশাগ্রাম	বাংলা	হন না।
৩৪।	চণ্ডীচরণ তর্করত্ন	গরাণহাটা	সংস্কৃত	হন না। তবে সগুণ উপাসনায়

		কলকাতা		স্তবে তুষ্ট হন।
৩৫।	রামচরণ তর্কালঙ্কার	বিষ্ণুপুর	বাংলা	হন না। তবে ভক্তি সহকারে স্তব করলে উপাসক পরকালে পরমপদ প্রাপ্ত হন।
৩৬।	ভজহরি শিরোমণি	মহেশপুর রাজসভাপণ্ডিত	বাংলা	হন না।
৩৭।	অন্নদাপ্রসাদ তর্করত্ন	সমুদ্রগড়	ঐ	হন।
৩৮।	উমেশচন্দ্র শর্মা	ভাটপাড়া	সংস্কৃত	ঐ। দৃষ্টান্ত ব্রহ্ম-পুরাণ, ৫৩ অধ্যায়, শিশুপালের কাহিনী।
৩৯।	হরদেব ভট্টাচার্য	কাঁচরাপাড়া	বাংলা	হন না।
৪০।	রুক্মিণীকান্ত সার্বভৌম	বিষ্ণুপুর তিলাবনি	সংস্কৃত	ঐ
৪১।	ব্রজকুমার মৈত্রেয়	মালদহ	বাংলা	ঐ
৪২।	বৈদ্যনাথ সার্বভৌম	কালীঘাট কলকাতা	ঐ	হন।
৪৩।	শ্রীবল্লভ	ভট্টপল্লী নিবাসী	সংস্কৃত	হন, আবার হন না, উভয় মতের পক্ষেই শাস্ত্রপ্রমাণ উদ্ধৃত করে শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত করেছেন, স্তবে তুষ্ট এবং নিন্দায় রুষ্ট হন।
৪৪।	শশিভূষণ দেবশর্মা	ছত্রকানালি	ঐ	হন না। তবে আত্মোৎকর্ষ লাভের জন্য স্তব করা উচিত।

মহতাবচন্দের উত্তর ঃ নির্গুণ নিরাকার পরমেশ্বর কিছুতেই তুষ্ট বা রুষ্ট হন না।

এখানে দেখা যাচ্ছে যাঁরা লিখেছেন পরমেশ্বর স্তবে তুষ্ট বা নিন্দায় রুষ্ট হন না,--তাঁদের প্রায় সকলেরই যুক্তি এই যে, সন্তোষ-অসন্তোষ দেহের ধর্ম, ঈশ্বর দেহাতীত, নির্গুণ, নিরাকার। সুতরাং তাতে তুষ্টি বা রুষ্টি কি করে সম্ভব?

এঁদের অধিকাংশই সেই সঙ্গে একটি লেজুড় যোগ করে এই অভিমতও প্রকাশ করেছেন যে, স্তবের দ্বারা ঈশ্বরের তুষ্টি না ঘটলেও স্তবকারীর আত্মোৎকর্ষ ঘটে এবং সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি পায়। নিন্দা করলে তমোগুণ ক্রমশ প্রবল হয়ে ওঠে। সুতরাং ঈশ্বরের নিন্দা না করাই বাঞ্ছনীয়।

উত্তরগুলি থেকে প্রতীয়মান, প্রথম প্রশ্নের নেতিবাচক উত্তরদাতাদের মধ্যে তেলিবেড়িয়া নিবাসী বেণীমাধব ন্যায়রত্ন ও মহেশপুর রাজসভাপণ্ডিত ভজহরি শিরোমণির

উত্তর খুবই সুস্পষ্ট ও নির্দ্বিধ। এঁরা দুজন লিখেছেন, ঈশ্বর যদি স্তবে সন্তুষ্ট এবং নিন্দায় রুষ্ট হতেন, তাহলে পাপী-তাপীরাও স্তবের দ্বারা পার পেয়ে যেতো। অর্থাৎ কেউই পাপকর্মে ভয় পেত না। এতে বিশ্বব্যাপী বিশৃঙ্খলা দেখা দিত। এতেই প্রমাণ হয় যে তিনি তুষ্টি-রুষ্টির ঊর্ধ্বে।

যে তিনজন সুস্পষ্ট উত্তরটি এড়িয়ে গিয়ে এও হয়, ওও হয় গোছের উত্তর দিয়েছেন, তাঁরা হলেন শালিখানিবাসী গোপালচন্দ্র ন্যায়বাগীশ, কালেশ্বরের বৈকুণ্ঠনাথ ন্যায়রত্ন ও গরাণহাটার চণ্ডীচরণ তর্করত্ন। শেষোক্ত দুজনের উত্তর হচ্ছে এই যে, সাকার উপাসনার ক্ষেত্রে ঈশ্বর স্তবে তুষ্ট ও নিন্দায় রুষ্ট হন, কিন্তু নিরাকারপক্ষে নয়।

যে-বারোজন উত্তরদাতা লিখছেন, পরমেশ্বর স্তবে তুষ্ট ও নিন্দায় রুষ্ট হন, তাঁরা অধিকাংশই ইন্দ্র, প্রহ্লাদ ও শিশুপালের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। এই দলের সংক্ষিপ্ততম উত্তর লেখক কালীঘাটের বৈদ্যনাথ সার্বভৌম। ইনি কোনোরকম শাস্ত্র-প্রমাণ বা দৃষ্টান্তের তোয়াক্কা না করে এক বাক্যে চাঁচাছোলা উত্তর দিয়েছেন ঃ "পরমেশ্বর স্তবেতে তুষ্ট হন নিন্দাতে রুষ্ট হন।"

অপর পক্ষে কেউ লিখেছেন ইষ্ট সিদ্ধি হয়। কেউ লেখেছেন মোক্ষলাভ হয়। কেউ লিখেছেন চিত্তশুদ্ধিরূপ ফল হয়। আবার কেউ কেউ লিখেছেন স্তব উপাসনার অঙ্গ। কাজেই স্তব দ্বারা উপাসনা করলে অভিলষিত ফললাভ হয়।

আলোচ্য প্রশ্নটি দ্বারা মহারাজ হয়ত সুকৌশলে প্রথম প্রশ্নের উত্তরদাতাদের পরীক্ষা করেছেন। কেননা এখানে প্রথম প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে স্ববিরোধিতার সম্ভাবনা ছিল।

আলোচ্য চতুর্থ প্রশ্নে বর্ধমাননিবাসী দেবপ্রতিপালক সাধুর উত্তরটি উল্লেখযোগ্য। ইনি নির্দ্বিধায় বলেছেন, পরমেশ্বরের স্তব নেই। স্তব শব্দের অর্থ অধিক গুণারোপ। কিন্তু পরমেশ্বরের কোনো গুণ নেই। তন্ত্র গ্রন্থাদিতে স্তব বলে যা লেখা আছে, তাকে স্তব বলা যায় না। শ্রোতার প্রবৃত্তির নিমিত্ত শুদ্ধ, বুদ্ধ, নিরঞ্জন, সর্বব্যাপী ইত্যাকার শব্দে তাঁর স্বরূপ প্রকাশ করা হয়েছে মাত্র।

৫ নং প্রশ্ন ঃ "পরমেশ্বরের নানাবিধ নামকরণ কি প্রকারে কে করিয়াছে?" কী প্রকারে'—এই প্রশ্নাংশটুকু দিব্যি এড়িয়ে গিয়ে একদল লিখেছেন, ভক্ত সাধকগণ স্ব স্ব রুচি অনুসারে ঈশ্বরের নানাবিধ নামকরণ করেছেন।

কয়েকটি প্রশ্নে সৃষ্টির আদিকাল থেকে সাধারণ মানুষের চিরন্তন ও দুর্জ্ঞেয় জিজ্ঞাসার প্রতিফলন ঘটেছে।

মহতাবচন্দ বাহাদুরের উত্তর ঃ "ঈশ্বর অশরীরী, অভিপ্রেত হইতে পারে না।"

প্রশ্নোত্তরমালার দ্বিতীয় ভাগের একটি মার্কসীয় দর্শণের বীজমন্ত্র তথা সর্বদেশিক সর্বকালিক মানব সাধারণের একটি শাশ্বত জিজ্ঞাসার প্রতিরূপ দেখা যায়। এই প্রশ্নে আছে ঃ মানুষের মধ্যে কেউ ধনী, কেউ নির্ধন, কেউ সুখী, কেউ দুঃখী। এর কারণ কী?

বর্তমান বিশ্বে ধনবৈষম্যহেতু উদ্ভূত অগ্নিগর্ভ রাজনৈতিক তথা সামাজিক সমস্যার প্রেক্ষিতে আলোচ্য প্রশ্নটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং শত বর্ষাকাল পূর্বে প্রশ্নরচয়িতা যে এই সমস্যা সম্পর্কে বিলক্ষণ সচেতন ছিলেন, প্রশ্নটি তারও পরিচয় দেয়।

প্রশ্নটির একটি মাত্র উত্তর পাওয়া গেছে এবং তা হল ব্যক্তির নিজ নিজ কর্মফলই এজন্য দায়ী। ধর্মশাস্ত্রযাজী সংস্কৃত পণ্ডিতগণের কাছ থেকে হয়ত এর চেয়ে প্রগতিশীল উত্তর আশা করা চলে না।

মহ্‌তাব্‌চন্দ বাহাদুর এখানে শাস্ত্রবাক্য নস্যাৎ করে বলেছেন ঈশ্বর্য্য-দারিদ্র্য কখনো অদৃষ্টের বিধান বলে স্বীকার করা যেতে পারে না। উদাহরণ দিয়ে লিখেছেন, বর্ষণকালে সদসৎ সকল বস্তুতেই সমান বর্ষণ হয়ে থাকে, আবার এক খণ্ড পাথর থেকে কিয়দংশে দেবতা, কিয়দংশে পাত্র নির্মিত হয়। এই সব ক্ষেত্রে যেমন অদৃষ্টের কথা স্বীকার করা যায় না, সেইরকম ধনী-দরিদ্রের ক্ষেত্রে তা কীভাবে স্বীকার করা যেতে পারে?

মহতাবচন্দ বাহাদুর স্পষ্ট করে না বললেও বোঝা যাচ্ছে, ধনবৈষম্য যে সুবিধাভোগী কিছু মানুষের নিজ স্বার্থে সৃষ্ট, সেই দিকেই তিনি অঙ্গুলি নির্দেশ করে গেছেন।

বিদ্যোৎসাহী ঃ—

মহারাজ মহ্‌তাব্‌চাঁদ বিদ্যোৎসাহী, গুণগ্রাহী ছিলেন তাই নয়, তিনি নিজেও গীতিকার ও পদকর্তা ছিলেন। প্রণয়সঙ্গীত, ভক্তিগীতি, বৈষ্ণব পদাবলী প্রভৃতি বহু সঙ্গীত তিনি রচনা করেছেন। এই তথ্যগুলি যাঁর গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত হয়েছে, শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁর নাম উল্লেখ করছি। তিনি হলেন, ডঃ আবদুস সামাদ প্রণীত গ্রন্থ 'বর্ধমান রাজসভাশ্রিত বাংলা সাহিত্য'।

কী সংখ্যাগত, কী গুণগত উভয় দিক থেকেই উনিশ শতকের অধ্যাত্মসঙ্গীত ও প্রণয়সঙ্গীত রচয়িতাদের তালিকায় মহতাবচন্দ মহতাব একটি বিশিষ্ট নাম। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে মুদ্রিত প্রায় সমস্ত সঙ্গীত-সংকলনগ্রন্থে মহতাব চন্দের পদ যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে উদ্ধৃত হয়েছে। হিন্দী ও উর্দু ভাষাতেও তাঁর নামে কয়েকটি চমৎকার সঙ্গীত প্রচলিত আছে।

মহতাবচন্দ বাহাদুরের এ পর্যন্ত প্রাপ্ত সঙ্গীতের সংখ্যা ঃ

সঙ্গীত সুধাকর	১ম ভাগ, ১৭৯৭ শকাব্দ (১৮৭৫ খ্রীঃ)	৯৪৫
ঐ	২য় ভাগ (সন ১২৮৭)	৪৫৬

ভক্তিগানামৃত (সন ১২৮৭)	৩৮২
'সঙ্গীত বিলাস' থেকে ভক্তিগানামৃতের শেষাংশে উদ্ধৃত	১৪
(কয়েকটি গান অসম্পূর্ণ অবস্থায় আছে)	———
	১৭৪৩

'ভক্তিগানামৃত' ও 'সঙ্গীত সুধাকর' (দ্বিতীয় ভাগ) এই দুখানি গ্রন্থের মুদ্রণ মহতাবচন্দের মৃত্যুর আগেই আরম্ভ হয়েছিল। তাঁর মৃত্যুর পরে মাস ছয়েকের ব্যবধানে বই দুইটি আফতাবচন্দ কর্তৃক প্রকাশিত হয়।

অঘোরনাথ তত্ত্বনিধি মহাশয় জানিয়ে গেছেন, মহতাবচন্দ রচিত এই সমস্ত গান রাজসভার গায়কগণ দ্বারা প্রত্যহ রাজসভায় গীত হত।

বিপুল সংখ্যক প্রণয়সঙ্গীত ছাড়াও মহতাবচন্দের নামে প্রায় সকল শ্রেণীর অধ্যাত্মসঙ্গীত প্রচলিত আছে। এখানে বিভিন্ন গ্রন্থে তাঁর নামে প্রচলিত গানের বিষয়ভিত্তিক গানের সংখ্যা নির্দেশ করা হল ঃ

সংগীত সুধাকর প্রথম ভাগে সংকলিত সব গানই (অর্থাৎ ৯৪৫টি) প্রণয় সঙ্গীত। দ্বিতীয় ভাগে ধৃত হয়েছে ৩৫৭ টি প্রণয়গীতি ও ৯৯ খানি হরিগান (কৃষ্ণ বিষয়ক)। ভক্তিগানামৃতে আছে ব্রহ্মসঙ্গীত ১১৫ খানি, শ্যামাসঙ্গীত ১০৪ খানি, ভবানী বিষয়ক ৯ খানি, দশমহাবিদ্যার গান ৬৩ খানি, গণেশবিষয়ক একটি, শিব বিষয়ক ১৩ টি ও কৃষ্ণবিষয়ক ২টি।

মহতাবচন্দের সঙ্গীতে 'চন্দ্র' —তাছাড়া তাঁর নামের মধ্যপদেও 'চন্দ্র', সেজন্যই এরূপ ভণিতা। এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, 'বিবিধ ধর্ম্মসঙ্গীত'-এ প্রতাপচাঁদের নামে সংকলিত পূর্বোদ্ধৃত 'আর কারে ডাকবো মাগো ছাওয়াল কেবল মাকে ডাকে' পদটি ঈষৎ পরিবর্তিতরূপে ভক্তিগানামৃতে মহতাবচন্দের নামে ধৃত হয়েছে।

মহতাবচন্দ শাক্ত সাধক নন, কিন্তু তাঁর মধ্যে ভক্তিপ্রাণতার গভীরতা ছিল। বিপুল ঐশ্বর্যের একচ্ছত্র অধিপতি হয়েও তিনি পরমার্থ চিন্তায় চিন্তিত থাকতেন। একটি শ্যামাসঙ্গীতে সেই ভক্তচিত্তের অধ্যাত্ম-ব্যাকুলতার পরিচয় পাওয়া যায় ঃ—

"বিপদে পড়েছি মা গো, এ বিপদ কর নাশ।
ঐশ্বর্য্য পাইয়াও মা, পেয়েছি যে মহাত্রাস।।
দিয়েছ রাজ্য বিস্তার, সময়ে মহা দুস্তার,
কেমনে পাব নিস্তার, তুমি বই নাহি আশ।"

অগাধ ঐশ্বর্যের মালিক হলেও ধনতৃষ্ণাকে কবি জয় করতে পারেন না: চুম্বক

যেমন লৌহকে, ঐশ্বর্যবাসনা তেমনি রাজচিত্তকে সর্বদা আকর্ষণ করছে। এই পরম সত্যভাষণে কবি কুণ্ঠিত নন ঃ—

"চুম্বক সমান ধন, লৌহ সম পর মন,
সদা করে আকর্ষণ, এমন ধন প্রয়াস।।"

ধনই ধনীর বৈরী হয়ে ওঠে। পদটির পরবর্তী অংশে মহারাজকবি এই সত্যটি প্রকাশ করেছেন। ধনীর ভাই নেই, বন্ধু নেই, ভিতরে ভিতরে সকলেই তার শত্রু ঃ—

"ধনীর কেহ বন্ধু নাই, ধনীর কোথা আছে ভাই,
ধনীর শত্রু সবাই, লোভে ধন করে নাশ।"

সেকালের এক সামন্তপ্রভু কবির এই উক্তি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

আলোচ্য পদটি আরও একটি কারণে উল্লেখযোগ্য। সমস্ত শাক্ত গীতিরচয়িতা শ্যামা-মার কাছে পরমার্থধন বা মুক্তিধন প্রার্থনা করেছেন। কিন্তু মহতাবচন্দের প্রার্থনা এখানে একান্তভাবে পার্থিব ঃ—

"তব নাম করি ধ্যান, বিপদে পেয়েছি ত্রাণ,
রাখ দুর্গে ধন মান, চন্দ্র করিছে আদ্দাস।।"

আবার প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির দ্বন্দ্বের অকৃত্রিম প্রকাশ কোথাও কোথাও লক্ষ্য করা যায়। যেমন ঃ "সেবিতে শ্যামাচরণ বাসনা যে সর্বক্ষণ, /ধন করে আকর্ষণ, সাধনা করে রহিত।" কিন্তু তিনি জানেন, 'ধনের এরূপ শক্তি নাশ করে দৃঢ় ভক্তি' বা 'বিষয়ের লালসায় সাধন সময় যায়।' তাই রাজ্যভারক্লিষ্ট মহারাজ মুমুক্ষু সাধকচিত্তের পরিচয় দিয়ে বলেছেন ঃ

"দিয়াছ মা রাজ্যভার, ধন জন পরিবার,
এ সবে কিসে নিস্তার, গৃহী অসাধ্য সাধন।
বিষয়ে হইয়ে লিপ্ত, ধন আশে থাকি তৃপ্ত
ভজন সাধন লুপ্ত আশা নহে নিবারণ।"

কবি এই ধনলিপ্সা থেকে মুক্তির জন্য শ্যামামার কাছে ঐকান্তিক আকূতি জানিয়ে বলেছেন ঃ 'নির্লিপ্ত কর গো তারা, মোহে হলো বুদ্ধিহারা।' অথবা 'কৃপা করি কৃপাময়ী কর গো তম খণ্ডন।' প্রথমোক্ত পদটির কথা বাদ দিলে ঐ নিবৃত্তিচেতনা বা বিষয়বাসনা-মুক্তিই তাঁর প্রার্থনার স্থায়ী ভাব বলে নির্দেশ করা যেতে পারে।

মহতাবচন্দের কিছু কিছু শ্যামাসঙ্গীত অত্যন্ত সুললিত ও সাঙ্গীতিক মাধুর্যে মনোমুগ্ধকর। যেমন, 'গৌরী আমার শ্যামা হলো, কে জানিবে কি কারণে,' অথবা 'শ্যামা গুণ গাওরে মন আর কি চাওরে' প্রভৃতি পদ স্মরণীয়।

কবি অনবদ্য ভাবে-ভাষায় কালীর কালো রূপের মহিমা কীর্তন করেছেন ঃ

"কালয় তে নির্ম্মল, কালয় করে উজ্জ্বল,
কে কোথা দেখেছে বল কালপ্রভা কালনাশী।
কালী মহাকাল জায়া কালীনাম কালক্ষয়া,
কালী বিপদে অভয়া, তাই কালী ভালবাসি।"

মাতৃসমীপে ভক্ত সন্তানের অকৃত্রিম আকুতির নিরলংকার অভিব্যক্তি হিসাবে নিম্নোক্ত অংশটুকু উদ্ধৃত করা চলে ঃ

"সুপুত্র কুপুত্র হৌক, মাতার সমান স্নেহ।
শ্যামা তোমার পুত্র মধ্যে, আমি কি মা নহি কেহ।।
তনয় অবাধ্য হলে, মাতা নাহি দেয় ঠেলে,
বরং ধরে রাখে কোলে কখন নহে অস্নেহ।।
তোমার তনয় হই, জানি না মা তোমা বই,
তবে কেন ভিন্ন রই, চন্দ্রে সদা কষ্ট দেহ।।
চণ্ডিকা মুণ্ডমালিকা, ত্রিগুণাত্মিকা মহাযোগিনী।
দাক্ষায়ণী, মোক্ষদায়িনী, দক্ষযজ্ঞ বিনাশিনী।।"
অসুর গর্ব্বিত, সমর খর্ব্বিত,
উর্ব্বী নির্ব্বীর কৃত, দুষ্ট বিনাশিনী।।
ত্বং হি শম্ভু শক্তি, ত্বং হি সাধক ভক্তি,
ত্বং হি পাপ মুক্তি যুক্তি বিধায়িনী।" ...... ইত্যাদি।"

ভক্তিগানামৃতের অনেকটা অংশ জুড়ে আছে দশমহাবিদ্যার গান। এই পর্যায়ে ৬৩টি পদ আছে। কালী, তারা, যোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী ও কমলা —দশমহাবিদ্যার এই রূপগুলি ছাড়াও তন্ত্রোক্ত ত্রিপুটা, ত্বরিতা, চৈতন্য ভৈরবী,অষ্টকূটা ভৈরবী, দুর্গা, ভদ্রকালী, শ্মশানকালী, আদ্যাকালী বজ্রপ্রস্তারিণী, শূলিনী, উচ্ছিষ্টমাতঙ্গী, মাতৃকা, মঙ্গলচণ্ডী, পারিজাত সরস্বতী, মহালক্ষ্মী, কাত্যায়নী, উগ্রচণ্ডা, মহিষমর্দিনী, গঙ্গা, লক্ষ্মী প্রভৃতি দেবীর ধ্যান অবলম্বনে এক বা একাধিক পদ রচনা করেছেন। তবে মহতাবচন্দের অনুবাদ সংস্কৃত-অনভিজ্ঞ তন্ত্রপাঠকের পথ সুগম করে দিয়েছে। তন্ত্রশাস্ত্রে এবং সংস্কৃত ভাষায় পদকর্তা যে বুৎপন্ন ছিলেন, এই শ্রেণীর পদগুলি তার পরিচয় বহন করে। অনুবাদ-কুশলার নমুনা হিসাবে তন্ত্রের ধূমাবতী ও মহতাবচন্দের ধূমাবতীর কিয়দংশ উদ্ধৃত করা যায়। তন্ত্রকার ধূমাবতীর বর্ণনা দিয়েছেন এইভাবে ঃ

"বিবর্ণাচঞ্চলা রুষ্টা দীর্ঘা চ মলিনাম্বরা।
বিবর্ণকুন্তলা রুক্ষা বিধবা বিরলদ্বিজা।।"

মহতাবচন্দের অনুবাদ ঃ

"বিষণ্ণা এ কাহার নারী, চিনিতে নারি।
রুক্ষকেশা ধূমাবতী পয়োধর নত অতি,
কলহ করিতে মতি, মলিনাংশু পরি।।
কাকধ্বজ রথে বালা, ক্ষুধাতুরা সচঞ্চলা,
দশনাবলী বিরলা, দীর্ঘকায়া হেরি।।"

তবে ভবানীবিষয়ক বা আগমনী গানগুলি এই নীরসতা-দোষমুক্ত। জননীর গভীর কন্যাবাৎসল্য এখানে সহজ কথায় রসঘন রূপ লাভ করেছে। জননী মেনকা উমাকে আনার জন্য স্বামীকে তাগিদ দিয়ে বলছেন ঃ

মাতার প্রাণের সুখ দেখিলে অপত্যমুখ . . . .
এমন নয় যে পাঠাব না, তিন দিন বৈ রাখিব না, ...
সে ত যোগী থাকে ধ্যানে মায়ের স্নেহ নাহি জানে,
বলো তাহে যাহে মানে, অশেষ করি আরতি।

কোন কোন অংশের মিতভাষিতা প্রবাদবাক্যের পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। যেমন ঃ 'যদি কন্যা সুখে রয়, তবু মাতা স্থির নয়', 'এক মাত্র কন্যা যার, সে বিনা কি সুখ তার', 'প্রসবে যত বেদনা প্রসূতি বিনা জানে না' ইত্যাদি।

মহতাবচন্দের রামবিষয়ক কোনো কোনো পদও অনবদ্য। যেমন ঃ

রাম পূজন রাম ভজন করো নর রাম সাধন।
রাম অনুপ রাম স্বরূপ, রাম স্বয়ং সনাতন।। . . . . ইত্যাদি।

পদটির ধ্বনিমাধুর্য সত্যিই মনোমুগ্ধকর।

সংস্কৃত ভাষাতেও মহতাবচন্দ পদরচনা করতে পারতেন। উদাহরণ হিসেবে শিব বিষয়ক একটি স্তোত্রের কিয়দংশ উদ্ধৃত করি ঃ

"জটিলং ধূর্জটিং বিভুং, দেবদেবং মহেশ্বরং।
গোপালং গোবিন্দং কৃষ্ণং, রাধানাথং রাসেশ্বরং।।
রাঘবং শ্যামলং রামং, সীতানাথং, মহাবীরং।
কালিন্দী ভেদনং রামং, শঙ্কর্ষণং নীলাম্বরং।।" ইত্যাদি

—প্রসঙ্গ তঃ মহতাবচন্দের উর্দু রচনার সামান্য নিদর্শন উদ্ধৃত করি ঃ

"সাচ্চা নাম যাকৎ রহেগা এক ওহি রহেগা।
যব্‌কে সোস্তাহু বাদ ক্যা হোগা
সোচ্ আত্ হ্যায় কচ্‌না রহেগা
রহেগা এক ওহি রহেগা।।"

মহতাবচন্দের ব্রহ্মবিষয়ক একটি গানে সাকার-নিরাকার উপাসনাভেদে অস্থির-চিত্ততা এবং ব্রাহ্মমতে বিশ্বাস থেকে পৌত্তলিকতায় প্রত্যাবর্তনের ইঙ্গিত আছে। কিয়দংশ উদ্ধৃত করি ঃ

"মনের দ্বিধা কেন আমার গেল না।
ভাবিয়ে কিছু স্থির হলো না, শাস্ত্রের বিরুদ্ধে কিবা ভাবিব।।
উপাধি কল্পনাশূন্য তাঁর ভাবি করি জন্য,
অদৃশ্যে কেমনে দেখিব।
অচিন্ত্য অব্যক্ত রূপায়, কিরূপে জানিব তায়,
কী সাহসে তাঁর চিন্তা করিব।।
শাস্ত্রে কহে বাক্যাতীত, শাস্ত্রে কহে মনোতীত,
কি উপায়ে তাঁরে জানিব।
নয়নের অগোচর, বিরাট অকলেবর,
কিরূপে তাঁরে ভজিব।।" . . . . . ইত্যাদি।

ভক্তিগানামৃতের শেষ গানটি মাত্র দুই পংক্তির। জীবনসায়াহ্নে পদকর্তার অতৃপ্ত জীবনের বিষণ্ণ দীর্ঘশ্বাস এই পংক্তি দুটিতে মূর্ত হয়ে উঠেছে ঃ

"আমার অবশিষ্ট জীবনের সব সুখ ঘুচিল।
ঈশ্বর সাক্ষী তুমি সে কে যে হরিল।।"

ভক্তিগানামৃতের শেষভাগে 'সংগীতবিলাস' থেকে উদ্ধৃত চৌদ্দটি গানই কৃষ্ণবিধায়ক।

"অন্ত নাহি পেলেম হরি, একান্তে ভাবিয়ে মনে।
সাকার কি নিরাকার অস্তি নাস্তি কে বা জানে।।
অসংখ্যক মুনিগণ দৃষ্ট করে নারায়ণ,
কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞান ব্যক্ত হয়েছে পুরাণে।
কেহ বা বলে সাকার কেহ বলে নিরাকার
কি আকার কি প্রকার, কি তত্ত্ব কেহ নাহি জানে।।"

মহতাবচন্দের অধিকাংশ কৃষ্ণবিষয়ক গান রসোত্তীর্ণ হয়েছে। একটি সম্পূর্ণ

কৃষ্ণবিষয়ক গান উদ্ধৃত করি ঃ

"কৈ গো কৈ মনচোরা, বাজায় মোহন বাঁশরী।
শুনিয়ে বংশীর ধ্বনি গৃহে কি রহিতে পারি।।
নিকুঞ্জ কাননে চল বিলম্বে কি ফল বল,
হেরিলে চিকন কাল, শ্রীঅঙ্গ-সঙ্গে কিশোরী।
হরি খেলিবারে হরি, ডাকিছেন ব্রজনারী,
চল সবে ত্বরা করি, হেরি যুগল মাধুরী।।"

'হরিগান'-য়ের অন্তর্ভুক্ত হোলির গানগুলিও রসমাধুর্যে অতুলনীয়। যেমন ঃ

"ছি ছি ছি কর কি একি বাঁকা বংশী ধরি
দিও না দিও না অঙ্গে, কুঙ্কুম আবির বারি,
একে কলঙ্কিনী বলে, তাহে অঙ্গে আবির দিলে,
কেমনে যাব গোকুলে, ওহে গিরিধারী।।"

মহতাবচন্দের প্রণয়-সঙ্গীতগুলি অপেক্ষাকৃত হ্রস্বায়তন। মুষ্টিমেয় কিছু বাদে সবই চার ছত্রে সম্পূর্ণ। মাত্র তিন ছত্রের গানও আছে। যেমন ঃ

"কিশোরী বাজে বাঁশরি, নিকুঞ্জ বনে।
কেন আর ব্যাজ, ত্যজ গৃহকাজ
সাজ কৃষ্ণ মিলনে।"

মহতাবচন্দের প্রণয়গীতে আছে পূর্বরাগ, মান, অভিসার, মিলন, বিরহ ইত্যাদি প্রেমের সর্বাবস্থার চিত্র। প্রকাশভীরু প্রেমের প্রথমাবস্থা তথা পূর্বরাগের সৌন্দর্যব্যাকুলতা বিষয়ক একটি গান এখানে উদ্ধৃত করি ঃ

"আমি যে তায় ভালবাসি সে কি তাহা জানে মনে।
জানিলে সে দেখা দিত কোন ছলে সঙ্গোপনে।।
বুঝি পটু নহে প্রেমে, কিম্বা নিজ মনোভ্রমে,
গুরুজন ভয়ক্রমে, বঞ্চিত করে মিলনে।।"

একটি গানে প্রেমিকার যুগপৎ লজ্জানম্রতা ও আবেগের অসম্বরণীয়তা মাত্র তিনটি পংক্তিতে অপূর্ব অভিব্যক্তি লাভ করেছে। যেমন ঃ

"দেখিয়ে কাতর থাকিব কেমন করে।
নয়নে তায় হেরি, সরমে যে মরি,
কেমনে নিবারি বল আমারে।"

বিরহতীব্রতা পরিস্ফুটনেও মহতাবচন্দ আশ্চর্য কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন ঃ

"প্রাণ কাঁদে যার লাগি সেই সে এলো কৈ।
ঘরে থাকা ভার হলো সদা উচাটন রৈ।।
গৃহ কার্য্যে নাহি মন, তাহা দেখি গুরুজন।
বলে কত কুবচন, মনদুঃখ কারে কৈ।।"

নিম্নোদ্ধৃত গানটিতে 'জানিলাম' শব্দের বহু আম্রেড়িত ব্যবহারে ব্যর্থ প্রেমের অকথিত বেদনা চমৎকার শিল্পরূপ লাভ করেছে ঃ

"জানিলাম প্রাণ তোমারে জানিলাম।
মন জানিলাম ব্যাভার জানিলাম।
জানিলাম ভালরূপে জানিলাম।।"

নারীর প্রেম-বিভোরতার মর্ম্মস্পর্শী চিত্র হিসাবে নীচের গানটি বিশেষভাবে মনে পড়ে ঃ

"যার জন্যে এত ক্লেশ তবু সেই জাগে মনে।
অদর্শনে সেরূপ দেখি, সম্মুখসম দর্শনে।।
হৃদয়ে ধারণ করি, নয়ন মুদিলে হেরি।
মনে সে রূপ মাধুরী, শয়নে কিবা স্বপনে।।"

এখানে আর একটি গানের কথা উল্লেখ করি —

"নারী পদ্মসমা পুরুষ মানসভৃঙ্গ,
যেন অনলে দগ্ধিত, হয় দেখহ পতঙ্গ।।
জানিয়ে প্রাণ হারায়, দিবা নিশি জ্বলে কায়,
তথাচ কি সুখ পায়, ভস্মি (স্মী) ভূত করি অঙ্গ।।"

সংস্কৃতের ধরনে মহতাবচন্দ প্রেমসঙ্গীত রচনার চেষ্টা করেছিলেন। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল ঃ

"অয়ি চারু হাস্যাননে, কিং ক্ষোভে অহো ক্ষোভিতে।
মোহিতে মহীতে স্থিতে, ছিন্ন বেশে অশোভিতে।।
নির্দ্দোষে দোষ অর্পিতে, হে মানময়ী দর্পিতে,
বিরাজ ভাব তপিতে, হে স্বানুরাগ লোভিতে।"

ব্রহ্মসঙ্গীত ঃ মহতাবচন্দ ব্রহ্মসঙ্গীতের একটি সংকলন প্রকাশ করেছিলেন ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে। উক্ত 'ব্রহ্মসঙ্গীত' -য়ের আখ্যাপত্র ঃ

"একমেবাদ্বিতীয়ং / এই ব্রহ্মসঙ্গীত / শ্রীল শ্রীযুক্ত বর্দ্ধমানাধীশ্বর মহারাজাধিরাজ

/ মহ্‌তাবচন্দ্‌ বাহাদুরের ব্যয়ে / সত্যসন্ধায়িনী সভা / হইতে বিতরণার্থ / বর্দ্ধমান / খাসপ্রেসে / বিশুদ্ধ রূপে মুদ্রিত হইল। / শকাব্দ ১৭৮২।।"

এতে তাঁর নিজের লেখা ১৩টি ব্রহ্মসঙ্গীত ধৃত হয়েছে। 'ভক্তিগানামৃত' থেকে নেওয়া আলোচ্য সংকলনে তারকনাথ তত্ত্বরত্ন ও শ্যামাচরণ তত্ত্ববাগীশসহ শ্রীধর কথক, ব্রজমোহন রায়, রাজা রামমোহন রায় প্রমুখ রচয়িতার গান সংকলিত।

বহু যাত্রাপালাকারও ছিলেন মহ্‌তাব্‌চাঁদের পৃষ্ঠপোষকতা প্রাপ্ত। পালাকার গোবিন্দ অধিকারী, তাঁর প্রথম পালা 'কালীয় দমন'। এই পালাই তাঁকে অর্থ ও খ্যাতি-প্রতিপত্তির চরম শিখরে পৌঁছে দিয়েছিল। প্রতিবছর রাজবাড়ীতে তাঁর পালাগানের আসর বাঁধা ছিল। একবার তাঁর আসরে তাঁরই কণ্ঠে "শ্যাম শুকপাখী সুন্দর নিরখি, (রাই) ধরিল নয়ান ফাঁদে"---এই গানটি শুনে মহ্‌তাব্‌চাঁদ প্রকাশ্য আসরে তাঁর নিজের বহুমূল্য শালখানি পুরস্কার দেন। তাঁর বাড়ী আটপাড়া। আর একজন পালাকারের কথা বলি। তিনি কৃষ্ণযাত্রাপালারচয়িতা প্রতিভাশালী পালাকার নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়। একবার ঁলক্ষ্মীনারায়ণ জীউ ঠাকুর বাড়ীতে নীলকণ্ঠ পালা গাইছেন, গোবিন্দ অধিকারী বেহালায় সঙ্গত করছেন। সেদিন মহারাজ মহ্‌তাব্‌চাঁদ আসরে আসতে পারেন নাই। সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর কানে যেতেই দূর থেকে তিনি বাইনাকুলার নিয়ে দেখছেন। ঘটনাটি গোবিন্দ অধিকারী লক্ষ করে শিষ্য নীলকণ্ঠকে বলেন "তোমার গানে খুশী হয়ে মহারাজ তোমায় দেখছেন। তাঁর কৃপায় তোমার আর কোন দুঃখ থাকবে না।" বলা বাহুল্য, প্রতিবছরই ঁরাধাবল্লভজীউ বাড়ীতে নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়ের আসর বাঁধা হয়ে গিয়েছিল। তার জন্য মহারাজ তাঁকে নগদ দক্ষিণা দিয়ে বিদায় করতেন। তাছাড়া মাত্র ৩২ টাকা জমায় ২৩২ বিঘা জমি দান করেন।

নীলকণ্ঠ বর্ধমান জেলার পানাগড় সন্নিহিত ধবনী গ্রামে ১৮৪২ খ্রীঃ জন্মগ্রহণ করেন। পারিবারিক অবস্থা ভাল ছিল না। কাজেই বালক বয়সেই অর্থের জন্য গোপাল রায় ও গঙ্গানারায়ণ রায়ের দলে যোগ দেন। তারা উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিত না। শ্রাবণ মাস, বর্ধমানে ঝুলন উৎসব। রাজবাড়ীতে গোবিন্দ অধিকারীর পালাগান চলছে। মাত্র আট আনা (৫০ প.) সম্বল করে বর্ধমান আসেন, এখানে সীতারাম ঘোষাল নামে এক ব্যক্তির সহায়তায় গোবিন্দ অধিকারীর সান্নিধ্যলাভ করেন। বালক নীলকণ্ঠের সুরেলা গলার গান শুনে অধিকারী মশায়, তাঁকে ১৬ টাকা মাসমাহিনায় নিজের দলে গ্রহণ করেন। পরে তিনি নিজেই নবরূপে কৃষ্ণযাত্রার পালাগান রচনা করে যশস্বী হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে তাঁর পুত্র কমলাকান্ত মুখোপাধ্যায়ের পালাগান সর্বমঙ্গলা ঠাকুর বাড়ীতে বাঁধা বন্দোবস্ত ছিল।

আর একজন বিশিষ্ট পালাকার ছিলেন, মতিলাল রায়। তিনিও ছিলেন একদিকে

পালাকার ও গায়ক। নন্দোৎসবের দিন ˆ লক্ষ্মীনারায়ণ জীউ ঠাকুর বাড়ীতে মতিলাল রায়ের যাত্রা পালা অনুষ্ঠিত হতো। তবে এখানে একটি বৈশিষ্ট্য ছিল, বিভিন্ন পালাকারের দলের ২/৩ টি শ্রেষ্ঠ দৃশ্য অভিনীত হতো। মহারাজ মহ্‌তাব্‌চাঁদ নিজে ঐ সব অভিনয় দেখে তা বিচার করতেন এবং শ্রেষ্ঠদলকে পুরস্কৃত করতেন। বর্ধমানে এই উৎসবকে বলা হতো 'নন্দোৎসবের বাধাই গান'।

মহারাজ মহ্‌তাব্‌চাঁদ প্রকৃত গুণীজনেরও সমাদর করতেন। তিনি মনে করতেন, খ্যাতিমান পণ্ডিতগণও যেমন মাননীয় যাঁরা যাত্রাপালাগান, পাঁচালী রচনা করতেন তাঁরাও বিশিষ্ট গুণী; তাঁদেরও সম্মান দেওয়া উচিত। সেই সময়ের বিশিষ্ট পাঁচালীকার দাশরথি রায় একটি উল্লেখযোগ্য নাম। তৎকালে বর্ধমান রাজ দেবালয় সমূহে কোন না, কোন উপলক্ষ্যে কোথাও কবিগান, কোথাও পালাগান, কোথাও রামায়ণগান লেগেই থাকতো। সেইরকম দাশরথি রায়ের পাঁচালী গানের আসর বসতো। দাশরথি রায় ছিলেন অসাধারণ প্রতিভাধর। তিনি ছিলেন অত্যন্ত প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, নিষ্কলুস সরস বাক চাতুর্যে আসরের জনমণ্ডলী খুব উৎফুল্ল হয়ে পড়তেন। মহতাব চাঁদ কবির সরস বাকচাতুর্যে মুগ্ধ হয়ে পুরস্কৃত করতেন। রাজবাড়ীতে তাঁরও আসর বাঁধা ছিল। তিনিও রাজপৃষ্ঠপোষকতা হতে বঞ্চিত হন নাই। দাশরথি রায়ের বাড়ী ছিল বর্ধমান জেলার বাঁধমুড়া গ্রামে। এই সময় আর একজন পাঁচালীকার ছিলেন যিনি মহ্‌তাব্ চাঁদের বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন তিনি হলেন রসিক রায়। রসিক রায়, দাশরথী রায়ের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। তিনি ছিলেন স্বভাব কবি। তিনি তাঁর নিজ বাড়ী সংলগ্ন ফুল বাগিচায় বসে কাব্য সাধনা করতেন। বিশেষ কোন ঘটনা উপলক্ষ্যে মহারাজ তাঁর তাৎক্ষণিক কবিতা রচনার পরিচয় পেয়ে তাঁকে সসম্মানে সমাদর করে রাজপ্রসাদে নিয়ে আসেন।

রসিক রায় ১২ খানি পাঁচালী পুস্তক রচনা করেন। মহারাজ মহ্‌তাব্‌চাঁদের প্রশস্তিমূলক জীবনীগ্রন্থ পাঁচালীর আকারে লেখেন। এই পাঁচালী গ্রন্থটি সম্ভবতঃ ১৮৫৩-৫৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল।

রসিক রায় এর বাড়ী ছিল বর্তমান হুগলী জেলার অন্তর্গত হরিপাল। মাতুলবংশের প্রচুর সম্পত্তি পেয়ে পরবর্তীকালে বড়া গ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। তাঁর রচিত কতকগুলি গ্রন্থ হলো, 'বর্ধমান চন্দ্রোদয়' 'পদাঙ্ক দূত', 'বৈষ্ণব মনোরঞ্জন', 'নবরসাঙ্কুর', 'কুলীন কুলাচার', শ্যামাসঙ্গীত 'দশমহাবিদ্যা', 'শকুন্তলা বিহার' প্রভৃতি।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, রামায়ণ, মহাভারত অনুবাদ প্রকাশে মহ্‌তাব্‌চাঁদের ব্যয় হয়েছিল দু লক্ষ (২,০০,০০০) টাকা। সুতরাং তিনি যে সমস্ত গ্রন্থ অনুবাদ করিয়েছিলেন

তার জন্য যে প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়েছিল সে কথা বলা নিষ্প্রয়োজন।

অতঃপর, কবিয়াল-যাত্রা পালাকার-পাঁচালীকার, তাঁরা খ্যাতি/প্রখ্যাত অথবা অখ্যাত যাই হোক না কেন, মহারাজ মহ্‌তাব্‌চাঁদ তাঁদেরও পোষকতা করতেন। কবিয়াল ভবানী বেণে ইনি ছিলেন তখনকার দিনে (১৮৫৪ খ্রীঃ) একজন খ্যাতিমান কবিয়াল। সম্পূর্ণ নাম ভবানীচরণ বনিক। বিভিন্ন উৎসবে বর্ধমান রাজের নাটমন্দিরে তাঁর কবিগানের আসর বসতো।

আর একজন কবিয়ালের উল্লেখ বিশেষ প্রয়োজন। তিনি ছিলেন সখের কবিয়াল। মহাতাবচাঁদ ইংরেজ অতিথিবর্গের সম্মানে রাজবাড়ীতে এক কবিগান অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। সেই কবিগানের আসরে ইংরেজ কবিয়াল, নাম, ন্যাথানিয়েল জন হ্যালহেড (*Nathaniel John Halhod*) এর একেবারে বাংলা কথ্য ভাষায় কবিগান শুনে উপস্থিত অতিথিবর্গ আনন্দোদ্বেল হয়ে ওঠেন। হ্যালহেড সাহেব পেশায় ছিলেন সদর দেওয়ানী আদালতের জজ। বর্ধমানে থাকাকালীন মহারাজের সদর আমন্ত্রণে আসতেন। পোষাক-পরিচ্ছদে, আচার-আচরণে ছিলেন সম্পূর্ণ বাঙ্গালীয়ানা। তিনি একজন ন্যায় পরায়ণ বিচারক ছিলেন। তাঁর রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ '*A Grammar of Bengal Language*' এবং '*A Code of Gentoolaws*'। তিনি দীর্ঘ রোগ ভোগের পর ১৮৩৮ খ্রীঃ ২ রা আগষ্ট, ৫১ বছর বয়সে কোলকাতায় পরলোক গমন করেন, নর্থ পার্কস্ট্রীটে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

এবম্‌প্রকার পণ্ডিত, জ্ঞানী-গুণী, সাহিত্যিক প্রভৃতির সমাবেশ এবং সাহিত্যকৃতির জন্য নিঃসন্দেহে বলা যায় মহারাজ মহ্‌তাব্‌চাঁদ একজন প্রকৃত বিদ্যোৎসাহী, গুণগ্রাহী ও সাহিত্য প্রেমিক ছিলেন।

মহারাজ মহ্‌তাব্‌চাঁদের পৃষ্ঠপোষকতা প্রাপ্ত আর এক কবি সাহিত্যিক ছিলেন, তাঁর নাম খোন্দকার সামসুদ্দিন সিদ্দিকী, বর্ধমান শহরের বাহির সর্বমঙ্গলায় বাড়ী। তাঁর কাব্যগ্রন্থটির নাম 'ভাবলাভ' আর একখানি গদ্যগ্রন্থ 'উচিত শ্রবণ', বইখানি ধর্মোপদেশ মূলক। 'ভাবলাভ' কাব্যগ্রন্থখানি গীতি কাব্য। প্রেমকাহিনী মূলক হলেও অধ্যাত্মভাবনার প্রতিফলন আছে।

কবি বনয়ারীলাল রায় ছিলেন মহারাজের আশ্রিত একজন খ্যাতিমান কবি। কবির পিতা প্রেমচাঁদ রায় রাজ এস্টেটে চাকরী করতেন। তাঁর অকাল মৃত্যুতে মহাবাজ মহ্‌তাব্‌চাঁদ, তাঁর অসহায় বালকপুত্র বনয়ারীলালকে মহারাজ রাজবাড়ীতে এনে জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা করে দেন। তদবধি রাজ এস্টেটে থাকতেন। তাঁর পৈর্তৃক বাড়ী হুগলী জেলার হরিপাল গ্রাম। তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'যোজন-গন্ধা'। ১৮৫৪ খ্রীঃ ১৩ জুন তারিখে 'সংবাদ ভাস্কর' পত্রিকায় বই খানির সপ্রশংস আলোচনা বের হয়। কাব্যটি 'বিদ্যাসুন্দর' জাতীয় কাব্য। প্যারীমোহন

চট্টোপাধ্যায়, কবিরত্ন — মহারাজ মহ্‌তাব্‌চাঁদের রাজ সভাশ্রিতগীতিকার ও গায়ক। মহারাজ তাঁর গানে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে 'কবিরত্ন' উপাধি ভূষিত করেন। ইনি ছিলেন সাধক কমলাকান্তের বংশধর। প্যারীমোহনের পিতা ছিলেন দ্বারকানাথ চট্টোপাধ্যায়।

মহারাজা মহ্‌তাব্‌চাঁদ বিদ্যোৎসাহী, ভাষা-সাহিত্যানুরাগী ছিলেন এবং জ্ঞানী-গুণীদের সমাদর করতেন। এখানে তাঁর এক দুঃসাহসিক কর্মের কথা বলা বিশেষ প্রয়োজন বলে মনে করি। তৎকালে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মত সর্বাগ্রগণ্য মহাপণ্ডিত যে সময়ে বিদ্যমান সেই সময় তিনি এক প্রকার নতুন হরফের প্রচলন করেন, যাকে 'মহতাব-লিপি' আখ্যা দেওয়া হয়। এই তথ্যটি আবিষ্কার করেন অধ্যাপক ডঃ তারাপদ মুখোপাধ্যায়। তিনি উক্ত লিপির প্রথম ভাগটি উদ্ধার করেন লণ্ডনের হোভ্‌ পাবলিক লাইব্রেরী থেকে এবং বইটির প্রতিলিপি সহ একটি সন্দর্ভ, ১৯৬৫ খ্রীঃ ৬ই মার্চ তারিখের সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশ করেন। তৎকালীন একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা 'সুলভ সমাচার' হতে জানতে পারা যায় ১৮৭৪ খ্রীঃ উক্ত প্রথমভাগটি প্রকাশ হয়। পত্রিকা সম্পাদক টিপ্পনি করেছিলেন—'রাজা রাজড়ায় যা করেন তাই সাজে, আমাদের বেলাই যত কথা।' কথা যাইহোক বা মহারাজা ধৃষ্টতা প্রকাশ যাই করুন, তবে তিনি যে বিদ্যাশিক্ষা সম্বন্ধে কিছু ভাবনা-চিন্তা করতেন এবং বিদ্যানুরাগী ছিলেন, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই।

দেববিগ্রহ প্রতিষ্ঠায় মহ্‌তাব্‌চাঁদ ঃ—

দেবপ্রতিষ্ঠা ইত্যাদি ব্যাপারে মহ্‌তাব্‌চাঁদের পূর্ববর্তী রাজগণ মহারাজ তেজচাঁদ, কীর্তিচাঁদ-এর মত অবদান বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। তবে একেবারেই যে নাই তা নয়, তাঁর স্বীয় নাম সহ মহারাণী নারায়ণকুমারীর নাম খোদিত ২/৩ টি দেবমন্দির প্রতিষ্ঠার কথা জানা যায়। আরও যে সব দেববিগ্রহ প্রতিষ্ঠার কথা জানা যায় সেগুলির কতক প্রতাপচাঁদ মহিষীর নামে আবার কোন কোনটি রাজমহিষীর সহচরির নামে।

মহারাজ মহ্‌তাব্‌চাঁদ, প্রতাপচাঁদের জ্যেষ্ঠা মহিষী প্যারীকুমারীর নামে শ্রীবৃন্দাবন ধামে ও বর্ধমানেও অনেকগুলি দেব প্রতিষ্ঠা করিয়েছেন। তা ছাড়া ১৮৩৩ খ্রীঃ মহারাণী কমলকুমারী (দত্তক মাতা)-র পরিচারিকা গঙ্গাদাসীর নামে অম্বিকা কালনায় যে শিব মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়েছিলেন তার শিলালিপিস্থ শ্লোক ঃ—

"শকাব্দে বেদেষুক্ষিতিধরশশাঙ্কপ্রগণিতে
মহারাজ্ঞ্যা যার্য্যা হি কমলকুমার্য্যা অনুচরী।
ইদং গঙ্গাদাসী শিব সদনসস্মিন্ সমকরোৎ
ভবাব্ধেঃ পারার্থং ভবভজনধী স্থাপনবতী।।"

শকাব্দা ঃ ১৭৫৪।

মহারাণী কমলকুমারীর অন্যতমা সহচরী দেবকী-দেবীর নামে ১৮৪৬ খ্রীঃ অম্বিকা কালনাতেই আরও একটি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। সেই মন্দির গাত্রে শিলালিপিস্থ্ শ্লোক ঃ—

"শুভমস্তু শকাব্দা ঃ ১৭৬৭

কাশীনাথ মন্দির

শ্রী দেবকী দেবী।।"

১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজ মহাতাব্‌চাঁদ, প্রতাপচাঁদের জ্যেষ্ঠা মহিষী প্যারীকুমারীর নামে অম্বিকা কালনায় বহু কারুকার্যপূর্ণ একটি দেউল প্রতিষ্ঠা করান। ঐ দেউলের শিলালিপিতে উৎকীর্ণ আছে—

"সংসারার্ণবতারণৈকতটিনীতীরে মুরারের্মুদে

শাকে ভৈশনগাগভেশবিমিতে তারেশকায়াদদৎ।

শ্রীরাধেশ সুরেশ রাসরসিকানন্দস্য দাসী

মহারাজাধীশ প্রতাপচন্দ্র মহিষী প্যারীকুমারী মঠম্।।"

শকাব্দা ১৭৭১/সন ১২৫৬ সাল।

এরপর ১৮০০ শকাব্দে, সন ১২৮৫ সালে সূর্যমন্দির, গৌরী শঙ্করের মন্দির ও আরও একটি মন্দির ঐ সময়েই প্রতিষ্ঠা করেন সম্ভবতঃ দার্জিলিং এ। শেষের মন্দিরটির স্থানোল্লেখ নাই। এই মন্দিরগুলি সমহিষী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। উৎকীর্ণ লিপিতে তার উল্লেখ আছে।

সূর্যমন্দিরের শিলালিপিস্থ্ শ্লোক —

"শাকে খাম্বরনাগচন্দ্রবিমিতে সোমে শুচৌ সংক্রমে

পক্ষাদাবসিতে বিধায় বিবিধং প্রাসাদমেতং দদৌ।

লোকালোকনলোচনায় মহ্‌তাবর্কায় সংস্থাপয়ন্

শ্রীল শ্রীমহতাবচন্দ্র নৃপতিঃ শ্রীমন্মহিষ্যা সহ।।

শকাব্দা ঃ ১৮০০ সম্বৎ ১৯৩৫।

শ্রাবণ কৃষ্ণ প্রতিপৎ। সন ১২৮৫।"

গৌরী শঙ্করের মন্দিরস্থ্ শ্লোক —

"শাকে বিন্দুবিয়দ্বসুক্ষিতিমিতে সৌম্যে তুলাসংক্রমে

প্রত্যষ্ঠাজ্জগদর্চনীয়চরণৌ শ্রীশঙ্করীশঙ্করৌ।

শ্রীনারায়ণদেয়িরাজমহিষীযুক্তো মহাভূমিপঃ

শ্রীল শ্রীমহ্‌তাব্‌চন্দ কপুর রাজাধিরাজঃ স্বয়ং।।

সম্বৎ ১৯৩৫ শকাব্দা ১৮০০

কার্তিকবদি পঞ্চমী বুধবার।''

১৮০০ শকাব্দেই যোগমায়া মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দিরটি 'গৌরীশঙ্কর' প্রতিষ্ঠার পূর্বে স্থাপিত হয়েছিল।

''দ্বিবিদুবসুভূমানে শাকে সিংহার্ক সংক্রমে

শ্রী নারায়ণদেয়ীতি দেব্যা সহ মহীধরে।

মহারাজাধিরাজ শ্রী মহ্‌তাব্‌চন্দ্‌ ত্রাতৃবর্মণা

নারায়ণী সমাখ্যেয়ং যোগমায়া প্রতিষ্ঠিতা।।

শকাব্দা ১৮০০

ভাদ্রকৃষ্ণ দ্বিতীয়া, সংক্রমণ পুণ্যাহে।''

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে মহারাজা মহ্‌তাব্‌চাঁদ লড়াই বা যুদ্ধ-বিগ্রহ করে তাঁর জমিদারী বৃদ্ধি করেন নাই। উড়িষ্যার কটক জেলার কুজঙ্গ মহল ক্রয় করেন। কুজঙ্গ অঞ্চলের কতকগুলি অংশ ছিল সমুদ্র জলবেষ্টিত ছোট ছোট দ্বীপ। ঐ দ্বীপগুলি মহারাজ ইংরাজদের দান করেন। দ্বীপগুলি বাদ দিলেও বাকি জমিদারীর আয় ছিল বার্ষিক প্রায় ৭ লক্ষ টাকা, এছাড়া দেবত্তর অংশের আয় ছিল ৩ লক্ষ টাকা। কুজঙ্গ জমিদারী নিয়ে মামলা হয়। কারণ উক্ত জমিদারীর বিক্রেতার বিক্রী করার কোন অধিকার ছিল না। কয়েক বছর মামলা চলার পর মহারাজ মহ্‌তাব্‌চাদ মামলার ডিক্রি পান। মামলায় জয়লাভ কবার পর মালিকানা নিষ্পত্তি হলে ঐ সম্পত্তি নিজ খাস দখলে রাখেন। খাস দখলে রাখার পদ্ধতিকে 'জিমবিদার' বলা হতো। যাদের এই জমি বিক্রী করা হতো তাদের বলা হতো 'জিমবিদার'। ঐ 'জিমবিদারী' সম্পত্তি কতকগুলি নীলাম করে বিলি করেন মহারাজ, আবার কতকগুলি 'মৌজাওয়ারী' বিলি করা হতো। নীলাম করে জমি বিলি করাকে বলে 'পলন্দ'। এই ব্যবস্থায় জিম্‌বিদারই জমির খাজনা ধার্য করতেন। প্রয়োজন বোধে খাজনা বৃদ্ধি করতে পারতেন, বাকী খাজনার দায়ে প্রজাদের উচ্ছেদ করতে পারতেন। মৌজাওয়ারী যাদের জমি বিলি করা হতো, সেইসব প্রজাদের বাকী খাজনার জন্য উচ্ছেদ করা চলতো না। 'পলন্দ' প্রথায় যাঁদের জমি দেওয়া হতো অর্থাৎ জিম্‌বিদাররা ধার্যকৃত খাজনার শতকরা ৭ ভাগ পেতেন আর বাকী অংশ (৯৩%) জমির মূল মালিকের। জিম্‌বিদারদের জমি বিলি করা হতো ৩ বছর মেয়াদী।

মেদিনীপুর জেলার সুজামুঠা জমিদারী মহারাজ তাঁর স্ত্রী নারায়ণকুমারীর নামে ৫ লক্ষ ২৫ হাজার (৫,২৫,০০০) টাকা মূল্যে ক্রয় করেন। এই জমিদারীর আয়তন ছিল ৪৫ বর্গমাইল।

উত্তরবঙ্গের পার্বত্য অঞ্চল সমীক্ষা করে ইংরাজ গভর্ণমেন্ট ঐ অঞ্চলের উন্নয়ণ প্রকল্প নিয়ে যখন চেষ্টা করে চলেছেন, দার্জিলিং ও কার্শিয়াং-এ দুটি শহর স্থাপন করেছেন এবং ঐ সব অঞ্চলে আবাসস্থল স্থাপনের জন্য ডাঙ্গা ও জঙ্গলপূর্ণ পতিত জমি নীলাম ডাকের ব্যবস্থা করেন। তখন মহ্‌তাব্‌চাঁদ সুউচ্চ শেখরের সমতল অঞ্চলে ১১ একর জমি ক্রয় করে শৈলাবাস নির্মাণ করেন। ঐ স্থানটির প্রাকৃতিক শোভা খুবই মনোরম। দুপাশে গভীর খাদ, পাহাড়ী নদী নেমে চলেছে, পশ্চাতে সৌধকীরিট্রিনি 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' তার বিচিত্র শোভায় দণ্ডায়মানা। ঐ শৈলাবাসটির নাম দেন 'মহ্‌তাব্‌নাসিন'। 'মহ্‌তাব্‌নাসিন' কুটীর বেশ সুন্দর সাজানো একতলা বাড়ী। ঐ কুটীরের পাশে নির্মাণ করেন অতিথিশালা, যাকে বলা হতো 'চন্দ্রকুঠী'। শৈলাবাসকে কেন্দ্র করে মহারাজ দার্জিলিং ও কার্শিয়াং অঞ্চলে প্রতি একর ১০্ (দশ টাকা) হিসাবে মোট ২,১৬২ (দু হাজার একশত বাষট্টি) একর জমি ক্রয় করেন। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে যখন দার্জিলিং 'পৌরসভা' গঠিত হয়, তখন তিনি তার বিশিষ্ট উপদেষ্টা ছিলেন এবং পৌরপ্রশাসন-আইন প্রণয়নে তাঁর সুচিন্তিত মহামত গৃহীত হয়।

দার্জিলিং ও কার্শিয়াং-এর সমস্ত সম্পত্তি তদারকি করার জন্য তিনি একজন 'দার্জিলিং-সুপারিণ্টেন্‌ডেন্ট' নিয়োগ করেন। তাঁর অধীন কতকগুলি অফিস, অফিসকর্মচারী, তহশীলদার ও চৌকীদার ছিল। মহারাজের সম্পত্তির অধীন কতকগুলি কৃষিপ্রধান গ্রাম ছিল আর কিছু অঞ্চল ছিল সেখানে নীচু খাদ থেকে পাথর তোলা হতো। এই সব সম্পত্তি নির্দ্দিষ্ট সময় মেয়াদী ইজারা বিলি করা হতো, মেয়াদ শেষে আবার নতুন বিলি বন্দোবস্ত করতেন, এই সব থেকে আয় হতো। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ১১ আগষ্ট দার্জিলিং-এর 'সোনাদা' স্থানের রাজহাট্টা জঙ্গল মহল মাত্র আড়াই হাজার টাকায় ক্রয় করেন, দেখাশোনা করতেন জনৈক মণ্ডল। জঙ্গলের বড় বড় গাছগুলিকে 20 ভাগে ভাগ করে; চার ভাগ A, B, C, D, বাকীগুলি 1 থেকে 16 সংখ্যা দিয়ে চিহ্নিত করা হতো। প্রত্যেক গাছের গুঁড়িতে তার মাপ অর্থাৎ কত ফুট কাঠ পাওয়া যেতে পারে, তার মূল্য প্রভৃতি হিসাব লিখিত থাকতো। যে সব ঠিকাদার গাছ ক্রয় করার জন্য আসতো, তারা গাছের গায়ে লিখিত চিহ্ন অনুসারে মূল্য নির্ধারণ করে, সমস্ত টাকা অগ্রিম মিটিয়ে দিলে গাছ কাটার অনুমতি পেত; নির্দিষ্ট গাছগুলি কেটে ৩ বছরের মধ্যে সমস্ত তুলে নিয়ে জমি পরিষ্কার করে দিতে হতো। তারপর সরকারী বনবিভাগ থেকে নতুন চারাগাছ কিনে আবার তা লাগানো হতো। এই থেকে মহারাজের জঙ্গলমহলের আয় ছিল প্রচুর।

মহারাজ মহ্‌তাবচাঁদ ব্যবস্থাপক সভা বা আইন সভার সদস্য থাকায় তাঁর নিজ জমিদারী পরিচালনা ব্যাপারে বেশ কতকগুলি বিধি-নিয়ম প্রচলন করেন। তাঁর জমিদারীর



হিজ-হাইনেস্ মহারাজাধিরাজ বাহাদুর মহাতাবচাঁদ

দায়িত্ব নিজ হাতে গ্রহণ করার পূর্ব পর্যন্ত পরাণচাঁদ কপূর দেখাশুনা করতেন। অতঃপর জমিদারীর ভার নিজ দায়িত্বে গ্রহণ করে অফিসের কাগজপত্র, জমিজমার রেকর্ড, আয়-ব্যয় রাজস্ব ইত্যাদির হিসাবপত্র বুঝে নিতে প্রায় ৩ বছর সময় লেগেছিল। তিনি চিন্তা করলেন, এই কাজ পরিচালনা ব্যাপারে সৎ নিষ্ঠাবান পরামর্শদাতার প্রয়োজন। অনেক ভাবনা-চিন্তা করে টি.ডি.বার্গ মিলার নামে একজন দক্ষ ইংরেজ সাহেবকে ব্যক্তিগত সচীব হিসাবে নিয়োগ করেন। তাঁর মাসিক বেতন ছিল চারশত (৪০০) টাকা। টি.ডি. বার্জ (বার্গ) মিলারের বিনা ভাড়ায় থাকার জন্য একখানি সুসজ্জিত বাড়ী নির্মাণ করিয়ে দেন। তিনি তাঁর সমগ্র প্রশাসনকে চার ভাগে বিভক্ত করেন। প্রতি বিভাগে একজন করে প্রধান কর্মকর্তার পদ দেন। খাজনা আদায় বিভাগ, আইন বিভাগ, জমা-খরচ বিভাগ (আয় ব্যয়), বাড়ীঘর পথঘাট রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগ। ঐ সব বিভাগগুলির দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের কাজ সুষ্ঠুভাবে ও যথাযথরূপে পরিচালিত হচ্ছে কিনা, তার জন্য একটি কমিটি গঠন করেন। কমিটির প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হলেন টি.ডি. বার্জ মিলার এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট হলেন দেওয়ান-ই-রাজ বনবিহারী কপূর। প্রত্যেক বিভাগের এক একজন প্রধান ছিলেন এবং বিভিন্ন বিভাগের অধস্তন কর্মচারী ছিলেন শতাধিক।

এইভাবে মহ্‌তাব্‌চাঁদ সুশৃঙ্খলভাবে রাজকার্য পরিচালনা করতেন।

সৌন্দর্য্য প্রীতি ঃ—

মহ্‌তাব্ ছিলেন রুচিশীল, সৌন্দর্যপ্রিয় মানুষ। তিনি জমিদারী বৃদ্ধি, বিষয় সম্পত্তির সুবন্দোবস্ত করার সঙ্গে সঙ্গে রাজপ্রাসাদ নবীকরণ, নগর সজ্জা ইত্যাদি বিষয়ে সচেষ্ট হন। ১৮৪৯ খ্রীঃ তিনি ইটালিদেশীয় দক্ষ স্থপতি আনিয়ে পুরনো অট্টালিকার বহু রদ-বদল করান, নতুন করে ইটালিয় স্থাপত্যের অনুসরণে 'মহ্‌তাব্‌মঞ্জিল' নির্মাণ করান এবং সুউচ্চ প্রাসাদের মাথায় একটি ঈগলের প্রতিকৃতি স্থাপন করান। ঐ প্রাসদ সংলগ্ন অনেকগুলি প্রাসাদ নির্মান করান। যেমন আয়েশ 'মহল', দক্ষিণখণ্ড, ছোটখণ্ড, বড় খণ্ড, দিলারাম, রঙ মহল, মোবারক মঞ্জিল, রাজমহল, অস্ত্রাগার এবং ইউরোপীয় অতিথি শালা। অট্টালিকাগুলির নির্মাণ কৌশল এমন ছিল যে, একটি থেকে আর একটিতে যেতে হলে ভিতরের অলিন্দপথ দিয়ে যাতায়াত করা যায়। আঞ্জামান কাছারীর মাথার উপরে একটি 'টাওয়ার ক্লক' আছে। এই ঘড়িটি চতুর্মুখী। প্রাসাদগুলির পৃথক পৃথক বিভাগ ছিল, মহারাণীর অন্দর মহল, রাজসাগর মহল, আত্মীয় স্বজনের সম্পূর্ণ ভিন্ন মহল, পুত্র কন্যাদের জন্য অপর এক মহল।

পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে রাজপ্রাসাদ মধ্যেই শ্রীশ্রী লক্ষ্মীনারায়ণজীউ মন্দিরের নির্মাণ কাজ শুরু করেন মহারাজ তিলকচাঁদ। তাঁর সময়ে নির্মাণ কাজ শেষ হয় নাই। পরবর্তি মহারাজ তেজচাঁদের সময় ঐ ঠাকুর বাড়ীর কাজ সমাধার দিকে বহুদূর অগ্রসর হয়। তিনিও

সম্পূর্ণ শেষ করতে পারেন নাই। তৎপরে মহাতাব্ চাঁদের সময়ে কাজটির সমাপ্তি হয়। এই বিশাল সুউচ্চ দেবালয় অপূর্ব কারুকার্যখচিত, বিশাল স্তম্ভ বিধৃত নাটমন্দির, সম্মুখে নহবৎখানা, পাতালেশ্বর শিব। লক্ষ্মীনারায়ণজীউ মন্দিরের প্রবেশের মুখে একটি 'রাসমঞ্চ আজও ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়ে প্রাচীন ঐতিহ্যকে ধরে রেখেছে। এই দেবী দর্শনে রাজপুরনারীরা যেমন অন্দরমহলের অলিন্দ পথে আসতে পারেন, তেমনি সাধারণ উৎসব দর্শনার্থীরাও যাতে বার থেকে আসতে পারে তারও ব্যবস্থা ছিল। "কাছাড়ী বাড়ীর দক্ষিণ অঞ্চলে, প্রাসাদের পূর্বাংশে, সোনাপট্টির পর সুউচ্চ তোরণদ্বার, এই তোরণ পথ দিয়েই সাধারণজন দেবদর্শনে যেতে পারতেন। এই দেবালয় উদ্বোধন অনুষ্ঠানে তিন লক্ষ ব্রাহ্মণকে আমন্ত্রণ জানান হয়।" (নগর বর্ধমানের দেবদেবী, নীরদবরণ সরকার, পৃঃ ৩৩) মহ্তাব্চাঁদ গোলাপবাগে 'দিলখুশা প্রাসাদ' নির্মাণ করান গ্রীষ্মকালে থাকার জন্য। প্রাসাদের বৈশিষ্ট্য হলো, ঐ প্রাসাদের তলদেশ দিয়ে প্রবাহ চলতে পারে এইরূপ বিরাট জলাশয় খনন করান যা গোলাপবাগ বেষ্টিত পরিখার সঙ্গে যুক্ত।

মহ্তাব্চাঁদ শহরের সুপ্রশস্থ পথের দুপাশে নানা প্রকার ফল ফুলের বড় বড় গাছ রোপন করে 'এ্যাভিনিউ' তৈরী করেন। রাজবাড়ীর উত্তর দিক হতে, গোলাপবাগের পূর্বদিক বরাবর উত্তরদিকে জি.টি.রোড পর্যন্ত বিস্তৃত লাল মোরামের পথ নির্মাণ করে তার দুপাশে বড় বড় বৃক্ষ রোপণ করান। এই রাস্তার নাম ছিল 'দিলখুশ' এ্যাভিনিউ। মহ্তাব্চাঁদই কৃষ্ণসাগর, শ্যামসাগর, রাণীসাগর প্রভৃতি পুষ্করিণীর চতুষ্পার্শ্বে আম, জাম, জামরুল, বকুল, ঝাউ, চালতা প্রভৃতি গাছ রোপন করে তাদের শোভা বর্ধন করেন। গোলাপবাগের মধ্যে বহু মূল্যবান বৃক্ষ, অশোক, নাগেশ্বরী, মেহ্গনী, নানারকম মূল্যবান গাছ রোপন করে তার শোভা বর্ধন করেন। গোলাপবাগের পূর্বদিকে রমনীয় 'রমনার বাগ' তাঁরই রচনা। দেশবিদেশের নানা জায়গা থেকে ফল-ফুল ইতাদি বিভিন্ন প্রকার বৃক্ষাদি সংগ্রহ করে এখানে লাগিয়েছেন। রমনার বাগের দক্ষিণ ফটক দিয়ে প্রবেশ করলে দেখা যাবে সুন্দর স্বচ্ছসলিলা পুষ্করিণী, চারদিকে বাঁধা ঘাট, প্রত্যেক ঘাটের মাথায় শিব মন্দির।

মহ্তাব্চাঁদ দার্জিলিং, আগ্রা, কানপুর, খরসান, চুচুড়া, কালনা প্রভৃতি স্থানে বহু পান্থাবাস নির্মাণ করেন।

তিনি রাজবাড়ীর মধ্যে আরও কতকগুলি বিভাগের গৃহ পুনঃ সংস্কার করান তোষাখানা, মহাফেজখানা, খাজনা খানা এবং ধনাগার। ধনাগারটি ছিল বিশেষ নৈপুণ্যে নির্মিত। দুটি আগার এর দেওয়াল একীভূত, আর তার দ্বার দেখলে মনে হতো না সেটি দরজা, সাধারণ দেওয়াল বলেই ধারণা হতো। এই দরজার গুপ্তচাবি বাইরে থেকে বোঝা

যেত না। সেই দরজার পেছনে ছিল একটি মোটা স্টীল সীটের দরজা, এই দরজা পার হয়ে গিয়ে গুপ্ত আগারের লোহার দরজা। পাশে, উপরে, নীচে স্টীলের হাতলযুক্ত প্যাডলক ছাড়া বড় আগড় তালা লাগানো থাকতো। এই আগড় তালা অন্য দরজাতেও থাকতো। যে ধনাগারের এত সতর্কতা সে ধনাগারে কিরূপ ধনসম্পদ থাকতো তা জানতে আগ্রহ সকলেরই হয়ে থাকে। মহারাজ মহাতাব্‌চাঁদের সময় যা ছিল এবং যে তথ্য জানা গেছে তার বিবরণ লিপিবদ্ধ করা গেল। গুপ্ত কক্ষের ভেতরে কতকগুলি বড় বড় 'হাউজ' ছিল। চারটি হাউজে দেখা গিয়েছিল ২১ লক্ষেরও বেশী রৌপ্য মুদ্রা। তিনটি দেশী সিন্দুকে ছিল ৪,৫০০ (চার হাজার পাঁচ শত)-এর অধিক অর্ধমোহর, ১৪০০ (একহাজার চার শত) অধিক সিকি মোহর, ৩৩০ (তিন শত ত্রিশ) পূর্ণ আকবরী মোহর, ৩৪০ (তিন শত চল্লিশ) ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মোহর, ৫০ (পঞ্চাশ) টি মিন্টের তৈরী স্বর্ণমুদ্রা, ৫০ (পঞ্চাশ) টি ব্রিটিশ সভ্‌রিন্‌। এছাড়া তখনকার বঙ্গদেশের প্রচলিত কিছু মোহর এবং পাঁচ মিশালি মুদ্রা ছিল।

মহারাজ মহ্‌তাব্‌চাঁদের আর এক সৌখিনতা ছিল, তা হলো সমাধি সৌধ নির্মাণ। তৎপূর্বে মহারাজাদের 'সমাজ বাড়ী' ছিল দাঁইহাটে। তৎতৎকালে দাঁইহাট ছিল অতি উন্নত ধরণের নদীবন্দর ও ব্যবসায় কেন্দ্র। কাজেই ঐ সময়ে রাজপ্রসাদ ছিল দাঁই হাটে। কাজেই সেই সময় পরলোকগত রাজন্যবর্গের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার পর তত্রত্য সমাজবাড়ীতেই অস্থি বা চিতাভস্ম'র ওপর সমাজ দেওয়া হতো। কিন্তু মহ্‌তাব্‌চাঁদ, মহারাজ তেজচাঁদের পরলোক গমনের পর অম্বিকা কালনায় তাঁর অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। পরে ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে মহ্‌তাব্‌চাঁদ, মহারাজ তেজচাঁদের চিতাভস্ম'র উপর 'সমাজ' প্রতিষ্ঠা করতঃ, তাহাতে যে শিলালিপি গ্রথিত করেন তাহার শ্লোক —

> "নৃপতিশ্যকাদিত্যস্যাতীতাব্দাঃ ১৭৫৪/৪/১/১৪
> শাকে বেদেষুসপ্তারনির্মিত ইহ গঙ্গাস্থলান্তঃস্থ দেহং
> যোগাত্যক্তাম্বিকায়ামমরপুরগমাৎ তেজচন্দ্রো নৃপেন্দ্রঃ।
> হর্ম্ম্যং চক্রে সমাধে নৃপকুলতিলকঃ শ্রী মহ্‌তাব্‌চন্দ্রঃ
> সিংহদ্ব্যংশে রবৌ শ্রীমতি কমলকুমার্য্যাঃ স্বমাতুর্নির্দেশাৎ।।"

মহারাজ মহ্‌তাব্‌ চাঁদ, অম্বিকায় তেজচাঁদের সমাধি মন্দির নির্মাণের পর "কিঞ্চিৎ অস্থি লইয়া শ্রীক্ষেত্রধামে সমুদ্রতীরে একটি সমাধি মন্দির প্রস্তুত করতঃ তন্মধ্যে গ্রথিত করিয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদ দ্বারা তাহার ভোগ প্রদানান্তে নিত্য অতিথি ভোজন করানো হইয়া থাকে। সেই সমাধি ক্ষেত্রে তৎপরবর্তী মৃত মহারাজা ও মহারাণীদিগেরও সমাধি মন্দির প্রস্তুত হইয়া, উক্তপ্রকার মহাপ্রসাদ দ্বারা অতিথি সৎকার হইয়া আসিতেছে।"

(রাজবংশানুচরিত পৃঃ ১৯০)।

মহারাজ প্রতাপচাঁদের মৃত্যু ঘোষিত (১৮২১ খ্রীঃ) হলেও তাঁর কোন সমাধি মন্দির বা স্মৃতি ফলক কোথাও পাওয়া যায় নাই। তবে তাঁর দুই মহিষীর প্রয়াণের পর মহতবচাঁদ অম্বিকা কালনায় তাঁদের শেষ কৃত্য সম্পন্ন করে সমাধি মন্দিরে যে স্মৃতিফলক প্রথিত করেন তা নিম্নরূপ —

১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ৮ই ফেব্রুয়ারী, সন ১২৬৯ সালের ২৭ শে মাঘ তারিখে প্রতাপচাঁদের জ্যেষ্ঠা মহিষীর মৃত্যুর পর অম্বিকা কালনায় তাঁর পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন করে সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। সেই স্মৃতি ফলকে উৎকীর্ণ আছে—

"যুগাদ্রি সিন্দুচন্দ্রমে শকাধিরাজ বৎসরে
গতা সমাধিমন্দিরে সবাসনা পরাৎপরে।।
বদান্যতৈকরোচনা প্রশান্ত সর্ব্বশোচনা
প্রতাপচন্দ্র ভূপতি প্রধানবাম লোচনা।।"

শকাব্দা ১৭৮৪।

জ্যেষ্ঠা মহিষী প্যারী কুমারীর পরলোক গমনের পাঁচ বছর পর ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই ডিসেম্বর, সন ১২৭৫ সালের ২রা পৌষ প্রতাপচাঁদের কনিষ্ঠা মহিষী আনন্দকুমারীর মৃত্যুর পর তাঁরও সমাধি মন্দির অম্বিকা কালনায় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তাঁর স্মৃতি ফলকে উৎকীর্ণ আছে —

"শরাঙ্ক বারভূমিতে
শকে সমাধিসঙ্গতা।
প্রতাপচন্দ্র ভূপতি—
দ্বিতীয়পাণিপীড়িতা।।"

শকাব্দা ১৭৯৫।

ইংরেজ আনুগত্য ঃ—

মহারাজাধিরাজ মহ্‌তাবচাঁদ (১৮৪৪ খ্রীঃ) যখন রাজ্যভার গ্রহণ করেন তখন সারা ভারতবর্ষে ইংরেজ আধিপত্য বেশ কায়েম হয়েছে, বলতে পারা যায়। ১৭৫৬ খ্রীঃ পলাশী যুদ্ধের পর প্রকারান্তরে বাংলা ইংরাজদের অধীনে যায়। তার ৪ বছর পর (১৭৬০ খ্রীঃ) বর্ধমান জমিদারী (বর্ধমান চাকলা সহ মেদিনীপুর, চট্টগ্রাম) রাজস্ব আদায়ের সনদ কোম্পানির হাতে চলে যায়। নবাবী শাসন সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তিনি অতিশয় দূরদর্শী ছিলেন, তাছাড়া তিনি স্পষ্টই বুঝেছিলেন, ধুরন্ধর ইংরেজশক্তির

বিরুদ্ধাচারণ করে তাঁর মত অতি ক্ষুদ্র শক্তির সংগ্রাম করা সহজ সাধ্যতনয়-ই এবং সমীচিন হবে না। ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে, নবাব সিরাজউদ্দৌল্লার বিপুল বাহিনী কিভাবে পরাজিত হয়েছে। তাঁর দুই-তিন পূর্ব-পুরুষগণ ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন, দুই একবার জয়লাভও করেছেন, শেষে বিফল হয়েছেন। কারণ, দেশীয় কোন রাজন্যবর্গ বা দুই-একটি ক্ষুদ্র জমিদার ছাড়া কেহই সহযোগিতা করেন নাই। কাজেই ইংরেজদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করলে বহু প্রজার প্রাণহানি হবে, শান্তি বিঘ্নিত হবে, শুধু তাই নয়, দেশীয় শক্তি যে তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করবে তার কোন ভরসা নাই। হয়তো সেইজন্যই তিনি ইংরেজদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছিলেন। তাই তিনিও ইংরেজদের নিকট হতে সম্মানিত হয়েছেন এবং করদ রাজার সমপর্যায়ে উন্নীত হয়েছিলেন।

মহ্‌তাব্‌চাঁদ, প্রত্যক্ষভাবে ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে সাঁওতাল বিদ্রোহ এবং ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহে ইংরেজদের সহযোগিতা করেন পূর্বেই সে কথা উল্লেখ করেছি। ইংরেজদের সাহায্য করা ঠিক হয় নাই—সত্য, তবে তিনি শান্তিতে বন্ধুসুলভ মনোভাব নিয়ে জমিদারী পরিচালনা করে যেতে চেয়েছিলেন। সেইভাবেই তিনি সৌহার্দ্য বজায় রেখে তাঁর রাজ্য রক্ষা, প্রজাপালন, তাদের মঙ্গলসাধন ও জনহিতকর বহু কাজ তিনি করে চলেছিলেন। জন্যকল্যাণকর কর্মের জন্যই তিনি ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক প্রশংসিত, সম্মানিত হয়েছিলেন, তিনি নিজে কখনও ইংরেজদের কাছে সম্মান ভিক্ষা করেন নাই, ইংরেজ সরকারের পত্রগুলি পড়লেই তা অনুধাবন করা যায়।

১৮৬৬ খ্রীঃ-এর দুর্ভিক্ষের ঘটনা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। মহাতাব্‌চাদের দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের যেভাবে সাহায্য করেছিলেন, তাঁর সেই অকৃপণ বদান্যতার জন্য তৎকালীন ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারেল জন লরেন্স নিজ হাতে লিখে যে পত্র দিয়েছিলেন তা আগেই লিবিবদ্ধ করা হয়েছে। মহারাজ মহ্‌তাব্‌চাঁদ কখনও গভর্ণর সাহেবকে তাঁর ত্রাণ কর্মের কথা বলেন নাই বা প্রশংসা করে পত্র লিখতেও অনুরোধ করেন নাই। রাজবংশানুচরিত ১৬৪ পৃঃ লিখিত আছে, "মহারাজার বহুল সদগুণ, অসাধারণ দানশীলতা ও অক্ষুন্ন রাজভক্তির পরিচয় পাইয়া, ভারত গবর্ণমেন্ট তাঁহাকে অতিশয় সম্মান করিতেন।" আবার উক্ত গ্রন্থের ১৬৫ পৃষ্ঠায় পাওয়া যায়, মহারাজের নানা প্রকার জনহিতকর কাজের জন্য মহারাণী ভিক্টোরিয়া তাঁকে '*Court of Arms*' দ্বারা সম্মানিত করেছেন, "মহারাজার সদগুণাবলি, ... মহোচ্চ বংশমর্যাদা দৃষ্টে ১৮৬৮ খৃঃ মহামহিমান্বিতা শ্রীশ্রীমতী ভারতসম্রাজ্ঞীর আজ্ঞানুসারে লণ্ডণস্থ 'কলেজ অব্ আরম্‌স্' হইতে, ইংলণ্ডস্থ কাউন্সিলর এডওয়ার্ড-জর্জ-ফিটজেলেন-হাওয়ার্ড, আরল-মার্শেল হেনরি ডিউক অব্-নর্ফোক, প্রভৃতির সম্মতিক্রমে গ্যাথারইল হার্ডি,

চার্লস জর্জ ইয়ং গার্টার, রবার্ট লরি অব ক্লেরেন্স প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের ও সর্ব্বোপরি মহামহিমান্বিতা ভারত সম্রাজ্ঞীর স্বাক্ষরিত মহোচ্চ সম্মান সূচক রাজচিহ্ন (Armonial Bearings) সংরক্ষণের সনন্দ প্রাপ্ত হয়েন।"

মহারাজ মহতাবৃচাঁদ, ১৮৫৫ ও ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে যা সহায়তা করেছিলেন তৎপরে আর কোনরূপ সাহায্য করেছিলেন কিনা সে সম্বন্ধে কোন রেকর্ড পাওয়া যায় নাই, তবে তিনি ইংরেজ সরকারের কোনরূপ বিরুদ্ধাচারণ করেন নাই এবং কোন চাটুকারিতাও করেন নাই। তিনি নিজ বিশাল জমিদারী বা রাজ্যের সামগ্রিক মঙ্গল জনক কর্ম করে এসেছেন। তার জন্য ব্রিটিশ সরকার তাঁকে নানাভাবে সম্মান দিয়েছেন।

১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ভয়াবহ ম্যালেরিয়াক্রান্তদের জন্য, নিজ রাজ্য এবং তাঁর বহির্রাজ্যেও অকাতরে সাহায্য পাঠিয়েছেন। আগে তার বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এবং তাঁর মহত্ব ও মহানুভবতার জন্য সরকারি পত্রের হুবহু প্রতিলিপির উল্লেখ করেছি।

এখানেও ব্রিটিশ সরকার তাঁকে সম্মানের আসনে বসিয়েছেন। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ২য় পুত্র ডিউক এডিনবরা যখন ভারতবর্ষে তখন তাঁকে অভ্যর্থনা করার জন্য কলকাতায় এক সভার আয়োজন হয়, সেই সময় তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল এবং তাঁকে বিশেষ একটি সম্মানীয় কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। উদ্ধৃতাংশ থেকে বোঝা যায়, ইংরেজরা তাঁকে কিরূপ শ্রদ্ধা সম্মান করতেন। —

"মহামান্যা শ্রীশ্রীমতী ভারত সম্রাজ্ঞীর মধ্যম পুত্র ডিউক অব্ এডিনবরা, ভারতবর্ষে শুভাগমন করিলে, তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য কলিকাতায় যে মহতী সভার অধিবেশন হইয়াছিল, উক্ত সভায় উপস্থিত হইবার জন্য ভারতবর্ষের মহামান্য গবর্ণর জেনারেল বাহাদুর মহারাজকে আমন্ত্রণ করেন। বর্দ্ধমানাধিপতিই উক্ত সভায় ভারতের যাবদীয় রাজন্যবর্গের সহিত ডিউকের পরিচয় করিয়া দিবার ভারপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন।" (রাজবংশানুচরিত পৃঃ১৭১)

তৎকালে ভারতবর্ষে বহু রাজন্যবর্গ ছিলেন, সরকার উক্ত কর্মের ভার অপর যে কোন রাজন্যের ওপর দিতে পারতেন, কিন্তু তা না করে, বর্ধমান রাজকেই দিয়েছিলেন। তার কারণ, বর্ধমান রাজ কর্তব্যপরায়ণ, দায়িত্বশীল, তাঁর উপর সরকারের ছিল শ্রদ্ধা। তা ছাড়া, মহারাজের উপর আরও আস্থা ছিল, মহারাজ রাজন্যবর্গের সঙ্গে ভব্যতা রক্ষা করে ডিউকের পরিচয় করিয়ে দিতে পারবেন। যা হোক ঐ সভায় ডিউকের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পর মহারাজ সৌজন্যতা ও ভদ্রতার খাতিরে বর্ধমানে নিজ রাজ ভবনে আমন্ত্রণ জানান।

ডিউক যখন বর্ধমান রাজ ভবনে আসেন (৫ই জানুয়ারী ১৮৭০, বুধবার) তখনও মহতাবৃচাঁদ নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে চলেছেন। এই উদ্ধৃতিটুকু থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় —

-"এতাদৃশ উচ্চ-পদস্থ ইংরাজদিগের সহিত মহারাজার এতদূর ঘনিষ্টতা থাকা সত্ত্বেও, তিনি কখনও ইংরাজী পরিচ্ছদ পরিধান অথবা ইংরাজী হাবভাবের অনুকরণ করিতেন না। যতদূর সম্ভব স্বদেশীয় চাল-চলনের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া চলিতেন।" (রাজবংশানুচরিত পৃঃ ১৭২)

মহ্তাব্চাঁদ ইংরাজী, বাংলা, হিন্দী, পারস্য প্রভৃতি ভাষায় ছিলেন দক্ষ ও ব্যুৎপত্তি সম্পন্ন। "তিনি যখন যে ভাষায় কথোপকথন করিতেন, ভ্রমেও তাহার সহিত অপর ভাষা মিশ্রিত করিতেন না।.... অতি মিষ্টভাষী সদালাপী ছিলেন।"(রাজবংশানুচরিত পৃঃ ১৮৬)

আর্তত্রাণে মহারাজ মহ্তাব্চাঁদের অবদান কম নয়। পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে তিনি কেবলমাত্র নিজ রাজ্য বা জমিদারীর মধ্যে (দানশীলতা) ত্রাণকার্য সীমাবদ্ধ ছিল না, দক্ষিণে মাদ্রাজ পর্যন্ত তা বিস্তৃত ছিল। এজন্য তিনি নিজে কখনও ভারতের গভর্ণরকে অবগত করেন নাই, তৎকালীন বঙ্গীয় সরকার, বিভাগীয় কমিশনারগণ মহারাজার বদান্যতার কথা, ভারত সরকারকে রিপোর্ট করেছেন। তার ভিত্তিতেই ব্রিটিশ সরকার তাঁকে সম্মানিত করেছেন। মহারাজ, তাঁদের সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ ব্যবহার করেছেন, তা হলো নিতান্ত মানবিকতার খাতিরে এবং বন্ধুত্বের খাতিরেই মহারাজ, মহারাণী ভিক্টোরিয়ার একটি প্রস্তরমূর্তি 'কলিকাতার মিউজিয়ামে স্থাপন করতঃ মহামান্য ভাইসরয়কে তাহার আবরণ উন্মুক্ত করিবার জন্য অনুরোধ করেন (বংশানুচরিত পৃঃ ১৭৯)। ইহা কি ইংরাজদের প্রতি মহারাজের তোষণ নীতি? ইহাকে ইতিহাসের একটি উপাদান হিসাবে মিউজিয়ামে রাখা যেতে পারে না? প্রকৃতপক্ষে যখনই দেশের কোন অঞ্চলে মানুষের দুঃখ দুর্দশা দেখা দিয়েছে, তখনই তিনি নির্দ্ধিধায় তাদের সাহায্যে হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন; অকাতরে অর্থ-খাদ্য বিতরণ করেছন। যাই হোক, উক্ত মূর্তির আবরণ উন্মোচন ব্যাপারে ভাইসরয়-এর প্রাইভেট সেক্রেটারী মহারাজকে যে পত্র দিয়েছিলেন তার বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হলো —

সিমলা

১৩ই জুলাই, ১৮৭৭

"প্রিয় মহারাজা।

মিঃ মার্শেল উডের নিকট হইতে আপনি ভারত সম্রাজ্ঞীর প্রস্তরময়ী প্রতিমূর্ত্তি ক্রয় করতঃ, তদীয় ভারতসম্রাজ্ঞী উপাধি গ্রহণ উপলক্ষে এতদ্দেশীয়ের সকৃতজ্ঞ স্মৃতি চিহ্ন স্বরূপ, উহা ভাইসরয়কে গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া বিগত ২০ জুন তারিখে যে পত্র লিখিয়া ছিলেন, তাহা প্রাপ্ত হইলাম।

লর্ড লিটন বাহাদুরের আদেশানুসারে আপনাকে অবগত করিতেছি যে, আপনার প্রদত্ত উক্ত মহোচ্চ উপহারটি ভারত সরকার সাদরে গ্রহণ করিবেন। যেহেতু উহা ভারত ইতিহাসে একটি অতি প্রয়োজনীয় ঘটনা মধ্যে পরিগণিত হইবে।

আপনার অভিপ্রায় অনুসারে, ভাইসরয়, বঙ্গেশ্বর ও কলিকাতার রাজকীয় মিউজিয়মের প্রধান প্রবেশদ্বারের সম্মুখেই উক্ত মূর্ত্তি স্থাপন করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

আপনার অকৃত্রিম বন্ধু
ও. জে. বরণ্
Simla
13th July 1877.

My dear Maharaja,

I have the honor to acknowledge the receipt of your letter of the 20th inst. intimating your purchase of Mr. Marshall Wood's statue of the Queen and Empress of India and requesting that the Viceroy may be pleased to accept it on behalf of the nation, as a gift from yourself in commemoration of her Magesty's assumption of the title of Empress of India.

In reply I am directed by Lord Lytton to express the gratification with which the Government of India accept the munificent gift thus offered by you in association with an event which has so important a bearing on the history of this country.

In accordance with the wishes expressed by you the Viceroy has in communication with the Lieutenant Governor of Bengal and the trustees of the Imperial Museum at Calcutta, arranged that the statue shall be placed in the main Entrance of the Museum, and it will give His Excellency much pleasure to unveil it on the first anniversary of the assumption of the Imperial title.

I remain
Your Highness' Sincere friend,
O.J.Burne.

My Lord,

May it please your Excellency.

In offering this status of our Gracious Sovereign for your Excellency's acceptance on behalf of the nation I beg leave to express to your Excellency

my deep sense of privilege which has been accorded to me in being permitted to do so. From the time when it was first intimated, that it was Her Majesty's Gracious intenticn to shed lustre upon the Imperial title by assuming it, it has been my heart-felt desire to create in the Capital of the Empire some memorial of the Great and Auspicious Event, and it appeared to me that the most fitting memorial I could offer to the people would be a Statue of Her Majesty to be erected in their midst My Lord, the many acts of grace which we, Her Majesty's Indian subjects, have received from our Beloved Sovereign need not be recited by me They are evidenced in the Hapiness and freedom we enjoy, in our guarded rights, our protected religious and our Imperial laws, and when on the first of January last year Her Majesty assumed the titled of Empress of India She crowned all former acts of grace and enshrined herself for ever in the hearts of my countrymen.

Your Excellency, the year which was thus happily commenced was unfortunately darkened by one of the most aflicting calaxities that history can record, but my Lord, we have seen thar calamity met in a manner that has no parallel in the pages of history and in witnessing the noble exertions made by your Excellency and your Government, and by all classes of Englishmen in this country in aid of the vectims of famine, and in receiving the magnificent assistance which England and Australia poured into our country to provede food for our starving, and shelter for our homeless, we have learned that not only by the bonds of policy are we bound to the great English race, but by the warner ties of sympathy, fellow-feeling and brotherhood.

It is my earnest conviction, My Lord, that lesson will never be forgotten, and that many generations of my countrymen will look upon this statue with pride in the common allegiance which unites them to the greatest and most generous people of the west; and with love and reverence in their hearts towards that great and gracious Lady, who by taking upon herself

the title of Empress of India gave form to their Empire, and to themselves a defined place among the nations of the world.

My Lord, I beg now to present this statue to the people, and to humbly thank your Excellency for having honored my gift by consenting to unveil it.

Reply of His Excellency the Viceroy to the address given by His Highness the Maharaja of Burdwan on the occasion of the unveiling of the statue of Her Majesty the Empress of India.

1 st January 1878.

Maharaja, I esteem it no common privilege that on this the first anniversary of the day when our August Sovereign assumed the Imperial title specially associating with her ancestral crown so important a portion of its vast dominoes, I should hate been asked to unveil the statue of Her Majesty, which the generosity of one of the most loyal Indian subjects has added to the historic memorials of her Indian Empire.

As her Majesty's representative in this country I gratefully accept on behalf of its Government and people the volued gift of your Highness. For the bestowal of that gift you have appropriately selected this memorable that your Highness has no less accurarely interpreted that you have eloquently expressed the sense of national satisfaction with which every Indian city, every Indian province, appreciates the definite place assigned to India among the nations of the world by that gracious decision of Her Majesty which, on the first day of the year now ended was proclaimed in the ancient capital, and again on the first day of the year now opening, is commemorated in the modern capital of Hindustan.

There is a singular suggestive contrast between different scenes in which, on each of the two occasions, it has been my privilege to take part. On this day, twelve months ago the Imperial title of the Sovereign of India

was proclaimed amidst the monumental record's of India's grandeur in the past. The solemn shrince of her earliest faiths, the silent places of her departed dynasties, the splendid tombs of her illustrious were then aorund us. How different is the scence on which, from the porch of this building, we may now look forth! Everywhere we see around us here the growing evidences of Indea's future greatness a busy harbour thronged with ships that bear to her shores the commerce of two hemispheres, a brisk metropolis whose teeming streets and stately marsions have sprung. almost within the memory of living man, out of the widening wealth and industry of its citizens. Thus in spacious place, beneath its undisputed sway, the present sceptre of this old but still freshly flourishing empire, associates progress with conservation, uniting prowess of the past to the promise of the future, and continuously transmitting, witnout violnce to the days to come the accumulated tribute of the days gone by.

It is for this reason that the public pomp which solemnised the great national assemnlage of last year, was no mere empty pageant. Its magnificeuce not only embellishes the memory of a people, but the benignant purpose it so fitly symbolised is still the people's permanent possession. Allow me to remind you of the old Greek story of the dispute between Feast day and the Day after the Feast. The Day after the Feast was dissatisfied with what it deemed the unmerited popularity of the Feast Day. "You" it said to its predecessor "have fraudulently secured by mere flourish of trumpets the public notice better deserved by the busy work of my silent hand." "That may be true" replied the Feast Day "but remember this had I not been been befote you, you would not have been at all." I need not point the obvious moral of this little fable. Nor need I dwell upon the fact, so intelligently appreciated by your Highness, that, in ordering her Government in this country to proclaim with special solemnity the title she assumed last year, Her Majesty desired to give public emphases to her

Royal recognition of the Imperial duties owed by England to England's great Eastern Dependency and to the equal solicitude, with which the national interests of Her Eastern and Western subjects are cherished by their common Sovereign. Of this solicitude so many and such touching proofs have been vouchsafed to me, thar I shall be unworthy to stand here if I could speak of them without emotion During the past year, the sufferings of the people and difficulties of the Government of India, have been great indeed. But they have not been greater than the tender sympathy with which Her Majesty has personally studied every detail of our terrible calamity, and encouraged every effort of Her Government to overcome the difficulties of its anxious task. It is the duty of those to whom Her Majesty has entrusted the administration of this great empire to give effect to her gracious intentions by patiently developing the practical application of those principles which can alone ensure its permanent and progressive prosperity. In the performance of this duty, our judgment may sometimes err, our foresight sometimes fall, for we are not less fallible than other mortals, but I can confidently assert that the one object we have ever honestly at heart is to deserve the confidence of our Sovereign, by preserving and promoting for her people throughout India those blessings of personal freedom combined with social order which we regard as the common heritage of all British subjects

By none of Her Majesty's subjects have those blessings been more intelligently appreciated and utilised than by your Highness. This is not the first, nor the second time that you have earned from the Government of India its acknowledgment of your generous sympathy in what it represents. Distinguished no less by wealth and position than by liberality and enlightenment you are justly regarded by your countrymen in Bengal as one of their trusted leaders In that capacity you have ever laboured to harmonise the aspirations of the people with the requirements of the state

and the assistance our Government has so frequently received from you has been always given with an unobtrusive tact, and just appreciation of circumstances and motive, which greatly enhance the value of it, and can not be too cordially acknowledged. With this your latest gift to the Empire of India, The memory of its donor will be honorably associated by the children of the future. Over the future, as over the august image we are about to confide to its reverent keeping, the veil still hangs. But it is a veil of which an occasion such as this, our thoughts instinctively anticipate the withdrawal. We ourselves, are the children of a century that is already far advanced towards its close . and some of us may possibly survive it. Looking forward, I can fancy that I see and hear that unreturning traveller, our parent century suspending its latest footstep as it passes from the world it governed to pause by yonder statue, and say to its successor in time the century about to come, "Look on this majestic marble, and learn from its mute evidence that I united under one just and gently sceptre the children of the East and West My days have been good and evil. My troubles were great so were my triumphs. But never through still or stormy times did the men I taught and trained to rule this land forget the duty I had laid upon them, to promote the peace of its princes and the prosperity of its people. I am about to disappear . and the tempests that have gathered round me sink with myself into the dim and quiet bosom of the past But though my life is ending the work of it endures. Lose not lower not, stain, not, the high and glorious heritage I bequeath to you". Of that heritage Maharaja, India receives from your hand the honored symbol. Calcutta has been called a city of statues and truly, I know of no other city of the British Empire so richly dowered with memorial images of those whose lives have helped to make this Empire what it is. But until to-day our Indian metropolis has lacked the one great image of all that we, the various subjects of the Empire, most honor and revere in the sovereign personifivation of its noblest and

gintlest attributes.

Therefore it is with gtateful appreciation of the private generousity which has so appropriately satisfied this public want that I now proceed to unveil the statue of our Queen and Empress.

Indian telegraph

To, From

MAHARAJA Sri Ashly Eedn

Burdwan,

I Have communicated your telegram to His Excellency the Viceroy who desires me to express to you his sincere thanks for this fresh instance of that well known loyalty to the British Government which you lose no opportunity. of evincing, The Government of India will not avail itself of your generous offer, not at present, being in want of advances of money.

কলিকাতা মিউজিয়ামে 'ভিক্টোরিয়া' মর্মর মূর্তি প্রদানের পূর্বে, ১৮৭৭ খৃঃ ১লা জানুয়ারী তারিখে ইণ্ডিয়া গেজেটে উল্লেখ আছে — "দুর্ভিক্ষ ও মহামারী উপস্থিত হইলে দরিদ্র ও পীড়িতগণের সাহায্যার্থে অসাধারণ বদান্যতা প্রদর্শন এবং তদীয় অক্ষুন্ন রাজভক্তির পর্য্যাপ্ত প্রমাণ সমূহ দর্শনে, তৎসমূহের পুরস্কার স্বরূপ দিল্লী দরবারে ১৮৭৭ খৃঃ ১লা জানুয়ারী তারিখে ভারত গবর্ণমেন্ট তাঁহাকে মহোচ্চ সম্মান প্রদর্শন করেন। তিনি স্বাধীন ভূপতি না হইয়াও তাঁহাদিগের ন্যায় গবর্ণমেন্ট হইতে আজীবন 'হিজহাইনেস' উপাধি ও ১৩ তোপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।" (রাজবংশানুচরিত পৃঃ ১৮০) এখানে উল্লেখ্য, উক্ত তারিখটি ছিল মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ৬০ বছর রাজত্বের জুবিলি অনুষ্ঠান; অনুষ্ঠিত হয়েছিল দিল্লীর দরবারে। সেই সময় মহারাজার শরীর অসুস্থ থাকায় অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারেন নাই। এই মহোচ্চ সম্মানের জন্য ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারেলকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ মানসে মহারাজ ফেব্রুয়ারী মাসে কলকাতা গমন করেন। মহারাজ, হাওড়া ষ্টেশনে পৌছলে "বেঙ্গল গবর্ণমেন্টের আদেশানুসারে, হাওড়া ষ্টেশনে তত্রস্থ ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বাহাদুর তাঁহাকে প্রথম অভ্যর্থনা করেন। তৎপরে পুলিশ বিভাগ হইতে তাঁহাকে সামরিক সম্মান প্রদর্শন করা হয়। পরিশেষে বেঙ্গল গভর্ণমেন্ট প্রেরিত শকট সহ বঙ্গেশ্বরের এডিকং কর্তৃক সমাদৃত হইয়া, তৎসহ কলিকাতাস্থ স্বীয় আবাস ভবনে গমন করেন।" (রাজবংশানুচরিত পৃঃ ১৮০-১৮১)

ঐ সম্বন্ধে বেঙ্গল গভর্ণমেন্টের প্রাইভেট সেক্রেটারী মহারাজকে যে টেলিগ্রাম

করেন তার প্রতিলিপি এইরূপ —

"I telegraphed to you to day regarding your reception at the Howrah station on your arrival on Saturday at 3 P.M.. A guard of Police will be furnished and the Magistrate of Howrah and an Aide-de-camp of His Honour will receive you at the Railway Station.

His Honour has also directed that a carriage should be sent to convey you to your house.

Belvedere Alipore
The 22nd February, 1877

ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারেল-এর সঙ্গে মহারাজার সাক্ষাৎ হওয়ার সম্বন্ধে তাঁহাকে কিভাবে অভ্যর্থনা করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তার আদব-কায়দা সম্পর্কীয় ভারত সরকারের আণ্ডার সেক্রেটারীর লিখিত লিপি থেকে জানা যায় মহ্‌তাব্‌চাঁদকে ব্রিটিশ সরকার কিরূপ সম্মান করতেন। তার একটি প্রতিলিপি হুবহু উদ্ধৃতি করা হলো। (রাজবংশানুচরিত পৃঃ ১৮২-১৮৩) ইংরাজী অনুচ্ছেদ . . . . .

Foreign Department
Fort William the 23rd Feb., 1877

Programme for the reception of His Highness Maharaja Adhiraj Mahtab Chand Bahadur of Burdwan.

At 5 P.M. of Tuesday, the 27 February 1877 His Excellency the Viceroy will receive the Maharaja of Burdwan.

At the appointed time the Maharaja will proceed to Government House.

The Maharaja will be received at the foot of the grand Stairease by an Aide-de-camp to His Excellency and at the top of hte Stairease by the Under Secretary in the Foreign Department, who will conduct him to the Audience chamber.

The Viceroy will receive the Maharaja seated on the throne, will touch and remit the Nuzzar of 101 gold mohors which the Maharaja will present and will show him to a seat on His Excellency's right.

On the right of the Maharaja will sit the Under Secretary and four Attendants. Two Aides-de-camp to His Excellency the Viceroy will be seated on the left.

After a short conversation the Maharaja's attendants will be introduced by the Under Secretary. They will present Nuzzars of one gold mohor each, which will be touched and remitted.

Utter & Pan will then he presented by the Under-Secretary to the Maharaja, and by the Superintendent of the Toshakhana to his attendants.

The Maharaja will then take his departure, being conducted to the head of the grand Staircase by the Under-Secretary, and to his carriage by the Aide-de-camp to His Excellency the Viceroy.

A salute of 13 Guns will be fired on the occasion.

(Sd) T.J. Chichell Plowden.
Under Secretary Govt. of India.

জগতে কেহই অবিনশ্বর নহে। প্রত্যেক দেহীকে সময়ের আহ্বানে দেহ পরিত্যাগ করতে হয় ইহাই স্বতঃসিদ্ধ। কাজেই সময়ের আহ্বানে রাজা-মহারাজা, আমীর ফকির সকলকেই ধরা ধাম থেকে চির বিদায় নিয়ে সেই আহ্বানে সারা দিয়ে যেতে হবেই এই নিয়ম।

"শেষ অবস্থায় মহারাজা তদীয় সুযোগ্য ভ্রাতৃপুত্র দেওয়ান-ই-রাজ রাজা বনবিহারী কপুর সাহেবের হস্তে এই সুবিশাল বর্দ্ধমান রাজ্যের সম্পূর্ণ ভার অর্পণ করতঃ স্বয়ং কথঞ্চিৎ নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন এবং তৎসঙ্গে একটি মন্ত্রীসভাও গঠন করতঃ রাজকার্য্যের কোন বিষয়ে কোন প্রকার কূট্‌তর্ক উপস্থিত হইলে, উক্ত সভায় তাহা মীমাংসা করিবার ভার অর্পণ করেন।" (রাজবংশানুচরিত, পৃঃ ১৯৪) তাঁর সুযোগ্য প্রাইভেট সেক্রেটারী ও প্রেসিডেন্ট মিঃ টি.ডি. বর্গ, ভাইস প্রেসিডেন্ট দেওয়ানইরাজ বনবিহারী কপুর ও পূর্বোল্লিখিত চারজন বিভাগীয় প্রধানকে সপ্তাহে একদিন অধিবেশন করে রাজ্যের সমস্ত সমস্যার আলোচনা করার এবং তার সমাধান করার নির্দেশ দিয়ে যান।

অতঃপর প্রজা বৎসল, দীন-দুঃখী আর্ত-ত্রাতা, দেশে-বিদেশে বহু সম্মানিত হিজ্‌হাইনেস্ মহ্‌তাব্‌চাঁদ বাহাদুর ৫৯ বছর বয়সে ১২৮৬ সালের ৯ই কার্তিক, ইং ১৮৭৯ খৃঃ ২৬ শে অক্টোবর তারিখে, ভাগলপুর শহরে ভাগীরথী তীরে কলেবর পরিত্যাগ করে কঙ্খিত ধামে চলে যান।



মহারাণী নারাণকুমারী, মহাতাবচাঁদের মৃত্যুর পর তাঁর প্রতিমূর্ত্তির পাশে দণ্ডায়মান

দেওয়ান-ই-রাজ বনবিহারী কপুর ও মহারাজের প্রাইভেট সেক্রেটারী টি.ডি.বর্গ মিলার সাহেবের উদ্যোগে স্বর্গত মহারাজের শ্রাদ্ধাদি কাজ শাস্ত্র সম্মতভাবে সম্পন্ন হয়। শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে দেশ-বিদেশ থেকে বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন এবং আশাতিরিক্ত বিদায় প্রাপ্ত হন। "অন্যূন ৮০ হাজার (৮০,০০০) কাঙ্গালীকে চাউল, বস্ত্র ও অর্দ্ধ মুদ্রা করিয়া বিতরণ করা হইয়াছিল।" (রাজবংশানুচরিত পৃঃ ১৯৫) রাজা বনবিহারী কপুরের সুব্যবস্থার জন্য তিনি প্রশংসিত হয়েছিলেন। অম্বিকা কালনায় মহারাজেরই নির্মিত একটি সুন্দর ভবনে তাঁর সমাজ প্রতিষ্ঠা হয়।



বর্ধমান সি.এম.এস. উচ্চ বিদ্যালয়



ক্যাথলিক চার্চ (পবিত্র হৃদয়ের গীর্জা)

মহারাজাধিরাজবাহাদুর আফ্‌তাব্‌চাঁদ

(১৭৭০-১৮৩২)

হিজ্ হাইনেস্ মহারাজাধিরাজ মহ্‌তাব্‌চাঁদের পরলোক গমনের পর তাঁর দত্তক পুত্র আফ্‌তাব্‌চাঁদ মহ্‌তাব্ ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র ১৯ বছর বয়সে বর্ধমান রাজ সিংহাসনে বসেন। ইনি ছিলেন রাজ পরিবারের ২য় দত্তক। তাঁর নাবালকত্বের জন্য, নিষ্ঠাবান, রাজকার্যকুশল, দেওয়ান বনবিহারী কপূর এবং মিঃ টি.ডি.বার্গ মিলার সাহেব মহারাজাধিরাজ মহ্‌তাব্‌চাঁদের ব্যবস্থানুযায়ী রাজকার্য পরিচালনা করে আসছিলেন। তৎকালীন আইনানুসারে রাজা নাবালক থাকলে বেঙ্গলগভর্ণমেন্ট 'কোর্ট অব্ ওয়ার্ড'-এর হতে রাজকার্য পরিচালন ভার দিয়ে থাকেন। কিন্তু উপযুক্ত সৎ ব্যক্তির হাতে সুষ্ঠুভাবে রাজকার্য পরিচালিত হওয়ায় 'কোর্ট অব্ ওয়ার্ডের' হাতে রাজকার্যভার দেওয়া হয় নাই।

আফ্‌তাব্‌চাঁদ মহ্‌তাবের বাল্যশিক্ষা, মহ্‌তাব্‌চাঁদ নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্যেই করেছিলেন। টি.ভি.বার্গ মিলার তাঁকে প্রতিদিন দুপুরে দু ঘণ্টা করে ইংরাজী বিষয়ে শিক্ষা দিতেন। তাঁর শিক্ষাদানে আফ্‌তাব্‌চাঁদ্ বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন, পনের বছর বয়স হতেই পিতা মহ্‌তবচাঁদের সঙ্গে গভর্ণমেন্ট দরবারে যেতেন।

পিতার মৃত্যুর পর রাজ্যের সমস্ত কাজকর্ম দেখা-শুনা ও পরিচালনা করতেন দেওয়ান বনবিহারী কপুর।

এক্ষণে রাজ হিতৈষী, ন্যায়নিষ্ঠ, কর্তব্যপরায়ণ, রাজা 'বনবিহারী' কপূরের কথা কিছু বলা প্রয়োজন। বনবিহারী কপুরের পূর্ব নাম জহুরীলাল সেঠ তলওয়ার। পিতা গোলাপলাল সেঠ তলওয়ার এর কনিষ্ঠ পুত্র। কিন্তু জহুরীলালের এমনি ভাগ্য যে তিনি পৃথিবীর আলোয় চোখ খোলার কয়েক মাস আগেই পিতার মৃত্যু হয়। গোপাললাল সেঠ তলওয়ার ভাল জ্যোতিষ শাস্ত্র জানতেন এবং তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হতো। তিনি মৃত্যুর পূর্বে বলে গিয়েছিলেন, "আমার পত্নীর গর্ভে যে পুত্র সন্তান আসছে। ঐ পুত্রটি সুলক্ষণ যুক্ত, রাজ্য প্রাপ্ত না হলেও রাজতুল্য সম্মান প্রাপ্ত ও ন্যায় পরায়ণ হবে।" তাঁর কথা যথার্থ হয়েছিল। তাঁদের আদি পুরুষ লাহোরের অধিবাসী ছিলেন, পূর্বতন ৬ষ্ঠ তম পুরুষ মথুরায় এবং তৎপরবর্তী পুরুষ সাহেবরাম সেঠ তলওয়ার বিবাহ সূত্রে সোঁয়াই-এ এসে বসবাস করেন। তখন হতেই তাঁরা সোঁয়াই-এর অধিবাসী। জহুরীলাল ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ১১ নভেম্বর তারিখে ভূমিষ্ঠ হন। তিন বছর বয়সে ১৮৫৬ খ্রীঃ ৩১ শে আগষ্ট তারিখে, পরাণচাঁদ কপুরের তৃতীয় পুত্র রাসবিহারী কপুর, অর্থাৎ চুণিলাল কপুর (মহ্‌তাব্‌চাঁদ)-এর ঠিক অগ্রজ, জহুরিলাল সেঠ তলওয়ারকে দত্তক গ্রহণ করেন। তখন তাঁর নাম হয় "বনবিহারী কপুর"। সুতরাং

বনবিহারী কপুর, মহ্‌তাব্‌চাঁদের ভ্রাতুষ্পুত্র। দত্তক গ্রহণের পরে রাসবিহারী কপুরের একটি পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করলে বনবিহারীর প্রতি আর তাঁর কোন স্নেহ বা আদর-যত্ন থাকল না। এই অঙ্গজ সন্তানের নাম ভৈরবলাল কপুর। এখন বনবিহারীকে দারুণ দুঃখ-কষ্ট, অবহেলা অনাদরে প্রায় চার বছর রাসবিহারী কপুরের কাছে ছিলেন। সাত বছরের বালক বন বিহারীর কষ্ট দেখে পরাণচাঁদ কপুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্যামচাঁদ কপুরের দ্বিতীয় পত্নী এবং মহারাজ মহ্‌তাব্‌চাঁদ তাঁকে রাজবাড়ীতে এনে পুত্র স্নেহে লালন পালন করতে থাকেন। এবং বিদ্যা-শিক্ষা প্রভৃতি সমুদয় ভার গ্রহণ করেন। রাজমহিষী নারায়ণ কুমারীও তাঁকে মাতৃস্নেহে পালন করতে থাকেন। বনবিহারীও তাঁদের ভক্তি, শ্রদ্ধা করতেন। তিনি অতি তীক্ষ্ণধী মেধাবী বালক ছিলেন। অল্প বয়সেই বিদ্যাশিক্ষায় বিশেষ বুৎপত্তি লাভ করেন। এদিকে রাসবিহারী কপুর বনবিহারীকে দত্তকগ্রহণকালে, তাঁর অবর্তমানে, তাঁর সমগ্র সম্পত্তি দত্তক পুত্রের নামে যে উইল সম্পাদন করেছিলেন, এক্ষণে গোপনে একখানি দ্বিতীয় উইল করে নিজ অঙ্গজ পুত্রকে সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী করে প্রথম উইলখানি বাতিল করে দেন।

ক্রমে রাজা বনবিহারী কপুর বয়ঃপ্রাপ্ত হলে মহারাজ মহ্‌তাব্‌চাঁদ তাঁকে রাজকার্য্য শিক্ষাদেন। তিনি অল্পসময়ে রাজকার্য সম্বন্ধে বিশেষ দক্ষ হন। মহারাজ, তাঁর বুদ্ধিমত্তা ও কার্য কুশলতা দেখে ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁকে দেওয়ান-ই-রাজ পদে নিযুক্ত করেন।

১৮৭৭ খ্রীঃ ১লা জানুয়ারী তারিখে ভারত সম্রাজ্ঞী, বনবিহারী কপুরকেও সম্মানসূচক (*Certificate of Honour*) পত্র দেন। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ভারত গভর্ণমেন্ট তাঁকে 'রাজা' উপাধি ভূষিত করেন।

রাজা বনবিহারী কপুর 'দেওয়ান-ই-রাজ' পদ প্রাপ্তির পূর্বে ১৫ বছর বয়সের সময় মহারাজ মহ্‌তাব্‌চাঁদ, ভাগলপুর শহরে সন ১২৭৯ সালের ২১শে মাঘ তারিখে তাঁর সঙ্গে বনবিহারী শ্যালক বংশগোপাল নন্দের কন্যা প্রণবদেয়ীর বিবাহ দেন। বিবাহের পর মহারাজা তাঁকে মাসিক ৫০০ (পাঁচশত) করে 'চিরবৃত্তি', অনেকগুলি ভূসম্পত্তি এবং বাসোপযোগী সুন্দর বসতবাটী নির্মাণ করিয়ে দেন। বড়বাজার বি.সি. রোডের উপর যে 'বন-আবাস' ভবনটি আছে সেই-টি রাজা বনবিহারী কপুরের আবাসভবন। মহারাজ মহ্‌তাব্‌চাঁদ, রাজা বনবিহারী কপুরকে যে সব ভুসম্পত্তি ক্রয় করে দিয়েছিলেন তার বার্ষিক আয় ছিল ৬,০০০ (ছয় হাজার) টাকা। কার্শিয়াং-এ ১০০ একর চা বাগান কিনে দিয়েছিলেন এবং সেখানে একটি প্রণবদেয়ীর নামে 'প্রণবাবাস' নির্মাণ করে দেন। রাজা বনবিহারী প্রসঙ্গ এখানেই স্থগিত রাখা হলো।

আফ্‌তাব্‌চাঁদ মহ্‌তাব্ সিংহাসনে আসীন হলেও রাজ্যভার স্বহস্তে ছিল না, দেওয়ান-

ই-রাজ বনবিহারী কপুর ও মিঃ টি.ডি. বার্গ মিলার সাহেবের রাজ্যের সমস্ত দায়-দায়িত্ব ছিল। এই সময় রাজ্যে সমস্যা দেখা দিল। কিছু স্বার্থান্বেষী রাজ কর্মচারী ও অমাত্যবর্গ-এর প্ররোচনায় মহারাজ আফ্‌তাব্‌চাঁদ্ বিপথগামী হয়ে পরেন এবং বিলাস-ব্যসনে মত্ত থাকেন। ঈর্ষাকাতর,পরছিদ্রান্বেষীরা রাজা বনবিহারী কপুরের বিরুদ্ধে দুরভিসন্ধিমূলক কুৎসা রটনা করে তৎকালীন বঙ্গীয় গভর্ণমেন্টের নিকট অভিযোগ দায়ের করেন, আবার মহারাজকেও নানাভাবে প্ররোচিত করেন। অন্যদিকে মহারাণী নারায়ণকুমারীও চেষ্টা করতে থাকেন রাজা বনবিহারীকে অপসারণ করে, তৎস্থলে নিজ ভ্রাতা বংশগোপাল নন্দেকে কেমন করে দেওয়ানের পদে নিয়োগ করা যায়। সেইজন্য সুবিধা-বাদীরা মাঝে মাঝে রাজা বনবিহারীর নামে মিথ্যা কুৎসা মূলক আবেদন পত্র বেঙ্গল গভর্ণমেন্ট-এর নিকট পাঠাতে থাকলেন এবং তাঁর চরিত্রেও নানারূপ মিথ্যা কলঙ্ক রটনা করতে থাকেন।

কিন্তু "বেঙ্গল গভর্ণমেন্ট ও অপরাপর প্রধান প্রধান উচ্চপদস্থ ইংরাজগণের নিকট দেওয়ান-ই-রাজের কার্য্য দক্ষতা ও অন্যান্য সদ্‌গুণরাশির খ্যাতি থাকায়, সকলেই তাঁহাকে বিশেষরূপে সম্মান ও বর্দ্ধমান রাজ্যের স্তম্ভস্বরূপ জ্ঞান করিতেন। .... বঙ্গেশ্বর সার এস্‌লি ইডেন সাহেব বাহাদুর রাজা বনবিহারীর বুদ্ধিমত্ত্বা, অমায়িকতা ও কার্য্যদক্ষতার বিষয় বিশেষরূপে অবগত হওয়ায় তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন।

সুতরাং তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, বনবিহারীর শত্রুরাই তাঁহার এরূপ অযথা গ্লানি করিতেছে।" (রাজবংশানুচরিত পৃঃ ১৯৭-১৯৮) বর্ধমান রাজ্যের পরিস্থিতি বুঝতে পেরে "সার এসলি ইডেন গোপনে কুমার বাহাদুরকে কলিকাতায় আহ্বান করতঃ কুচক্রিদিগের সংসর্গ পরিত্যাগ করিতে ও তাঁহাদের কুমন্ত্রণায় কর্ণপাত না করিয়া বিশেষ সাবধানে রাজা বনবিহারী ও মিঃ টি.ডি.বর্গ মিলার সাহেবের পরামর্শ অনুসারে রাজ কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে উপদেশ প্রদান করিলেন।"(রাজবংশানুচরিত পৃঃ ১৯৮)

মহারাজ আফ্‌তাব্‌চাঁদ মহ্‌তাব্ ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে সাবালকত্ব প্রাপ্ত হলে তিনি নিজে রাজ্যভার গ্রহণ করেন। তিনি রাজ্যভার গ্রহণ করার পর অধিক দিন জীবিত থাকেন নাই। কিন্তু সেই অল্পকালের মধ্যে বহু জনহিত কর কাজ করে ছিলেন। মেদিনীপুর জেলার কাঁথি মহকুমার পানীয় জলের খুবই অসুবিধা থাকায় সেই অঞ্চলের অধিবাসীগণ মহারাজ আফ্‌তাব্‌চাঁদ মহ্‌তব্‌কে সাহায্য প্রার্থনা করেন। মহারাজ আফ্‌তাব্‌চাঁদ বাহাদুর তিন হাজার টাকা খরচ করে সেখানে একটি পরিষ্কার জলের জন্য বিরাট পুষ্করিণী কাটাইয়া দেন। তৎপরে ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে দার্জিলিং-এ সাধারণের চিকিৎসার জন্য ইউরোপীয় দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত এককালে ১০ হাজার (দশ হাজার) টাকা দান করেন। এই

সময় বঙ্গের গভর্ণমেন্টের সেক্রেটারী এ. মেকেঞ্জি বাহাদুর (পরে ইনি বঙ্গের লেফটেন্যান্ট গভর্ণমেন্ট হয়েছিলেন) মহারাজ আফ্‌তাব্‌চাঁদ মহ্‌তাবকে উক্ত অর্থপ্রাপ্তির সম্বন্ধে যে সকৃতজ্ঞ পত্র দিয়েছিলেন তার বঙ্গানুবাদ দেওয়া হলো —

দারজিলিং

২৯ শে জুলাই, ১৮৮১

বেঙ্গল গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী
এ. মেকেঞ্জি স্কয়ারের নিকট হইতে
বর্দ্ধমানের মহারাজকুমার আফ্‌তাব্ চন্দ্
মহ্‌তাব্ সমীপে।

বন্ধুবর!

দারজিলিঙ্গে ইউরোপীয়দিগের নিমিত্ত দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপনার্থে আপনি যে, দশ সহস্র টাকা সাহায্য প্রদান করিয়াছেন, তাহার এক খণ্ড মন্তব্য আপনার নিকট প্রেরণ করিবার জন্য মান্যবর লেফ্‌টেন্যান্ট গবর্ণর-এর আদেশ প্রাপ্ত হইয়া অত্রস্থ প্রেরণ করিতেছি। আপনার প্রেরিত অর্থ সানন্দে গ্রহণ করতঃ, সাধারণ হিতার্থে আপনার তাদৃশ বদান্যতা দৃষ্টে প্রীত হইয়া, সার এসলি ইডেন বাহাদুর আপনাকে ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক আমাকে পত্র লিখিতে আদেশ করিলেন। মন্তব্যে দেখিবেন যে, আপনার নামে একটি ওয়ার্ডের নামকরণ ও আপনার নাম এবং বদান্যতার পরিচয় সূচক একখানি শিলালিপি হস্‌পিটাল হলে গ্রথিত করিয়া রাখিবার জন্য কমিটির সভ্যদিগকে অনুরোধ করা হইয়াছে।

আপনার অকৃত্রিম বন্ধু

এ. মেকেঞ্জি
বেঙ্গল গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী

Darjeeling
The 29th July 1881.

From
A. MACKENZIE ESQ.
Secretary to the Government of Bengal.
To Maharaj Kumar Aftab Chand Mahatab
of Burdwan.
My friend,

I have been desired by the Lieutenant Governor to forward for

your information the accompanying copy of a resolution recorded by him this day in connection with the eatablishment of an European Hospital at Darjeeling, towards which you have offered Rs. 10,000. The lieutenant Governor accepts with much pleausre the gift you have offered, and I am to convey to you Sir Ashly Eden's very cordial thanks for this renewed instance of public spirit and liberality on your part. You will observe that the Governing Committee of the Hospital have been requested to place in the Hall of the hospital building a marble slab acknowledging your gift, and to name one of the word after you,

I remain

Your Sincere friend

A. Mackenzie

Secretary to the Government of Bengal

অতঃপর ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারেল মহারাজ আফ্‌তাব্‌চাঁদ মহতাব্‌ বাহাদুরকে যে পদ উপাধি প্রদান করেন তার বঙ্গানুবাদ নীচে দেওয়া হলো —

(ভারত গভর্ণমেন্ট)

মোহর

সনন্দ।

বর্দ্ধমানের

মহারাজকুমার

আফ্‌তাব্‌ চন্দ্‌ মহতাব্‌

প্রতি।

এতদ্বারা আমি আপনাকে মহোচ্চ 'মহারাজ'পদ এবং 'মহারাজাধিরাজ আফ্‌তাব্‌চন্দ্‌ মহ্‌তাব্‌ বাহাদুর নাম, পদ ও উপাধি প্রদান করিলাম।

সিমলা

১২ই আগষ্ট, ১৮৮১

রিপন

ভারতবর্ষের রাজপ্রতিনিধি এবং

গবর্ণর জেনারেল।

To

Maharaj Kumar Aftab Chand Mahatab

of Burdwan.

I hereby confer upon you the dignity of "Maharaja" by the name, style and title of Maharaja Dhiraj Aftab Chand Mahatab Bahadur.

Simla	*Ripon*
The 12th August	*Viceroy and Governor*
1881	*General of India.*

এই উপলক্ষে দেওয়ান-ই-রাজ বনবিহারী কপূর সমগ্র শহরে বিশেষ উৎসব আড়ম্বরের ব্যবস্থা করেছিলেন। রাজপ্রাসাদের তোরণে তোরণে আলোক সজ্জা, রাজপথের স্থানে স্থানে তোরণ দ্বার, দেবালয় সমূহে এবং নাট মঞ্চে যাত্রাপালা, কবিগান দিন রাত ব্যাপী আনন্দোৎসব, নহবৎখানায় নহবৎ বাদ্য, মহা আড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই উৎসবে বহু রাজন্যবর্গ আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। তাঁদের পরিতুষ্টির জন্য নাচ-গানের সুচারু ব্যবস্থা হয়েছিল। সর্বোপরি হাজার হাজার কাঙালী ভোজন, দীন-দুঃখীদের অন্ন, বস্ত্র ও অর্থ বিতরণ করেন। এই সমারোহ কয়েকদিন যাবৎ চলেছিল। রাজা বনবিহারীর সৌহার্দ্যপূর্ণ আপ্যায়ন, তাঁর অমায়িকতায়, মিষ্টালাপে সদ্ব্যবহারে নিমন্ত্রিতরা সকলে চরম প্রীত হয়ে তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেন এমন কি শত্রুরাও প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছিলেন।

এই আনন্দ উচ্ছ্বল উৎসব মুখর রাজ দরবারের একখানি বিশাল তৈলচিত্র অঙ্কন করেছিলেন মিঃ ক্যাডি, তার জন্য পারিশ্রমিক পেয়েছিলেন দশ হাজার টাকা। এই চিত্রটি বারদ্বারী ভবনের সোপানাবলির উপরিভাগে লম্বিত ছিল।

১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বঙ্গেশ্বর সার এস্‌লি ইডেন, বর্ধমান রাজ প্রাসাদে নিমন্ত্রিত উচ্চপদস্থ ইংরাজ, এতদ্দেশীয় সম্ভ্রান্ত জমিদার, রাজন্যবর্গের সমক্ষে উপস্থিত হয়ে মহাসমারোহে মহারাজকুমার আফ্‌তাবচাঁদ্ মহ্‌তাব্ বাহাদুরকে বহুমূল্য রাজপরিচ্ছদ, ঢাল ও তরবারি, রত্নাদিখচিত শিরপেঁচ, মতির মালা প্রভৃতি খেলাত এবং সর্বোপরি মহামান্য ভারত রাজপ্রতিনিধি লর্ড রিপন-এর সাক্ষরিত ও মোহরযুক্ত তাঁর পিতৃসম্মান ও পদ প্রদানপূর্বক তাঁকে রাজ সিংহাসনে অভিষিক্ত করেন।

অতঃপর মহারাজাধিরাজ আফ্‌তাব্‌চাঁদ্ মহ্‌তাব্ একদিকে বিশাল রাজ্যের অধিপতি, প্রভূত অর্থের মালিক এবং যৌবনের উন্মাদনা এই তিনের একত্র সমাহারে তাঁর যৌবন সুলভ যাবতীয় দোষে দুষ্ট হয়েছিলেন। যে সব অমাত্যবর্গ ও পারিষদ তাঁকে রাজকার্য্যে সহায়তা করবেন, তাঁরাই নিজ নিজ স্বার্থ সিদ্ধির জন্য মহারাজকে নানাভাবে প্ররোচিত করেন। মহারাজা উদ্ভিন্ন যৌবনের উন্মাদনায় দেওয়ান-ই-রাজ বনবিহারী কপুর ও টি.ডি. বর্গ মিলারের কোন

উপদেশে কর্ণপাত না করে ঐ সব কুমন্ত্রণা দাতাদের কথাই শুনতেন। তিনি রাজা বনবিহারী কপুর ও টি.ডি. বর্গ মিলারের উপর দায়িত্ব অর্পণ করে নিজে বিলাসিতায় গা ভাসিয়ে দেন। এবং এই ভাবে শারীরিক অত্যাচারের ফলে অল্প দিনেই অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং পাঁচ মাস শয্যাশায়ী থাকার পর সন ১২৯১ সালের ১৩ই চৈত্রতে ইং ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৫ শে মার্চ তারিখে পঁচিশ বছর বয়সে (২৪ বৎসর ৭ মাস) ইহলীলা সাঙ্গ করেন।

যে রাত্রে তিনি বর্ধমান রাজপ্রসাদে মহাপ্রয়াণ করেন, সেই সময় বর্ধমানে নিদারুন শোকের ছায়া নেমে এসেছিল। রাজপুর নরনারী, অমাত্য, পারিষদ এবং বর্ধমানের আপামর জনসাধারণ এমনই শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েছিলেন তা বর্ণনাতীত, সমগ্র বর্ধমান যেন শ্মশান ভূমিতে পরিণত হয়ে পড়েছিল। "পরদিন পূর্ব্বাহ্নে যখন তাঁহার শবদেহ সৎকারার্থে শ্মশান ভূমিতে লইয়া যাওয়া হয়, তখন তাঁহার পূর্ব্বাদেশ অনুসারে, অশ্বশালার যাবদীয় সুসজ্জিত অশ্ব, লণ্ডন হইতে আনীত শকটাদি, হস্তিশালার গলদশ্রু সুসজ্জিত বারণবৃন্দ, কৃষ্ণঝীয় ধারী নিম্নমুখ বন্দুক হস্তে সজ্জিত সৈন্যশ্রেণী নিষ্কোশিত অসি হস্তে কৃষ্ণঝীয়ধারী অশ্বারোহিগণ, হৃদয় বিদারক শোক-প্রকাশক (*Dead March*) ব্যাণ্ড বাদ্য করিতে করিতে ব্যাণ্ড বাদকগণ সুবর্ণদণ্ড চামড় হস্তে চামড়ধারীগণ স্বর্ণদণ্ড ছত্রহস্তে ছত্রধর, ঐ প্রকার আড়ানী সূর্যমুখী আশা সোটা ছড়ি ও পতাকা বাহকগণ রজত নির্ম্মিত শিবিকা স্কন্ধে বাহকগণ, গলদশ্রুনয়নে সকরুণ বিলাপ করিতে করিতে রাজ শয্যাসহ শ্মশান ভূমি পর্য্যন্ত শবের অনুগমন করিয়াছিল। রাজকুটুম্ব, রাজামাত্য ও রাজানুচরগণ শোকে আত্মহারা হইয়া, হৃদয় বিদারক হাহাকার রবে চতুর্দ্দিক পরিবেষ্টন করিয়া চলিয়াছিলেন। বর্দ্ধমান বিভাগের কমিশনার সাহেব বাহাদুর এবং জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি যাবদীয় প্রধান প্রধান রাজপুরুষগণ ও বর্দ্ধমানের সমগ্র ভদ্রমণ্ডলী, ছল-ছল-ছল চক্ষে মলিন বদনে শ্মশান ভূমি পর্য্যন্ত শবের অনুগমন করিয়াছিলেন। রাজপথ লোকে পরিপূর্ণ, চতুর্দ্দিকেই কেবল সকরুণ হাহাকার ধ্বনি ভিন্ন আর কিছুই শ্রুতিগোচর হয় নাই। ফলতঃ মহারাজাধিরাজ আফ্‌তাব্ চন্দ্ মহ্‌তাব্ বাহাদুরের অকাল মৃত্যুতে বর্দ্ধমানবাসী আপামর সাধারণ যেরূপ শোকাকুল হইয়াছিল, অন্যকোন মহারাজার মৃত্যুতে তদ্রূপ হয় নাই।" (রাজবংশানুচরিত পৃঃ ২১১-২১২) এখানে উল্লেখ্য, মহারাজের মহাপ্রয়াণে রাজবাড়ীতে এক অলৌকিক ঘটনা ঘটেছিল। এই ঘটনা বহুজনেই প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

"যে রাত্রিতে তাঁহার মৃত্যু হয়, সেই দিন প্রাতঃকালে অশ্বশালায় তাঁহার অতিপ্রিয় দুইটি অশ্বের, হস্তিশালায় একটি হস্তীর, গোশালায় দুইটি বড় বড় বলদের এবং পশুশালায় একটি বৃহদাকার নরভুক ব্যাঘ্রের সহসা মৃত্যু হয়। পূর্ব্বদিন রাত্রি পর্য্যন্ত ঐ সকল পশুর

কোন প্রকার পীড়ার চিহ্নের প্রকাশ পায় নাই। এই আকস্মিক দৈব-দুর্ঘটনায় সকলেই বিস্মিত হইয়াছিল।" (রাজবংশানুচরিত পৃঃ ২১২)

মহারাজ আফ্‌তাব্‌চন্দ মহ্‌তাব্‌ মৃত্যুর প্রায় দেড় বছর আগে থেকে তাঁর স্বভাব পরিবর্তনে সচেষ্ট হয়েছিলেন এবং সফলও হয়েছিলেন। তখন তিনি দেওয়ান-ই-রাজ বনবিহারী কপুর ও টি.ডি. বর্গ মিলারের পরামর্শ অনুযায়ী রাজকার্য পরিচালনা করতেন এবং রাজা বনবিহারী কপুরকে সবসময়েই নিজের সান্নিধ্যেই রাখতেন, একদণ্ডও কাছছাড়া করতেন না। তাঁর মানসিক অবস্থা এমনই হয়েছিল যে, অনুশোচনায় দগ্ধিভূত হতে থাকেন তাঁর ভুল পথে পরিচালিত হওয়ার জন্য এবং তজ্জন্য তিনি স্ত্রীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

এখানে বলা প্রয়োজন, মৃত্যুর পূর্বে যে উইল সম্পাদন করেছিলেন তার শেষাংশে লিখিত আছে —

"আমার মৃত্যুর পর সমস্ত সম্পত্তি 'কোর্ট-অব্‌-ওয়ার্ডের হস্তে অর্পিত হইবে কিন্তু আমি কোর্ট-অব্‌-ওয়ার্ডকে বিশেষ রূপে অনুরোধ করিতেছি যে, যতদূর সম্ভব তাঁহারা আমার প্রচলিত রাজ কার্য্যের নিয়মাবলী রক্ষা করতঃ, আমার নিযুক্ত বিশ্বাসী রাজকর্মচারীগণের দ্বারাই যেন রাজকার্য্য পরিচালনা করেন।" (রাজ বংশানুচরিত, পৃঃ ২০৯)

তিনি উইলের ৪র্থ স্তম্ভে আরও উল্লেখ করেন —

"কিন্তু তিনি (মহারাণী) আমার ভ্রাতা অথবা ভ্রাতৃ সম্বন্ধীয় কাহাকেও দত্তক পুত্র গ্রহণ করিতে পারিবেন না।" (রাজবংশানুচরিত, পৃঃ ২১০)

তিনি জ্যেষ্ঠাধিকারের পক্ষপাতি ছিলেন। তিনি যে উইল সম্পাদন করেছিলেন তার প্রথম স্তম্ভে জ্যেষ্ঠাধিকার সম্বন্ধে লিখিত আছে — "যদি আমার স্ত্রীর গর্ভে একাধিক পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে, তাহা হইলে, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ সন্তানই আমাদিগের বংশের নিয়মানুসারে, মহারাজাধিরাজ উপাধি ও সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হইবে। অপর সন্তানগণ প্রত্যেকে বার্ষিক ২৪ সহস্র টাকা, অর্থাৎ মাসিক ২০০০ (দুই সহস্র) টাকা বৃত্তি প্রাপ্ত হইবেন। (রাজবংশানুচরিত পৃঃ ২১০)

অতঃপর মহারাজের মৃত্যুর পর তাঁর মহিষী বেণদেয়ী দেবী নাবালিকা ছিলেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র ১৪ বছর। সুতরাং মহারাজের ইচ্ছানুযায়ী তৎসম্পত্তি কোর্ট-অব্‌-ওয়ার্ডের হাতে চলে যায়। তার বিবরণ উদ্ধৃত করা হলো —

"কোর্ট-অব্‌-ওয়ার্ড

নাবালিকা মহারাণী অধিরাণী বেনদেয়ী দেবী মহারাজাধিরাজ আফ্‌তাব্‌চন্দ মহ্‌তাব্‌ বাহাদুরের পরলোক গমনের পরদিবসে বর্দ্ধমানের শ্রীযুক্ত কালেক্টর সাহেব বাহাদুর রাজবাটীতে আগমন

করিয়া রাজান্তপুর ও ধনাগার প্রভৃতির সংরক্ষণের ভার গ্রহণ করিলেন। নাবালিকা মহারাণী অধিরাণী বেনদেয়ী দেবীর অভিভাবক ও আসন্ন বন্ধুস্বরূপ কোর্ট-অব্-ওয়ার্ড তাঁহার নামেই রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণের ভার গ্রহণ করতঃ দ্বিতীয় আদেশ পর্য্যন্ত রাজা বনবিহারী কপুর সাহেব ও মিঃ টি.ডি. বর্গ মিলার সাহেবের হস্তেই কার্য্যভার অর্পণ করিলেন। মহারাণীর প্রার্থনা অনুসারে তদীয় পিতা লালা লক্ষ্মীনারায়ণ খান্না এবং মহারাণীর বিমাতা, মহারাণীর অভিভাবক নিযুক্ত হইলেন। অল্পদিন পরেই রাজা বনবিহারী কপুর ও টি. ডি. বর্গ মিলার সাহেব বর্দ্ধমান রাজ্যের যুক্ত (*Joint*) ম্যানেজার নিযুক্ত হইলেন।" (রাজবংশানুচরিত ২১২, ২১৩)

মহারাজাধিরাজ আফ্‌তাব্‌চাঁদ বাহাদুর এর যেদিন শবদাহ হয়, সেই রাত্রে রাজ্যলোলুপ তাঁরই জন্মদাতা পিতা, বংশগোপাল নন্দে নিজ বাড়ীতে বর্ধমানের বিশিষ্ট উকীলকে এনে, কেমন করে এই বিশাল বর্ধমান রাজ্য (জমিদারী) হস্তগত করা যায় সে সম্বন্ধে পরামর্শ করেন। অপরদিকে মহারাণী নারায়ণকুমারী, পরলোকপ্রাপ্ত স্বামী মহারাজাধিরাজ মহ্‌তাব্‌চাঁদ কৃত উইল মোতাবেক একাধিক 'দত্তক' গ্রহণের ক্ষমতা থাকায় বংশগোপাল নন্দেরই অপর এক সন্তানকে দত্তক গ্রহণ করে তিনি নিজে রাজ্যের সর্বেসর্বা হতে মনস্থ করেন। এই জন্য প্রধান প্রধান ব্যবহারজীবিদের নিকট শলাপরামর্শ করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মহারাজ আফ্‌তাবচাঁদ মহ্‌তাব্-এর উইল এর সর্ত অনুসারে, আইন মোতাবেক তদ্ মহিষী বেনদেয়ী দেবীই দত্তক পুত্র গ্রহণের অধিকারী। যাই হোক, মহারাণী অধিরাণী নারায়ণকুমারী এবং নাবালিকা মহারাণী বেনদেয়ী দেবী উভয়েই একত্রে রাজ অন্তঃপুরে বসবাস করে আসছিলেন। কিন্তু বেনদেয়ীর পিতা, লালা লক্ষ্মীনারায়ণ খান্না, বর্ধমানের কালেক্টর সাহেবের নিকট নাবালিকা মহারানীর অভিভাবক হিসাবে তাঁকে নিজ সন্নিধানে রাখার প্রার্থনা জানান এবং সেইমত তিনি নিজ পিতৃসান্নিধ্যেই থাকতেন। এই সময় লালা লক্ষ্মীনারায়ণ খান্না, কন্যা বেনদেয়ী দেবীকে তাঁর দ্বিতীয়া পত্নীর দুই পুত্রের মধ্যে যে কোন একজনকে দত্তক গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করেন। বলা বাহুল্য, লক্ষ্মীনারায়ণ খান্নার এই দুই-পুত্রই মহারাণী বেনদেয়ী দেবীর বৈমাত্রেয় ভাই তাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠকে দত্তক গ্রহণ করতে মহারাণী ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু মহারাণী অধিরাণী নারায়ণ কুমারী, মহারাণী বেনদেয়ী দেবীকে বলেন "বৈমাত্র ভ্রাতাকে দত্তক গ্রহণ শাস্ত্র সম্মত নয় এবং রীতি বিরুদ্ধ, রাজমাতা নারায়ণকুমারী, বংশগোপাল নন্দের পুত্রকে দত্তক গ্রহণের কথা বলেন। কিন্তু মহারাণী বেনদেয়ী দেবী, মহারাজাধিরাজ আফ্‌তাব্‌চাঁদ মহ্‌তবের কৃত উইল অনুসারে বংশগোপাল নন্দের কোন পুত্রকেই দত্তক গ্রহণ করতে পারেন না। অপর দিকে মহারাজ আফ্‌তাব্‌চাঁদ মহ্‌তাব্

জীবিতাবস্থায় রাজা বনবিহারী কপুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র বিজনবিহারী কপুরকে (কনিষ্ঠপুত্র অকালে মৃত) দত্তক গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন এবং রাজা বনবিহারী কপুরকেও এ ব্যাপারে অনুরোধ করেছিলেন, তাতে রাজা সাহেব অস্বীকৃত ছিলেন না, আবার অহেতুক আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই। মহারাণী বেনদেয়ী দেবীও বিজনবিহারীকে যথেষ্ট স্নেহ করতেন।

যাইহোক, প্রথমতঃ মহারাণী বেনদেয়ী দেবী, যখনই কোন বৈমাত্রেয় ভ্রাতা অর্থাৎ পিতা লক্ষ্মীনারায়ণ খান্নার পুত্রকে দত্তক গ্রহণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেন তখনই তার মৃত্যু হয়। এইভাবে তাঁর (লক্ষ্মীনারায়ণ খান্নার) পর পর তিনটি পুত্রেরই মৃত্যু হয়। সুতরাং লক্ষ্মীনারায়ণ খান্নার সকল আশাই হতাশায় পরিণত হয়।

বংশগোপাল নন্দের রাজ্য প্রাপ্তির কোনরূপ আশা নাই দেখে তিনি বনবিহারী কপুরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার চেষ্টা করতে লাগলেন। তিনি লক্ষ্মীনারায়ণ খান্না ও আরও কিছু রাজকর্মচারী গোপনে রাজমাতা মহারাণী অধিরাণী নারায়ণকুমারীর দ্বারা রাজা বনবিহারীর বিরুদ্ধে, কালেক্টর, কমিশনার এবং বেঙ্গল গভর্ণরের নিকট বহু মিথ্যা অভিযোগপত্র দায়ের করেন। বর্ধমান রাজ পরিবারে তখন দারুণ সংকট উপস্থিত। রাজা বনবিহারী মাত্র কয়েকজন একান্ত অনুগত, অত্যন্ত বিশ্বাসী ও শুভানুধ্যায়ী রাজকর্মচারীদের নিয়ে জমিদারী পরিচালনা করছিলেন।

রাজপরিবারের এরূপ বিশৃঙ্খল অবস্থা দেখে বেঙ্গল গভর্ণমেন্ট মহারাণী বেনদেয়ী দেবী সত্বর দত্তক পুত্র গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানিয়ে পত্র দেন।

প্রথমে মহারাজাধিরাজ আফ্‌তাব্‌চাঁদ মহ্‌তাবের জীবিতাবস্থাতেই তিনি এবং তৎমহিষী বেনদেয়ী দেবী রাজা বনবিহারী কপুর সাহেবের কনিষ্ঠ পুত্র সুজনবিহারীকে দত্তক গ্রহণের মনস্থ করেছিলেন, কিন্তু মহারাজাধিরাজের পরলোক গমনের অত্যল্পকাল পরেই তার মৃত্যু হয়। এখন, মহারাণী বেনদেয়ী দেবী, দত্তকপুত্র গ্রহণ ব্যাপারে মহাসমস্যার সম্মুখীন হন। এই সময় কতকগুলি সুযোগ সন্ধানী ক্ষত্রিয় পরিবার তাঁদের পুত্রদের নিয়ে তাঁর কাছে দত্তক গ্রহণের প্রস্তাব দেন। দৃঢ়চেতা, বুদ্ধি মতী মহারাণী বেনদেয়ী দেবী কাহারও কোন প্রস্তাবে সম্মত না হয়ে শেষ পর্যন্ত দেওয়ান-ই-রাজ বনবিহারী কপুর-এর জ্যেষ্ঠ পুত্র বিজনবিহারীকেই দত্তক গ্রহণের স্থির সিদ্ধান্ত জানিয়ে বর্ধমানের তৎকালীন কালেক্টর মিঃ টি.ই. কক্‌স্‌হেড সাহেবকে সুস্পষ্টভাবে জ্ঞাত করেন। মহারাণী বেনদেয়ী দেবীর অভিপ্রায় অবগত হয়ে কালেক্টর সাহেব ১৮৮৬ খ্রীঃ ৩রা আগষ্ট তারিখে বর্ধমানের কমিশনার সাহেবকে *676 W* নম্বর পত্রে জ্ঞাতকরেন। কমিশনার সাহেবও মহারাণীর অভিপ্রায় জ্ঞাত হয়ে যথেষ্ট সন্তুষ্ট হন এবং ১৮৮৭ খ্রীঃ ৩রা ফেব্রুয়ারী তারিখে, রেভিনিউ বোর্ডের সেক্রেটারীকে যে

রিপোর্ট পাঠান তাতে উল্লেখ আছে "লালা বনবিহারীর পুত্রটিকে মনোনীত করাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছে বলিয়াই আমার ধারণা, এবং তিনি (বনবিহারী) এই বিষয় বিবেচনা করিবার জন্য যে সময় লইয়াছেন, তাহাতে আমার বোধ হয়, তিনি ইহাতে অমত করিবেন না।" (রাজবংশানুচরিত পৃঃ ২১৮)

মহারাণীর পিতা লালা লক্ষ্মীনারায়ণ খান্নাও বিজনবিহারীকে দত্তক পুত্র গ্রহণ করা কর্তব্য বলে মনে করেন। এই সংবাদে সাধারণ প্রজাবর্গ এবং রাজ শুভানুধ্যায়ীগণ যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হয়েছিলেন। কেবলমাত্র রাজমাতা মহারাণী অধিরাণী নারায়ণকুমারী ও তাঁর ভ্রাতা বংশগোপাল নন্দে খুশী হতে পারেন নাই, যদিও বিজন বিহারী তাঁর একমাত্র দৌহিত্র।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, মহারাণী বেনদেয়ী দেবীর প্রস্তাবে দেওয়ান-ই-রাজ বনবিহারী কপুর স্বীকৃত ছিলেন না। তাঁর সৎপরামর্শদাতা, পরমহিতৈষী, অকৃত্রিম বন্ধু তৎকালীন গভর্ণমেন্ট উকীল সত্যকিঙ্কর সেন বাহাদুর, সম্ভ্রান্ত ইংরাজ বন্ধুগণ তাঁকে বার বার অনুরোধ করায় সর্ত সাপেক্ষে বিজনবিহারীকে দত্তক প্রদান করতে স্বীকৃত হন। বিশেষতঃ মহারাণী, পিতা লক্ষ্মীনারায়ণ খান্না দ্বারা রাজা বনবিহারী কপুরকে বার বার অনুরোধ করেন। "তিনি ১৮৮৭ খৃঃ ২৫ ফেব্রুয়ারী তারিখে বর্দ্ধমানের কমিশনার ও কালেক্টর সাহেব বাহাদুরকে ডাকাইয়া, তাঁহাদিগের নিকটেও স্পষ্ট বলিয়াছিলেন যে, তিনি রাজা বনবিহারীর পুত্র ভিন্ন অপর কাহাকেও দত্তকপুত্র গ্রহণ করিবেন না। মহারাণীর সহিত সাক্ষান্তে, কালেক্টর মিঃ ডবলিউ. বি. ওল্ডহেন সাহেব মহোদয়, কমিশনার সাহেব বাহাদুরের নিকট উক্ত তারিখে, যে ১৮১২ নং রিপোর্ট প্রদান করেন তাহার তৃতীয় স্তম্ভে উক্ত বিষয়টি লিখিত আছে। যে সময়ে কালেক্টর ও কমিশনার সাহেব মহারাণীর অভিপ্রায় শ্রবণার্থে রাজান্তঃপুরে গমন করেন, সে সময়ে মহারাণীর পিতা ও রাজা সাহেবও তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাঁহাদের সমক্ষেই যবনিকার অন্তরাল হইতে রাজাসাহেবকে পুত্র প্রদান করিবার জন্য অনুরোধ করিলে, রাজা সাহেব চারটি সর্ত্তের প্রস্তাব করেন, মহারাণী উক্ত প্রস্তবে সম্মত হইলে, রাজা সাহেবও পুত্র প্রদান করিতে সম্মত হয়েন। ঐ চারটি সর্ত্তের বিষয়ও কালেক্টর সাহেবের উক্ত রিপোর্টের ৪র্থ স্তম্ভে লিখিত আছে। যথা — ১) লালা বনবিহারী কপুরই বালকের আইন সম্মত অভিভাবক হইবেন। ২) যে পর্য্যন্ত মাতা ও পুত্রের মধ্যে, পরস্পরের স্নেহ বিশেষরূপে পরিবর্দ্ধিত না হয়, সে পর্য্যন্ত পুত্রটি, প্রত্যহ ৩/৪ ঘন্টার অতিরিক্ত সময় মহারাণীর নিকট অবস্থিতি করিবেন না। দত্তক পুত্র গৃহীত হইলেও পুত্রটি পিত্রালয়েই বাস করিবেন। মাতা ও পুত্রের মধ্যে স্নেহ পরিবর্দ্ধিত হইলে, পুত্র যখন নিয়ত মাতার নিকট অবস্থিতি করিবেন, তখনও

মধ্যে মধ্যে পিত্রালয়ে গিয়া অবস্থিতি করিবেন। ৩) পুত্রকে তদীয় ভগিনীদ্বয়ের নিকট হইতে সহসা বিচ্ছিন্ন করা হইবে না, এবং যখন তিনি মহারাণীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবেন তখন তাঁহার ভগিনীদ্বয়ও তাঁহার সহিত অন্তঃপুরে গমন করিবেন। ৪) পুত্রের শিক্ষা, সহচর, শিক্ষক, চিকিৎসক, ভৃত্য প্রভৃতি তিনিই নিযুক্ত করিবেন ও পুত্রের জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন হইবে তৎসমুদয়ই তিনি স্বয়ং বন্দোবস্ত করিবেন।" (পৃঃ ২২০-২২১, রাজবংশানুচরিত)

অতঃপর বর্ধমানের কালেক্টর সাহেবের রিপোর্ট পাওয়ার পর কমিশনার মিঃ জন বিমস্ সাহেব, রেভিনিউ বোর্ডের সেক্রেটারীকে ১৮৮৭ খ্রীঃ ২৮ ফেব্রুয়ারী তারিখে ৮০১/ডবলিউ নং পত্রের ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম স্তম্ভের তাঁহার বক্তব্যগুলি উদ্ধৃতি করে দেওয়া হলো (পৃঃ ২২২, রাজবংশানুচরিত) —

৩য় স্তম্ভে লিখিত আছে, "লালা বনবিহারীর একমাত্র পুত্রকেই দত্তক পুত্র গ্রহণ করিতে মহারাণী ইচ্ছুক হইয়াছেন এবং তাঁহার প্রস্তাবিত সর্ত্তগুলিতে মহারাণী সম্মত হওয়ায় তিনিও পুত্র প্রদান করিতে স্বীকার করিয়াছেন।"

৪র্থ স্তম্ভে লিখিত আছে, "বর্দ্ধমান রাজবংশের প্রচলিত রীতি ও শাস্ত্রানুসারে, একমাত্র পুত্রকে দত্তকপুত্র গ্রহণ করিবার কোন প্রতিবন্ধকই দৃষ্ট হয় না এবং এই সম্বন্ধে মিঃ উড্রফ, ইভান্স প্রভৃতি বিজ্ঞতম ব্যরিষ্টারগণ যে ব্যবস্থাপত্র প্রদান করিয়াছেন, তৎ সমুদয় বিগত ১১ই তারিখে ৬৭২/ডবলিউ নম্বর রিপোর্ট সহ ইতিপূর্বেই প্রেরিত হইয়াছে।"

৫ম স্তম্ভে লিখিত আছে, "এই দত্তক পুত্র গ্রহণের অনুমতি প্রদান না করিবার, অন্য কোন কারণই দৃষ্ট হয় না। বাস্তবিকই অতি উৎকৃষ্ট পুত্রই মনোনীত করা হইয়াছে, আমিও অনুরোধ করিতেছি যে, যদি বনবিহারীকে অভিভাবক নিযুক্ত করা হয়, তাহা হইলে, এই বুদ্ধিমান, সুকুমার পঞ্চম বর্ষীয় শিশুটি উত্তমরূপেই সুশিক্ষিত হইবে।" শেষে তিনি অনুরোধ করেছিলেন, সত্ত্বর দত্তক গ্রহণের অনুমতি প্রদান করতে।"

রাজা বনবিহারী কপুর ১৮৮৭ খ্রীঃ ২৫ শে মে তারিখের পত্রে বোর্ডের মেম্বরকে জানিয়েছিলেন, তিনি পূর্বোক্ত সর্ত ৪টি বালকের হিতার্থে আরোপ করেছিলেন।

এখন মহারাণী বেনদেয়ী দেবী যখন একান্তই রাজা বনবিহারীর পুত্রকে দত্তক গ্রহণ করবেন বলে স্থির সিদ্ধান্তে এসেছেন তখন বংশগোপাল নন্দে, রাজমাতা মহারাণী অধিরাণী নারায়ণ কুমারী দত্তক গ্রহণ রহিত করার জন্য "তদ্বিরুদ্ধে নানা প্রকার যুক্তি প্রদর্শন করতঃ, তাঁহার অজ্ঞাতে যাহাকে দত্তক গ্রহণের অনুমতি প্রদান করা না হয়, তজ্জন্য বোর্ডে একখানি আবেদন পত্র প্রেরণ করেন। এক্ষণে মহারাণী বিজনবিহারী ভিন্ন অপর কাহাকেও দত্তকপুত্র গ্রহণ করিবেন না স্থির করিয়াছেন শ্রবণ করিয়া রাজমাতা ও তদীয় ভ্রাতা বংশগোপাল

বাবু বোর্ডে আবেদন করিলেন যে, " নাবালিকা মহারাণীর নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও বনবিহারী বলপূর্ব্বক তাঁহাকে এই দত্তকপুত্র গ্রহণ করাইতেছেন এবং বর্দ্ধমানস্থ কোন ক্ষত্রিয়ই ঈদৃশ রীতি ও শাস্ত্র বহির্ভূত দত্তক গ্রহণে অনুমতি প্রদান করেন নাই।" (রাজবংশানুচরিত পৃঃ- ২২২) তা ছাড়া রাজমাতা নারায়ণকুমারী প্রধানত আপত্তির তিনটি কারণ দেখিয়ে বলেছেন ঃ—

১) ভাগিনেয়কে দত্তক পুত্র গ্রহণ করা বিধি সম্মত নয়।

২) একমাত্র পুত্রকে দত্তক পুত্র গ্রহণ করা সম্পূর্ণ অবৈধ।

৩) পঞ্চমবাৎসরাধিক বয়স্ক বালককে দত্তক গ্রহণ করা নিয়ম বহির্ভূত।

উপরোক্ত আপত্তির কারণ সম্বন্ধে বোর্ড যেরূপ প্রামাণ্য দৃষ্টান্ত (পৃঃ ২২৬, রাজবংশানুচরিত) উল্লেখ করে তার মীমাংসা করেছিলেন তা উদ্ধৃতি করা হলো প্রথম আপত্তির মীমাংসা

১) মিতাক্ষরা শাস্ত্রানুসারে এবং পঞ্জাব প্রদেশের রীত্যানুসারে, ভাগিনেয়কে দত্তকপুত্র গ্রহণ করিবার কোন প্রতিবন্ধকতা নাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উক্ত আছে মহারাজাধিরাজ মহ্‌তাব্‌চাঁদ বাহাদুরের সহোদর ভ্রাতা শ্যামচাঁদ কপুর, তাঁহার ভাগিনেয়ীর পুত্র অমরচাঁদ কপুরকে দত্তক পুত্র গ্রহণ করিয়াছেন। তৎকালে মহারাজাধিরাজ জীবিত ছিলেন এবং উক্ত দত্তক গ্রহণ সম্বন্ধে কোন প্রকার আপত্তিই উত্থাপিত হয় নাই, বরং ক্ষত্রিয় সমাজ মধ্যে ইহা রীতি ও শাস্ত্রানুমোদিত বলিয়াই প্রতিপন্ন হইয়াছে।

২) দ্বিতীয় আপত্তির মীমাংসা — পঞ্জাব প্রদেশীয় রীতি ও শাস্ত্রানুসারে একমাত্র পুত্র অথবা জ্যেষ্ঠপুত্রকেও দত্তক পুত্র গ্রহণ করা যাইতে পারে, তাহারাও কয়েকটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে। মহারাজা মহ্‌তাব্‌চন্দ্‌ বাহাদুর ও তদীয় মহিষী মহারাণী অধিরাণী শ্রীমতী নারায়ণকুমারী দেবী, লালা বংশগোপাল নন্দের জ্যেষ্ঠ ও একমাত্র পুত্র মহারাজাধিরাজ আফ্‌তাব্‌চন্দ্‌ মহ্‌তাব্‌ বাহাদুরকে দত্তকপুত্র গ্রহণ করিয়াছেন এবং উহা যখন শাস্ত্র ও রীতি সম্মত বলিয়াই প্রতিপন্ন হইয়াছে, তখন রাজমাতার এই আপত্তি আদৌ গ্রাহ্য হইতে পারে না। বোর্ড যখন এই সকল আপত্তির মীমাংসা করেন তখন রাজমাতার পক্ষ হইতে মিঃ উড্রফ্‌ এবং মিঃ পিউ, নাবালিকা মহারাণীর পক্ষ হইতে অনারেবল্‌ স্যার চার্লস্‌ পল, এড্‌ভোকেট জেনারেল ও অনারেব্‌ল্‌ গ্রিফেথ ইভান্স, বাদীপক্ষ ও প্রতিবাদীর পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। ফলতঃ বোর্ড বিজনবিহারীর দত্তক গ্রহণ সম্পূর্ণরূপে অনুমোদন করিয়া বঙ্গেশ্বরকে এবং বালিকা মহারাণীকে তাঁহাদের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন।" (রাজবংশানুচরিত পৃঃ ২২৭)

অতঃপর মহারাণী বেনদেয়ী দেবী, নিয়মানুসারে রাজমাতার অনুমতি প্রার্থনা করিলে তিনি তা অগ্রাহ্য করেন এবং বিজন বিহারী ছাড়া অন্য কোন ক্ষত্রিয় সন্তানকে দত্তক গ্রহণ

করতে বলেন। কিন্তু বেনদেয়ী দেবী বিজন বিহারী ছাড়া অপর কাহাকেও দত্তক গ্রহণ করবেন না সে বিষয়ে স্থির প্রতিজ্ঞ। পরিশেষে বঙ্গেশ্বর স্যার ষ্টুয়ার্ট বেলী সাহেব স্বয়ং বর্ধমানে আসেন উভয়ের বাদ-বিশম্বাদ মীমাংসার জন্য। রাজামাতা গভর্ণর সাহেবকে বলেন, বিজনবিহারীকে দত্তক গ্রহণ করায় তাঁর আপত্তি আছে এবং তদ্বিরুদ্ধাচারণ হলে রাজ্যে মামলা মোকদ্দমা হবে ও তাতে জমিদারীর প্রভুত ক্ষতি হবে। তখন মহারাণী বঙ্গেশ্বরকে স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, ''রাজমাতা ক্রোধ পরবশ হইয়াই এরূপ অনর্থক আপত্তি উত্থাপন করিতেছেন। যদি মোকদ্দমাই উপস্থিত হয়, তখন আপনি আমাদের কর্ত্তা বর্ত্তমান আছেন, আপনিই তাহার প্রতিবিধান করিবেন। আমার সে ভাবনা করিবার আবশ্যক নাই।'' প্রকৃতপক্ষে বিচক্ষণ আইন বিদ্গণ যখন বিজনবিহারীকে দত্তক গ্রহণ, রীতিগত-নীতিগতভাবে গর্হিত নয় সেই চিন্তা করে বঙ্গেশ্বর ''অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইয়া সমাগত সহস্র সহস্র দর্শকমণ্ডলীর সমক্ষে শ্রীমান বিজন বিহারীকে দত্তক গ্রহণ করিবার অনুমতি প্রদান করিলেন। অমনি চতুর্দিক হইতে গগনভেদী জয়ধ্বনি সমুত্থিত হইয়া দিঙ্মণ্ডল পরিপূর্ণ করিল। শঙ্খ ঘণ্টা, কাঁসর, নহবৎ, রৌসন চৌকী প্রভৃতি মাঙ্গল্য বাদ্যে রাজপুরী আমোদিত করিয়া তুলিল।'' (রাজবংশানুতরিত পৃঃ ২৩০) এই উৎসবে বর্ধমানের তৎকালীন কালেক্টর ডবলিউ. বি. ওল্ডহেম, কমিশনার মিঃ উইলিয়ম্স্ এবং বহু সম্ভ্রান্ত বিশিষ্ট ব্যক্তবর্গ ও পদস্থ ইংরাজ কর্মচারিগণও যোগ দেন।

জনগণের এরূপ স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ-উচ্ছাস দেখে, বঙ্গেশ্বর স্যার স্টুয়ার্ট বেলী সাহেবও যথেষ্ট খুশী হয়েছেন তা ব্যক্ত করেন। তিনি ইহাও বুঝতে পারলেন, আপামর জনসাধারণ মহারাণী বেনদেয়ীদেবীর ইচ্ছাকেই সাদরে সসম্মানের সঙ্গে গ্রহণ করছেন।।

দত্তক গ্রহণের সকল প্রকার বাদ-বিসম্বাদ ও সমস্যাবলীর পরিসমাপ্তির পর ১৮৮৭ খৃঃ ৩১ জুলাই তারিখে অর্থাৎ মহারাজাধিরাজ আফ্তাব্চাঁদ মহ্তাব্-এর প্রয়াণের দুই বছর পর মহারাণী বেনদেয়ীদেবী বিজন বিহারীকেই দত্তক পুত্র গ্রহণ করে 'মহারাজকুমার বিজয়চাঁদ মহ্তব্' নাম প্রদান করেন। কোর্ট-অব্-ওয়ার্ড রাজা বনবিহারী কপুরকেই মহারাজকুমারের অভিভাবক নিযুক্ত করলেন। রাজা বনবিহারী কপুর, কয়েকজন অতি বিশ্বাসী ও অনুগত রাজকর্মচারীকে মহারাজকুমারের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেন। বর্ধমান রাজ পরিবারে ইহাই তৃতীয় ও শেষ দত্তক গ্রহণ। অতঃপর মহারাজাধিরাজ বিজয়চাঁদ মহ্তাব্-এর সময় হতে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ সময় কাল পর্যন্ত বংশ পরম্পরায় রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হয়ে আসছেন।

যাইহোক, দত্তক গ্রহণের পর মহারাণী রাজমাতা বোর্ডে আবেদন করেন

মহারাজাধিরাজ মহ্‌তাব্‌চাঁদ নারায়ণ কুমারীর নামে যে সুজামুঠা পরগণা ও কুজঙ্গ এষ্টেট, রাজ এষ্টেট হতে বিচ্ছিন্ন করে তাঁকে দেওয়া হোক। কোর্ট-অব্‌-ওয়ার্ড তাঁকে অন্যান্য সমস্ত সম্পত্তি প্রত্যার্পণ করেন। কেবলমাত্র সুজামুঠা পরগণা ও কুজঙ্গ এষ্টেট রেখে দিয়ে তাঁকে ঐ সম্পত্তির উপসত্ব হিসাবে মাসিক ৪ হাজার ও মহারাজাধিরাজ মহ্‌তাব্‌চাঁদের উইল মোতাবেক ৫ হাজার, সর্বসমেত মাসিক ৯ হাজার (৯,০০০/-) টাকা রাজ এস্টেট থেকে বৃত্তি পাবেন। রাজমাতা কোর্ট-অব্‌-ওয়ার্ডের কাছে, রাজ এস্টেটে যে সব মণিমাণিক্যখচিত অলঙ্কারাদি স্ত্রী ধন ছিল তার প্রার্থনা জানালে, একজন মধ্যস্থতা থেকে রাজমাতার দাবী অনুযায়ী প্রায় সমস্ত অলঙ্কার হস্তগত করেন। যাইহোক কোর্ট-অব্‌-ওয়ার্ড ব্যবস্থা অনুযায়ী বেনদেয়ী দেবী সেই সিদ্ধান্তই মেনে নেন। তৎপরে ১৮৮৮ খ্রীঃ ১৩ই মে তারিখে মহারাণী বেনদেয়ী দেবী পুত্রের 'চূড়াকরণ' সম্পাদন করার পর মহারাণী মাত্র ১৯ বছর বয়সে পরলোক গমন করেন। মহারাজা বিজয়চাঁদ মহ্‌তাবের ৪ বছর বয়সকালে গর্ভধারিণী মাতা এবং ৬ বছর বয়সে দত্তক গ্রহীতা মাতাও দত্তক গ্রহণের এক বছর মধ্যেই পরলোক প্রাপ্তা হন।

জনহিতকর কাজ —

মহারাজাধিরাজ আফ্‌তাব্‌চাঁদ মহতবের কর্মকাল অতি সামান্য। তিনি ১৮৮১ খ্রীঃ ডিসেম্বর মাসে রাজ্যভার গ্রহণ করেন এবং ১৮৮৫ খ্রীঃ ২৫ শে মার্চ পরলোক গমন করেন। অর্থাৎ ৩ বছর ৩ মাস (প্রায় ৪ বছর) মাত্র রাজকার্য পরিচালনা করেন। এত অল্প সময়ের মধ্যে জনহিতকর কাজ করার অবসর পান নাই। তার মধ্যেও তিনি মেদিনীপুর জেলার কাঁথি মহকুমায় পানীয় জলের উপযোগী পুষ্করিনী খনন করিয়ে দেন। বর্ধমান শহরে তৎকালে বিশুদ্ধ পানীয় জলের কোন ব্যবস্থা না থাকায় জনস্বাস্থ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই ভাবনা চিন্তা করে পরিশ্রুত জল যাতে জনসাধারণ পায়। সেই জন্য তিনি এককালে বর্ধমান মিউনিসিপ্যালিটিকে ৫০ হাজার (পঞ্চাশ হাজার) টাকা দেন। এবং সেই অর্থেই পৌরপ্রতিষ্ঠান লাকুডিহিতে জল পরিশ্রুত করার বিশেষ ব্যবস্থা করেন, সেই পরিশ্রুত জল শহরের সর্বত্র সরবরাহ করারও ব্যবস্থা করেন। মহারাজাধিরাজ আফ্‌তাব্‌চাঁদ মহতবের দেবদেউল প্রতিষ্ঠা অপেক্ষা জন স্বাস্থ্যের দিকে তাঁর বিশেষ দৃষ্টি ছিল। তিনি দার্জিলিংএ দাতব্য চিকিৎসালয়ে ১০ হাজার (দশ হাজার) টাকা দেন। বর্ধমানস্থ্ গভর্ণমেন্ট দাতব্য চিকিৎসালয়ে চক্ষুপীড়া সংক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসার জন্য স্বতন্ত্র বিভাগ *(eye word)* নির্মাণ করাইয়া দেন। তা ছাড়া যাতে অধিক সংখ্যক রোগী অবিস্থিতি করতে পারে উক্ত চিকিৎসালয়ে আরও ঘর বৃদ্ধি করার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করেন। তিনি মাঝে মাঝে চিকিৎসালয়ে গিয়ে রোগীদের অবস্থা দেখে আসতেন ও গরীব রোগীদের গোপনে অর্থদান করতেন। তাঁর পরোপকারের আর একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ

মহারাজাধিরাজ বাহাদুর আফ্‌তাব্‌চাঁদ

মহারাজাধিরাজ বাহাদুর আফ্‌তাব্‌চাঁদ



দেওয়ান-ই-রাজ বনবিহারী কপূর

করা প্রয়োজন, দেওয়ানি জেলে যারা বন্দী থাকত, অর্থের জন্য যাদের কারাবাস হয়েছে, তিনি নিজে অর্থ দিয়ে সেইসব কারাবাসীদের মুক্ত করে দিতেন। তাঁর এরূপ জনহিতকর কাজের জন্য বঙ্গীয় সরকার যে পত্র দিয়েছিলেন তার উদ্ধৃতি দেওয়া হলো ঃ—

পাবলিক ওয়ার্ক ডিপার্টমেন্ট

বর্দ্ধমানাধিপতি হিজহাইনেস্

মহারাজা সমীপে

কলিকাতা ৮ই নভেম্বর ১৮৮২।

১৮৮১ খৃঃ অপরাপর লোক কর্ত্তৃক বঙ্গদেশে যে সমস্ত দেশহিতকর কার্য্যানুষ্ঠান হইয়াছে, তৎসমুদয়ের বিজ্ঞাপন ৮ই তারিখের কলিকাতা গেজেটের ক্রোড়পত্রে প্রকাশিত হওয়ায়, বঙ্গেশ্বরের আদেশানুসারে আপনার অবগতির জন্য তাহার একখানি প্রতিলিপি আপনাকে প্রেরণ করিতেছি।

বিজ্ঞাপন তালিকায় সাধারণের হিতার্থে আপনার ঈদৃশ অসাধারণ বদান্যতা দৃষ্টে, আপনাকে ধন্যবাদ প্রদান করিবার জন্য বঙ্গেশ্বর আমাকে আদেশ প্রদান করিলেন।

বশম্বদ

হরনেল

বেঙ্গল গভর্ণমেন্টের এসিসটেন্ট সক্রেটারী

(রাজবংশানুচরিত পৃঃ- ২০৫)

শিক্ষানুরাগী আফ্‌তাব্‌চাঁদ্‌—

মহারাজাধিরাজ মহতাব্‌চাঁদ যে উচ্চ ইংরাজী (H.E.) বিদ্যালয়টি স্থাপন করে গিয়েছিলেন, "আফ্‌তাব্‌চন্দ মহ্‌তাব্‌ বাহাদুর বর্দ্ধমান রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়াই উক্ত স্কুলটিকে কলেজে পরিণত করিয়া বিনা বেতনে বালকদিগকে এল. এ. পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিবার ব্যবস্থা করিয়া দেন।" (রাজবংশানুচরিত পৃঃ- ২০৩) পূর্ববর্তী মহারাজাধিরাজ মহতাব্‌চাঁদ্‌ বাহাদুর কলেজের ভিত্তিস্থাপন করে গিয়েছিলেন সেই অসমাপ্ত কাজ, আফ্‌তাব্‌চাঁদ ৮০,০০০ (আশি হাজার টাকা) ব্যয়ে তা সমাপ্ত করেন। এই কলেজে পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদের গুনানুসারে বৃত্তি দিতেন।

Public Works Department

To

H.H.the Maharaja of Burdwan.

Dated Calcutta the 18th November 1882.

Sir

I am directed by the Lieutenant Governor to forward for your information a translation of a notification dated the 7th. ultimo, giving a list of works of Public utility constructed by private individuals in Bengal during the year 1881 which has been published in the supplement of Calcutta Gazette of the 8th idem.

2. The lieutenant Governor has remarked the position in which your name appears in the list, and desires me to thank you for the very useful work which you have so liberally constructed for the benefit of the public.

List of public utility

1. Pucca building for College in Burdwan with Cost Rs. 80,000

2. Public library in Burdwan With cost Rs. 9,000

Total 89,000

I have the honer & C

O.HEORNLF

Asst. Secy. to the Govt. of Bengal

মহারাজাধিরাজ আফ্‌তাব্‌চাঁদ মহ্‌তবের শিক্ষানুরাগীতার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়, আর একটি কাজে যা পূর্ববর্তী মহারাজা অথবা গভর্ণমেন্টও চিন্তা করেন নাই; তা হল 'সাধারণ গ্রন্থাগার' (Public Library) স্থাপন। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে ৯ হাজার (নয় হাজার) টাকা ব্যয়ে শহরে একটি সাধারণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেন। এবং এখানকার কয়েকজন কৃতবিদ্য লোকের হাতে তার তত্ত্বাবধানের ভার দেন। এবং রাজসরকার থেকে তার যাবতীয় ব্যয়ভার গ্রহণ করেন। এই সাধারণ গ্রন্থাগারটি স্থানান্তরিত হয়ে ও নাম পরিবর্তিত হয়ে বর্তমানে 'উদয়চাঁদ গ্রন্থাগার' নামে পরিচিত। পূর্বে এই গ্রন্থাগারের নাম ছিল RAJ PUBLIC LIBRARY. এই লাইব্রেরীর অবস্থান ছিল, এখন যেখানে রূপমহল সিনেমা। এছাড়া, শিক্ষাক্ষেত্রে আরও তাঁর দান আছে। সংস্কৃত শিক্ষায় উৎসাহ দেওয়ার জন্য সর্বোৎকৃষ্ট দুটি ছাত্রকে বার্ষিক ৫০ টাকা করে ১০০ টাকা এবং দুজন সর্বোৎকৃষ্ট অধ্যাপককে বার্ষিক ৫০ টাকা করে ১০০ টাকা বৃত্তি দেবার ব্যবস্থা করেন এবং পুরস্কার দেওয়ারও ববস্থা করেন। এই জন্য বেঙ্গল গভর্ণমেন্টকে এককালে ৫হাজার (পাঁচ হাজার) টাকা প্রদান করেন। উক্ত টাকা পেয়ে বেঙ্গল গভযর্ণমেন্টের অস্থায়ী আণ্ডার সেক্রেটারী সি. এস. বেলি সাহেব শিক্ষা

বিভাগের ডিরেক্টর সাহেবকে অবগত করেন। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ২৭ শে ফেব্রুয়ারী তারিখের শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর বাহাদুরকে লেখা বেঙ্গল গভর্ণমেন্টের আণ্ডার সেক্রেটারী মহাশয়ের পত্র থেকে জানা যায়।

From

C.S. BAYLEY Esqr

Ofg. Under Secy to the Government of Bengal.

To

The Director of Public Institution, Bengal

Sir,

I am, directed to acknowledge the receipt of your letter no. 1233 dated the 27th February 1882 reporting that the Maharaja of Burdwan has made a donation of Rs. 5,000 with a view to the foundation of two annual Scholarships of the value of Rs. 50 each and of two annual rewards of Rs. 50 each for teachers, in connection with the Sanskrit Titles examination.

2. The Lieutenant Governor was much pleased in Accepting the donation and desires that an expression of his thanks may be conveyed to the Maharaja for his public spirit and liberality.

3. The correspondence will be published in the Calcutta Gazette.

I have the honor & c

C.S. Bayley

Offq. Under Secy. to the Govt. of Bengal.

Belvedere

My dear Maharaja,

I write to inform you that having been appointed to the India Council in England I leave Calcutta in the P & O. Steamer on the 24th instant making over charge to my successor Mr. Rivers Thompson. If you come to Calcutta any day after the 20th I shall have much pleasure in introducing you to him and will at the same time wish you goodbye.

Your sincere friend

A. Eden.

সাহিত্যপ্রীতি—

মহারাজাধিরাজ আফ্‌তাব্‌চাঁদ মহ্‌তব্‌ যে বিদ্যোৎসাহী, শিক্ষানুরাগী ছিলেন তাই নয় তাঁর সাহিত্যপ্রীতিও কম ছিল না। মহারাজাধিরাজ মহ্‌তবচাঁদের আরব্ধ কাজ এই সংক্ষিপ্ত জীবনে শেষ করে যান।

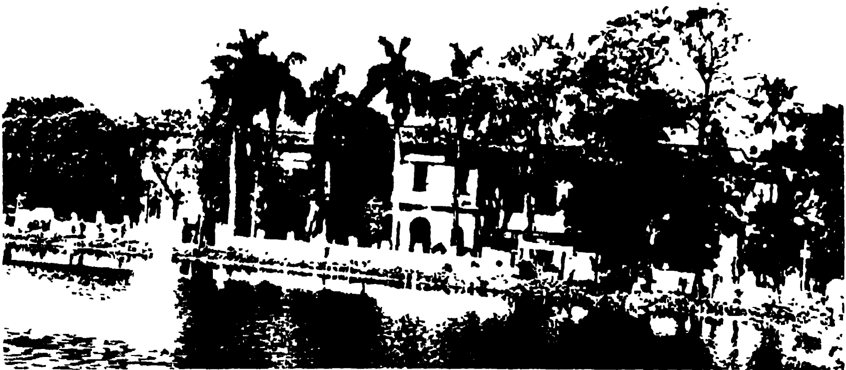
দুটি উল্লেখযোগ্য মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারত। এই মহাকাব্যের বঙ্গানুবাদ কার্যে নিযুক্ত ছিলেন আশুতোষ শিরোরত্ন, অঘোরনাথ তত্ত্বনিধি, ব্রজেন্দ্রকুমার বিদ্যারত্ন অভয়াচরণ তর্কপঞ্চানন, তারকনাথ তত্ত্বরত্ন, শ্যামাচরণ প্রমুখ বিখ্যাত পণ্ডিতবর্গ। মহারাজা মহ্‌তাব্‌চাঁদের সময়ে রামায়ণের 'কিষ্কিন্ধা কাণ্ড' পর্যন্ত অনুবাদিত ও মুদ্রিত হয়েছিল। পরবর্তী তিনটি কাণ্ড সুন্দর কাণ্ড, লঙ্কা কাণ্ড ও উত্তর কাণ্ড মহারাজা আফ্‌তাব্‌চাঁদ মহ্‌তাবের এর সময় ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে সমাপ্ত হয়। মহাভারতের 'শান্তি' পর্ব পর্যন্ত মহ্‌তাব্‌চাঁদের সময়ে অনুবাদ কার্য শেষ হয়। অবশিষ্ট অনুশাসন পর্ব, অশ্বমেধ, আশ্রমবাসিক, মৌষল, মহাপ্রস্থানিক, স্বর্গারোহণ ও খিলহরিবংশ পর্বগুলি আফ্‌তাব্‌চাঁদ মহ্‌তাবের সময়ে সম্পূর্ণ হয়। মহাভারতের অনুবাদকর্ম শেষ হয় ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে। শেষ পর্যন্ত সব পণ্ডিতই জীবিত ছিলেন না ; কেবলমাত্র জগমোহন তর্কালঙ্কার ও অঘোরনাথ তত্ত্বনিধি জীবিত ছিলেন।

'যজুঃকর্ম্মদীপিকা' গ্রন্থের অনুবাদ আরম্ভ করেছিলেন মহারাজা মহ্‌তাব্‌চাঁদ বাহাদুর। এই গ্রন্থটিও সম্পূর্ণ অনুবাদ হয় নাই, কেবলমাত্র 'মিতাক্ষরার' আচার অধ্যায় অংশ প্রকাশ হয়েছিল। মহারাজা আফ্‌তাবচাঁদের সময়ে পুনরায় মুদ্রণ কাজ শুরু হয় কিন্তু তাঁরও পরলোকগমনে কাজ অসমাপ্ত থাকে। তবে তাঁর বিধবা মহিষীর চেষ্টায় ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে বইটি প্রকাশ লাভ করে। গ্রন্থটি সংকলন করেন অঘোরনাথ তত্ত্বনিধি ও ব্রজেন্দ্রকুমার বিদ্যারত্ন। উর্দূসাহিত্য *'চাহার দরবেশ'* এর অনুবাদ করেছিলেন ব্রজেন্দ্রকুমার বিদ্যারত্ন ও মুন্সি মহম্মদী। এই কাহিনী পুস্তকটি মহ্‌তব্‌চাঁদের সময়ে অনুবাদিত হয়েছিল, মহারাজ আফ্‌তাবচাঁদ মহ্‌তাবের সময় মুদ্রিত হয়ে প্রকাশ হয়। 'ভক্তিগানামৃত' ও 'সঙ্গীত সুধাকব' এই দু'খানি গ্রন্থ মহারাজ মহ্‌তাব্‌চাঁদ বাহাদুর রচনা করেন। উক্ত গ্রন্থ দুটির প্রথমভাগ তাঁর সময়ে মুদ্রিত হয়েছিল। গ্রন্থ দুটির দ্বিতীয় ভাগ মহারাজ আফ্‌তাব্‌চাঁদ মহ্‌তাব্‌ সন ১২৮৭ সালের যথাক্রমে শ্রাবণ ও ফাল্গুন মাসে প্রকাশিত হয়।

শর্ম্মিষ্ঠা নাট্যগীতিকা—

শর্ম্মিষ্ঠা নাটক মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রণীত সেকালের অসামান্য জনপ্রিয় নাটক। বাংলা নাটক ও নাট্যশালার আদিযুগের নট, নাট্যকার কালিদাস সান্যাল, মহারাজা

আফ্‌তাবচাঁদ বাহাদুরের নির্দেশে মধুসূদনের 'শর্ম্মিষ্ঠা' নাটকটিকে অবলম্বন করে 'শর্ম্মিষ্ঠা গীতিনাট্য' রচনা করেন। গীতিনাট্যটি বর্ধমান রাজ অধিরাজ যন্ত্রে মুদ্রিত হয় সন ১২৮৭ সাল ৯ই জৈষ্ঠ। বলাবাহুল্য কালিদাস সান্যাল, মাইকেল মধুসূদন দত্তের ঘনিষ্ঠ পরিচিত ছিলেন। ইহাও মহারাজের সাহিত্যপ্রীতির পরিচায়ক। মহারাজ আফ্‌তাব্‌চাঁদ মহতবের সময় ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে ভারতচন্দ্রের কাহিনী অবলম্বনে ''বিদ্যাসুন্দর গীতাভিনয়'' নাটকটি কালিদাস সান্যাল মহাশয় রচনা করেন। কালিদাস সান্যাল এর জনপ্রিয় নাটক 'নলদময়ন্তী'। সান্যাল মহাশয় মহারাজা মহ্‌তাব্‌চাঁদের রাজসরকারে চাকরী করতেন। রাজবাড়ীতে এই নাটকটি অভিনীত হয়। অভিনয় দেখে মহারাজ মহতাব্‌চাঁদ মুগ্ধ হন। এবং নাট্যকার তজ্জন্য বিশেষভাবে অনুগৃহীত হন ও পোষকতা লাভ করেন। 'নলদময়ন্তী' নাটকটি মহারাজা মহ্‌তাব্‌চাঁদের অর্থানুকুল্যে মুদ্রিত হয়। সান্যাল মহাশয়, পরবর্তী বর্ধমানরাজ, মহারাজাধিরাজ আফ্‌তাব্‌চাঁদ মহ্‌তাব্‌চাঁদ বাহাদুরের সময়েও জীবিত ছিলেন। বর্ধমান জেলাতেই তাঁর বাড়ী ছিল। পালাকার নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় মহারাজ মহ্‌তাব্‌চাঁদের আশ্রিত ছিলেন। তাঁর পুত্র পালাকার কমলাকান্ত মুখোপাধ্যায়ও মহারাজাধিরাজ আফ্‌তাব্‌চাঁদ বাহাদুরের পোষকতা লাভ করেন। সর্বমঙ্গলা ঠাকুর বাড়িতে তাঁর পালাগানের বাঁধা বন্দোবস্ত ছিল। মহারাজাধিরাজ আফ্‌তাব্‌চাঁদ মহ্‌তাব্ ভক্তিপরায়ণ ছিলেন। তিনি রাজসভাশ্রিত প্রবীণ পণ্ডিত, রামায়ণ ও মহাভারতের অন্যতম অনুবাদক অঘোরনাথ তত্ত্বনিধি মহাশয়কে সতীর পতিভক্তি কাহিনী অবলম্বনে অভিনয়োপযোগী একখানি নাটক রচনার কথা বলেন। তত্ত্বনিধি মহাশয় মহারাজের কথানুযায়ী 'সতীবিয়োগ' নাটকটি রচনা করেন। নাটকটি বর্ধমান অধিরাজ যন্ত্রে মুদ্রিত হয়ে সন ১২৮৯ সালে প্রকাশিত হয়।



আফ্‌তাবচাঁদ প্রতিষ্ঠিত বর্ধমান রাজ কলেজ

বর্ধমানরাজ যে সঙ্গীত রসিক ছিলেন তা মহারাজা মহতাব্ লিখিত 'ভক্তিগানামৃত', 'সঙ্গীত বিলাস' সঙ্গীত গ্রন্থ থেকেই বোঝা যায়। মহারাজ আফ্‌তাব্‌চাঁদ গীতিকার ছিলেন না, তবে তিনিও যে সঙ্গীত প্রিয় ছিলেন তা নিঃসন্দেহে বোঝা যায়। ফার্‌সী হরফে মুদ্রিত 'হিন্দুস্থানী রাগসঙ্গীতে'র গ্রন্থটির বাংলা হরফে মুদ্রণের সমস্ত ব্যয়ভার তিনি বহন করেন। এই হরফান্তরিত করেছিলেন ব্রজেন্দ্রকুমার বিদ্যারত্ন ও মৌলভী মুন্সী মহম্মদী। গ্রন্থখানি বর্ধমান অধিরাজ যন্ত্রে মুদ্রিত হয়ে সন ১২৯১ সালের ৮ই ফাল্গুন প্রকাশিত হয়।

ইত্যাদি প্রকার ক্রিয়াকলাপ হতেই বোঝা যায় মহারাজা আফ্‌তাবচাঁদ বাহাদুর একজন প্রকৃত শিক্ষনুরাগী, বিদ্যোৎসাহী, সাহিত্য প্রেমিক গুণগ্রাহী পুরুষ।

অতঃপর রাজবংশের রীতি অনুসারে তৎপূর্ববর্তী পুরুষের সমাধি সৌধ নির্মাণ ব্যাপারে যথেষ্ট কর্তব্যনিষ্ঠ ছিলেন। তাঁর স্থাপিত মহারাজাধিরাজ মহ্‌তাব্ চাঁদের স্মৃতিফলক থেকে জানা যায়। স্মৃতিফলকে উৎকীর্ণ লিপি উদ্ধৃত করা হলো—

''১৮৮১ খৃঃ মহারাজকুমার অম্বিকায় পরলোকগত হিজহাইনেস্ মহারাজ অধিরাজ মহ্‌তাব্‌চাঁদ বাহাদুরের সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। তাহার শিলালিপিস্থ শ্লোক—

ভুজযুগসাগর শশিমশকেশ্বর
বৎসরলব্ধ বিভূতি
ফূজ্যপদং প্রতি পদ্য পিতা মতি
বর্দ্ধিত কীর্ত্তি বিভূতিঃ।
শশিখ বসুক্ষিতি মিতশক ভূপতি
হায়ন বাহুল মাসি।
নবম দিনে নৃপ মৌলি মুকুট কৃপ
মহ্‌তব্‌চন্দ্ গুণরাশিঃ।।
ভাগলপুর পুর পুরতো ভাসুর
.... বৃত মূর্ত্তিঃ।
ব্রহ্মপদং .... মাপ পরাৎপর
.... পার্থিবপূর্ত্তিঃ।।

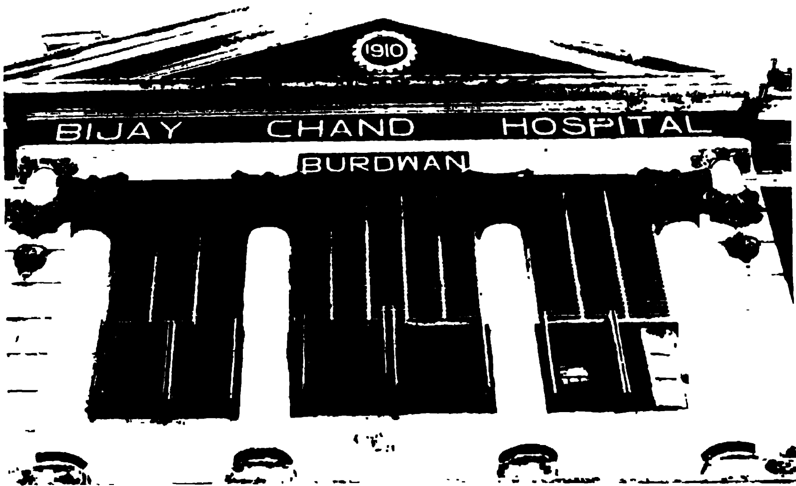
''সো লেভে ঢেকুনীনাং .... মদনপরিমিতং শ্রীল ভিক্টোরিয়াঃ
সম্রাজো মানমুচ্চৈর্ব্বর নরবরগং বঙ্গরাজৈরলভ্যং।
যোভুক্ত্বাশেষভোগান্ সময়বশগতঃ সোহদ্য কঙ্কালমাত্রঃ
কঃ কঙ্কালং জহাতি ত্রিপুররিপুরতঃ সোহপি কঙ্কালমালী।।

নির্ম্মিতে মন্দিরে তস্য কঙ্কবং স্থাপিতং ময়া।
মাতুরাদেশতঃ শ্রীমদাফ্‌তাব্ চন্দ্ ভ্রাতৃধর্ম্মনা।।"

"মদীয় পিতা হিজ্ হাইনেস্ চতুর্দ্দশ মহামহীন্দ্র মহারাজাধিরাজ মহতব্‌চন্দ্ বাহাদুর ১৭৪২ শকাব্দে আবির্ভূত হইয়া, ১৭৬৫ শকে রাজ্যলাভ পূর্ব্বক রাজনীতি অনুসারে সর্ব্বমনোরঞ্জন সুনিয়ম সংস্থাপন এবং রাজ্য ও ঐশ্বর্য্যের প্রভূত উৎকর্ষ বিধান করতঃ শ্রী শ্রীমতী ভারতেশ্বরীর মহাসমাজ হইতে স্বাধীন ভূপালগণের সমান সম্মানসূচক ত্রয়োদশ তোপ প্রাপ্ত হয়েন এবং দেশ বিদেশে বাপী, কূপ, তড়াগ, প্রাসাদ প্রভৃতি এবং দেবালয়, বিদ্যালয় ও চিকিৎসালয় সংস্থাপন এবং মহাভারত, রামায়ণ, মিতাক্ষরা প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থ সকল অনুবাদসহ মুদ্রিত করিয়া নানা দেশে নিজ কীর্তি বিস্তার করেন।

পরিশেষে ১৮০১ শকে ৯ই কার্ত্তিক শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে ভাগলপুরে ভাগীরথী তীরে মায়াময় কলেবর পরিহার পূর্ব্বক পরব্রহ্মে লীন হইয়াছেন। মদীয় মাতা মহারাজাধিরাজ মহিষী শ্রী শ্রীমতী নারায়ণদেয়ী দেবীর আদেশ ও কুলাচার অনুসারে আমি এই পিতৃনির্ম্মিত মন্দিরে তদীয় প্রতিকৃতি এবং ব্যবহারোপযোগী পরিচ্ছদ প্রভৃতির সহিত ১৮০২ শকে ২রা ভাদ্রে তদীয় অস্থি স্থাপন করিলাম।

শ্রী আফতাব্‌চন্দ্ মহ্‌তাব্ বাহাদুর



বর্ধমান বিজয়চাঁদ হসপিটাল

মহারাজাধিরাজ বিজয়চাঁদ

(১৮৮৭-১৯৪২)

মহারাজাধিরাজ আফ্‌তাব্‌চাঁদ মহ্‌তাব্‌ পরলোক গমনের দুই বছর পর তাঁর বিধবা মহিষী বেনদেয়ী দেবী, রাজা বনবিহারী কপূরের একমাত্র জ্যেষ্ঠপুত্র বিজনবিহারীকে ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে দত্তক গ্রহণ করেন; তখন তাঁর নাম হয় বিজয়চাঁদ মহ্‌তাব্‌। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের, ১৩-ই মে তাঁর চূড়াকরণের পরেই মহারাণী বেনদেয়ী দেবী পরলোকগমন করেন।

বহু তর্ক বিতর্ক, বাদ-বিশম্বাদ, আইন আদালত করার পর বিজয়চাঁদ মহ্‌তাব্‌ই রাজসিংহাসনের অধিকারী হন। কিন্তু তখনও সিংহাসন নিষ্কণ্টক হয় নাই। মহারাণী বেনদেয়ী দেবীর মৃত্যুর পর রাজমাতা মহারাণী অধিরাণী নারায়ণকুমারী দেবী ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে পুনরায় আইনের আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁর একান্তই ইচ্ছা, রাজা বনবিহারী কপূরের পরিবর্তে দেওয়ান-ই-রাজ হোক তাঁর ভ্রাতা বংশগোপাল নন্দে এবং দত্তক পুত্র হিসাবে গৃহীত হওয়ার বিজয়চাঁদের কোন অধিকার নাই। কারণ, তিনি হলেন পিতার একমাত্র পুত্র। রাজমাতা নারায়ণকুমারী ও বংশগোপাল নন্দের যৌথ অভিযোগ, কলিকাতার উচ্চতম আদালত অনর্থক মোকদ্দমাটির আপোষ নিস্পত্তি করে দেওয়া সত্ত্বেও রাজমাতা নারায়ণকুমারী দেবীর বক্তব্য,-মহারাজ আফ্‌তাব্‌চাঁদ ও তৎপত্নী বেনদেয়ী দেবী লোকান্তরিত; সেই হেতু তিনিই বর্ধমান রাজ্যের মালিক এবং তাঁর নির্দেশ মত সমস্ত কাজ কর্ম পরিচালিত হবে। এই ইচ্ছানুযায়ী তিনি নিজ আবাসন রঙমহলে বর্ধমানস্থ ক্ষত্রিয়কুলকে আমন্ত্রণ জানিয়ে এক সভার আয়োজন করেন; উদ্দেশ্য, স্বপক্ষে জনমত গঠন করা। সেই সভায়, সদ্য পরলোকগতা মহারাণী বেনদেয়ী দেবীর পিতা লক্ষ্মীনারায়ণ খান্নাও উপস্থিত ছিলেন। রাজমাতা নারায়ণকুমারী দেবী ও বংশগোপাল নন্দের অভিমত ও বক্তব্যের বিরুদ্ধে লক্ষ্মীনারায়ণ খান্না তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে জ্বালাময়ী ভাষায় সভাস্থ জনসমক্ষে ন্যায় ও যুক্তিসিদ্ধ যে উক্তি করেন, তাতে সকলেই একবাক্যে লক্ষ্মীনারায়ণ খান্নাকে সর্বান্তকরণে সমর্থন করেন। এবং তিনি ইহাও ঘোষণা করেন, বেনদেয়ী দেবীর শেষকৃত্য ও পারলৌকিক যাবতীয় ক্রিয়াকর্ম করার একমাত্র অধিকার রাজকুমার বিজয়চাঁদ মহ্‌তাবেরই আছে, অন্য কাহারও নাই। সুতরাং রাজমাতা নারায়ণকুমারী দেবী ও বংশগোপাল নন্দে নিরস্ত হলেন।

মহারাজ আফ্‌তাব্‌ মহিষী বেনদেয়ী দেবী রাজা বনবিহারী কপূরের কনিষ্ঠ পুত্র বিজনবিহারী কে যে দত্তক গ্রহণ করেছিলেন তার সরকারী স্বীকৃতিটি উদ্ধৃতি করা হলো ঃ—

REVENUE DEPARTMENT
Land Revenue
CALCUTTA, the 26th. JULY 1887
Resolution

Adoption of a son by the Maharani of Burdwan.

Read ----

Letter from the Board of revenue, No. 356 A, dated the 16th April 1885, with enclosure. Letter from the Board of Revenue No. 96A, dated the 8th February, 1886, with enclosure. Letter from the Board of Revenue, No. 99A, dated the 8th February 1887, with enclosure. Letter from the Board of Revenue. No. 227A. dated the 24th. March 1887, with enclosure. Letter from the Board of Revenue. No. 428A, dated the 17th. June 1887, with enclosure. Letter from the Solecitor to the Government of India, No.745, dated the 9th. July 1887, and enclosure. Petition from the Dowager Maharani of Burdwan. dated the 13th. July 1887, and enclosure.

The late Maharajadhiraj Aftab Chand Bahadur, of Burdwan, who died in March 1885, left a will by which his widow, the Maharani Benodeyi Devi, is bound, under a heavy penalty, to adopt an heir, the only lemit place on her choice being a prohibition against the selection of one of the testator's brothers. She was at first disposed to adopt the younger son of the Hon'ble Lalla Bun Behari Kapur, but before any definite proposal could be made, the child unfortunately died. Her selection fell next on her half-brother, and the Court of Wards recommended that the consent of the Lieutenant Governor, necessary under the provisions of Bengal Act IX of 1879 to any adoption made by a Ward, should be accorded, provided the legal validity of the act could be clearly established. The question wheather the adoption of a half-brother would be valid according to the law

binding on the Burdwan family was accordingly referred by this Government for the Consideration of the Advocate-General, who, having associated with himself Mr. Pitt-Kennedy, Barrister-at-law, returned the opinion that such an adoption would be invalid. The Lieutenant-Governor thought himself bound to act in conformity with this advice, and accordingly declined to accept the Maharani's proposal. She questioned the Correctness of the view taken by the legal advisers of Government producing several opinions on the other side, obtained from counsel learned in the law, and the matter was still under discussion when, in January last, this child also died.

In the following month the Maharani intimated a desire, which she has since very strongly pressed upon the Court of Wards and upon Government, to adopt the only surviving son of Lalla Bun Behari. To this arrangement the Dowager Maharani Narain Kumri Devi, an influential member of the Burdwan family, objected, on the ground that the boy being an only son, and the son of the adopter's sister, the act would be invalid according to the Benares School of Hindu law, to which the Burdwan family, as she alleged, is subject. On behalf of the younger Maharani, it was stated in reply that the family, having come originally from the Punjab, and never having abandoned its ancient customs, is infact bound in this matter by the Hindu law prevalent in the Provide, which permits adoptions such as that which it is now proposed to make. The records throwing light on the question as to the school of law by which the family has been guided since its settlement in Bengal have been examined with great care by the Court of Wards, and discussed in an elaborate report. The conclusion at which the Court arrived

after considering all ascertained facts, and hearing able counsel on both sides of the question, was that the adoption would not be illegal, and may properly be sanctioned by Government. All the papers of the case including copies of the documents filled by the parties, were then forwarded by this Government for the consideration of the Standing Counsel, as the Advocate-General had been engaged in the case. Mr.Bonnerjee, acting with Mr. Hill, Barrister-at-law, gave the following opinion :---

We have carefully considered this case by the light of the materials placed before us, and are of opinion that if, as is asserted on behalf of the younger Maharani, and as would seem to have been practically allowed by the Dowager Maharani, the founder of the Burdwan Raj family came from the Punjab and settled at Burdwan, there can be no doubt whatever but that the family must be presumed, unless and until the contrary is proved, to be governed in all matters of marriage, adoption, inheritance, and others in which the Hindu law is still applicable to the Hindus by the laws, manners usages, and customs which were in force in the Punjab at the time he left. In this case we have in addition to the presumption of law to which we have referred, the fact that, exconcessu the adoption of the Maharajah Aftab Chand Bahadur himself, if valid at all, was valid by virtue of the Punjab customs; and we think that the burden of the Dowager Maharani to show that the family ever abandoned the Punjab customs, so far as these were inconsistent with the law of the Benares School of the Hindu law, and adopted the law of this school in its entirety will be an exceedingly difficult one.

We are also of opinion that, according to the Punjab customs applicable to Khettries as interpreted and enforced by

the Chief Court of the Province, it is competent to a person to adopt the only son of his sister, and we see no reason in law why His Honour the Lieutenant-Governor should withhold his snaction under section 61 of the Court of Wards Act. 1879, to the proposed adoption.

Upon the difficult point of law involved, the Lieutenant-Governor considers that he is bound to accept this opinion of his professional advisers, given after the facts had been ascertained as fully as was possible without a trial before a Court of law, and after the whole subject in all its bearing had been exhaustively discussed. Without attempting to repeat the arguments upon which the finding of the legal advisers of Government is founded, it may be noticed that there seems to be no evidence to support the assertion that members of the Burdwan family are bound by the Benares School of law, which prevails neither in the Punjab, the place of their origin, nor in Bengal, the place of their domicile, but in a region with which they seem to have never had any connexion. It moreover appears that the late head of the family, the Maharajah Aftab Chand, was, when adopted, an only son, and by blood, the nephew of the lady who became his mother by adoption: an instance from which it may be inferred, on the usual assumption of the validity of uncontested adoptions, on the strength of which a great family has been maintained, that the Burdwan Maharajahs have not been, and therefore are not now governed by the stricter school of Hindu law prevailing in Benares.

Sir Stewart Bayley would gladly have seen the selection so made as to command the approval of all the members of the family, and at a personal interview with the Maharani of

Burdwan, having first ascertained that her choice was really spontaneous, he pointed out to her that perseverance in it would lead to friction, probably to litigation and expense. He urged upon her the advantage of adopting some child to whom no objection would be made by any of her relatives, if such a boy could be found. As not withstanding this consideration, which was made quite plain to her, she declared very clearly and forcibly that, having satisfied herself that no legal obstacle existed to the adoption of the son of Lalla Bun Behari, she desired to take him and no other, and that he was her definite and only choice, the Lieutenant-Governor does not think it right to refuse his sanction to the selection, the right of making which, according to her own discretion, belongs to the widow, not only by Hindu custom, but also by the direction provision of the will left by the late Maharajah. Sir Stewart Bayley has seen the boy, and has not found that, apart from the question of law, there are any considerations, personal to the child, which could possibly furnish ground for refusing sanction to the adoption. The opposition offered by the Dowager Maharani is certainly an objection of a very serious character, but Sir Stewart Bayley has ascertained that it is based only on a view of the law, which he is advised is mistaken. His Honour has, at a personal interview expressed to the Dowager Maharani his hope that she will be able to restore peace to the Burdwan family by accepting the decision which the able barristers consulted have arrived at upon this abstruse question of Hindu law.

Under these circumstances, the Lieutenant Governor gives his consent under section 61, Bengal Act IX of 1879, to the adoption of the only son of Lalla Bun Behari by Maharani

Benodeyi Devi, widow of the late Maharajadhiraj Aftab Chand Bahadur of Burdwan.

By order of Lieutenant-Governor of Bengal

P. NOLAN

Secetary to the Government of Bengal

No. 2240 --- 829LR.

Copy forwarded to Srimati Maharani Benodeyi

তখন, ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে বেনদেয়ী দেবী পুত্রের 'চূড়াকরণ' করেন। তৎপরে ঐ বছরের ১৩ই মে তারিখে মাত্র ১৯ বছর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন। এই সময় বিজনবিহারীর বয়স ৭ বছর (জন্ম ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের, ১৯শে অক্টোবর)। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে অক্টোবর বিজনবিহারী, 'বিজয়চাঁদ মহ্‌তাব্‌' নামে বর্ধমান রাজ্যের একাধিপত্য প্রাপ্ত হন। ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারেল লর্ড কার্জন ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে ১লা জানুয়ারী 'মহারাজাধিরাজ' খেতাব যুক্ত সনন্দ প্রদান করেন।

১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে পরলোকপ্রাপ্তা মহারাণী ভিক্টোরিয়ার পুত্র অ্যালবার্টভিক্টর কলিকাতা আগমন করলে গভর্ণমেণ্ট হাউসে তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য ৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে মহারাজকুমার বিজয়চাঁদ সহ রাজা বনবিহারী কপূরকে একখানি আমন্ত্রণ পত্র পাঠান। বলাবাহুল্য, রাজা বনবিহারী কপূর যথাসময়ে, মহারাজকুমারকে সঙ্গে নিয়ে গভর্ণমেণ্ট হাউসে উপস্থিত হলে তাঁকে অত্যন্ত সমাদরে ও সস্নেহে অভ্যর্থনা করেন।

মহারাজাধিরাজ বিজয়চাঁদ মহাতাব্‌ রাজ্যভার গ্রহণ করার পূর্বে ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে সন ১৩০০ সালের ১৯ শে চৈত্র তারিখে রাজবংশের চিরপ্রথা অনুসারে অম্বিকা কালনায় স্বর্গীয় মহারাজাধিরাজ আফ্‌তাব্‌চাঁদ্‌ মহতাব্‌ বাহাদুর ও মহিষী মহারাণী অধিরাণী বেনদেয়ী দেবীর সমাজমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর উৎকীর্ণ শিলালিপিস্থ্‌ শ্লোক উদ্ধৃতি করা হলো।

মহারাজা আফ্‌তাবচাঁদ বাহাদুরের স্মৃতিফলকে লিখিত আছে ঃ—

''শাকীযাঙ্কিকুলাদ্রিসপ্তচন্দ্রমনভঃপঞ্চাধিবিংশপ্রমে।
জাতঃ সৌম্যদিনে ততঃ পুরাণশতমে বেদাঙ্গ মানাধিকে।
শাকে চৈত্রশিবারিমানচান্দ্রিদিবসে ধাম শ্রিতঃ শ্রীপতেঃ

আফ্‌তাব্ চন্দ্ মহতাব্ মহীন্দ্রমুকুটঃ শেতে সমাধাবিহ।।"

মহারাণী বেনদেয়ী দেবীর শিলা ফলকে উৎকীর্ণ আছে ঃ–

"শাকে শূলশিখাগ্রহর্বিশশিমে রাধর্ত্তুচন্দ্র প্রমে
কাব্যে লব্ধজনির্দ্দিনে ততইতা বেনাদিদেয়ী দিবং।
আস্তেহষ্টাদশদিক্‌শকীয়শুচিভূমানাহহীনাঙ্গিকা
আফ্‌তাব্‌চন্দ্‌মহ্‌তাব্ মহীন্দ্র মহিষী ভর্ত্তারমারাদিহ।।"

"শাকে পঞ্চশাঙ্কদিক্‌করিমহীমানে মধৌ পূষণি
বিংশে চৈকবিহীনিতে দিবমুপাযাতস্য তাতস্য চ।
মাতুশ্চ স্মৃতয়ে সমাধিসদনং চক্রে হস্থিভিঃ প্রোথিতৈ-
রত্র শ্রীবিজয়াদি চন্দ্ মহতাব রাজাধিরাজো মহান্।।
শকাব্দা ১৮১৫। বঙ্গাব্দা ১৩০০। ১৯ চৈত্র
সম্বৎ ১৯৫১। চৈত্রবদী দশমী।" (রা,বং চ পৃঃ ২৩৫)

মহারাজাধিরাজ কুমার বিজয়চাঁদ মহ্‌তাব্ এর উক্ত কাজ রাজা বনবিহারী কপূরের তত্বাবধানে সম্পন্ন হয়। তিনি সব সময়ই কুমার বিজয়চাঁদ বাহাদুরকে সতর্ক দৃষ্টিতে রাখতেন। এমন কি তাঁর খাদ্য সম্বন্ধে নজরদারি করার জন্য 'খাওয়াস' নিযুক্ত করেন। তাঁর কাজ হলো, মহারাজকুমার বাহাদুরকে যে সব খাদ্যবস্তু দেওয়া হতো সেগুলি তিনি পরীক্ষা করে দেখতেন, তাতে কোন বিষাক্ত বা অনিষ্টকর কিছু আছে কি না।

১৮৯৭ খ্রীঃ গভর্ণমেণ্ট অব্ ইণ্ডিয়ার আদেশানুসারে বর্ধমান মহারাজাধিরাজ বাহাদুর ৬০০ (ছয় শত) বন্দুকধারী সৈন্য (*Armed force*) ও ৪৯ (উনপঞ্চাশ) টি কামান রাখার ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। বলা বাহুল্য, এ পর্যন্ত কোন রাজাই এত ক্ষমতা প্রাপ্ত হন নাই।

এই সময় মহারাজাধিরাজ কুমার বাহাদুর বিজয়চাঁদ মহতাব্ এর বয়স ১৬ বছর। রাজা বনবিহারী কপূর, কুমার বাহাদুরের বিবাহের জন্য লাহোরস্থিত বিখ্যাত ধনবান ও সদ্বংশজাত বলে প্রসিদ্ধি আছে এইরূপ এক পরিবারের খবর পান। ঐ পরিবারের প্রয়াত কর্তা ঝাণ্ডমল মেহেরার একটি সুলক্ষণা কন্যা আছে। তখন রাজা বনবিহারী ব্রাহ্মণ সহ লাহোরে উপস্থিত হয়ে কন্যা দেখতে যান। পিতৃহীনা বালিকার নাম রাধারাণী; ব্রাহ্মণ তাঁর কর বিচার করে এবং কন্যাকে দেখে, রাজরাণী হওয়ার সুযোগ্যা বিবেচনা করে

পাত্রী স্থির করে, তাঁকে এবং তাঁর আত্মীয় স্বজন ও পরিজনদের নিয়ে বর্ধমান ফিরলেন। তাঁরা বর্ধমান ষ্টেশনে পৌঁছনো মাত্র সারা শহরে রটনা হয়ে গেল ভাবী মহারাণী আসছেন। তাঁকে দেখার জন্য বহু লোক ষ্টেশনে জমায়েত হয়েছে। রাজা বনবিহারী, নয় বছরের বালিকা পুত্রবধূ রাধারাণীকে কোলে করে ট্রেন থেকে প্লাটফর্মে নামালেন। ছয় ঘোড়ার গাড়ীতে ভাবী মহারাণী অধিরাণী, অন্য গাড়ীতে অপরাপর আত্মীয় স্বজন সকলে উইল বাড়ীতে এসে উঠলেন। রাধারাণী দেবীর আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে ছিলেন তাঁর বড় দিদি, তাঁর স্বামী ও পুত্রগণ, তৃতীয়া অগ্রজা ও তাঁর স্বামী, রাধারাণীর তিন ভ্রাতা, দুই মামা এবং একজন পুরোহিত।

এখন, রাজা বনবিহারী কপূর বেশ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। প্রথমতঃ দত্তক গ্রহণ ব্যাপারে বিরোধিতা করে এসেছেন রাজমাতা নারায়ণকুমারী দেবী; এখন পাত্রী পছন্দ ব্যাপারে কি মনোভাব গ্রহণ করবেন তা বলা সম্ভব নয়। তা ছাড়া তিনি রাজমাতার মতামত গ্রহণ না করে নিজে পছন্দ ক'রে লাহোর থেকে কন্যা নিয়ে এসেছেন। অথচ, তাঁর অনুমতি ভিন্ন কুমার বাহাদুর বিজয়চাঁদ মহ্‌তাবের বিবাহ দেওয়া সম্ভব নয়। এবং তাঁকে পাত্রী দেখানো অত্যাবশ্যক। কাজেই তিনি সশঙ্ক চিত্তে বালিকা রাধারাণী দেবীকে রাজমহলে নিয়ে গেলেন। সুলক্ষণা, সুচারু-আননা, প্রিয়দর্শীনী বালিকাকে দেখা মাত্র ধনদেয়ী দেবী (মহারাজা মহ্‌তাবচাঁদের প্রথমা মহিষীর কন্যা) সস্নেহে আদরে তাঁকে কোলে তুলে নিলেন। ধনদেয়ীদেবী, রাধারাণীকে বিজয়চাঁদ মহ্‌তাবের একখানি ফটো দেখালে, তাঁর আনন্দোচ্ছল লাজাবনতা মুখাবয়ব লক্ষ্য করে তিনি (ধনদেয়ী) পাত্রীকে মহারাজাধিরাজ কুমার বাহাদুরের উপযুক্তা মনে ক'রে অভিমত ব্যক্ত করেন। রাজামাতা পাত্রীকে অন্তরে ভাল জানলেও, বিদ্বেষ ব্যঞ্জক ভাষায় বললেন, "ভালই হয়েছে।" এক্ষণে নিশ্চিন্ত রাজা বনবিহারী কপূর তাঁকে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানিয়ে কৃতজ্ঞ চিত্তে কুমার বাহাদুরের বিবাহের বন্দোবস্ত করতে থাকেন। ইতিমধ্যে তিনি ভাবী পুত্র বধূর বাংলা শিক্ষার জন্য গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করেন।

রাজমাতা মহারাণী অধিরাণী নারায়ণকুমারী চিন্তা করলেন, রাজাচার অনুসারে যদি কোন কর্ম না করেন তা হলে তা রীতি বিরুদ্ধ কাজ হবে এবং তা নিতান্ত অশোভন হবে। অতঃপর একদিন তিনি রাধারাণীকে আশীর্বাদ করতে এলেন। তিনি নিজহাতে বালিকাকে বেনারসী শাড়ি পরিয়ে, নানা অলঙ্কারে ভূষিতা করে পিঁড়িতে বসিয়ে ধানদুর্বা দিয়ে আশীর্বাদ করলেন; হাতে দিলেন মোহর। আহার্য দিলেন, নানা ধরণের শুকনো মেওয়া ফল। সেই সময় একদিন কুমার বিজয়চাঁদ মহ্‌তাব্ ঘোড়ায় চড়ে, পশ্চাতে

[illegible]



মহারাজাধিরাজ বিজয়চাঁদ

ওঁ

তোমারে, ডাকি মা, [illegible]

এতিন ভুবনে, জননী আমার, [illegible]

ত্রিলোক তারিণী, তুমি নারায়ণী, [illegible]

তোমার মহিমা, অনন্ত অসীম [illegible]

তাই, গঙ্গাজলে, জোড়া বিল্বদলে, [illegible]

তোমার চরণে, [illegible]

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ নাহি চাই, [illegible]

জনমে, জনমে, তনয়া হইয়া, [illegible]

মা, [illegible]

জননী [illegible]

অসহায়া তনয়া

অদ্য ২৭ বৎসর [illegible]

[illegible]

এই শিলালিপিটি অধিষ্ঠাত্রী দেবী সর্ব্বমঙ্গলা মায়ের [illegible]

স্ত্রী) অজ্ঞাত কারণে বর্ধমান ছেড়ে চলে যান [illegible]

অগ্রহায়ণ, ১৩০৪ সাল ইংরেজীর ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দ [illegible]

লক্ষ দর্শনার্থী এটি পড়ে অনুশোচনায় দগ্ধ হ[illegible]।



মহারাণী অধিরাণী রাধারাণী দেবী (বিজয় চাঁদের স্ত্রী, উদয়চাঁদের মা)



মহারাজাধিরাজ বিজয়চাঁদ

সারিবদ্ধ গজস্কন্ধে পরিজন সহ এলেন। ভাবী রাজবধূকে দোতলার জানালা দিয়ে বিজয়চাঁদ বাহাদুরকে দেখার অনুমতি দেওয়া হলো। পাত্র-পাত্রী নির্বাচন পর্ব এই ভাবেই সমাপ্ত হয়। তারপর শুভদিন দেখে, ১৩০৪ সালের ২৫ শে অগ্রহায়ণ, ইং ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ১৬ বছর বয়সে মহারাজ বাহাদুরের শুভ পরিণয় কাজ সুসম্পন্ন হয়। বিবাহে পঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিমপ্রদেশের বহু ক্ষত্রিয় ও সারস্বত ব্রাহ্মণ যোগ দেন। এই বিবাহে দুই লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছিল। (রাঃ বং চ পৃঃ ২৩৬)। কয়েকদিন যাবৎ নাচ, গান, যাত্রা, নাট্যাভিনয় প্রভৃতি আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা হয়েছিল। এই উপলক্ষে "অন্যূন ২০ সহস্র (২০,০০০) দরিদ্রকে চাউল ও বস্ত্র বিতরণ করা হইয়াছিল।" (রাঃ বং চ পৃঃ-২৩৬) বলাবাহুল্য রাজা বনবিহারী কপূরের আন্তরিক আপ্যায়ণে ও অভ্যর্থনায় নিমন্ত্রিত অ-নিমন্ত্রিত, অনাহূত, রবাহূত, বিশিষ্ট মান্যগণ্য, ব্যক্তিবর্গ থেকে গরীব দুঃখীরাও যৎপরোনাস্তি পরিতুষ্ট হয়েছিলেন। বিচক্ষণ দূরদর্শী রাজা বনবিহারী কপূর মহারাজাধিরাজ বিজয়চাঁদ মহতাব্ বাহাদুরের শিক্ষার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখতেন। ধীশক্তি সম্পন্ন মহারাজাধিরাজ বাহাদুর ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রবেশিকা (বর্তমান মাধ্যমিক) পরীক্ষায় দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। তৎপরে ভাষা, সাহিত্য, ইংরাজী, বাংলা প্রভৃতি বিবিধ গ্রন্থ পাঠ ও রাজকার্য্যে শিক্ষা লাভ করে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তা ছাড়া নিয়মিত ভাবে শারীর শিক্ষা অনুশীলন, অশ্বারোহণ, অস্ত্রচালনা প্রভৃতি রাজোচিত অত্যাবশ্যক বিষয়গুলি সযত্নে ও সুচারুরূপে শিক্ষা গ্রহণ করেন।

এই অত্যল্প বয়সে তাঁর প্রতিভার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি ধর্মপরায়ণ এবং ধর্মবিষয়ক চিন্তা, অধ্যাত্মচিন্তা তাঁর প্রণীত গ্রন্থে পাওয়া যায়। তাঁর রচিত 'মনঃ শিক্ষা' নামক গ্রন্থটি আত্ম অনুশাসনের বিশেষ পরিচয় রাখে। একটি ছত্র এখানে উল্লেখ্য "ধূলিতে জীবন মিশে যায়/ যখন সময় হয়।" এই সময়ে তিনি আরও কয়েক খানি গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর চিন্তাধারা ছিল আধ্যাত্ম ভাব- ভাবনায় ভাবিত। মানুষকে কর্ম করে যেতে হবে, কর্মের মধ্য দিয়েই তার মুক্তি। তাই তিনি বাস্তব জীবনে নিজেকে কর্তব্য কর্মে নিয়োজিত রেখেছিলেন, কোন দিন অবহেলা করেন নাই।

১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে গভর্ণমেন্ট হাউসে বিশেষ প্রবেশপথ (*Private Entry*) দিয়ে অনুপ্রবেশের অধিকার প্রাপ্ত হন। অত্যন্ত উচ্চপর্যায়ের বিশেষ সম্মানিত অতিথি ছাড়া উক্ত পথ দিয়ে প্রবেশাধিকার ছিল না।

মহারাজাধিরাজ বিজয়চাঁদ মহ্তাব্ রাজ্যভার গ্রহণের পূর্বে ১৩০৬ সালে (১৮৯৯ খ্রীঃ) ১৮২১ শকাব্দা। ৩০ ফাল্গুন তারিখে মহারাণী অধিরাণী নারায়ণকুমারী দেবী

বর্ধমান শহরে একটি সুন্দর দেবালয় নির্মাণ করিয়ে সেখানে শ্রীশ্রীভুবনেশ্বরী দেবী মূর্তি ও তৎসম্মুখে ঁনারায়ণেশ্বর শিব স্থাপন করেন। তাঁর শিলালিপিস্থ উৎকীর্ণ শ্লোক গুলি উদ্ধৃতি করা হলো। উক্ত দেবালয়টির অবস্থান রাজবাড়ীর উত্তরে মিঠাপুকুর গলিতে।

শ্রী শ্রী দুর্গা

হিজ্ হাইনেস মহ্তাব্ নৃপতিসু মহিষী শ্রীল নারায়ণাদি –
শব্দাদেবীকুমারী বিজয়নরপতেঃ শ্রীমতস্তাতমাতা।
শাকে গ্লাবক্ষিবস্বিন্দুম ইহ জগতাং শক্তিমাদ্যাংঘটান্তে
সংস্থাপ্যাসৈ সুহর্ম্ম্যং বিপুলগৃহমিমং প্রাদদভক্তিযুক্তা।।
মহারাজ অধিরাজ হিজ হাইনেস,
স্বর্গীয় মহ্তাব্চন্দ্ বিখ্যাত নরেশ।
তাঁহার মহিষী হার হাইনেস যুতা,
শ্রী শ্রীমতী নারায়ণকুমারী বিখ্যাতা।।
শ্রীযুত বিজয়চন্দ্র নৃপপিতামহী,
যাঁহার সুযশগান সদা করে মহী।
শাকে অষ্টাদশ শত একবিংশ মানে,
কুম্ভ ছাড়ি দিনেশের মীনে অধিষ্ঠানে।
স্থাপিয়া শ্রী আদ্যাশক্তি ভক্তি সহকারে,
এ বিপুল সুহর্ম্ম্যটি অর্পিলেন তাঁরে।।
শকাব্দ ১৮২১। বঙ্গাব্দ ১৩০৬ , ৩০ ফাল্গুন।"

নারায়ণেশ্বর শিব মন্দিরের শিলালিপিতে উৎকীর্ণ আছে ঃ——

শ্রী দুর্গা শরণম্

" শাকে ভেশযুগাষ্টভূপরিমিতে শ্রীযুক্তনারায়ণ। –
প্রাদ্যা শ্রীলযুতো হস্টদেহসু কুমারী শং মহাতাব্ প্রিয়া।
তাতাম্বা বিজয়াদিচন্দ্রনৃপতেরত্র প্রতিষ্ঠাপ্য সদ্
ধামাস্মৈ প্রদদাবিদং খভুবনোন্মাহে ঘটান্তে হরৌ।।
হিজ্ হাইনেস যুত বর্দ্ধমানাধিপতি।
মহ্তাব্চন্দ্র নৃপমহিষী সুমতি,

অধুনা অধীনা যাঁর বর্দ্ধমান মহী,
শ্রীবিজয়চন্দ্রমহতাব পিতামহী।
হার হাইনেস মহারাণী অধিরাণী
শ্রী শ্রীমতী নারায়ণকুমারী সুরাণী।
শশিভূজবসুভূমি পরিমিত শকে,
ঘট হানি মীনে দিননাথের অংশকে
নারায়ণেশ্বর শিব করিয়া স্থাপন,
নির্ম্মিয়া মন্দির তাঁরে করেন অর্পণ।।
শকাব্দা ১৮২১। বঙ্গাব্দা ১৩০৬। ৩০ ফাল্গুন।

এই দেব দেবী প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠানে তৎকালীন বঙ্গের নানা স্থান থেকে বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন আর বর্ধমানের যত ব্রাহ্মণ ছিলেন তাঁদের সকলকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। মহারাজ বিজয়চাঁদ পিতামহীর এই সমস্ত কর্ম সুষ্ঠু ভাবে পরিচালনা করেন এবং সকল ব্রাহ্মণকে ভুড়িভোজন করিয়ে, প্রভূত পরিমাণে ভোজন দক্ষিণা দিয়েছিলেন। তাঁরা পরম পরিতুষ্ট হয়ে প্রাণ খুলে আশীর্বাদ করে যান। তৎপরে ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে ১৯ শে অক্টোবর শ্রীল শ্রীযুক্ত বিজয়চাঁদ মহ্‌তাব্ বাহাদুর ২১ বছর বয়সে পদার্পণ করলে, তিনি সাবালকত্ব প্রাপ্ত বলে স্বীকৃত হওয়ায়, কোর্ট-অব-ওয়ার্ড তাঁকে বিশাল বর্ধমান রাজ্যের একাধিপত্য অধিকার প্রদান করেন।

দরবার উপলক্ষে তৎকালীন ভারতবর্ষের গভর্ণরজেনারেল ও ভাইসরয় লর্ড কার্জন, মহারাজাধিরাজ বিজয়চাঁদ মহ্‌তাব্‌কে দিল্লীতে আমন্ত্রণ জানান। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী তারিখে উক্ত দরবার কক্ষে তাঁকে বংশানুক্রমিক মহারাজাধিরাজ খেতাবযুক্ত সনদ প্রদান করে সম্মানিত করেন। সনদের প্রতিলিপি নিম্নে দেওয়া হল ঃ—

SANAD

Government
COAT OF ARMS

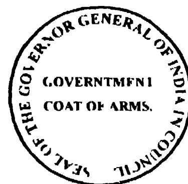
To

MAHARAJ KUMAR BIJAY CHAND MAHATAB,
ZAMINDAR OF BURDWAN,

I hereby confer upon you, as Zamindar of Burdwan, the hereditary title of Maharaja Dhiraj, to be attached to the Estate.

(Sd) CURZON

Viceroy and Governor General of India.



DELHI

The 1st January, 1903.



To,

Maharaj Adhiraj Bejoy Chand Mahatab,

Zemindar of Burdwan.

I hereby confer upon you the title of Maharaj Adhıraj Bahadur as a personal distinction.

Fort William
The 2nd. February, 1903.



(Sd) CURZON
Viceroy and Governor
General of India.

(Seal of the Governor General of India in Coucıl)



To,

The Honourable Maharajadhiraja Bejoy Chand Mahatab Bahadur of Burdwan

I hereby confer upon you, as Zemindar of Burdwan, The Hereditary

title of Maharajadhiraj Bahadur to be attached to the Estate.

Simla — *(Sd) MINTO*

The 26th. June 1903. — *Viceroy and Governor General of India*

(Seal of the Governor General of India in Council.)

The Seal of the order of the Indian Empire.

(Sd.) Edward R & I.

Edward the Seventh by the grace of God of the United kingdom of Great Britain and Ireland and of the British Dominions beyond the seas, King, Defender of the Faith, Emperor of India, and Sovereign of the most eminent order of the Indian empire. To Maharaja Dhiraj Bejoy Chand Mahtab Bahadur of Burdwan, a Member of the Council of the Lieutenant Governor of Bengal for making Laws and Regulations Greeting Whereas we have thought fit to nominate and appoint. You to be an additional Knight Commander of our said Most Eminent Order of the Indian Empire. We do by these present grant unto you the dignity of a Knight Command of our said Order and hereby authorise you to have, hold and enjoy the said dignity and rank commander of our aforesaid Order, Together with all and singular privileges thereunto belonging or appertaining.

Given at our court at Buckingham Palace under our Sign manual and the Seal of our said Order this first day of January, 1909 in the eighth year of our Reign.

By the Sovereign's Command.

(Sd.) MORLEY, J.B.

Grant of the dignity of a Knight Commander of the most Eminent Order of the Indian Empire to Maharaja Dhiraj Bejoy Chanda Mahatab Bahadur of Burdwan.



Home Department.

This is to certify

The Honourable Maharajadhiraj Sir Bejoy Chand Mahatab Bahadur, K.C.I.E.of Burdwan.

Was admitted by Notification of the Government of India in the Home Department No.2, dated the 1st. January 1909 to the Third Class of the Civil Division of the Indian Order of Merit in recognition of the act of bravery described below.

Description of the act of bravery. For conspicuous courage displayed by him at the Overtoun Hall, Calcutta on the 7th. November, 1908 in connection with the attempt upon the life of Sir Andrew Fraser, the Lieutenant Governor of Bengal.

Given under my hand at Calcutta this 9th. day of February 1909.

(Sd.) H. STUART.
Secretary to the Government of India.
Home Department.

মহারাজাধিরাজ বিজয়চাঁদ মহ্তাব্ ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারেলের আমন্ত্রণে, 'সনদ' প্রদান অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য যেদিন দিল্লী ষ্টেশনে অবতরণ করেন, সেদিন সেখানকার সম্ভ্রান্ত ক্ষত্রিয়বর্গ তাঁকে রাজসিক অভ্যর্থনা জানান এবং ক্ষত্রিয় সমিতির বিপুল জন সমাবেশে নবীন মহারাজকে 'অভিনন্দন' পত্র প্রদান করে বিশেষ ভাবে সম্মানিত করেন ও ক্ষত্রিয় সমিতির 'সভাপতি' হিসাবে বরণ করেন।

দিল্লী থেকে বর্ধমান ফিরে আসার পর ১৯০৩ খ্রীঃ ১০ই ফেব্রুয়ারী তারিখে মহাসমারোহে রাজ্যাভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। অভিষেক উপলক্ষে পাঁচ দিন ধরে শহরে উৎসব চলেছিল। সমগ্র শহরকে সাজানো হয়েছিল নানা ভাবে। স্থানে স্থানে মনোহর তোরণ নির্মাণ, রাজপথের দু'পাশে নানা বর্ণের পতাকা, বিচিত্র আলোক মালায় সুসজ্জি ত করা হয়েছিল শহর। ঘোড়দৌড়, রিগেটা, আতসবাজী প্রভৃতি মনোরঞ্জনকর অনুষ্ঠান হয়েছিল। থিয়েটার, নাচ, গান প্রভৃতি আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থাও হয়েছিল। অভিষেক উৎসবের ৪র্থ দিবসে শহরের প্রতিটি নাগরিককে ভুড়িভোজে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল আর ৩৫ হাজার (৩৫০০০) গরীব দুঃখীকে চাল ও বস্ত্র বিতরণ করা হয়।

যে উপলক্ষে এত সমারোহ সেই অভিষেক অনুষ্ঠানটিও হয়েছিল মহা আড়ম্বরে। উক্ত ১০ই ফেব্রুয়ারী তারিখে, ''মান্যবর বঙ্গেশ্বর বেঙ্গল গভর্ণর উডবর্ণ সাহেব বাহাদুর বৰ্দ্ধমান নগরে উপনীত হইয়া বহুজন সমাকীর্ণ বিচিত্র সভামণ্ডপে সর্ব্বজন সম্মুখে বৰ্দ্ধমানের রাজবংশের গুণ কীর্ত্তন করতঃ নবীন ভূপতিকে বিবিধ প্রকার সদুপদেশ প্রদান করিয়া মহামান্য শ্রীল শ্রীযুক্ত গভর্ণর জেনারেল ও ভাইসরয় বাহাদুরের প্রদত্ত 'বাহাদুর' খেতাব সহ ফরমান ও খেলাত প্রদান করতঃ মহাসমারোহে বৰ্দ্ধমান রাজ্যের সুবর্ণ সিংহাসনে সমাসীন করেন।''

''এতদুপলক্ষে বৰ্দ্ধমান নগরে মহা সমারোহ হইয়াছিল। শতাধিক সম্ভ্রান্ত উচ্চপদস্থ ইংরাজ রাজপুরুষ সস্ত্রীক নিমন্ত্রিত হইয়া পাঁচ দিন রাজপুরে অবস্থিতি করিয়া ভোজন নাচ আদি বিবিধ প্রকার আমোদ প্রমোদে পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন। স্বদেশ ও বিদেশস্থ বহুতর সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি নিমন্ত্রিত হইয়া রাজসভা সমুজ্জ্ব ল করিয়াছিলেন।'' (রাঃ বং চ পৃঃ ২৩৯) । ''যে সময়ে নবীন ভূপতি বহু জন সমাকীর্ণ সভা মধ্যে বঙ্গেশ্বরের নিকট হইতে সনন্দ ও খেলাত লইয়া মঞ্চ হইতে অবতরণ করেন, তৎকালে যে একটি অভিনব হৃদয়গ্রাহী দৃশ্য সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা মনুষ্য মাত্রেরই অনুকরণ্য। নবীন মহারাজাধিরাজ মঞ্চ হইতে অবতরণ করিয়াই মহামান্য রাজপ্রতিনিধি প্রদত্ত সনন্দ খানি তদীয় পূজ্যপাদ জনক শ্রীযুক্ত রাজা বনবিহারী কপূর, সি-এস-আই মহোদয়ের হস্তে সমর্পণ করতঃ উভয় হস্তে তদীয় পদধারণপূর্বক তৎপদধূলি মস্তকে ধারণ করিয়া পিতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। সভাস্থ যাবদীয় দর্শক মণ্ডলী তাঁহার ঈদৃশ সুব্যবহার দৃষ্টে পরম পরিতুষ্ট হইয়া সকলেই একবাক্যে তাঁহাকে শত শত ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছিলেন।'' (রাঃ বং চ পৃঃ ২৪০)

মঙ্গলাচরণ ঃ-- বঙ্গীয় গভর্ণর উডবর্ণ সাহেব মহারাজাধিরাজকে রাজসিংহাসনে উপবেশন করানোর সঙ্গে সঙ্গে পুরোহিত রাজা-রাণীর ললাটে চন্দন তিলক অঙ্কন করে আশীর্বাদ জানালেন। উপস্থিত ব্রাহ্মণদের সমবেত কণ্ঠে উচ্চারিত বেদ মন্ত্রে সভাগৃহ মুখর হয়ে উঠল অন্তরালবর্তীনীদের মাঙ্গলিক শঙ্খ ধ্বনিতে পরিপূরিত হয়ে উঠল সভাগৃহ। হিজ্ হাইনেস মহারাজাধিরাজ বিজয়চাঁদ মহ্‌তাবের মঙ্গল কামনায় দেবালয়ে দেবালয়ে চলেছিল কাঁসর-ঘণ্টা নিনাদে আরতি।

রাজ্য পরিচালনায় বিজয়চাঁদ ঃ- এই ভাবেই মহারাজাধিরাজ বিজয়চাঁদের রাজ্যাভিষেক শেষ হয়। জনসাধারণের দর্শনার্থে মহারাণীকে দরবার কক্ষে কিছু সময় অধিষ্ঠিতা রাখা হলো, কারণ অন্তঃপুরে প্রবেশ করলে আর তো সাধারণ তাঁর দর্শন পাবে না।

যাইহোক আনন্দোৎসবের মধ্য দিয়ে মহারাজাধিরাজ বিজয়চাঁদ্ মহ্‌তাব্ রাজকার্য নিজ হাতে গ্রহণ করলেন। প্রথমে তিনি শাসন ব্যবস্থার সুচারু পরিচালন ও প্রজা মঙ্গলের জন্য কোন কোন দপ্তরের কর্মচারীদের স্থানান্তরিত করলেন। তাতে অনেকের অসুবিধা হলো। তিনি ঊর্ধ্বতন সকল কর্মচারীকে ডেকে তাঁদের সঙ্গে আলোচনা ও পরামর্শ করে বললেন, রাজার উদ্দেশ্য, প্রজাদের মঙ্গল দেখা, তাঁর নিজের সুখস্বাচ্ছন্দকে প্রাধান্য দেওয়া ঠিক নয়। এবং যোগ্য বিবেচনা করেই, উপযুক্ত ব্যক্তিকে এক এক দপ্তরের ভার দেওয়া হয়েছে বলে মনে হয়। তাতে, প্রজাদের মঙ্গলই হবে, তাদের নিকট হতে কোন অভিযোগ আসবে ব'লে মনে হয় না এবং প্রজা নির্যাতন হয়েছে একথাও শুনতে হবে না।

সেই সময় ৫/৬ বছর অন্তর প্রায় দুর্ভিক্ষ লেগেই থাকতো। সেইজন্য তখন 'ইণ্ডিয়ান পিপ্‌লস্ ফেমিনট্রাষ্ট' বা 'দুর্ভিক্ষ ভাণ্ডার' ছিল। জনদরদী মহারাজাধিরাজ সিংহাসনে আরোহন করে উক্ত দুর্ভিক্ষ ত্রাণ তহবিলে নগদ ১০ হাজার (১০,০০০) টাকা দান করেন। দরিদ্র প্রজাদের দেয় দেড়লক্ষ টাকা বাকী খাজনা মকুব করে দেন, শহরে পয়ঃ প্রণালী ও নিকাসি ব্যবস্থার উন্নতির জন্য মিউনিসিপ্যালিটিকে এককালীন ৪০ হাজার (৪০,০০০)টাকা দেন। উড়িষ্যার কুজঙ্গ এস্টেট পরিদর্শন করতে গিয়ে সেখানকার গরীব প্রজাদের ২৫ হাজার (২৫,০০০) টাকা বাকী খাজনা মকুব ক'রে দেন।

এখানে একটি অন্য প্রসঙ্গের কথা উল্লেখ করা হলো। স্বর্গতা মহারাণী

ভিক্টোরিয়ার পুত্র ডিউক-অব্- কণ্ট দরবার উপলক্ষে দিল্লী আসেন। উক্ত দরবারে মহারাজাধিরাজ বিজয়চাঁদ মহ্‌তাব্ উপস্থিত ছিলেন। প্রসঙ্গত ডিউক, ডাবলিনের পশুশালার জন্য একটি ভারতীয় হস্তী শাবক নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। সেই সময় বর্ধমান মহারাজার হাতীশালায় একটি হাতীর বাচ্চা ছিল। মহারাজা তাঁকে এই হাতীর বাচ্চাটি উপহার দেন।

বর্ধমান রাজ হাতীশালায় একটি স্ত্রী হাতী ঐ শাবকটি প্রসব করেছিল। তার স্বীকৃতি পত্রের প্রতিলিপি দেওয়া হলো ঃ–

Bombay
25th. February. 1903.

My Sincere friend !

I have to-day received the young Elephant which your Highness has been good enough to send for my acceptance, I am very pleased indeed to accept it, and I write to offer you my sincere thanks for your kind gift. I shall take it home with me in H.M.S. "Renour" and eventually place it in the Zoological gardens in Dublin where I will have an inscription placed in its Stall stating that it was presented to me by your Highness during my visit to India this year.

I can assure you it will afford a great deal of pleasure to a great many people.

H. H.
Maharaj Dhiraj
Bijaychand Mahtab
Bahadur of Burdwan



I remain--
Your Sincere friend

(Sd) ***Arthur***

রাজকার্য পরিচালন ব্যাপারে মহারাজা স্থির করলেন, পৃথক পৃথক দপ্তরের কাজ নজরদারি করা অসুবিধাজনক, একজন মাধ্যম থাকলে তাঁর কাছ থেকেই সমস্ত বিভাগের কাজ বুঝে নেওয়া সহজ হবে। সেইজন্য তিনি একজন প্রধান ম্যানেজার নিয়োগ করেন। এই ম্যানেজারই সমস্ত বিভাগের কাজকর্ম তদারকি করবেন, এবং ম্যানেজারই সমস্ত বিভাগীয় কর্মের রিপোর্ট মহারাজকে জ্ঞাত করবেন। এই মর্মে সমস্ত বিভাগে লিখিত নির্দেশ দেন এবং তা ১৯০৬ খ্রীঃ ১লা জানুয়ারী থেকে কার্যকর করা হয়।

তদারকি কাজের জন্য ম্যানেজারকে যে ক্ষমতা দেওয়া হলো, ঃ–

(১) যে সব কাজের সিদ্ধান্ত ম্যানেজারের পক্ষে একক নেওয়া সম্ভব, সেই সব সমস্যার জন্য মহারাজের নিকট পর্যন্ত যাওয়ার দরকার নাই।

(২) ম্যানেজার কর্মচারীদের সবরকম ছুটি মঞ্জুর করতে পারবেন।

(৩) তিনি কর্মচারীদের তঙ্খা, বেতন নির্ধারণ, পেনসন্ মঞ্জুর করতে পারবেন।

(৪) কোন কর্মচারী শস্তিমূলক অপরাধ করলে ম্যানেজার তাঁকে উচিত শাস্তি দিতে পারবেন। প্রয়োজন বোধে তাঁকে পদচ্যুত করতে পারবেন।

(৫) সরকারের বা ব্যক্তির সব রকম পাওনা,খাজনা, ট্যাক্স, সেস, মাইনা মিটিয়ে দেওয়ার অধিকার ম্যানেজারের থাকল এবং তার যথাযথ রসিদ গ্রহণ করবেন।

রাজা বনবিহারী কপূর, সি-আই-ই অবসর নিতে চাইলেও মহারাজাধিরাজ বিজয়চাঁদ মহ্তাব্ তাঁকে অবসর না দিয়ে সর্বোপরি তাঁকে প্রধান উপদেষ্টা হিসাবে থাকতে তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করলেন।

শিক্ষাদান ব্যবস্থাপনায় বিজয়চাঁদ ঃ- শিক্ষাদান ব্যাপারে ত্রুটি ও অনগ্রসরতা দেখে চার জন সদস্য বিশিষ্ট একটি অনুসন্ধান-কমিটি গঠন করেন। এই সদস্যদের কাজ হলো প্রত্যেক শ্রেণীতে গিয়ে লক্ষ করা শিক্ষকমশায়দের পঠন-পাঠন, শিক্ষকের অবর্তমানে ছাত্রদের জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা, কোন্ শিক্ষকমশায়কে তারা বেশী পছন্দ করে এবং কেন তাঁকে তাদের ভাল লাগে এবং কলেজেও তাঁরা গিয়ে শিক্ষাদান, কলেজের কাজ কর্ম পরিচালনা ও নিয়ম-শৃঙ্খলা কি ভাবে প্রতিপালিত হচ্ছে সে সব রিপোর্ট তাঁকে জানাতে।

তিনি চিন্তা করে দেখলেন, সাধারণ শিক্ষায় সকল ছাত্রের সমান আগ্রহ নাই,

সমান মেধা-ও নাই। সুতরাং, যাদের সাধারণ শিক্ষায় অগ্রগতি হচ্ছে না; তাদের তিনি, অন্ততঃ পক্ষে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে সেইরূপ শিক্ষাদানের জন্য কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা করার বিষয় ভাবলেন। এবং ১৮৯৩ খ্রীঃ এপ্রিল মাসে পুরাতনচক মহল্লায় একটি কারিগরি বিদ্যালয় স্থাপন করলেন অল্প কয়েকজন ছাত্রকে নিয়ে। বর্তমানে সেই স্থানটি নির্দেশ করা যায় না। এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি সমগ্র বঙ্গে প্রথম এবং একমাত্র কারিগরী বিদ্যালয়। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটির নাম দেওয়া হয় ''ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড টেকনিক্যাল স্কুল অব্ বর্ধমান''। টেক্নিক্যাল স্কুলটিতে তিন বছরের 'আর্টিজেন কোর্স' পড়ানো হতো। ঐ শিক্ষায়তন এর সিংহভাগ ব্যয় ভার বহন করতেন মহারাজাধিরাজ নিজে, বাকী খরচ বহন করতেন 'ডিস্ট্রক্ট বোর্ড' ও 'মিউনিসিপ্যালিটি'। এবং বেঙ্গল গভর্ণমেন্ট যৎসামান্য অনুদান দিতেন। এই কারিগরী বিদ্যালয়ে প্রবেশের জন্য সাধারণ শিক্ষাগত মান ছিল ৬ষ্ঠ শ্রেণী উত্তীর্ণ *(M.E.)*। পরে বিদ্যালয়টি সদর থানার সম্মুখে, এখন যেটি উদয়চাঁদ গ্রন্থাগার সেখানে স্থানান্তরিত হয়। স্বাধীনতার পর ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যালয়টি ''মহারাজাধিরাজ-বিজয়চাঁদ-ইন্স্টিটিউট-অব্ ইঞ্জিনিয়ারিং-এণ্ড টেকনোলজি'' নামে রূপান্তরিত হয়ে, পলিটেকনিক পর্যায়ে উন্নীত হয় এবং স্থান পরিবর্তন করে বর্ধমান মহারাজের অতিথিশালা সাধনপুরে উঠে আসে।

শিক্ষা অনুসন্ধান কমিটির প্রদত্ত রিপোর্ট, ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট মহারাজাধিরাজ বিজয়চাঁদ মহ্তাব্ পর্যালোচনা করে দেখেন,কলেজের পড়াশোনা আদৌ ভাল হচ্ছে না। অধ্যক্ষের কলেজ চালানো ব্যবস্থায় বিশেষ ত্রুটি আছে। অধ্যাপকদের অধ্যাপনার যোগ্যতা নাই। তা ছাড়া নবীন অধ্যাপকদের নানা প্রকার ছল-চাতুরি রয়েছে। রাজস্কুলের অবস্থাও তদ্রূপ। এখানেও শিক্ষা দানের মান নিম্নগামী। অত্যন্ত বার্ধক্য জনিত প্রধান শিক্ষকের স্কুল প্রশাসন অত্যন্ত দুর্বল। প্রতিকার হিসাবে প্রথমতঃ তিনি কলেজের অধ্যাপক ও বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ত্রুটি-বিচ্যুতির উল্লেখ করে প্রত্যেককে সতর্ক করে লিখিত ভাবে জানিয়ে ছিলেন। অধ্যাপনা কাজে সম্পূর্ণ অযোগ্য অধ্যাপককে, বিদ্যালয়ে শিক্ষকতায় বদলী করলেন। অন্য দিকে বিশেষ কৃতিত্ব ও যোগ্যতা সম্পন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষককে কলেজে অধ্যাপনার কাজে নিয়োগ করলেন। বিদ্যালয়ের বৃদ্ধ অপটু প্রধানশিক্ষককে অবসর গ্রহণ করার নির্দেশ দিলেন। প্রধান পণ্ডিত, এবং তাঁর সহকারীকে সরিয়ে একজন স্নাতক শ্রেণীর ব্যক্তিকে নিয়োগ করলেন এবং একজন মৌলবীর পদ রাখলেন। এবার তিনি ছাত্রদের মাসিক মাইনে *(Tuition fees)* ধার্য করলেন।

এ পর্যন্ত সকল ছাত্রই বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ পেত, অতঃপর সে সুযোগ পাবে না। কারণ হিসাবে মহারাজ বিজয়চাঁদের বক্তব্য, অভিভাবকরা তাঁদের সন্তানের জন্য যে টাকা খরচ করছেন তার উপযুক্ত ফল পাচ্ছেন কি না। অবশ্য যে সব ছাত্র খুব ভাল ফল করতে পারবে যোগ্যতা অনুসারে সম্পূর্ণ বিনা বেতন বা অর্ধবেতনে পড়ার সুযোগ পাবে।

১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে রাজ আমন্ত্রণে ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারেল ও ভাইসরয় লর্ড কার্জনের বর্ধমান আগমণ উপলক্ষে শহরের প্রবেশ মুখে তাঁর সম্মানার্থে একটি *'STAR OF INDIA GATE'* তোরণ নির্মাণ করান এবং ঐ তোরণের নাম দেন 'কার্জনগেট'। *"The only modern monument of any importance is the Star of India arch erected by the present Maharaja at the entrance to the town, to commemorate Lord Curzon's visit". (Bengal District Gazetteers. BURDWAN ---- J.C.K.PETERSON --1910.P-191)* স্বাধীনতার পর ঐ ফটকের নামকরণ হয় 'বিজয় তোরণ'।

মহারাজাধিরাজের কীর্তিফ্রেজার হাসপাতাল ঃ- ১৯০৭ খ্রীঃ অব্দ। জন স্বাস্থ্যের কথা এবং দরিদ্র গ্রামবাসীদের কথা চিন্তা করে তাদের সুচিকিৎসার জন্য শ্যামসায়রের পশ্চিম তীরবর্তী অঞ্চলে ৩০ বিঘা জমির. উপর হসপিটাল নির্মাণ করান। এই হাসপাতালটি উদ্বোধন করেন তদানিন্তন বেঙ্গল গভর্ণর এন্‌ড্রুফ্রেজার এবং তাঁর নামানুসারে হাসপাতালের নামকরণ হয় 'ফ্রেজার হসপিটাল' হাসপাতালের গৃহ নির্মাণে মহারাজা বিজয়চাঁদ এককালীন ৮০,০০০ (আশী হাজার) টাকা দিয়েছিলেন। এনড্রু ফ্রেজার প্রসঙ্গে একটা কথা বলা প্রয়োজন। এই সময় কার্জনের বঙ্গভঙ্গ ব্যাপার নিয়ে দেশের রাজনৈতিক অবস্থা বেশ উত্তাল। ১৯০৮ খ্রীঃ ৭ই নভেম্বর কলকাতার ওভারটুন হলে মিটিং-এ এন্‌ড্রু ফ্রেজার প্রবেশ করছেন এমন সময় সন্ত্রাসবাদী এক যুবক তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়েন পর পর দু'বার। মহারাজা বিজয়চাঁদ ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁকে রক্ষা করেন। কিন্তু যে কোন কারণেই হোক, রিভালভারথেকে গুলি না ছোটায় উভয়েই রক্ষা পান। হসপিটাল নির্মাণে বর্ধমান পৌরসভা তাঁদের পরিচালিত তৎকালীন হাসপাতালটির বিক্রয় লব্ধ ৪০,০০০ (চল্লিশ হাজার) টাকা দেন। এ ছাড়া অনুদান হিসাবে মহারাজা বার্ষিক ১২,০০০ (বার হাজার) টাকা, পরে ১২,৫০০ (বার হাজার

পাঁচশো) টাকা এবং বর্ধমান মিউনিসিপ্যালিটি বার্ষিক ৯,০০০ (নয় হাজার) পরে ৯,২৫০ (নয় হাজার দুই শত পঞ্চাশ) টাকা অনুদান প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেন।

হাসপাতাল নির্মাণ সম্বন্ধে ১৯০৭ খ্রীঃ ১৩ জুলাই, বর্ধমান বিভাগের কমিশনার, তদানিন্তন সরকারের অর্থসচিব, অসামরিক হাসপাতাল সমূহের পরিদর্শক, বর্ধমান জেলা কালেক্টর, সিভিল সার্জেন (অসামরিক শল্য চিকিৎসক), মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান এবং মহারাজ স্বয়ং এর উপস্থিতিতে এক জরুরী সভায় উক্ত জমি ও অর্থ প্রদানের প্রতিশ্রুতি ছাড়া, গৃহ নির্মাণের দায়িত্ব দেওয়া স্থির হয় 'মেসার্স ম্যাকিনটস্ বার্ণ এণ্ড কোং' কে।

১৯০৮ খ্রীঃ ১৬ ই জুলাই স্যার এনড্রুজ ফ্রেজার বর্ধমান পরিদর্শনে এসে হাসপাতালের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। এবং ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই নভেম্বর স্যার এড্‌ওয়ার্ড বেকার আনুষ্ঠানিক ভাবে হাসপাতালের উদ্বোধন করেন। এড্‌ওয়ার্ড বেকার *'Contagious word'* নির্মাণের জন্য ১১,০০০ (এগার হাজার) এবং এই সংলগ্ন *Pathesical word* প্রস্তুত করার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা প্রদান করেন। সার্জেন জেনারেল জি-এফ্-হ্যারিস, সি.এস.আই ১৯১৫ খ্রীঃ ১৩ই ফেব্রুয়ারী *Pathesical word* টির উদ্বোধন করেন এবং তাঁরই নামানুসারে ওয়ার্ডটির নামকরণ করা হয়।

হাসপাতালের মহিলা বিভাগ ঃ- ১৯১২ খ্রীঃ ১২ ডিসেম্বর লেডি কারমাইকেল এই হাসপাতালের একটি মহিলা বিভাগের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন এবং তিন বছর পর১৯১৫ খ্রীঃ ২০শে মার্চ লেডি কারমাইকেলই ইহার উদ্বোধন করেন; তাঁর নামানুসারেই ঐ বিভাগের নামকরণ করা হয়। উক্ত বিভাগটি নির্মাণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল 'মেসার্স এ.উইং এণ্ড কোং'র উপর।

পরবর্তী কালে হাসপাতালের সমস্ত সম্পত্তি একটি দাতব্য প্রতিষ্ঠানের উপর ন্যস্ত করা হয়।

অতঃপর শ্যামসায়রের পূর্বপারে ডাক্তারী শিক্ষার বিদ্যালয়টিও মহারাজা বিজয়চাঁদ নির্মাণ করান। তৎকালে বঙ্গীয় গভর্ণর রোনাল্ড্‌সের নামানুসারে 'রোনাল্ড্‌সে মেডিকেল স্কুল', নামকরণ করা হয়। এখানে 'এল্-এম্-এস্' / 'এল্-এম্-এফ্' কোর্স পড়ানো হতো।

এখানে উল্লেখ্য, বর্ধমান রাজকাছারী বাড়ী যা 'আঞ্জুমান কাছারি' নামে অভিহিত, তা মহারাজা বিজয়চাঁদ মহ্‌তাব রাজসিংহাসনে আরোহনের পূর্বে রাজা বনবিহারী কপূর সম্পূর্ণ করেন। এবং কাছারির মস্তকে যে চতুর্মুখ ঘড়ি স্থাপিত হয়েছিল তা ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে। আনন্দবাজার পত্রিকায় (১৫ই জানুয়ারী, ২০০৪), সাংবাদিক রাণা সেনগুপ্তের তথ্যসূত্র অনুসারে প্রস্তর ফলকে উৎকীর্ণ, যে শ্লোক তিনি উদ্ধার করেছেন, তার থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় মহ্‌তাব্‌চাঁদের পূর্বে 'আঞ্জুমান কাছারি' নির্মিত হয়েছিল।

এখানে উৎকীর্ণ শ্লোকটি উদ্ধৃতি করা হল ঃ—

পূর্বে আঞ্জুমান নামে ছিল যে মন্দির
জীর্ণ দেখি দেহ তার মহ্‌তাব্‌ সুধীর।।
ত্রংশীতি অধিক সপ্ত-দশ-শত শকে
ভাঙিলেন সেই গৃহ পরম পুলকে।।
ফাল্গুন মাসেতে কার্য্য আরম্ভ হইল
সুধাকর সম সৌধ উঠিতে লাগিল।।
বসু-বিল-মুনি-শশিমিত শক সমে
একতল হয়, কিন্তু গঠন বিরমে।
তাহাতেই যত ধরে অফিস আসিল।
সেইরূপে আফ্‌তাব সময় কাটিল।
তৎপরে আরব্ধ কার্য্য করিবারে শেষ
দ্বিতল করিতে করি যতন বিশেষ
শাকে চতুর্দ্দশাধিক অষ্টদশ শতে
কার্ত্তিকেতে কার্য্যারম্ভ হয় পূর্ব মতে।
মহারাজ অধিরাজ শ্রীল শ্রী সহিত
বিজয়চাঁদ মহ্‌তাব্‌ সুবিমল চিত।
তাঁহার জনক ধীর সর্ব্ব হিতকারী
রাজ ম্যানেজার রাজা শ্রীবনবিহারী

অষ্টাদশ শত ষোল শাকে ইষ মাসে
করিলে কার্য্যের শেষ, সব অফিস আসে।

উক্ত ফলকের নিচে একটি বড় ফলকে ইংরাজী লিপিতে উৎকীর্ণ আছে ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে ঐ ভবন নির্মাণের কাজ শেষ হয়। ঘড়ির নাম প্রসঙ্গে উক্ত দূটি ফলকের কোনটিতেই 'বেনসন টাওয়ার ক্লক' উল্লেখ নাই। তবে ঘড়ির মধ্যে সম্ভবতঃ কারিগরের নাম লিখিত আছে 'জে - ডব্লু - বেনসন' তারিখ উল্লেখ আছে ১৮৯৩।

সুতরাং বলা যেতে পারে বেনসন সাহেব উক্ত ঘড়ি ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে নির্মাণ করেছিলেন।

ঘড়িটি বর্তমান বিজয়তোরণের সঙ্গে এক সরলরেখায় অবস্থিত। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত ঘড়ি অচল হয়ে পড়ে। তখন 'ওয়েষ্ট এণ্ডওয়াচ' কোম্পানির অভিজ্ঞ স্থানীয় মিস্ত্রি, সৈয়দ আবুতাহের ঘড়িটি চালু করেন। পূর্বে সে কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ১৯৫০ এর দশক থেকে ঐ ঘড়ি পুনরায় বিকল হয়ে দীর্ঘদিন পড়ে ছিল। ২০০০ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে কলকাতা জি-পি-ও (জেনারেল পোষ্ট অফিস) এর ঘড়ি মেরামতের মিস্ত্রীর ওপর দায়িত্ব দেওয়া হয়। ২০০৪ খ্রীঃ জানুয়ারীতে আবার সে ফেলে আসা অতীতের কথা ঘোষণা করে যাচ্ছে তার ঘণ্টা ধ্বনিতে।



বর্তমানে বেনসেন টাওয়ারের ছবি (২৭.০৪.২০০৪ তারিখে তোলা হয়েছে)।

মহারাজাবিজয়চাঁদ ও অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন ঃ-১৯১৫ খ্রীঃ ২০ শে মার্চ লেডি কারমাইকেল ফ্রেজার হাসপাতালের মহিলা বিভাগের উদ্বোধন করে গেলেন। তারপর দু'সপ্তাহ মধ্যেই আর এক বিরাট কর্মকাণ্ডের দায়িত্ব তাঁর উপর। অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের উদ্বোধন ৩রা এপ্রিল। এই বিরাট সাহিত্য অভ্যর্থনা সমিতির তিনি সভাপতি। কেবল মাত্র 'সভাপতি'র দায়িত্ব থাকলে কথা ছিল, কিন্তু তা নয়, উক্ত সভা অনুষ্ঠিত হবে রাজবাড়ীতে, ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রথিতযশা, বিভিন্ন বিষয়ে দিকপাল পণ্ডিতবর্গ আসবেন তা ছাড়াও বহিরাগত বিশিষ্ট ব্যক্তিরা আসবেন। সুতরাং সহস্রাধিক ব্যক্তির থাকা খাওয়া সব কিছুর সুষ্ঠু ব্যবস্থা তাঁকে করতে হবে। ঐ সব মান্য গণ্য অতিথি পণ্ডিতবর্গের সম্মান রাখতে না পারলে তাঁর মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হবে, সেই সঙ্গে বর্ধমানেরও সুনাম নষ্ট হবে।

ইতিপূর্বে বঙ্গীয় সাহিত্য সভা ৭টি হয়ে গেছে। বিগত বঙ্গ-সাহিত্য সভাগুলি অপেক্ষা, অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য সভা হয়েছিল বিশেষ তাৎপর্য পূর্ণ। এই সভার মূল সভাপতি থেকে শুরু করে বিভাগীয় সভাপতিগণ ছিলেন এক এক দিকপাল। সমগ্র সভার মূল সভপতি ছিলেন সাহিত্য ক্ষেত্রে একজন দিকপাল মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়, সম্ভবত বর্তমানেও এত বড় পণ্ডিত নাই বললেও চলে। বিজ্ঞান বিভাগের সভাপতি ছিলেন কটকের রায়সাহেব যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি এম. এ.। দর্শন বিভাগের সভাপতি ছিলেন হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ইতিহাস বিভাগের সভাপতি ছিলেন অধ্যাপক যদুনাথ সরকার। প্রকৃত পক্ষে এমন বৈচিত্র্য পূর্ণ ও বর্ণাঢ্য সভা বড় একটা দেখা যায় না। এই সম্মিলনী সুষ্ঠু ভাবে পরিচালনার জন্য কতকগুলি সমিতি গঠন করা হয়েছিল, আহ্বায়ক সমিতি, অভ্যর্থনা সমিতি, কার্যনির্বাহক সমিতি, পরামর্শ সমিতি, প্রদর্শনী পরিচালন সমিতি, আমোদ প্রমোদ সমিতি। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মহারাজ বিজয়চাঁদের অভিভাষণ, সম্মিলনীর কার্যসূচী বিভিন্ন সমিতির সদস্য বৃন্দ, প্রতিনিধিদের তালিকা, এখানে উদ্ধৃত করা হলো ঃ-

মহারাজের অভিভাষণ ঃ—

"সমবেত বঙ্গের সাহিত্যসেবী সভ্যবৃন্দ!

বর্ধমান সাহিত্য শাখারপক্ষ হইতে, বর্ধমান পুরবাসিগণের পক্ষ হইতে, এবং এই নগরে প্রতিষ্ঠিত বর্ধমান-রাজের পক্ষ হইতে আমি অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি স্বরূপে

আপনাদিগকে সাদরে অভিনন্দন করিতেছি। আপনারা অদ্য এই স্থানে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের অষ্টম অধিবেশন প্রারম্ভ করত আমাদের সকলের প্রীতি ও উৎসাহ বর্দ্ধন প্রদান করুন ও এই সম্মিলনে দেশের সাহিত্য-প্রচার সম্বন্ধে নব বল প্রদান করুন। অতি প্রাচীনকাল হইতে বর্দ্ধমান রাঢ়ের একটি প্রধান স্থান বলিয়া খ্যাত, এবং সেই কারণেই বোধ হয়, আমার পূর্ব্ব পুরুষগণও বর্দ্ধমানে আসিয়া ধর্ম্ম ও সমাজের উন্নতি কল্পে অনেক সময়ে সাহায্য ও উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন। বর্তমান যুগে আমাদের দেশবাসিগণ রাজনৈতিক আলোচনা ও গবেষণায় এত অধিক পরিব্যাপ্ত যে, দেশের ও সমাজে অন্যান্য অতি প্রয়োজনীয় সংস্কার কার্য্যে মনোনিবেশ করিবার যথোপযুক্ত অবসর তাঁহাদের মিলে না ঃ ইহা অতীব আক্ষেপের বিষয় সন্দেহ নাই। এই উপেক্ষিত কর্ত্তব্যের কিয়দংশ পালন করা স।হিত্য পরিষদের প্রধান উদ্দেশ্য, সেই কারণে আমি এই পরিষদের কার্য্যে বিশেষরূপে আকৃষ্ট এবং কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি আপনাদের এই সব দৃষ্টান্ত পূর্ব্ব কথিত রাজনৈতিকগণের অনুকরণীয় হউক এবং আপনাদের সাধুচেষ্টা সম্যক্ ফলবতী হউক। আপনারা যে রাঢ়ের রাণী বর্দ্ধমানকে এতদিন ভুলিয়া ছিলেন, তাহা কেবল কালবৈগুণ্যে, তবে সন্তান যেমন অশেষ দোষ করিলেও কেবল একবার 'মা' বলিয়া মা'র কাছে আসিলেই জননী তাহাকে বুকে টানিয়া লন, তেমনি আপনারা তত্ত্বানুসন্ধান ও সাহিত্য-প্রচার-কার্য্যে ব্রতী হইয়া আজ যখন রাঢ়জননী বর্দ্ধমানের ক্রোড়ে সমবেত হইয়াছেন, তখন নিশ্চয়ই তিনি আপনাকে গৌরবান্বিতা মনে করিয়া তাঁহার ও বঙ্গের সুসন্তানগণকে নিজ সাধ্যানুরূপ সমাদর করিতে চেষ্টা করিবেন। আপনারা যে কার্য্যে ব্রতী, তাহা সাধু ও স্বদেশানুরাগ প্রণোদিত সন্দেহ নাই। পরন্তু এই প্রসঙ্গে আমার বক্তব্য এইটুকু মাত্র যে, আপনারা নগরে নগরে, পল্লীতে পল্লীতে, বনে বনে বহু পরিশ্রমে পরিভ্রমণ করিয়া যে সকল প্রাচীন গ্রন্থ, ইষ্টক ও প্রস্তর ও ফলকাদি সংগ্রহ করিতেছেন এবং তাহা হইতে যে অভিনব-তত্ত্ব ও বিস্মৃত বা বিকৃত ইতিহাসের যথার্থ কাহিনী আবিষ্কার করিয়া তাহার প্রচার কল্পে বিপুল অর্থব্যয়ে গ্রন্থাদি মুদ্রণ করিতেছেন, তাহার ফল যাহাতে স্থায়ী হয় তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। ইহা শুধু অর্থবল সাপেক্ষ নহে – লোকবল ব্যতীত এই চেষ্টা কদাচিৎ সম্পূর্ণরূপে সার্থক হইতে পারে না। আপনারা যদি আপনাদিগের উদ্দেশ্য স্পষ্টরূপে না বুঝাইয়া পল্লীবাসিগণের নিকট হইতে তাহাদের পুঁথিপত্র, বিগ্রহাদি সংগ্রহ করিতে থাকেন তাহা হইলে হয়ত তাহারা কিছুকাল পরে আপনাদিগকে স্বদেশবৎসল, লোকহিতব্রত মহাপুরুষ স্বরূপ মনে না করিয়া কোন নূতন জাতীয় তস্কর মাত্র মনে করিতে পারে। কারণ, নিরীহ অর্দ্ধশিক্ষিত পল্লী বাসিগণ সাধারণতঃ সাহিত্য



পরিষদের বড় একটা ধার ধারে না বা নব প্রচারিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদির কোন খোঁজ খবরও রাখে না। যদি বলেন, "এ সম্বন্ধে আমাদের কি কর্ত্তব্য?" তাঁহার উত্তরে আমার প্রস্তাব এই যে,– যে যে ব্যক্তির নিকট হইতে প্রত্নতত্ত্বের আলোচনার্থে কোনওদ্রব্য সংগৃহীত হইবে, তাহাদের প্রত্যেককে তত্তৎবিষয়ে আলোচনা সম্বলিত সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকাদি বিনামূল্যে বিতরণ করা তো উচিত-ই, অধিকন্তু সেই স্থানে যদি কোন লোকপূজ্য, চিরস্মরণীয় কবি বা মহাপুরুষের সংস্রব থাকে, তাহা হইলে তাহার নিদর্শনার্থে কোনওরূপ স্মৃতি চিহ্ন স্থাপন করা কর্ত্তব্য ও প্রাচীন প্রথার অনুকরণে কথক বা গায়ক সম্প্রদায় সাহায্যে তাঁহাদের পবিত্র কাহিনী স্থান হইতে স্থানান্তরে প্রচার করিবার ব্যবস্থা করা উচিত। স্বদেশানুরাগ ও স্মৃতি পূজার ইহা একটি প্রকৃষ্ট পন্থা বলিয়া আমার মনে হয়। যদি জনসাধারণের হৃদয়ে এই অনুরাগ বদ্ধমূল না হয় এবং মহাপুরুষগণের উজ্জ্বল আদর্শ যদি আমরা সকলের সমক্ষে তুলিয়া ধরিতে অক্ষম হই, তাহা হইলে আমরা ক্রমে জনসাধারণের সহানুভূতি লাভে বঞ্চিত হইয়া পরিণামে বিফল-প্রযত্ন হইব।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির পক্ষে এরূপ আলোচনা করা বোধ হয় সমীচীন নহে। সুতরাং পরিষদের কর্ত্তব্য-সম্বন্ধে এইটুকু মাত্র বলিয়া ক্ষান্ত হইলাম।

এক্ষণে আমাদের এই সম্মিলনের যিনি প্রধান সভাপতি, মহামহোপাধ্যায় শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়, যাঁহার সূক্ষ্ম তত্ত্বানুধাবন তৎপরতা ও ধীশক্তি আপনাদের কাহারও অবিদিত নহে, তাঁহার নিকট ও বঙ্গের অন্যান্য কৃতিসন্তানগণ, যাঁহারা বিভিন্ন শাখার সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন, তাঁহাদের নিকট আমার বিনীত নিবেদন এই যে, তাঁহারা এবং সমবেত বঙ্গের উজ্জ্বলতম সাহিত্য-সেবিগণ অদ্য এই স্থানে উপনীত হওয়ায় আমরা সকলেই সাতিশয় গৌরবান্বিত অনুভব করিতেছি। এক্ষণে তাঁহারা স্ব-স্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাদের কৃতিত্বের পরিচয় দিয়া আমাদের মন্ত্রমুগ্ধ করুন। পরিশেষে আমি আপনাদের নিকট নিবেদন করিতেছি যে, এ বৎসর বর্দ্ধমানে সাহিত্য-সম্মিলনীর আমন্ত্রণের প্রধান উদ্যোগী কাসিমবাজারাধিরাজ মাননীয় মহারাজা মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী মহোদয়, যে মহানুভবতা, অমায়িকতায় বঙ্গবাসী আপ্যায়িত, তাঁরই দ্বারা উৎসাহিত হইয়া আমি এই কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলাম, আপনারা নিজগুণে আমাদের সকল ত্রুটি উপেক্ষা করি সম্মিলনের কার্য্য সুচারুরূপে নির্বাহ করিলেই আমরা নিজ নিজ শ্রম সফল জ্ঞান করিব

অষ্টম বঙ্গীয়-সাহিত্য-সাম্মলন, বৰ্দ্ধমান

প্রথম দিন

সময় — ২০শে চৈত্র ১৩২১, ৩রা এপ্রিল ১৯১৫, শনিবার অপরাহ্ন ২টা

কার্য্যসূচী

১। স্বস্তিবাদ -- বর্দ্ধমানরাজের প্রধান সভাপণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ তর্করত্ন ও মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ।

২। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রবিজয় বসু ও শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী বা তাঁহার অনুপস্থিতিতে শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়দ্বয় কর্ত্তৃক পূজার দালান-মধ্য হইতে মাল্য লইয়া মঞ্চোপরি সভাপতিদ্বয়কে মাল্য প্রদান।

৩। অবাহন সঙ্গীত – কথা – শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর সিংহ বি, এ। গায়ক– অভ্যর্থনা– সঙ্গীত-সমিতি।

৪। আবাহন (কবিতা) 'কপিঞ্জল' রচিত।

৫। বন্দনাগীত – কথা – শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক বি, এ। গায়ক –অভ্যর্থনা - সঙ্গীত-সমিতি।

৬। আবাহন (কবিতা) – শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক বি, এ।

৭। আবাহন-অভিনন্দন-গীত – শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় বি, এ। গায়ক --- অভ্যর্থনা– সঙ্গীত – সমিতি।

৮। গত বর্ষের কলিকাতার সপ্তম সম্মিলনের সভাপতি শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পত্র পাঠ।

৯। অভ্যর্থনা— সমিতির সভাপতি মহারাজাধিরাজ স্যর শ্রীযুক্ত বিজয়চাঁদ মহ্তাব্ বাহাদুরের অবিভাষণ।

১০। সভাপতি বরণ --

প্রস্তাবক — মহারাজাধিরাজ স্যর শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ মহ্তাব্ বাহাদুর (বৰ্দ্ধমান)

সমর্থক --- মাননীয় শ্রীযুক্ত রায় বৈকুণ্ঠনাথ সেন বাহাদুর (মুর্শিদাবাদ)

অনুমোদক --(১) মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পি এইচ ডি (নদীয়া)

(২) মুনসী শ্রীযুক্ত মুন্‌শী মহম্মদ রৌশনআলি চৌধুরী (ফরিদপুর)

১১। সঙ্গীত — কথা --- শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র এম্ এ

গায়ক — মেরিগোল্ড্ ক্লাব

১২। কবিতা— (১) শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র এম্ এ, বি এল

(২) শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্র কুমার দত্ত

১৩। সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের অবিভাষণ

১৪। সপ্তম সম্মিলনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ — মাননীয় ডাঃ শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী এম্ এ, এল্ এল্ ডি, ডি এল্, সি আই ই ; (সম্পাদক)

১৫। উক্ত কার্য- বিবরণ গ্রহণ-প্রস্তাব —

প্রস্তাবক — শ্রীযুক্ত রায় প্রমথনাথ চৌধুরী (সন্তোষ)

সমর্থক — শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এম্ এ

১৬। বিষয়-নির্ব্বাচন-সমিতি-গঠন —

প্রস্তাবক — শ্রীযুক্ত রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর বেদান্ত-বাচস্পতি, এম্ এ, বি, এল্ (যশোহর)

সমর্থক — শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার বসু এম্ এ, বি এল্ (বর্দ্ধমান)

(যদুবাবুর প্রস্তাবে দেশ-বিদেশ হইতে আগত প্রতিনিধি সমস্ত এবং বর্দ্ধমান-অভ্যর্থনা-সমিতির উপস্থিত সদস্যগণকে এই সমিতির সদস্যরূপে গহণ করা হয়)

"গ" পরিশিষ্ট

নবম বার্ষিক সম্মিলন-পরিচালন-সমিতি

কলিকাতা

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ
শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল্
মাননীয় শ্রীযুক্ত ডাঃ দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী
শ্রীযুক্ত ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র রায় সি আই ই
শ্রীযুক্ত রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর
,, প্রফুল্লনাথ ঠাকুর
,, কুমার অরুণচন্দ্র সিংহ
,, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় এম্ এ
,, ললিতচন্দ্র মিত্র এম্ এ
,, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ
,, মৌঃ মনিরুজ্জ মান
,, মৌঃ মহম্মদ আকরাম খাঁ
,, মৌঃ নূর আহমদ
,, জলধর সেন
,, খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ।

২৪ পরগণা

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
মৌঃ মহম্মদ কে চাঁদ
ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী।

হুগলী

শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার বি এ
,, অম্বিকাচরণ গুপ্ত
,, কুমার ক্ষিতীন্দ্র দেবরায়
শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী
,, আশুতোষ দাসগুপ্ত মহলানবীস

বর্দ্ধমান

মাননীয় মহারাজাধিরাজ বাহাদুর
রাজা শ্রীযুক্ত বনবিহারী কপূর সাহেব
শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রবিজয় বসু এম্ এ, বিএল
,, জ্যোতিঃপ্রসাদ সিংহ
,, উপেন্দ্রনাথ নাগ এল এম্ এস্
,, সন্তোষকুমার বসু
,, শ্রীহর্ষ মুখোপাধ্যায় বি এল
,, দেবেন্দ্রনাথ সরকার
,, দেবেন্দ্রনাথ মিত্র

বীরভূম

মহারাজ কুমার শ্রীযুক্ত মহিমানিরঞ্জন-চক্রবর্ত্তী
শ্রীযুক্ত নির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়
,, শিবরতন মিত্র
,, তারকচন্দ্র রায় বি এ

মেদিনীপুর

কুমার শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রলাল খাঁ
শ্রীযুক্ত মনীষিনাথ বসু
,, সত্যেন্দ্রনাথ বসু
,, মহেন্দ্রনাথ দাস
,, জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কবিরত্ন

বাঁকুড়া

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বি এল্

শ্রীযুক্ত রামনাথ মুখোপাধ্যায়

মুর্শিদাবাদ

শ্রীযুক্ত মহারাজ সার্ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর

,, রাধাকমল মুখোপাধ্যায় এম্ এ

,, যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

,, দেবেন্দ্রনারায়ণ রায়

যশোহর

রায় শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর এম্ এ বিএল

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ

,, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি এ

,, কুমার সতীশকণ্ঠ সিংহরায়

নদীয়া

মহারাজ শ্রীযুক্ত ক্ষৌণীশচন্দ্র রায়

শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর সেন

,, হেমচন্দ্র সরকার এম্ এ

,, মৌঃ মোজাম্মেল হক

,, ভবেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

,, আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ

,, বিভূতিভূষণ মজুমদার

খুলনা

শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত এম্ এ

,, সতীশচন্দ্র মিত্র বি এ

,, গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

বরিশাল

শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী

,, নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ বিএল

,, প্রতাপচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

ফরিদপুর

শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায়

,, মৌঃ রওশন আলি চৌধুরী

ঢাকা

শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ

,, উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ

,, অনুকুলচন্দ্র সরকার

,, নলিনীকান্ত ভট্টশালী এম্ এ

,, যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

,, যতীন্দ্রমোহন রায়

ময়মনসিংহ

মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহ বি এ

শ্রীযুক্ত গোপাল দাস চৌধুরী

,, রাজা জগৎ কিশোর আচার্য্যচৌধুরী

,, কেদারনাথ মজুমদার এম্ আর এ এস

,, দুর্গাদাস রায় বি এল্

ত্রিপুরা

কুমার সুরেন্দ্রচন্দ্র দেববর্ম্মা

কুমার নবদ্বীপচন্দ্র দেববর্ম্মা

,, অনুকুলচন্দ্র রায়

নোয়াখালী

সম্পাদক নোয়াখালী সম্মিলনী

চট্টগ্রাম

রায় শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর সি আই ই

রায় শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র দত্ত বাহাদুর

,, শশাঙ্কমোহন সেন বি এল

,, বিপিনবিহারী নন্দী বি এল

,, ত্রিপুরাচরণ চৌধুরী

পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ বি এ

শ্রীযুক্ত রজনীরঞ্জন দেব বি এ

,, অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত বি এ

,, অচ্যুতচরণ চৌধুরী

কাছাড়

শ্রীযুক্ত ভূবনমোহন ভট্টাচার্য্য

,, জগন্নাথ দেব

গৌহাটী

শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য এম্ এ

,, বনমালী বেদান্ততীর্থ

,, সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

,, হেমচন্দ্র দেব গোস্বামী এম্ এ

,, ভুবনমোহন সেন এম্ এ

শ্রীযুক্ত কালীচরণ সেন

গোয়ালপাড়া

রাজা শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া

শ্রীযুক্ত দ্বিজেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্ এ, বিএল্

কুচবিহার

কুমার শ্রীযুক্ত নিত্যেন্দ্রনারায়ণ বাহাদুর

শ্রীযুক্ত কোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য এম্ এ

,, চৌধুরী আমানতুল্লা আহমদ

রঙ্গপুর

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন কবি-সম্রাট

শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ

,, ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

,, সেখ রেয়াজুদ্দীন আহমদ

রায় শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর

বগুড়া

শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত

,, হরগোপাল দাসকুণ্ডু

পাবনা

শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র রায়

,, সতীশচন্দ্র রায় এম্ এ

শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

দিনাজপুর

মহারাজ সার শ্রীযুক্ত গিরিজানাথ রায়

শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী এম্‌এ, বিএল্‌

,, বরদাকান্ত বিদ্যারত্ন

মালদহ

শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত

,, রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী

,, বিপিনবিহারী ঘোষ বি এল্‌

,, নলিনীকান্ত বসু

পূর্ণিয়া

শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্‌এ,বিএল

,, রায় নিশিনাথ সেন বাহাদুর

রাজসাহী

মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদিন্দ্রনাথ রায়

কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম্ এ

,, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বি এল

,, রমাপ্রসাদ চন্দ্র বি এ

,, রাধাগোবিন্দ বসাক এম্ এ

,, পঞ্চানন নিয়োগী এম্ এ

মানভূম

শ্রীযুক্ত জ্যোতির্ম্ময় চট্টোপাধ্যায় এমএ, বিএল

শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ সেনগুপ্ত বি এল

,, হরিনাথ ঘোষ

কটক

রায়সাহেব যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি এম্‌এ

ভাগলপুর

শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বি এল্‌

,, দুর্গাদাস রায়

বাঁকীপুর

রায় শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ বাহাদুর এম্ এ, বি এল

শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এম্ এ

,, যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার বি এ

,, রাখালরাজ রায় বি এ

কাশী

শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়

দিল্লী

শ্রীযুক্ত ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়

,, পুরুষোত্তম সিংহ বি এ

,, সরোজনাথ বাগচি

মিরাট

শ্রীযুক্ত কালীপদ বসু বি এল্‌

,, নবকৃষ্ণ রায় বি এ

"ঘ" পরিশিষ্ট

অভ্যর্থনা-সমিতির কর্ম্মাধ্যক্ষগণ

সভাপতি

মাননীয় শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বাহাদুর — বর্দ্ধমান

সহকারী সভাপতি

১। শ্রীযুক্ত রাজা বনবিহারী কপূর সাহেব, সি, এস, আই

২। শ্রীযুক্ত ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ, সি, আই, ই ; সি, এস, আই

৩। শ্রীযুক্ত জে, এন্, রায়, আই, সি, এস

৪। মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্

৫। শ্রীযুক্ত রায় পুলিনবিহারী লাল হাণ্ডে বাহাদুর

৬। ,, রায় বৈকুণ্ঠনাথ সেন বাহাদুর

৭। মাননীয় শ্রীযুক্ত রায় নলিনাক্ষ বসু বাহাদুর

৮। শ্রীযুক্ত রায় ললিতমোহন সিংহ রায় বাহাদুর

৯। ,, কুমার প্রমথনাথ মালিয়া

সম্পাদক

১। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মিত্র

২। ,, দেবন্দ্রনাথ সরকার

সহকারী সম্পাদক

১। শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার বসু

২। মৌলবী মহম্মদ ইয়াসিন্

৩। শ্রীযুক্ত রাখালরাজ রায়

৪। ,, মন্মথকুমার চট্টোপাধ্যায়

৫। ,, শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র

৬। ,, সিদ্ধেশ্বর সিংহ

৭। ,, হেমেন্দ্রনাথ বসু

কোষাধ্যক্ষ

১। শ্রীযুক্ত শ্রীপতি দত্ত

পরিদর্শকগণ

১। শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বসু

২। ,, জগদ্বন্ধু মিত্র

৩। ,, রায় মণিলাল সিংহ রায় বাহাদুর

৪। ,, পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সহকারী পরিদর্শকগণ

অভ্যর্থনা-বিভাগ —

১। শ্রীযুক্ত শ্রীহর্ষ মুখোপাধ্যায় (অধ্যক্ষ)

২। ,, শৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

৩। ,, ক্ষীরোদবিহারী চট্টোপাধ্যায়

৪। ,, নরেন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়

৫। ,, নরেশচন্দ্র মিত্র

৬। শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী ভট্টাচার্য্য
৭। ,, অবিনাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
৮। ,, দ্বিজেন্দ্রনাথ মণ্ডল
৯। ,, মৌলবি আজিজর রহমান

কার্য্যালয়-বিভাগ —

১। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রবিজয় বসু এম্ এ , বি এল্ (অধ্যক্ষ)
২। ,, রাখালরাজ রায়
৩। ,, অবিনাশচন্দ্র মিত্র
৪। ,, বীরেন্দ্রকুমার বসু
৫। ,, শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র
৬। ,, হেমেন্দ্রমোহন বসু
৭। ,, সিদ্ধেশ্বর সিংহ

সাজসজ্জ া-বিভাগ —

১। শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র বসু (অধ্যক্ষ)
২। ,, প্রকাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

যানাদি-ব্যবস্থা-বিভাগ —

১। শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী (অধ্যক্ষ)
২। ,, ভুপেন্দ্রনাথ দত্ত

হিসাব-পরীক্ষক —

১। শ্রীযুক্ত রায় সাহেব শ্যামাচরণ রায়
২। মাননীয় রায় শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ বসু-বাহাদুর

প্রদর্শনী-বিভাগ —

১। শ্রীযুক্ত রাখালরাজ রায় (অধ্যক্ষ)
২। ,, মন্মথনাথ রায়
৩। ,, শিবদাস তেওয়ারী
৪। ,, হরিদাস পালিত

স্বেচ্ছাসেবক-বিভাগ —

১। শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় (অধ্যক্ষ)
২। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র ঘোষ

সঙ্গীত-সমিতি-বিভাগ —

১। শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকুমার বসু (অধ্যক্ষ)
২। ,, দ্বিজেন্দ্রনাথ বাগচী
৩। ,, রবীন্দ্রকুমার বসু এম্ এ
৪। ,, জটাধারী বসু
৫। ,, ডাক্তার অটল কুমার ঘোষ
৬। ,, নিতাইচন্দ্র দাস
৭। ,, ব্রহ্ম পদ দত্ত
৮। ,, সদানন্দ খান্না
৯। ,, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
১০। ,, নীরদচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বাস্থ্য-বিভাগ —

১। শ্রীযুক্ত এস্, কে, সেন
২। ,, অমুল্যচন্দ্র মিত্র
৩। ,, শ্রীপতি মুখোপাধ্যায়
৪। ,, অটলকুমার বসু
৫। ,, অহিভূষণ মুখোপাধ্যায়

আমোদ- প্রমোদ-বিভাগ —

১। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সরকার(অধ্যক্ষ)
২। ,, হরিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

অর্থসংগ্রাহকগণ —

১। শ্রীযুক্ত মন্মথকুমার চট্টোপাধ্যায়
২। ,, রাখালরাজ রায়
৩। ,, শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র
৪। ,, অবিনাশচন্দ্র মিত্র
৫। ,, বীরেন্দ্রকুমার বসু
৬। ,, হেমেন্দ্রমোহন বসু

বাসস্থান-বিভাগ —

১। শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
২। ,, জলধর সেন

কর্ম্মচারী — শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ মিত্র

কার্য্যনির্ব্বাহক - সভার সাধারণ সদস্য

শ্রীযুক্ত মধুসূদন দাস মহান্ত মহারাজ
,, রামনারায়ণ দত্ত বি, এ
,, শরচ্চন্দ্র বসু বি, এল্
,, হৃষিকেশ চট্টোপাধ্যায়
,, রায় সাহেব মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়
,, বিপিনবিহারী ঘোষ এম,এ, বি,এল
,, আশুতোষ ঘোষ বি, এল্
,, মথুরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ
,, নরেন্দ্রনাথ ঘোষ বি, এল
,, প্রিয়নাথ দত্ত এম্ এ, বি এল্
,, ভামিনীরঞ্জন সেন বি, এল্
,, বনোয়ারীলাল চৌধুরী বি,এল্
,, শ্রীনারায়ণ তেওয়ারী
,, হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ
,, লালা জ্যোতিঃ প্রকাশ নন্দে
,, লালা গতি প্রকাশ নন্দে
,, লালা মুক্তি প্রকাশ নন্দে
,, লালা দীপ্তি প্রকাশ নন্দে
,, লালা শান্তি প্রকাশ নন্দে
,, রাজেন্দ্রনাথ শেঠ
,, সৌরীন্দ্রমোহন সিংহ
,, ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কাব্যকণ্ঠ

শ্রীযুক্ত অমৃতলাল শীল
,, ননিলাল ঘোষ বি, এল্
,, সুরেন্দ্রকুমার বসু এম্ এ, বি এল্
,, রাজেন্দ্রনাথ সিংহ সরস্বতী
মৌলবী সৈয়দ্ আবদুল আলম্
সৈয়দ আবদুল্লা উল্ মসাভি
শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
,, কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ
,, জ্যোতিঃ প্রসাদ সিংহ
,, সত্যশরণ সরকার বি, এ
,, আশুতোষ চক্রবর্ত্তী এম এ, বি এল্
,, ভূপেন্দ্রনাথ গুপ্ত এম্ এ
,, সুরেন্দ্রনাথ রায় এম্ এ, বি এল্
,, ভবদেব চট্টোপাধ্যায়
,, পি, এন্, সরকার
,, যোগেন্দ্রনাথ রায়
,, যদুপতি চট্টোপাধ্যায়
,, গিরিশচন্দ্র বসু
,, কুমারনাথ মুখোপাধ্যায়
,, হেমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
,, দুর্গাদাস লাহিড়ী

পরামর্শ-সমিতি

মাননীয় শ্রীযুক্ত মহারাজ বাহাদুর
শ্রীযুক্ত রাজা বনবিহারী কপূর সাহেব
মাননীয় শ্রীযুক্ত রায় নলিনাক্ষ বসু বাহাদুর

শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বসু
,, দেবেন্দ্রবিজয় বসু
,, দেবেন্দ্রনাথ মিত্র

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সরকার
,, জগদ্বন্ধু মিত্র
,, শ্রীহর্ষ মুখোপাধ্যায়
,, আশুতোষ সেন
,, সন্তোষকুমার বসু
,, রায় সাহেব শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ রায়
,, অমুল্যচন্দ্র মিত্র

শ্রীযুক্ত হৃষিকেশ চট্টোপাধ্যায়
,, জলধর সেন
,, রাখালরাজ রায়
,, মৌলবী মহম্মদ ইয়াসিন্
,, হরিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়
,, মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী
,, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত

অভ্যর্থনা-সমিতির সদস্যগণ

শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ সাহা, দাঁইহাট
,, অটলকুমার বসু এল,এম,এস্,বর্দ্ধমান
,, অতুলচন্দ্র ঘোষ, বর্দ্ধমান
,, অতুলানন্দ রায়চৌধুরী, বর্দ্ধমান
,, অদ্বৈতচরণ বসু বি, এল্, দ্বারভাঙ্গা
,, অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় বি,এল, বর্দ্ধমান
,, অবনিমোহন চট্টোপাধ্যায় বি,এ ঐ
,, অবিনাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঐ
,, অবিনাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হাট-শ্রীধরপুর
,, অবিনাশচন্দ্র মিত্র, বর্দ্ধমান
,, অমরনাথ দত্ত, বি,এল, বর্দ্ধমান
,, অমরেন্দ্রনাথ দাঁ ঐ
,, অমূল্যচন্দ্র মিত্র ঐ
,, অম্বিকাচরণ ব্রহ্ম চারী ভক্তিরঞ্জন, দেনুড়
,, অহিভূষণ মুখোপাধ্যায়, বর্দ্ধমান
,, মৌলবী আজিজর রহমান বি,এল ঐ
,, লালা আনন্দলাল হাণ্ডে

শ্রীযুক্ত আনন্দগোপাল সিংহ, দেবীপুর
মৌঃ কাজী মহম্মদ আজি সাহেব, কুসুমগ্রাম
আবদুল হাফিজ এম্,এ, কলিকাতা
সৈয়দ আবদুল আলম, বর্দ্ধমান
আবদুল্লা উল্ মোসাভি, বেহার
আশুতোষ চক্রবর্ত্তী বি,এল, রাণীগঞ্জ
আশুতোষ চন্দ্র মিত্র, কলিকাতা
আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল, বর্দ্ধমান
আশুতোষ সেন বি, এল্ ঐ
ইন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় বি,এল্ ঐ
উতঙ্কলাল মুখোপাধ্যায়,বাগনাপাড়া
উপেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি এল্, বর্দ্ধমান
উপেন্দ্রচন্দ্র কুণ্ডু ঐ
উপেন্দ্রনাথ হাজরা ঐ
এককড়ি দে, মাথরুন ঐ
মৌলবী এক্রামল্ হক্ ঐ

মিঃ এ, স্মিথ, বর্দ্ধমান
,, কমলকৃষ্ণ বসু এম্ এ, বি এল্, বর্দ্ধমান
,, করুণানিধান মুখোপাধ্যায় ঐ
,, করুণাময় নাগ বি, এল্ ঐ
,, কানাইলাল ঘোষ বি,এল্ ঐ
,, কানাইলাল ঘোষ, চুঁচুড়া
,, কামাখ্যানাথ মিত্র এম্,এ, বি এল, কাশ্মীর
,, কামিনীমোহন নন্দী, বন্দীপুর
,, কামিনীনাথ রায়, খরমপুর
,, কালীদাস রায়, বি এ, কড়ুই
,, কালীকিঙ্কর কাব্যতীর্থ, কুলীনগ্রাম
,, কালীপদ চট্টোপাধ্যায় বি, এল, মালদা
,, কালীপদ সরকার এম্, এ, খণ্ডঘোষ
,, লালা কুন্ধন লাল কপূর, বর্দ্ধমান
,, কুমারনাথ মুখোপাধ্যায় ঐ
,, শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক বি, এ, মাথরুন
,, কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় বিএ, চুঁচুড়া
,, কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, বর্দ্ধমান
রায় কৃষ্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর, দেয়াসঁ
শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চন্দ্র, আউশগ্রাম
,, কেশবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, বর্দ্ধমান
,, ক্ষিতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত ঐ
,, ক্ষিতীশচন্দ্র মৈত্র ঐ
,, ক্ষীরোদবিহারী চট্টোপাধ্যায় এম্, এ বি, এল, বর্দ্ধমান
,, ক্ষীরোদচন্দ্র চৌধুরী এল,এম্ এস, ঐ

শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম বসু এম্, এ, কলিকাতা
,, ক্ষেত্রনাথ অধিকারী ঐ
,, ক্ষেত্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, বর্দ্ধমান
,, ক্ষেত্রনাথ চৌধুরী ঐ
,, ক্ষেত্রনাথ দত্ত, বীরভূম
,, ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বর্দ্ধমান
,, ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ, কলিকাতা
,, ক্ষেত্রনাথ সেনগুপ্ত বি এল, ধানবাদ
,, গগনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বৈদ্যপুর
,, লালা গতিপ্রকাশ নন্দে, বর্দ্ধমান
,, গদাধর দাস, বি এল্, বর্দ্ধমান
,, গিরিশচন্দ্র বসু এম্ এ, কলিকাতা
,, গিরিশচন্দ্র মণ্ডল বি, এল, রাণীগঞ্জ
,, গিরিন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্, এ বি, এল, বর্দ্ধমান
,, গিরীন্দ্রনাথ মিত্র, বর্দ্ধমান
,, গোকুলচাঁদ মঙ্গলচাঁদ, ঐ
,, গোপালচন্দ্র দত্ত, বনতীর
,, গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বর্দ্ধমান
,, গোপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ঐ
গোবিন্দচাঁদ সাহা, কাটোয়া
গোবিন্দপদ সিংহ ঐ
গোবিন্দবিজয় গোস্বামী বিএ, মাথরুন
গোরাচাঁদ চৌধুরী, ওকর্সা
গোলোকবিহারী লাল, হাণ্ডে, উখরা
গোষ্ঠবিহারী মাকড় বি,এ, কলিকাতা
গৌরদুলাল দে, মীরপুর
গৌরপদ রায় বি, এল্, বর্দ্ধমান

শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, বর্দ্ধমান
,, চারুচন্দ্র দত্ত, ধুলিয়া
,, চারুচন্দ্র মিত্র, বর্দ্ধমান
,, চাঁদমল মাড়োয়ারী ঐ
,, জগদানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ বি, এল্, বর্দ্ধমান
,, পণ্ডিত জগদীশ্বর ওঝা, বর্দ্ধমান
,, জগদ্বন্ধু মিত্র এল্, এম্, এস্ ঐ
,, জলধর সেন, কলিকাতা
,, জয়লাল মাড়োয়ারী, বর্দ্ধমান
,, জিতেন্দ্রলাল বসু মুন্সী, কাইগ্রাম
,, জিতেন্দ্রনাথ সামন্ত, বোগরা
,, মৌঃ জিয়ান্নবী সাহেব, কুসুমগ্রাম
,, লালা জ্যোতিঃপ্রকাশ নন্দে, বর্দ্ধমান
,, জ্যোতিঃপ্রসাদ সিংহ, কাটোয়া
,, জ্ঞানদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম, এ বি,এল, বর্দ্ধমান
,, জি, এন, রায়, আই, সি, এস ঐ
,, জ্ঞানেন্দ্রলাল দত্ত বি,এল ঐ
,, জ্ঞানেন্দ্রশশী গুপ্ত বি,এল,নবাবগঞ্জ
,, তারাপদ রায় বি, এ, দিল্লী
,, তারাপ্রসন্ন চোঙ্গদার, গুসকরা
,, তুলসীদাস কর এম. এ, কলিকাতা
,, দাশরথি কর বি, এল, বর্দ্ধমান
,, দুর্গাদাস লাহিড়ী, হাওড়া
,, লালা দেবীপ্রসাদ কপুর, বর্দ্ধমান
,, দেবেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক বি.এল,কলিকাতা
,, দেবেন্দ্রনাথ মিত্র, বর্দ্ধমান
,, দেবেন্দ্রনাথ সরকার ঐ

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রবিজয় বসু এম্,এ, বি,এল ঐ
,, দ্বিজেন্দ্রনাথ মণ্ডল বি, এল্,বর্দ্ধমান
,, দ্বিজেন্দ্রনাথ মিত্র মজুমদার, কুলীনগ্রাম
,, লালা দীপ্তিপ্রকাশ নন্দে, বর্দ্ধমান
,, ধরণীধর চট্টোপাধ্যায়, উখরা
,, ধীরেন্দ্রমোহন মিত্র, কলিকাতা
,, নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বর্দ্ধমান
মৌলবী নসিরুদ্দীন আহম্মদ বি,এল,বর্দ্ধমান
শ্রীযুক্ত নটবর দত্ত এল,এম,এস, মানকর
,, ননিগোপাল মুখোপাধ্যায় এম, এ বি, এল, বর্দ্ধমান
,, ননিলাল ঘোষ এম,এ,বি,এল্ ঐ
,, নরেন্দ্রনাথ ঘোষ ঐ
,, নরেন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় বি,এল ঐ
,, নরেশচন্দ্র বসু বি, এ ঐ
,, নরেশচন্দ্র মিত্র বি, এল ঐ
মাননীয় রায় নলিনাক্ষ বসু বাহাদুর ঐ
,, নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা
,, নলিনীমোহন মিত্র, সিমলা
,, নিখিলনাথ রায় বি,এল, ময়মনসিংহ
,, নিত্যানন্দ দত্ত, বর্দ্ধমান
,, নিবারণচন্দ্র হুই বি, এল্ ঐ
,, নিরঙ্কচন্দ্র বসু ঐ
,, নির্ম্মলচন্দ্র মিত্র বি, এল্, কাটোয়া
,, নীরদচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, জামালপুর
,, নৃত্যগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, বর্দ্ধমান
,, নৃত্যগোপাল সিংহ, দেবীপুর
,, নৃত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,বর্দ্ধমান
,, নৃসিংহদেব বন্দ্যোপাধ্যায়, কাইগ্রাম

শ্রীযুক্ত নৃসিংহ প্রসাদ চৌধুরী,কামারকিতা
,, নৃসিংহপ্রসাদ রায় মহাশয়, চুপী
,, পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় এম,এ,বি, বৰ্দ্ধমান
,, পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য, বড়বেলুন
,, পঞ্চানন সিংহ, বৰ্দ্ধমান
,, পরমশুক চন্দ্র, শ্রীবাটি
,, পরমেশপ্রসন্ন রায় বি,এ,আসানসোল
,, পি,এন সরকার, বৰ্দ্ধমান
রায় পুলিনবিহারী লাল হাণ্ডে বাহাদুর, উখরা
শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি,এল,কাটোয়া
,, পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি,এল, বৰ্দ্ধমান
,, পূর্ণচন্দ্র অধিকারী ঐ
,, পূর্ণচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ঐ
,, পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য বি,এ, শ্রীখণ্ড
,, প্রকাশচন্দ্র দত্ত, বৰ্দ্ধমান
,, প্রকাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ
,, প্রফুল্লচন্দ্র দত্ত বি, এল,নীলফামারি
,, প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম,এ, কলিকাতা
,, প্রবোধানন্দ সরকার, বৰ্দ্ধমান
,, প্রভাতরঞ্জন মিত্র বি,এল ঐ
কুমার প্রমথনাথ মালিয়া, শিয়ারশোল
শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়,বৰ্দ্ধমান
,, লালা প্রসাদদাস কপূর, বৰ্দ্ধমান
,, প্রাণকৃষ্ণ নায়েক, কুলীনগ্রাম
,, প্রি[illegible] ঘোষ, বৰ্দ্ধমান
,, প্রিয়নাথ তত্ত্বরত্ন ঐ
,, প্রিয়নাথ দত্ত এম, এ বি, এল ঐ

শ্রীযুক্ত পাঁচুষষ্ঠী দাস, কাইগ্রাম
,, ফকিরচন্দ্র মণ্ডল বি,এল্ ঐ
,, ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায় বি,এ,কাটোয়া
,, ফণীন্দ্রলাল সেন এম,এ, বি,এল, রঘুনাথপুর
মাননীয় বৰ্দ্ধমানাধিপতি মহারাজ অধিরাজ বাহাদুর
রাজা বনবিহারী কপূর সি,এস,আই, বৰ্দ্ধমান
শ্রীযুক্ত বক্সীরাম মাড়োয়ারী ঐ
,, বনোয়ারীলাল চৌধুরী বি,এল ঐ
,, বনোয়ারীলাল হাটি বি,এল্ ঐ
,, বরদাপ্রসাদ বসু, কলিকাতা
,, বসন্তবিহারী চন্দ্র এম, এ, কাটোয়া
,, বি,এম,মিত্র আই,এম,এস মীরাট
,, বিজয়গোবিন্দ চৌধুরী, মন্তেশ্বর
শ্রীযুক্ত বিজয়গোপাল চট্টোপাধ্যায় এম,এ,বি,এল, নওগাঁ
,, বিজয়বসন্ত ভট্টাচার্য্য এম,এ, বৰ্দ্ধমান
,, বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়, কালনা
,, বিধুভূষণ শিক্‌দার বি,এল,বৰ্দ্ধমান
শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী ভট্টাচার্য ঐ
,, বিনোদবিহারী সরকার এম, এ বি, এল্, বৰ্দ্ধমান
,, বিপিনবিহারী ঘোষ এম, এ বি,এল্, ভবানীপুর
,, বিভূতিভূষণ চৌধুরী, বৰ্দ্ধমান
,, বিহারীলাল বসু এল, এম, এস, কলিকাতা
,, বিরজাচরণ মিত্র বি,এল, বৰ্দ্ধমান

শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকুমার বসু আই, সি, এস, বৰ্দ্ধমান
,, বীরেন্দ্রকুমার বসু ঐ
,, বীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ
রায় বৈকুণ্ঠনাথ সেন বাহাদুর বি, এল, সৈদাবাদ
শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী, কলিকাতা
,, ব্রজেন্দ্রনাথ বিদ্যারত্ন, বৰ্দ্ধমান
,, ব্রজেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায় ঐ
,, ব্রহ্মানন্দ সিদ্ধান্ত, জামালপুর
,, ভগবতীচরণ মুখোপাধ্যায় বি,এল, বৰ্দ্ধমান
,, ভবদেব চট্টোপাধ্যায়, শাকনারা ঐ
,, ভবেশচন্দ্র দাসগুপ্ত ঐ
,, ভামিনীরঞ্জন সেন বি,এল ঐ
,, ভূতনাথ ঘোষ, আঝাপুর
,, ভূতনাথ মুখোপাধ্যায়, খানাজংশন
,, ভুবনমোহন বসু বি, এল, শাঁকারি
,, ভূপেন্দ্রনাথ গুপ্ত এম, এ, বৰ্দ্ধমান
,, ভূপেন্দ্রনাথ ঘোষাল বি,এল ঐ
,, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত বি,এ,বি,ঈ ঐ
,, ভোলানাথ দে ঐ
,, ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ
,, সৈয়দ মকবুল এলাহি ঐ
,, মঙ্গলপ্রসাদ রায় চৌধুরী ঐ
,, মথুরানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি,এ ঐ
,, মধুসূদন শরণদেব মহান্ত মহারাজ ঐ
রায় মণিলাল সিংহ রায় বাহাদুর, চকদিঘী
রায় মন্মথকুমার চট্টোপাধ্যায় এমএ,বি,এল,বৰ্দ্ধমান

শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল, কাটোয়া
,, মৌঃ মহম্মদ ইয়াসীন, বৰ্দ্ধমান
,, মহাবিষ্ণু চোঙ্গদার, গুস্করা
,, মহেশচন্দ্র বিশ্বাস তর্কবাগীশ, মানকর
,, লালা মুক্তিপ্রকাশ নন্দে, বৰ্দ্ধমান
,, সূতচাঁদ ঐ
,, মৃগাঙ্কলাল মুখোপাধ্যায় বি,এলঐ
রায় সাহেব মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়, রাণীগঞ্জ
শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী, বৰ্দ্ধমান
,, যতীন্দ্রকুমার রায়, বাঁকীপুর
,, যতীন্দ্রনাথ মিত্র, মাহাতা
,, যতীন্দ্রনাথ সাঁই, বৰ্দ্ধমান
,, যতীন্দ্রনাথ রায় ঐ
,, যতীন্দ্রনাথ সরকার ঐ
,, যতীন্দ্রমোহন ঘোষ, মেমারি
,, যতীন্দ্রমোহন মল্লিক বি, ঈ, বৰ্দ্ধমান
,, যতীশচন্দ্র ঘোষ ঐ
,, যতীন্দ্র মল্লিক বি,এল. ধানবাদ
,, যদুনাথ মজুমদার, কাটোয়া
,, যদুপতি চট্টোপাধ্যায় ঐ
,, যাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা এম,এ,বি,এল, বৰ্দ্ধমান
রায় যামিনীমোহন মিত্র এম,এ বাহাদুর, কলিকাতা
,, যুগলবিহারী মাকড় এম,এ,বি এল, রামপুরহাট
,, যোগীন্দ্রলাল সাহা, কাটোয়া
,, যোগেন্দ্রনাথ রায়, বৰ্দ্ধমান

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষ, কাটোয়া
,, রমনীমোহন মিত্র এম,এ,কলিকাতা
,, রমেশচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ, বড়বেলুন
রায় রসময় মিত্র বাহাদুর এম,এ,কলিকাতা
শ্রীযুক্ত রাখালদাস মুখোপাধ্যায়, বৰ্দ্ধমান
,, রাখালদাস সেন, কাব্যতীর্থ সাহিত্যভূষণ
,, রাখালচন্দ্র দাস বি, এল, বর্দ্ধমান
,, রাখালরাজ রায় বি, এ ঐ
,, রাখালনন্দ ঠাকুর, শ্রীখণ্ড
,, রাজকৃষ্ণ দত্ত, বৰ্দ্ধমান
,, রাজরাজেন্দ্র চন্দ্র, শ্রীবাটী
,, রাজেন্দ্রনাথ শেঠ, বৰ্দ্ধমান
,, রাজেন্দ্রনাথ সিংহ, সরস্বতী,বোরশুল
,, রাজেশচন্দ্র রায় এল,এম,এস, মেমারি
,, রাধাবল্লভ মুখোপাধ্যায়, কাটোয়া
,, রাধিকাপ্রসাদ চৌধুরী এম,এ, কৃষ্ণনগর
,, রাধিকাপ্রসাদ দত্ত, দাঁইহাট
,, রাধিকা প্রসাদ বসু বি,এল, বৰ্দ্ধমান
,, রামকৃষ্ণ গোস্বামী, বাগনাপাড়া
,, রামনারায়ণ দত্ত বি,এ, ভৈটা
,, সার রাসবিহারী ঘোষ এম,এ,বি, এল,সি,এস্,আই; সি,আই, ই, কলিকাতা
শ্রীযুক্ত ললিতমোহন ঘোষ এম্,এ, বি এল ঐ
,, রায় ললিতমোহন সিংহ রায়, বাহাদুর, চকদিঘী
,, শচীন্দ্রমোহন ঘোষ বি,এল,পুরুলিয়া
,, শরচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি,এ ,বৰ্দ্ধমান
,, শরচ্চন্দ্র বসু বি, এ ঐ

শ্রীযুক্ত শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায় বি,এ,উখরা
,, শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কালনা
,, শশিভূষণ বসু বি,এল্, বৰ্দ্ধমান
,, লালা শান্তিপ্রকাশ নন্দে ঐ
,, শিবপ্রসাদ ভকত ঐ
,, শিবদাস তেওয়ারী ঐ
,, শিবরাম গোস্বামী, পুটশুরী
,, শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র, বৰ্দ্ধমান
,, শৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম.এ; বি,এল. বৰ্দ্ধমান
,, রায় সাহেব শ্যামাচরণ রায় ঐ
,, শ্যামাদাস বাচস্পতি, কলিকাতা
,, শ্রীকান্ত মুখোপাধ্যায়, বহরমপুর
,, শ্রীনারায়ণ তেওয়ারী, বৰ্দ্ধমান
,, শ্রীপতি দত্ত ঐ
,, শ্রীপতি মুখোপাধ্যায় এল,এম,এস ঐ
,, শ্রীমোহন সিংহ বি,এল ঐ
,, শ্রীহরি মুখোপাধ্যায় বি,এল, রায়গঞ্জ
,, শ্রীহর্ষ মুখোপাধ্যায় বি,এল, বৰ্দ্ধমান
,, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, নবদ্বীপ
,, সতীন্দ্রনাথ পাঁজা, বৰ্দ্ধমান
,, সতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,গঙ্গাটিকুরী
,, সতীপ্রসন্ন সরকার এম,এ, বৰ্দ্ধমান
,, সতীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় এম,এ, জামালপুর
,, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি, এল, বৰ্দ্ধমান
,, সতীশচন্দ্র সরকার ঐ
,, সত্যচরণ গোস্বামী, কুড়মুন

শ্রীযুক্ত সত্যশরণ সরকার বি, এ, বর্দ্ধমান
,, সত্যেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক আই,সি,এস, কৃষ্ণনগর
,, সনৎকুমার চৌধুরী, কলিকাতা
,, সন্তোষকুমার বসু, বর্দ্ধমান
,, সন্তোষকুমার রায় ঐ
,, সারদাপ্রসাদ চৌধুরী ঐ
,, সিদ্ধেশ্বরকিঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, কুলীনগ্রাম
,, সিদ্ধেশ্বর সিংহ বি,এ, বর্দ্ধমান
,, সুধীরকুমার বসু, এম,বি,কলিকাতা
,, সুরেন্দ্রকুমার বসু এম. এ, বি, এল, বর্দ্ধমান
,, সুরেন্দ্রকুমার সেন,এল,আর,সি,পি ঐ
,, সুরেন্দ্রনাথ কুণ্ডু ঐ
,, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি,এ ঐ
,, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি,এল, কাঁথী
,, সুরেন্দ্রনাথ মিত্র, পুরী
,, সুরেশচন্দ্র ঘোষ, বর্দ্ধমান
,, সুরেশচন্দ্র বসু বি,এ, ইটাচুনা
,, সুরেশচন্দ্র মিত্র এল,এম,এস, গয়া
,, সুশীলকুমার ঘোষ বি,এ, বর্দ্ধমান
,, সুশীলকুমার বসু বি,এল,কলিকাতা

শ্রীযুক্ত সূর্য্যনারায়ণ ঘোষ, ঢাকা
,, সৌরীন্দ্রকুমার গুপ্ত, পি এইচ্ ডি, বি,এল,বার-এট-ল,কলিকাতা
,, সৌরীন্দ্রমোহন গুপ্ত, এল,এম,এস, মুঙ্গের
,, সৌরীন্দ্রমোহন সিংহ, বর্দ্ধমান
,, হরকালী মুখোপাধ্যায়, বিএ, চকদীঘি
,, হরগোবিন্দ রেজ, কালনা
,, হরিকুমার গুপ্ত, বর্দ্ধমান
,, হরিদাস পালিত, কলিগ্রাম
,, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়,বর্দ্ধমান
,, হরিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় বি,এঐ
,, হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায় ,কলিকাতা
,, হরিপদ রেজ, কুসুমগ্রাম
,, হরেন্দ্রকৃষ্ণ রায় এম,এ,বি,এল, উলীপুর
,, হাজারীমল, বর্দ্ধমান
,, মৌঃ সৈয়দ হামিদুল্লা ঐ
,, হৃষিকেশ চট্টোপাধ্যায় বি,এল, বর্দ্ধমান
,, হেমন্তকুমার সরকার, কালনা
,, হেমেন্দ্রনাথ সেন বি,এল, কলিকাতা
,, হেমেন্দ্রমোহন বসু বি,এ, বর্দ্ধমান

"ঙ" পরিশিষ্ট

বর্দ্ধমান, অষ্টম বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনে প্রতিনিধি-প্রেরণকারী সভাসমিতি, পুস্তকাগার ও পাঠাগারের তালিকা

কলিকাতা

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ
সাহিত্য-সভা
চৈতন্য-লাইব্রেরী
রামমোহন-লাইব্রেরী
হিন্দি সাহিত্য-পরিষৎ
বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা
বৌদ্ধধর্ম্মাঙ্কুর-সভা
জাতীয় শিক্ষা-পরিষৎ
বঙ্গীয় ছাত্র-সম্মিলনী
আর্য সাহিত্য-সমাজ
ভবানীপুর সাহিত্য-সমিতি
সাহিত্য-সংঘ
বঙ্গবাসী-সম্মিলনী
ত্রিপুরা হিতসাধিনী-সভা
নোয়াখালি-সম্মিলনী
শ্রীহট্ট-সম্মিলন
শ্রীহট্ট সমাজসেবা-সমিতি
দেবালয়
অধ্যাত্ম-পরিষৎ
National Reading Society
Rajanikanta Gupta Memorial Library
Michael Modhusudan Library
Boy's Own Library

২৪ পরগণা

Panihati Club
Ariadah Association Library & Reading Room
Barisha Reading Club & Library

হুগলী ও হাওড়া

উত্তরপাড়া-সম্মিলনী
শিবপুর পাবলিক-লাইব্রেরী
মাজু পাব্‌লিক-লাইব্রেরী
উলুবেড়িয়া ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল লাইব্রেরী
Friend's Debating Club, Chinsura
শিক্ষা-সমিতি, বালী
শান্তিকুটীর লাইব্রেরী ও অক্ষয় দত্ত স্মৃতি-সমিতি
হুগলী বার-এসোসিয়েশন
শিবপুর সাহিত্য-সংসদ
জীরাট পল্লী-সমাজ, বলাগড়
জগদ্বল্লভপুর সাহিত্য-সমিতি

বর্দ্ধমান

বর্দ্ধমান শাখা-পরিষৎ
কালনা শাখা-পরিষৎ

বাঁকুড়া

বাঁকুড়া শাখা-পরিষৎ
টানাদীঘি সারস্বত-লাইব্রেরী

বিহার

প্রবাসী বঙ্গবাসী-সংঘ, বাঁকীপুর
ঐ ঐ মুঙ্গের
ভাগলপুর শাখা-পরিষৎ

মালদহ

সাহিত্য-সভা
জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ
সাহিত্য-সংসদ, কলিগ্রাম

রাজসাহী

বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতি
রাজসাহী শাখা-পরিষৎ
P.M.Public Library, Naogaon

জলপাইগুড়ী

যমগ্রাম বীণাপাণি-লাইব্রেরী, বাউরা
উপনচৌকীপল্লী সাহিত্য-সমিতি, ঐ

পাবনা

পাবনা শাখা-পরিষৎ
সাঁকরাইল সারদাচরণ ফ্রি-পাবলিক-লাইব্রেরী
এবং বিদ্যোৎসাহিনী-সমিতি, হরিপুর

রঙ্গপুর

রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ
বেলপুকুর পল্লী-পরিষৎ, শ্যামগঞ্জ
কমলা-পাঠাগার, নাওডাঙ্গা

মুর্শিদাবাদ

বহরমপুর শাখা-পরিষৎ
আশুতোষ লিটারারি সোসাইটি, নিমতিতা

ঢাকা

পূর্ব্ববঙ্গ সারস্বত-সমাজ
ঢাকা সাহিত্য-পরিষৎ

ফরিদপুর

কোহিনূর-সমিতি, পাংশা
প্রসন্নকুমার লাইব্রেরী— হাবাসপুর

যশোহর

যশোহর বার-এসোসিয়েশন
ব্রাহ্ম ণডাঙ্গা অমরাবতী লাইব্রেরী রায়গ্রাম

অন্যান্য স্থান

বীরভূম অনুসন্ধান-সমিতি, হেতমপুর
মেদিনীপুর সাহিত্য-সমাজ
কুমারখালি সাহিত্য-সম্মিলনী
বরিশাল শাখা-পরিষৎ
চট্টগ্রাম শাখা-পরিষৎ
বগুড়া পরিষৎ-শাখা
কামরূপ অনুসন্ধান-সমিতি
কাছাড় অনুসন্ধান-সমিতি
অষ্টগ্রাম সুনীতি-সঞ্চারিণী-সভা (কুমিল্লা)

"চ" পরিশিষ্ট

সম্মিলনে বিদেশাগত প্রতিনিধি ও দর্শকগণের তালিকা

শ্রীযুক্ত	অক্ষয়কুমার দে	পাবনা	শ্রীযুক্ত	অনুকূলচন্দ্র বর্ম্মা	ঐ
,,	অক্ষয়কুমার বড়াল	কলিকাতা	,,	অনুকূল চন্দ্র সরকার	ঐ
,,	অক্ষয়কুমার সরকার	হাওড়া	,,	অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	হাওড়া
,,	অক্ষয়কুমার সেন	ময়মনসিংহ	,,	অন্নদাপ্রসাদ দত্ত	কলিকাতা
,,	অক্ষয়চন্দ্র সরকার	চুঁচুড়া	,,	অবতারচন্দ্র লাহা	কলিকাতা
,,	অকিঞ্চন দাস	কলিকাতা	,,	অবনীকান্ত সেন	ঐ
,,	অখিলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	ঐ	,,	অবনীনাথ পণ্ডিত	পাবনা
,,	অঘোরনাথ ঘোষ	ঐ	,,	অবিনাশচন্দ্র দাস	আজিমগঞ্জ
,,	অঘোরনাথ সাহা	দাঁইহাট	,,	অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	এলাহাবাদ
,,	অঘোরনাথ দত্ত	কলিকাতা			
,,	অচ্যুতচন্দ্র সরকার	চুঁচুড়া	,,	অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	ময়মনসিংহ
,,	অজয় কুমার বড়াল	কলিকাতা	,,	অবিনাশচন্দ্র সরকার	কলিকাতা
,,	অজয়চন্দ্র সরকার	চুঁচুড়া	,,	অবিনাশচন্দ্র সান্ন্যাল	ময়মনসিংহ
,,	অতুলকিঙ্কর দত্ত	কলিকাতা	,,	অজয়নাথ পাল	কলিকাতা
,,	অতুলকৃষ্ণ দত্ত	ঐ	,,	অভয়াপদ বন্দ্যোপাধ্যায়	নদীয়া
,,	অতুলকৃষ্ণ সিংহ	হাওড়া	,,	অমরনাথ দাস	কলিকাতা
,,	অতুলচন্দ্র দত্ত	কলিকাতা	,,	অমরনাথ কুণ্ডু	পাংশা
,,	অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়,	শিবপুর	,,	অমরনাথ সিংহ	ময়মনসিংহ
,,	অনঙ্গরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়,	কলিকাতা	,,	অমরেন্দ্রনাথ আচার্য্য	ঢাকা
,,	কুমার অনাথকৃষ্ণ দেব	ঐ	,,	অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়,	উত্তরপাড়া
,,	অনাথবন্ধু কর্ম্মকার	ঐ	,,	অমরেন্দ্রনাথ বসু	কলিকাতা
,,	অনাদিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়	ঐ	,,	অমূল্যচরণ ভট্টাচার্য্য	দামুন্যা
,,	অনিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	ঐ	,,	অমূল্যচন্দ্র দত্ত	কলিকাতা
,,	অনুকূলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	ঐ	,,	অমূল্যধন ভট্টাচার্য্য	বৈদ্যপুর
,,	অনুকূলচন্দ্র দাস	ঐ	,,	অমূল্যনাথ মুখোপাধ্যায়,	ভবানীপুর

শ্রীযুক্ত অমূল্যরতন চট্টোপাধ্যায়, পুরুলিয়া
,, অমৃতলাল হাজরা উলুবেড়িয়া
,, অম্বিকাচরণ চৌধুরী পাবনা
,, অরুণকান্ত স্মৃতিতীর্থ যশোহর
,, অশ্বিনীকুমার আচার্য্য বগুড়া
,, অশ্বিনীকুমার দত্ত ত্রিপুরা
,, অশ্বিনীকুমার পালিত দেবগ্রাম
,, অশ্বিনীকুমার বটব্যাল মাথরুন
,, অশ্বিনীকুমার সেন সেনহাটি
,, অসিতকুমার হালদার, শান্তিনিকেতন
,, আনন্দনাথ রায় ঢাকা
,, আনন্দরাম চৌধুরী গৌহাটী
,, মৌঃ আফাজদ্দীন মহম্মদ কুষ্ঠিয়া
,, আবদুল করিম চট্টগ্রাম
,, ডাঃ আবদুল গফুর ২৪-পরগণা
,, আবদুল গণি মালদহ
,, আবদুল মলাম চট্টগ্রাম
,, আবদুল মজিদ জলপাইগুড়ি
,, আবদুলহোসেন চৌধুরী বেলপুকুর
,, আশুতোষ কুণ্ডু পাংশা
,, আশুতোষ চক্রবর্ত্তী নিমতিতা
,, আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় বাঁকীপুর
,, আশুতোষ চৌধুরী মালদহ
,, আশুতোষ দাসগুপ্ত কলিকাতা
,, আশুতোষ দাশগুপ্ত মহলানবীশ শিবপুর
,, আশুতোষ দাস ঘোষ কলিকাতা
,, আশুতোষ বর্ম্মা জেমো
,, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, কামদেবপর

শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুন্সী নিমতিতা
,, আশুতোষ রায় কাশী
,, আশুতোষ শাস্ত্রী কলিকাতা
,, ইন্দ্রভূষণ বিশ্বাস বাঁকীপুর
,, ইন্দ্রনারায়ণ ঘোষ ভাগলপুর
,, ঈশ্বরচন্দ্র গুহ ময়মনসিংহ
,, উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ ঢাকা
,, উপেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ঐ
,, উপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, চন্দননগর
,, উপেন্দ্রনাথ দত্ত সেনহাটি
,, উপেন্দ্রনাথ নাগ কালনা
,, উমেশচন্দ্র দাস শ্রীহট্ট
,, উমেশচন্দ্র মৈত্র রাজশাহী
,, কমলাকান্ত চৌধুরী গৌহাটী
,, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা
,, করালীচরণ রায় বরাকর
,, কানাইলাল বসু কলিকাতা
,, কামিনীনাথ রায় খরমপুর
,, কাজী আবদুল আমেদ ফরিদপুর
,, কার্ত্তিকচন্দ্র ঘোষ ভাগলপুর
,, কালিদাস বাগচি বহরমপুর
,, কালিদাস রায় উলিপুর
,, কালীমুদ্দীন সরকার, জলপাইগুড়ী
,, কালীকান্ত বিশ্বাস রঙ্গপুর
,, কালীকিঙ্কর কাব্যতীর্থ, কুলীনগ্রাম
,, কালীকিঙ্কর রায় চৌধুরী, কলিকাতা
,, কালীচরণ ত্রিবেদী পুরুলিয়া
,, কালীচরণ সেন গৌহাটী
,, কালীনারায়ণ ভট্টাচার্য্য হাওড়া

শ্রীযুক্ত কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, বহরমপুর
,, কালীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী ময়মনসিংহ
,, কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় চুঁচুড়া
,, কালীপ্রসন্ন সেন শ্রীরামপুর
,, কালীরঞ্জন লাহিড়ী মালদহ
,, কালীরঞ্জন লাহিড়ী গৌহাটী
,, কিরণচন্দ্র দত্ত কলিকাতা
,, কিরণচন্দ্র সেন বাঁকীপুর
,, কিশোরীমোহন চট্টোপাধ্যায় কলিকাতা
,, কিশোরীলাল কুণ্ডু কুমারখালি
,, কীর্ত্তি চন্দ্র দাস মালদহ
,, কুঞ্জবিহারী বসু ২৪-পরগণা
,, কুঞ্জলাল বসু কলিকাতা
,, কুমুদনাথ চট্টোপাধ্যায় ইচ্ছাপুর
,, কুমুদনাথ মল্লিক রাণাঘাট
,, কুমুদবন্ধু ভট্টাচার্য্য ময়মনসিংহ
,, কুমুদরঞ্জন মল্লিক মাথরুন
,, কুমুদিনীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় ঢাকা
,, কৃষ্ণকিঙ্কর রায়চৌধুরী কলিকাতা
,, কৃষ্ণকুমার চৌধুরী গৌহাটী
,, কৃষ্ণচন্দ্র মিত্র কলিকাতা
,, কৃষ্ণচরণ সরকার কলিগ্রাম
,, কৃষ্ণনাথ বসাক কলিকাতা
,, কৃষ্ণনাথ সেন দিনাজপুর
,, কৃষ্ণবিহারী ঘোষ ভাগলপুর
,, কৃষ্ণবিহারী চৌধুরী গোলাঘাট
,, কৃষ্ণলাল চট্টোপাধ্যায় চুঁচুড়া
,, কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, মতিহারী
,, কেদারনাথ মজুমদার, ময়মনসিংহ

শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার রাজসাহী
,, কেদারনাথ সেন ময়মনসিংহ
,, কেশবচন্দ্র বসু শ্রীরামপুর
,, কেশবলাল চৌধুরী ঐ
,, ক্ষিতীশচন্দ্র ঘোষ কলিকাতা
,, ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মেদিনীপুর
,, ক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যশোহর
,, ক্ষিতীশচন্দ্র ঠাকুর রাজশাহী
,, ক্ষীরোদনারায়ণ ভূঞা ভবানীপুর
,, ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, কলিকাতা
,, ক্ষেত্রদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, হাবসপুর
,, ক্ষেত্রনাথ পুরকায়স্থ কলিকাতা
,, ক্ষেত্রনাথ সেনগুপ্ত ধানবাদ
,, ক্ষেত্রমোহন ঘোষ কলিকাতা
,, খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা
,, খগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভাগলপুর
,, খগেন্দ্রনাথ বসু কলিকাতা
,, খগেন্দ্রনাথ মিত্র কলিকাতা
,, গঙ্গাচরণ ধর চুঁচুড়া
,, গঙ্গাচরণ সেন গোয়ালপাড়া
,, গঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষ বহরমপুর
,, গণদেব গঙ্গোপাধ্যায় কলিকাতা
,, গণপতি রায় ঐ
,, গিরিগোবর্দ্ধন মুখোপাধ্যায়, মালদহ
,, গিরিজাকুমার বসু শিবপুর
,, গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়, রাণাঘাট
,, গিরিজা প্রসাদ বসু কলিকাতা
,, গিরিজাপ্রসন্ন সেন ঐ
,, গিরিজাভূষণ শেঠ ঐ

শ্রীযুক্ত	গিরিজামোহন সান্ন্যাল	রাজশাহী	শ্রীযুক্ত	জগদীশ চট্টোপাধ্যায়, ময়মনসিংহ	
,,	গিরীন্দ্রনাথ সেন	কলিকাতা	,,	জগদীশ বর্ম্মা	জেমো
,,	গিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	ময়মনসিংহ	,,	জগদীশ বাজপেয়ী	কান্দি
,,	গুণালঙ্কার মহাস্থবির	কলিকাতা	,,	জগদ্বন্ধু মোদক	কলিকাতা
,,	গুরুদাস দত্ত	হাওড়া	,,	মৌঃ জমীরুদ্দীন	নদীয়া
,,	গুরুদাস সরকার	রাণাঘাট	,,	জলধর সেন	কলিকাতা
,,	গোকুলচন্দ্র শীল	চুঁচুড়া	,,	জানকীনাথ বসু	ঐ
,,	গোপালচন্দ্র ঘোষ	রঙ্গপুর	,,	মৌঃ জান মহম্মদ	ফরিদপুর
,,	গোপালচন্দ্র সরকার	বগুড়া	,,	জিতেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	নদীয়া
,,	গোপেন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কাশী		,,	জিতেন্দ্রনাথ গুপ্ত	বাঁকীপুর
,,	গোপেশ্বর সিংহ	জেমো	,,	জিতেন্দ্রনাথ ঘোষ	কলিকাতা
,,	গোবর্দ্ধন মজুমদার	কলিকাতা	,,	জিতেন্দ্রনাথ মিত্র	বৈদ্যপুর
,,	গোলোকেন্দ্রনাথ দে	পাবনা	,,	জিতেন্দ্রনাথ রায়	কলিকাতা
,,	গোষ্ঠবিহারী কুণ্ডু	কলিকাতা	,,	জিতেন্দ্রমোহন দত্ত	মালদহ
,,	গৌরহরি সেন	কলিকাতা	,,	জীবনকান্ত দাস	গৌহাটী
,,	চণ্ডীচরণ দাস	মালদহ	,,	জীবনকৃষ্ণ গাঙ্গুলী	মালদহ
,,	চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	নদীয়া	,,	জীবানন্দ প্রামাণিক	শান্তিপুর
,,	চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়,কলিকাতা		,,	জে এন মিত্র	আড়িয়াদহ
,,	চন্দ্রনাথ চৌধুরী	রাজশাহী	,,	জ্যোতিঃপ্রসাদ সিংহ	কাটোয়া
,,	চন্দ্রনাথ শর্ম্মা	গৌহাটী	,,	জ্ঞানচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়,ময়মনসিংহ	
,,	চন্দ্রভূষণ শর্ম্মা মণ্ডল	শ্রীবাটী	,,	জ্ঞানদা প্রসাদ ত্রিবেদী	কান্দি
,,	চন্দ্রশেখর সেন	চট্টগ্রাম	,,	জ্ঞানেন্দ্রকুমার বসু	কলিকাতা
,,	চারুচন্দ্র বসু	ভাগলপুর	,,	জ্ঞানেন্দ্রকৃষ্ণ কাব্যরত্ন	ঐ
,,	চারুচন্দ্র মিত্র	কলিকাতা	,,	জ্ঞানেন্দ্রনাথ কোঁয়ার	কলিকাতা
,,	চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়,গোবরডাঙা		,,	জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ	ঐ
,,	চারুচন্দ্র সেন	মেদিনীপুর	,,	জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়,মেদিনীপুর	
,,	ডাঃ চুনীলাল বসু	কলিকাতা	,,	জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাস	কলিকাতা
,,	জগদিন্দু রায়	শ্রীরামপুর	,,	জ্ঞানেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,হাওড়া	
,,	মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ রায়, নাটোর		,,	জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু	কলিকাতা

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী, নিমতিতা
,, জ্ঞানেন্দ্র শশী গুপ্ত নবাবগঞ্জ
,, তারক চন্দ্র মিত্র কলিকাতা
,, তারকনাথ বিশ্বাস জলপাইগুড়ী
,, তারাপ্রসন্ন বিদ্যাবিনোদ,বেলেঘাটা
,, তারাপদ মুখোপাধ্যায়, বহরমপুর
,, তীর্থবাসী সিংহ রায় হুগলী
,, ত্রিপুরাচরণ চৌধুরী চট্টগ্রাম
,, দক্ষিণারঞ্জন ঘোষ সিউড়ী
,, দাশরথি ঘোষ চুঁচুড়া
,, দিগেন্দ্রচন্দ্র ঘটক ময়মনসিংহ
,, দীননাথ ধর ঐ
,, দীননাথ মুখোপাধ্যায়, ময়মনসিংহ
,, দীননাথ সেন ঐ
,, দীনেশচন্দ্র সেন কলিকাতা
,, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বাঁকীপুর
,, দুর্গাদাস রায় ভাগলপুর
,, দুর্গাদাস রায় পাবনা
,, দুর্গাদাস রায় ময়মনসিংহ
,, দুর্গাপদ চৌধুরী কলিকাতা
,, দুর্গাপ্রসাদ রায় বগুড়া
,, দুর্গেশনাথ ভট্টাচার্য্য মুর্শিদাবাদ
,, দুলালচন্দ্র মিত্র কলিকাতা
,, দেবকুমার রায়চৌধুরী বরিশাল
,, দেবপ্রসাদ সরকার কলিকাতা
,, দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী ঐ
,, দেবপ্রসাদ সান্যাল কলিকাতা
,, দেবেন্দ্রকুমার সরকার ময়মনসিংহ
,, দেবেন্দ্রকুমার সরকার মালদহ

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রচন্দ্র দত্ত মালদহ
,, দেবেন্দ্রনাথ ইন্দু কলিকাতা
,, দেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী বীরভূম
,, দেবেন্দ্রনাথ দাস কলিকাতা
,, দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পুরুলিয়া
,, দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা
,, দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বহরমপুর
,, দেবেন্দ্রনাথ রায় পাবনা
,, দেবেন্দ্রনারায়ণ রায় জেমো
,, দেবেশচন্দ্র পাকড়াশী পাবনা
,, দ্বিজেন্দ্রনাথ দাস কলিকাতা
,, দ্বিজেন্দ্রনাথ পাল ঐ
,, দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র ঐ
,, দ্বিজেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী বড়িশা
,, দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগ্‌চি কলিকাতা
,, দ্বিজেন্দ্রমোহন দত্ত দিনাজপুর
,, মৌঃ দৌলত আহম্মদ ত্রিপুরা
,, ধাত্রীদাস ঘোষাল ফরিদপুর
,, ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ কলিকাতা
,, ধীরেন্দ্রমোহন ঘটক বগুড়া
,, ধ্রুবকুমার পাল শিবপুর
,, নকুলেশ্বর দত্ত কলিকাতা
,, নগেন্দ্রচন্দ্র দত্ত চট্টগ্রাম
,, নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, বোলপুর
,, নগেন্দ্রনাথ দাস কলিকাতা
,, নগেন্দ্রনাথ ধর হুগলী
,, নগেন্দ্রনাথ বসু কলিকাতা
,, নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব কলিকাতা

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ
,, নগেন্দ্রনাথ মজুমদার কলিকাতা
,, নগেন্দ্রনাথ সরকার বগুড়া
,, নগেন্দ্রনাথ সেন খুলনা
,, নগেন্দ্রনাথ সোম কলিকাতা
,, নন্দগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ
,, নবকিশোর মজুমদার মালদহ
,, মৌঃ নবিরদ্দি মহম্মদ, জলপাইগুড়ি
,, নরেন্দ্রনাথ দত্ত কলিকাতা
,, নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ময়মনসিংহ
,, নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়,কলিকাতা
,, নরেন্দ্রনাথ সেন বাঁকীপুর
,, নরেশচন্দ্র মিত্র কলিকাতা
,, নলিনচন্দ্র গাঙ্গুলি ঐ
,, নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য ঐ
,, ননিলীকান্ত বিশ্বাস ঐ
,, নলিনীকান্ত ভট্টশালী ঢাকা
,, নলিনীমোহন রায় চৌধুরী, রঙ্গপুর
,, নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত কলিকাতা
,, নারায়ণচন্দ্র ঘোষ ঐ
,, নারায়ণচন্দ্র মজুমদার হাওড়া
,, নিকুঞ্জবিহারী দাস শ্রীহট্ট
,, নিখিলনাথ মৈত্র কলিকাতা
,, নিখিলনাথ রায় এখোরা
,, নিত্যগোপাল সাহা পাবনা
,, নিত্যলাল দাস কলিকাতা
,, নিত্যানন্দ ঘোষ বাঁকীপুর
,, নিত্যানন্দ রায় কলিকাতা
,, নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত বরিশাল

শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কলিকাতা
,, নির্ম্মলচন্দ্র দাশগুপ্ত ঐ
,, নির্ম্মলচন্দ্র দাশগুপ্ত বাঁকীপুর
,, নির্ম্মলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মালদহ
,, নির্ম্মলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ
,, নির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়, লাভপুর
,, নীলকমল ত্রিবেদী জেমো
,, নীলকান্ত রায় যশোহর
,, নৃপেন্দ্রকুমার দত্ত চুঁচুড়া
,, নৃপেন্দ্রনাথ বসু মুর্শিদাবাদ
,, পঞ্চানন পাল বরাহনগর
,, পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা
,, পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য বড়বেলুন
,, পতাকিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পাণিহাটি
,, পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য গৌহাটি
,, পরেশনাথ বসু কলিকাতা
,, পরেশলাল সোম ঐ
,, পশুপতি ঘোষ ঐ
,, পশুপতি চট্টোপাধ্যায় ঐ
,, পশুপতি দে পাংশা
,, পশুপতি মুখোপাধ্যায় কলিকাতা
,, পাঁচকড়ি সরকার ঐ
,, পান্নালাল মুখোপাধ্যায় ঐ
,, পার্ব্বতীচরণ ভট্টাচার্য্য বগুড়া
,, পুলিনবিহারী দত্ত কলিকাতা
,, পুলিনবিহারী মাকড় রামপুরহাট
,, পূর্ণচন্দ্র গোস্বামী গৌহাটি
,, পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচায্য মেমারী

শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ময়মনসিংহ
,, পূর্ণচন্দ্র রায় কলিকাতা
,, পূর্ণচন্দ্র সিংহ বাঁকীপুর
,, পূর্ণচন্দ্র সিংহ দিনাজপুর
,, পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ বাঁকীপুর
,, প্রতাপচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বরিশাল
,, প্রতাপচন্দ্র সেনগুপ্ত রঙ্গপুর
,, প্রতাপেন্দ্র পাঁড়ে পাকুড়
,, ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র রায় কলিকাতা
,, প্রফুল্লনাথ ঠাকুর ঐ
,, প্রফুল্লনাথ সাহা পাবনা
,, প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়,কলিকাতা
,, প্রবোধচন্দ্র মল্লিক ঐ
,, প্রভাতচন্দ্র কুণ্ডু বেলপুকুর
,, প্রভাসচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়,কলিকাতা
,, প্রভাসচন্দ্র বসু ঐ
,, প্রভাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায়,বরাহনগর
,, প্রভাসচন্দ্র সেন চট্টগ্রাম
,, প্রমথকুমার কুণ্ডু হাবাসপুর
,, প্রমথনাথ তর্কভূষণ কলিকাতা
,, প্রমথনাথ দত্ত ঐ
,, প্রমথনাথ রায়চৌধুরী, কলিকাতা
,, প্রমথনাথ সান্ন্যাল হাওড়া
,, প্রমথনাথ সেন ভবানীপুর
,, প্রসন্নকুমার রাহা মালদহ
,, প্রসন্নকুমার সেন চট্টগ্রাম
,, প্রসন্ননারায়ণ চৌধুরী পাবনা
,, প্রিয়কুমার চট্টোপাধ্যায়, মতিহারী
,, প্রিয়নাথ কুণ্ডু পাংশা

শ্রীযুক্ত ডাঃ প্রিয়নাথ নন্দী কলিকাতা
,, প্রিয়নাথ দে ঐ
,, প্রিয়নাথ সেন মেদিনীপুর
,, ফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কলিকাতা
,, ফকিরচাঁদ রায় জগদ্বল্লভপুর
,, ফণীন্দ্রনাথ দে ঐ
,, ফণীন্দ্রনাথ পাল ঐ
,, ফণীন্দ্রনাথ বর্ম্মন্ ঐ
,, বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র কলিকাতা
,, বঙ্কুবিহারী পণ্ডিত চুঁচুড়া
,, বরদাকান্ত মজুমদার কলিকাতা
,, বরদারঞ্জন চক্রবর্ত্তী কুমিল্লা
,, বরেন্দ্রনাথ বসু কলিকাতা
,, বলাইচন্দ্র মিত্র ঐ
,, বসন্তকুমার দত্ত শিবপুর
,, বসন্তকুমার বসু কলিকাতা
,, বসন্তকুমার লাহিড়ী বেলপুকুর
,, বসন্তরঞ্জন রায় কলিকাতা
,, বাণীনাথ নন্দী ঐ
,, বামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় ঐ
,, বামাচরণ বসু বহরমপুর
,, বামাচরণ মজুমদার কলিকাতা
,, বারাণসী চট্টোপাধ্যায় নদীয়া
,, বিজয়কান্ত গঙ্গোপাধ্যায়, ময়মনসিংহ
,, বিজয়কুমার চক্রবর্ত্তী কলিকাতা
,, বিজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ
,, বিজয়কুমার বর্ম্মন জগদ্বল্লভপুর
,, বিজয়কুমার বর্ম্মন রায় ত্রিপুরা
,, বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ কলিকাতা

শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়,২৪পরগণা
,, বিজয়কৃষ্ণ মৈত্র নিমতিতা
,, বিজয়কৃষ্ণ শাস্ত্রী কলিকাতা
,, বিজয়চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়,কলিকাতা
,, বিজয়নারায়ণ আচার্য্য,ময়মনসিংহ
,, বিজয়ভূষণ ঘোষ ঘাটেশ্বর
,, বিজয়লাল দত্ত কলিকাতা
,, বিজয়কান্ত লাহিড়ী ময়মনসিংহ
,, বিধুভূষণ সেনগুপ্ত কৃষ্ণনগর
,, বিপিনবিহারী গুপ্ত কলিকাতা
,, বিপিনবিহারী গোস্বামী, রাজসাহী
,, বিপিনবিহারী নন্দী চট্টগ্রাম
,, বিপিনবিহারী পাইন কলিকাতা
,, বিপিনবিহারী ভড় শ্রীরামপুর
,, বিভূতিপদ চট্টোপাধ্যায়,কলিকাতা
,, বিভূতিভূষণ বসু বহরমপুর
,, বিভূতিভূষণ বসু উলুবেড়িয়া
,, বিভূতিভূষণ ভট্টাচার্য্য কৃষ্ণনগর
,, বিভূতি ভূষণ মজুমদার নদীয়া
,, বিভূতি ভূষণ মিত্র পাতুন
,, বিমলকান্তি ঘোষ কলিকাতা
,, বিশ্বরাজ ধন্বন্তরী কানপুর
,, বিশ্বানন্দ রায় কলিকাতা
,, বিশ্বেশ্বর দাস শান্তিপুর
,, বিশ্বেশ্বর রায় বহরমপুর
,, বিষ্ণুপদ ঘোষ হাওড়া
,, বিষ্ণুরাম বন্দ্যোপাধ্যায়, কাটোয়া
,, বিহারীলাল সরকার কলিকাতা
,, বীরেন্দ্র চক্রবর্ত্তী চট্টগ্রাম

শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর সেন কৃষ্ণনগর
,, বীরেশ্বর সেন কটক
,, বেণীমাধব চক্রবর্ত্তী কলিকাতা
,, বৈকুণ্ঠনাথ বসু ঐ
,, বৈকুণ্ঠনাথ সেন বহরমপুর
,, বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় বাঁকুড়া
,, ব্যোমকেশ মুস্তফী কলিকাতা
,, ব্রজনাথ চন্দ্র মেদিনীপুর
,, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, হুগলী
,, ব্রজবল্লভ রায় চুঁচুড়া
,, ব্রজেন্দ্রনাথ দত্ত কলিকাতা
,, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় হুগলী
,, ভবতারণ সাংখ্য-তন্ত্ররত্ন পাতুন
,, ভবাণীচরণ ঘোষ বড়িষা
,, ভবেশচন্দ্র দেবশর্ম্মা পাবনা
,, ভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী বসিরহাট
,, ভুবনচন্দ্র কাব্যতীর্থ মেদিনীপুর
,, ডাঃ ভুবনমোহন গঙ্গোপাধ্যায় কলিকাতা
,, ভুবনমোহন চট্টোপাধ্যায়, বাঁকীপুর
,, ভূতনাথ চৌধুরী শ্রীরামপুর
,, ভূপতি মুখোপাধ্যায় ঝরিয়া
,, ভূপতি মুখোপাধ্যায় খুলনা
,, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত কলিকাতা
,, ভূপেন্দ্রনাথ বসু ঐ
,, ভৈরবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বীরভূম
,, ভোলানাথ ব্রহ্মচারী দেনুড়
,, ভোলানাথ মিত্র কলিকাতা
,, মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর

শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, কলিকাতা
,, মণীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ভাগলপুর
,, মণীন্দ্রনাথ ঘোষ কলিকাতা
,, মণীন্দ্রনাথ পাল ঐ
,, মতিলাল ইন্দু রাজশাহী
,, মথুরানাথ মজুমদার কলিকাতা
,, মথুরানাথ সিংহ বাঁকীপুর
,, মদেন্দ্রমোহন ঠাকুর মুর্শিদাবাদ
,, মনুজেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য ঢাকা
,, মনোমোহন চক্রবর্ত্তী রায়গ্রাম
,, মনোমোহন বসু কলিকাতা
,, মন্মথনাথ ঘোষ খুলনা
,, মন্মথনাথ ঘোষ যশোহর
,, মন্মথনাথ দত্ত বহরামপুর
,, মন্মথনাথ দে বাঁকীপুর
,, মন্মথনাথ মজুমদার পাবনা
,, মন্মথনাথ রায় চুপী
,, মন্মথনাথ রায় বরাকর
,, মৌঃ মহম্মদ মজাম্মল হক্, শান্তিপুর
,, মহানন্দ ব্রহ্মচারী পাতুন
,, মহিমচন্দ্র ঠাকুর ত্রিপুরা
,, মহেন্দ্রচন্দ্র দাস শ্রীহট্ট
,, মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত চন্দননগর
,, মহেন্দ্রনাথ দত্ত ডায়মণ্ডহারবার
,, মহেন্দ্রনাথ দাস মেদিনীপুর
,, মহেন্দ্রনাথ তত্ত্বনিধি, ডায়মণ্ডহারবার
,, মহেশচন্দ্র আতর্থী কলিকাতা
,, মহেশচন্দ্র দাস চট্টগ্রাম
,, মাখনলাল সেন কলিকাতা

শ্রীযুক্ত মিহিরনাথ রায় বাঁকীপুর
,, মৃত্যুঞ্জয় রায়চৌধুরী রঙ্গপুর
,, মৃণালকান্তি ঘোষ কলিকাতা
,, মোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য বগুড়া
,, মোক্ষদারঞ্জন রায় চট্টগ্রাম
,, মোহান্ত বলদেব মন্তগীর, মালদহ
,, মোহান্ত ভোগুলি দাস, মুর্শিদাবাদ
,, মোহিনীনাথ শর্ম্মা রাজশাহী
,, যজ্ঞেশ্বর চট্টোপাধ্যায় মালদহ
,, যতীন্দ্রনাথ ঘোষ কলিকাতা
,, যতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ঐ
,, যতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় দেবগ্রাম
,, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, কলিকাতা
,, যতীন্দ্রনাথ মল্লিক ঐ
,, যতীন্দ্রনাথ দাস ঐ
,, যতীন্দ্রনাথ সেন চট্টগ্রাম
,, যতীন্দ্রমোহন চৌধুরী চুঁচুড়া
,, যতীন্দ্রমোহন রায় কলিকাতা
,, যতীন্দ্রমোহন রায় বগুড়া
,, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত সেনহাটি
,, যতীশচন্দ্র ঘোষ ভবানীপুর
,, যতীশচন্দ্র মিত্র কলিকাতা
,, যতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ঐ
,, যদুনাথ মজুমদার যশোহর
,, যদুনাথ সরকার চুঁচুড়া
,, যাদবগোবিন্দ রায় কলিকাতা
,, যাদবেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রাঁচি
,, যামিনীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়, কলিকাতা

শ্রীযুক্ত যামিনীকান্ত লাহিড়ী ময়মনসিংহ
,, যোগীন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দিনাজপুর
,, যোগীন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী বগুড়া
,, যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার বাঁকীপুর
,, যোগেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ঢাকা
,, যোগেশচন্দ্র রায় কটক
,, যোগেন্দ্রচন্দ্র সিংহ মেদিনীপুর
,, যোগেন্দ্রনাথ মিত্র কলিকাতা
,, যোগেশচন্দ্র দাসগুপ্ত ঢাকা
,, যোগেশচন্দ্র সান্ন্যাল কুমারখালি
,, যোগেশচন্দ্র সিংহ ভাগলপুর
,, যোগেশচন্দ্র সেন মজঃফরপুর
,, রঘুনাথ চৌধুরী গৌহাটী
,, রজনীকান্ত ত্রিবেদী কান্দি
,, রজনীকান্ত বিদ্যাবিনোদ, কলিকাতা
,, রজনীকান্ত ভৌমিক নোয়াখালি
,, রজনীকান্ত সান্ন্যাল শ্যামগঞ্জ
,, রত্নকান্ত চট্টোপাধ্যায় গৌহাটি
,, রবীন্দ্রকুমার বসু কলিকাতা
,, রমণীকান্ত সেন বাঁকীপুর
,, রমণীমোহন ঘোষ কলিকাতা
,, রমণীমোহন চক্রবর্ত্তী মালদহ
,, রমণীমোহন সেন বহরমপুর
,, রমণীমোহন সেনগুপ্ত চট্টগ্রাম
,, রমণীরঞ্জন চৌধুরী ঐ
,, রমণীরঞ্জন সেন ঐ
,, রমণেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কলিকাতা
,, রমাপতি ত্রিবেদী জেমো
,, রমাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা

শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় বগুড়া
,, রমাপ্রসাদ চন্দ রাজসাহী
,, রমেশচন্দ্র ঘোষ
,, রমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মালদহ
,, রমেশচন্দ্র দত্ত শ্রীহট্ট
,, রমেশচন্দ্র মজুমদার কলিকাতা
,, রমেশচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ বড়বেলুন
,, রসময় লাহা কলিকাতা
,, রাইকিশোর প্রামাণিক মালদহ
,, রাখালচন্দ্র মল্লিক কলিকাতা
,, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ
,, রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, লক্ষ্মীপাশা
,, রাজকুমার বেদতীর্থ কৈকালা
,, রাজমোহন রায় বাঁকীপুর
,, রাজরাজেন্দ্র চন্দ্র শ্রীবাটী
,, রাজেন্দ্রকুমার সেন ময়মনসিংহ
,, রাজেন্দ্রনাথ রায় ২৪পরগণা
,, রাধাচরণ দাস পাবনা
,, রাধানাথ মিত্র কলিকাতা
,, রাধাবল্লভ জ্যোতিষতীর্থ ঐ
,, রামকমল সিংহ ঐ
,, রামগতি মুখোপাধ্যায় ঐ
,, রামচন্দ্র নাগ জিরাট
,, রামচন্দ্র রায় পাবনা
,, রামতারণ মুখোপাধ্যায়, রাজসাহী
,, রামরতন সরকার হুগলী
,, রামরাখাল ঘোষ কলিকাতা
,, রামলাল সিংহ বাঁকীপুর
,, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় কলিকাতা

শ্রীযুক্ত	রামেশ্বর সেন	বরিশাল
,,	রাসবিহারী ঘোষ	ফরিদপুর
,,	রাসবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়	বালী
,,	রেবতীমোহন সরকার	চট্টগ্রাম
,,	মৌঃ রৌশনআলি চৌধুরী	পাংশা
,,	ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়,	কলিকাতা
,,	ললিতচন্দ্র মিত্র	ঐ
,,	ললিতচন্দ্র রায়চৌধুরী,	২৪পরগণা
,,	ললিতমোহন বাগ্‌চি	মুর্শিদাবাদ
,,	ললিতমোহন দে	কলিকাতা
,,	ললিতকুমার সরকার	ঐ
,,	শচীন্দ্রনাথ ঘোষ	বাঁকীপুর
,,	শচীন্দ্রনাথ বসু	ঐ
,,	শচীন্দ্রমোহন ঘোষ	রায়গ্রাম
,,	শচীপতি চট্টোপাধ্যায়	বীরভূম
,,	শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	পাবনা
,,	শম্ভুনাথ সরকার	বীরভূম
,,	শম্ভুনাথ সরকার	বহরমপুর
,,	শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী	ফরিদপুর
,,	শরচ্চন্দ্র চম্পটি	বরাহনগর
,,	শরচ্চন্দ্র দত্ত	কলিকাতা
,,	শরচ্চন্দ্র দাস	মালদহ
,,	শরচ্চন্দ্র পণ্ডিত	জঙ্গিপুর
,,	শরচ্চন্দ্র পুরকায়েত	২৪পরগণা
,,	শরচ্চন্দ্র মিত্র	কলিকাতা
,,	শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী	ঐ
,,	শরৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়,	বাঁকীপুর
,,	শরৎকুমার লাহিড়ী	বেলপুকুর
,,	শশধর বিদ্যাভূষণ	লোহাগড়া
,,	শশাঙ্কমোহন সেন	চট্টগ্রাম
শ্রীযুক্ত	শশিভূষণ মিত্র	বীরভূম
,,	শান্তকুমার পাল	বরাহনগর
,,	শান্তিচরণ বিশ্বাস	হুগলী
,,	শিবরাম গোস্বামী	পুটশুড়ী
,,	শিবেন্দুনারায়ণ রায়	জেমো
,,	শিশিরকুমার মৈত্র	কলিকাতা
,,	শীতলচন্দ্র রায়	যশোহর
,,	শৈলেন্দ্রকুমার বসু	কলিকাতা
,,	শৈলেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়,	চট্টগ্রাম
,,	শৈলেশ্বর সেন	কলিকাতা
,,	শ্যামরতন চট্টোপাধ্যায়,	কলিকাতা
,,	শ্যামলাল কুণ্ডু	ফরিদপুর
,,	শ্যামাচরণ সেন	চট্টগ্রাম
,,	শ্যামপদ রায়	জঙ্গিপুর
,,	শ্রীকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়	বহরমপুর
,,	শ্রীপদ বসু	কলিকাতা
,,	শ্রীরাম মৈত্রেয়	বলিহার
,,	শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	কলিকাতা
,,	শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	চট্টগ্রাম
,,	শ্রীশচন্দ্র দাস	বাঁকুড়া
,,	শ্রীশচন্দ্র নাইয়া	২৪ পরগণা
,,	শ্রীশচন্দ্র সিংহ	ঐ
,,	সঞ্জীবচন্দ্র লাহিড়ী	পাবনা
,,	সতীনাথ মিশ্র	কলিকাতা
,,	সতীন্দ্রসেবক নন্দী	কলিকাতা
,,	সতীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়	চকদিঘী
,,	সতীশচন্দ্র চৌধুরী	ময়মনসিংহ
,,	সতীশচন্দ্র দাস	কলিকাতা
,,	সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত	বরিশাল

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র নিয়োগী	বগুড়া	শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার বসু	কলিকাতা
,, সতীশচন্দ্র বসু	পাতুন	,, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়	ঐ
,, সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ	কলিকাতা	,, সুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	ঐ
,, সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	২৪পরগণা	,, সুরেন্দ্রকুমার সেন	দিনাজপুর
,, সতীশচন্দ্র মিত্র	কলিকাতা	,, সুরেন্দ্রচন্দ্র বক্‌সী	বগুড়া
,, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়,	কলিকাতা	,, সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	গৌহাটী
,, সতীশচন্দ্র রায়	পাবনা	,, সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়,	জলপাইগুড়ী
,, সতীশচন্দ্র সেনগুপ্ত	হুগলী	,, সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস	মেদিনীপুর
,, সত্যচরণ সেনগুপ্ত	রাণাঘাট	,, সুরেন্দ্রনাথ রায়	মুর্শিদাবাদ
,, সত্যচরণ সেনগুপ্ত	কলিকাতা	,, সুরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী	রঙ্গপুর
,, সত্যশরণ মুখোপাধ্যায়	গুস্তিয়া	,, সুরেন্দ্রনাথ সেন	মজঃফরপুর
,, সত্যেন্দ্রনাথ বসু	মেদিনীপুর	,, সুরেন্দ্রপ্রসাদ লাহিড়ী,	ময়মনসিংহ
,, সন্তোষকুমার ঘোষ	কলিকাতা	,, সুরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষাল	বগুড়া
,, সরোজকুমার মুখোপাধ্যায়	ঐ	,, সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	মালদহ
,, সরোজনাথ ঘোষ	ঐ	,, সুরেশচন্দ্র চৌধুরী	বগুড়া
,, সর্ব্বেশ্বর শর্ম্মা	কালনা	,, সুরেশচন্দ্র দত্ত	কলিকাতা
,, সর্ব্বেশ্বর শর্ম্মা	গৌহাটী	,, সুরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত	ঐ
,, সারদাচরণ কাব্যতীর্থ	কলিকাতা	,, সুরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত	বগুড়া
,, সারদাচরণ মিত্র	ঐ	,, সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়,	বহরমপুর
,, সারস্বত ভট্টাচার্য্য	ময়মনসিংহ	,, সুরেশচন্দ্র বসু	হুগলী
,, সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়	মগরা	,, সুরেশচন্দ্র রায়	যশোহর
,, সিদ্ধেশ্বর শর্ম্মা	গৌহাটী	,, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি	কলিকাতা
,, সুকুমার চট্টোপাধ্যায়	কলিকাতা	,, সুশীলকুমার দত্ত	ঐ
,, সুখনলাল মিত্র	বরাহনগর	,, সুশীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	বগুড়া
,, সুখরঞ্জন রায়	ঢাকা	,, সুশীলচন্দ্র আচার্য্য	পাবনা
,, সুদর্শনচন্দ্র বিশ্বাস	ফরিদপুর	,, সূর্য্যকুমার ঘোষাল	কালিকাপুর
,, সুধাংশুমোহন মুখোপাধ্যায়	গৌহাটী	,, সূর্য্যকুমার চট্টোপাধ্যায়,	কলিকাতা
,, সুধীন্দ্রনাথ সেন	কলিকাতা	,, সূর্য্যকুমার পাল	ঐ
,, সুধীন্দ্রনাথ সেন	ঢাকা	,, সূর্য্যকুমার মুখোপাধ্যায়	কলিকাতা

শ্রীযুক্ত	সূর্য্যনারায়ণ ঘোষ	ঢাকা
,,	সূর্য্যলাল দত্ত	বাঁকুড়া
,,	সোমনাথ রায়	হুগলী
,,	সোমেশ্বর মুখোপাধ্যায়,	কলিকাতা
,,	মৌঃ হবিবুদ্দিআহম্মদ,	জলপাইগুড়ী
,,	হরকিঙ্কর টহলদার	কলিকাতা
,,	হরকিঙ্কর দাস	শ্রীহট্ট
,,	হরলাল দাশগুপ্ত	ভাগলপুর
,,	হরমোহন দত্ত	গৌহাটী
,,	হরমোহন দাস	ঐ
,,	হরলাল মজুমদার	কলিকাতা
,,	হরলাল মুখোপাধ্যায়	হাওড়া
,,	হরিদাস চট্টোপাধ্যায়	কলিকাতা
,,	হরিদাস ভট্টাচার্য্য	আগরতলা
,,	হরিদেব শাস্ত্রী	কলিকাতা
,,	হরিনাথ ঘোষ	পুরুলিয়া
,,	হরিপদ চক্রবর্ত্তী	কলিকাতা
,,	হরিপদ দাস	জেমো
,,	হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়	ঐ
,,	হরিপদ রায়	ঐ
,,	হরিপদ হালদার	২৪পরগণা
,,	হরিপ্রসাদ বসু	বোলপুর
,,	হরিশচন্দ্র দত্ত	চট্টগ্রাম
,,	হরিহর শেঠ	চন্দননগর

শ্রীযুক্ত	হরিহর ভট্টাচার্য্য	যশোহর
,,	হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়	হেতমপুর
,,	হারাণচন্দ্র মিত্র	বাঁকীপুর
,,	হারাণচন্দ্র রক্ষিত	মজিলপুর
,,	হৃদয়নাথ সাহা	কলিকাতা
,,	হৃদয়নাথ সাহা	বোলপুর
,,	হৃষিকেশ মজুমদার	কলিকাতা
,,	হৃষীকেশ মুস্তফী	ঐ
,,	হৃষীকেশ লাহিড়ী	রঙ্গপুর
,,	হেমচন্দ্র গোস্বামী	উজানবাজার
,,	হেমচন্দ্র ঘোষ	কলিকাতা
,,	হেমচন্দ্র দাস	মালদহ
,,	হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	কলিকাতা
,,	হেমচন্দ্র বসু	মুঙ্গের
,,	হেমচন্দ্র সেনগুপ্ত	কলিকাতা
,,	হেমচন্দ্র সেন এম্ এ	কলিকাতা
,,	। রায়	পাবনা
,,	হেমেন্দ্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরী	ময়মনসিংহ
,,	হেমেন্দ্রকুমার মজুমদার	কলিকাতা
,,	হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ	ঐ
,,	হেরম্বচন্দ্র ঘটক	ময়মনসিংহ
,,	হেরম্বনাথ কুণ্ডু	পাংশা

"ছ" পরিশিষ্ট

স্বেচ্ছাসেবকগণের কর্ম্মবিভাগ

১) রেলওয়ে-ষ্টেশন

সহকারী অধ্যক্ষ — শ্রী সুরেশচন্দ্র ঘোষ

অধিনায়ক — শ্রী বিনোদবিহারী চৌধুরী

শ্রী সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

স্বেচ্ছাসেবকগণ

১। শ্রীযুক্ত হরিপ্রসাদ বসু

২। ,, নীলমণিকুমার চট্টোপাধ্যায়

৩। ,, বঙ্কিমচন্দ্র ঘোষ

৪। ,, ক্ষিতীশচন্দ্র দাঁ

৫। ,, পঞ্চানন যশ

৬। ,, হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত

৭। ,, রবীন্দ্রনাথ সরকার

৮। ,, শরচ্চন্দ্র দে

৯। ,, সত্যপ্রসন্ন বসু

১০। ,, সাহাদৎ হোসেন

১১। ,, সুরথকুমার মজুমদার

১২। ,, নকুলচন্দ্র নন্দী

১৩। ,, প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ

১৪। ,, মহম্মদ আবদুল হক

১৫। ,, প্রফুল্লকুমার দে

১৬। ,, বিমলচন্দ্র মজুমদার

১৭। ,, অম্বিকানাথ রায়

১৮। ,, সনৎকুমার চৌধুরী

১৯। ,, অধীরনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

২০। ,, সন্তোষকুমার দাস

২১। ,, বলাইচাঁদ হালদার

২২। ,, সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

দ্বিচক্রযান-বাহী

২৩। শ্রীযুক্ত উমাকান্ত রায়

২৪। ,, নুরুল আফজার

২৫। ,, বীরেশ্বর মুখোপাধ্যায়

২৬। ,, কৃপানাথ নাগ

২) সভামণ্ডপ - স্বেচ্ছাসেবকগণ

১। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ শেঠ

২। ,, চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

৩। ,, ত্রিদশেশ্বর মিত্র

৪। ,, বীরেন্দ্রকুমার বসু

৫। ,, সুধাকর দত্ত

৬। ,, আমির উল্ ইস্‌লাম

৭। ,, জিতেন্দ্রনাথ মহান্তি

৮। ,, ইন্দুভূষণ বিশ্বাস

৩) কার্যালয় - স্বেচ্ছাসেবকগণ

১। শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ ঘোষ

২। ,, সূর্য্যনারায়ণ সরকার

৩। ,, শ্রীধর রায়

৪। ,, দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

৫। ,, শিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

৬। ,, সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

৭। ,, ভবেন্দ্রবিজয় ঘোষ

৮। ,, অতুলচন্দ্র রায়

দ্বিচক্রযান - বাহী

৯। শ্রী বলাইচাঁদ ভট্টাচার্য্য

৪) প্রদর্শনী

১। শ্রীযুক্ত গতিকৃষ্ণ রায় বি, এ
২। ,, সতীশচন্দ্র রায় বি, এ
৩। ,, দেবেন্দ্রনাথ সরকার বি, এ
৪। ,, সুরেশচন্দ্র দাস বি, এ
৫। ,, অনাথনাথ দাস বি, এস, সি
৬। ,, যতীন্দ্রনাথ বড়াল বি, এ
৭। ,, হেমচন্দ্র রায়
৮। ,, দুর্গাদাস চট্টোপাধ্যায়
৯। ,, বিভূতিভূষণ মিত্র
১০। ,, জিতেন্দ্রনাথ বসু
১১। ,, রামগোবিন্দ বসু
১২। ,, মনোরঞ্জন রায়

৫) রাজ - কলেজ (বাসস্থান)

অধিনায়ক - শ্রীযুক্ত ললিতমোহন রায় বিএ

দ্বিচক্রযান- বাহী

শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

শ্রী বলাইচাঁদ রায়

স্বেচ্ছাসেবকগণ

১। শ্রীযুক্ত উমাশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়
২। ,, অবনীমোহন ধর
৩। ,, হরিহর মুখোপাধ্যায়
৪। ,, মানসকুমার সিংহরায়
৫। ,, ভূপেন্দ্রনাথ গুহরায়
৬। ,, জয়কৃষ্ণ রায়
৭। ,, সাতকড়ি পালিত
৮। ,, সুধীরচন্দ্র ভঞ্জ
৯। ,, সত্যসাধন সরকার
১০। ,, রামরঞ্জন মুখোপাধ্যায়
১১। ,, ভানুপ্রকাশ নন্দী
১২। ,, দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায়
১৩। শ্রীযুক্ত জ্ঞানপ্রকাশ চন্দ্র
১৪। ,, বিজয়গোবিন্দ চন্দ্র
১৫। ,, দুলালচন্দ্র ভঞ্জ
১৬। ,, জ্যোতির্ম্ময় চট্টোপাধ্যায়
১৭। ,, পাঁচুগোপাল রায়
১৮। ,, প্রফুল্লচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
১৯। ,, হরিহর ভট্টাচার্য্য
২০। ,, গিরিজাশঙ্কর চৌধুরী
২১। ,, গৌরীপদ নাগ
২২। ,, মুকুন্দলাল মিশ্র

৬) নির্ম্মল-লজ্

অধিনায়ক - শ্রীতারাপদ চট্টোপাধ্যায় বি,এ

দ্বিচক্রযানবাহী - শ্রীবিভূতিভূষণ দে

স্বেচ্ছাসেবকগণ

১। শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
২। ,, সলিলকুমার ঘোষ
৩। ,, নৃসিংহপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য
৪। ,, জগন্নাথ দে

৭) বালিকা-বিদ্যালয় ও অবনীবাবুর বৈঠকখানা।

অধিনায়ক-শ্রীসত্যাংশুকুমার সিংহ বি, এ

দ্বিচক্রযান-বাহী - শ্রীচারুচন্দ্র দাস

১। শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার মুখোপাধ্যায়
২। ,, বসন্তকুমার ভট্টাচার্য্য
৩। ,, ত্রিভঙ্গলাল গঙ্গোপাধ্যায়
৪। ,, প্রভাকর দত্ত
৫। ,, ফণীন্দ্রনাথ বসু
৬। ,, মণীন্দ্রনাথ বসু
৭। ,, রাধিকাপদ গঙ্গোপাধ্যায়

৮। শ্রীযুক্ত রামগুরু মুখোপাধ্যায়

৮) রাজাসাহেব বড়খণ্ড

অধিনায়ক - শ্রীমোহনলাল ঘোষ

দ্বিচক্রযানবাহী - শ্রীমাখনলাল দত্ত

শ্রীকর মুখোপাধ্যায়

স্বেচ্ছাসেবকগণ

১। শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর লালা
২। ,, যশোদানন্দ ঘোষ
৩। ,, ইন্দ্রনাথ সাহা
৪। ,, পূর্ণচন্দ্র বসু
৫। ,, বিনোদগোপাল রায়
৬। ,, নির্ম্মলপ্রকাশ ঘোষ
৭। ,, বিজয়চন্দ্র বটব্যাল
৮। ,, হরেন্দ্রবিজয় বসু
৯। ,, কাশীনাথ সেন
১০। ,, পশুপতি সিংহ
১১। ,, হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায
১২। ,, জ্যোতিঃপ্রকাশ চন্দ্র

৯) উইল - বাড়ী

অধিনায়ক - শ্রীজ্ঞানানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

দ্বিচক্রযান-বাহী - শ্রীরাঘবেশ্বর সরকার

শ্রীরঞ্জনকুমার বসু

স্বেচ্ছাসেবকগণ

১! শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
২। ,, অভয়াচরণ ঘোষ
৩। ,, বিনয়কৃষ্ণ বসু
৪। ,, সুবলচন্দ্র রায়
৫। ,, রাসবিহারী চট্টোপাধ্যায়
৬। ,, সাতকড়ি মুখোপাধ্যায়
৭। ,, প্যারীমোহন ভট্টাচার্য্য
৮। শ্রীযুক্ত চতুর্ভুজ ওঝা
৯। ,, ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ গোস্বামী
১০। ,, মন্মথনাথ সিংহ
১১। ,, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়
১২। ,, বৈদ্যনাথ চৌধুরী
১৩। ,, সত্যপ্রসাদ মিত্র
১৪। ,, অজয়কুমার সেন
১৫। ,, অজিতকুমার সেন
১৬। ,, রামকিঙ্কর রায়

১০) ৺গোপেন্দ্র মিত্রের বাটী

অধিনায়ক - শ্রীবিনোদীলাল ঘোষ বি, এ

দ্বিচক্রযান-বাহী – শ্রীদুর্ল্লভকিশোর মিত্র

স্বেচ্ছাসেবকগণ

১। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গুপ্ত
২। ,, সুধাংশুবিকাশ ঘোষ
৩। ,, দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য
৪। ,, মোহিনীরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়
৫। ,, দুলালচন্দ্র পাল
৬। ,, কৃষ্ণপদ মিশ্র
৭। ,, গোবিন্দ প্রসাদ চাঁদ
৮। ,, বিভূতিভূষণ মিত্র

১১) ৺বক্কেশ্বর তা মহাশয়ের বাটী

অধিনায়ক – শ্রীপ্রফুল্লকুমার পাঁজা

দ্বিচক্রযানবাহী - শ্রীগোলাম সত্তার

স্বেচ্ছাসেবকগণ

১। শ্রীযুক্ত কমলাপ্রসাদ আইচ
২। ,, প্রহ্লাদচন্দ্র বসু

১২) নির্ম্মল - বাগ

অধিনায়ক - শ্রীধরণীধর ঘোষাল

দ্বিচক্রযানবাহী– শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বর্ম্মন

শ্রীসতীন্দ্রনাথ চৌধুরী

১। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়
২। ,, শিশিরকুমার ঘোষ
৩। ,, জগৎরাম চট্টোপাধ্যায়
৪। ,, ধীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
৫। ,, শশধর চট্টোপাধ্যায়
৬। ,, রামপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়
৭। ,, শশধর ভট্টাচার্য্য

১৩) বিজয় - চতুষ্পাটী

অধিনায়ক - শ্রীবেণীমাধব কাব্যতীর্থ

১। শ্রীযুক্ত সত্যপ্রকাশ কাব্যতীর্থ
২। ,, আশুতোষ ভট্টাচার্য্য
৩। ,, বিশ্বনাথ কাব্যতীর্থ
৪। ,, রামনাথ ভট্টাচার্য্য

১৪)ছো ট দেউড়ী ও ডেভিস সাহেবের বাটী

অধিনায়ক - শ্রীআলাউদ্দীন মহম্মদ

স্বেচ্ছাসেবকগণ

১। শ্রীযুক্ত আহম্মদ মোল্লা
২। ,, মহম্মদ ইশাক
৩। ,, মীর রহমৎ আলি
৪। ,, চৌধুরী আবদুল হাকিম

১৫) সাবেক টোল

অধিনায়ক - শ্রীগোলাম মূর্ত্তজা বি, এ

স্বেচ্ছাসেবকগণ

১। শ্রীযুক্ত আবদার রহমন
২। ,, আবদুল কাদের

১৬) শ্রীপতিবাবুর বৈঠকখানা

অধিনায়ক - শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত

দ্বিচক্রযানবাহী - শ্রীবিনয়কৃষ্ণ সামন্ত

স্বেচ্ছাসেবকগণ

১। শ্রীযুক্ত পদ্মলোচন ভট্টাচার্য্য
২। ,, ললিতমোহন ভট্টাচার্য্য
৩। ,, শ্যামাপদ ভট্টাচার্য্য
৪। ,, ললিতকুমার ভট্টাচার্য্য

১৭) খোষ- বাগান

অধিনায়ক - শ্রীসত্যশরণ সরকার বি. এ

দ্বিচক্রযানবাহী - সত্যেন্দ্রনাথ মিত্র

স্বেচ্ছাসেবকগণ

১। শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন রায়
২। ,, শিশিরকুমার ঘোষ
৩। ,, ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়
৪। ,, কুমুদরঞ্জন সিংহ
৫। ,, যতীন্দ্রনাথ বিষ্ণু
৬। ,, নির্ম্মলচন্দ্র বিশ্বাস
৭। ,, গৌরীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়
৮। ,, দ্বিজপ্রসাদ দত্ত

১৭) কালিবাজার - কুঠী

অধিনায়ক - শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ

দ্বিচক্রযানবাহী - শ্রীকালীপদ হালদার

শ্রীভূপেন্দ্র নাথ বসু

স্বেচ্ছাসেবকগণ

১। শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার বসু
২। ,, গুরুগোবিন্দ বসু
৩। ,, দ্বিজেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী
৪। ,, তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়
৫। ,, পরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
৬। ,, সুচাঁদ মুখোপাধ্যায়

৭। শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী হাজরা
৮। ,, মোহনলাল বিশ্বাস
৯। ,, বনজাক্ষ চৌধুরী
১০। ,, ভোলানাথ ভঞ্জ

১৮) টাউন - হল

অধিনায়ক - শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
দ্বিচক্রযানবাহী - শ্রীঅজয়চন্দ্র হাজরা
শ্রীযুক্ত বিজনচন্দ্র বসু
,, কালীকৃষ্ণ পাল

স্বেচ্ছাসেবকগণ

১। শ্রীযুক্ত শ্রীঅনাথবন্ধু মিত্র
২। ,, গৌরীশঙ্কর মজুমদার
৩। ,, ধীরেন্দ্রনাথ বসু
৪। ,, নির্ম্মলপ্রকাশ চৌধুরী
৫। ,, রামহরি মুখোপাধ্যায়
৬। ,, ভুজঙ্গভূষণ হাজরা
৭। ,, হরেন্দ্রনাথ সরকার
৮। ,, গোপেন্দ্র নাথ দত্ত

প্রতিনিধিগণের বাসস্থান

বাসস্থান	ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীগণ
১। নির্ম্মল - বাগ	শ্রীকালীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়
	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
	শ্রীমন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়
২। রাজ - কলেজ	শ্রীঅতুলানন্দ রায় চৌধুরী
	শ্রীসন্তোষকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
	শ্রীবিপিনবিহারী চট্টোপাধ্যায়
৩। বালিকা - বিদ্যালয়	শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
	শ্রীভোলানাথ মুখোপাধ্যায়
৪। রাজা-সাহেবের বড়-খণ্ড	শ্রীলালা গুরান্দিত্যা মেহেরা
	শ্রীআশুতোষ চট্টোপাধ্যায়
	শ্রীপরাণচন্দ্র সেন
৫। নির্ম্মল- লজ	শ্রীসুরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
	শ্রীযোগেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
৬। উইল - বাড়ী	শ্রীঅবনীমোহন চট্টোপাধ্যায়
	শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
৭। ঁগোপেন্দ্র মিত্রের বাটী	শ্রীগোপেশ্বর সিংহ
	শ্রীপরিতোষ ভট্টাচার্য্য

৮। কৃষ্ণনগর - চাঁদনী	শ্রীনৃসিংহপ্রসাদ রায় মহাশয়
	শ্রীভূবনমোহন মুখোপাধ্যায়
৯। খোষ - বাগান	শ্রীপূর্ণচন্দ্র ঘোষ
	শ্রীবিভূতিভূষণ বর্ম্মন্
১০। শ্রীপতি বাবুর বাটী	শ্রী শ্রীপতি দত্ত
	শ্রীঅখিলচন্দ্র দত্ত
১১। টাউন - হল	শ্রীনেপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
	শ্রীগোবিন্দপদ রায়
১২। কালী-বাজার কুঠী	শ্রীঅকূলনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
	শ্রীযতীন্দ্রমোহন হালদার
১৩। ঁঅবনী বাবুর বাটী	শ্রীমন্মথনাথ চৌধুরী
	শ্রীভোলানাথ রায়
১৪। ঁবক্রেশ্বর তা'র বাটী	শ্রীভূদেব মুখোপাধ্যায়
	শ্রীমণীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
১৫। সাবেক টোল	শ্রীনাজিরুদ্দীন আহম্মদ বেগ
	শ্রীনেজাবৎ হোসেন
১৬। ডেভিস্ সাহেবের বাটী	শ্রী ফজলুর হোসেন
	শ্রীমহাতাবুদ্দীন চৌধুরী
১৭। ছোট-দেউড়ী	শ্রীসেখনুরুল আয়ান্
	শ্রীসেখ তোকু
১৮। বিজয়-চতুষ্পাটী	শ্রীপ্রিয়নাথ তর্করত্ন
	শ্রীবীরেশ্বর তর্কতীর্থ
১৯। ঁ নির্ম্মল বাবুর বাটী	শ্রীরাজেন্দ্র মিত্র
	শ্রীশৈলেন্দ্র বসু
২০, ২১, ২২, ও ২৩	দীলকুশা, খুর্শেদমহল
	দীলারাম, আরামবাগ

"জ" পরিশিষ্ট

প্রদর্শিত দ্রব্যের তালিকা

ক) বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের চিত্রশালার দ্রব্য।

১। পিত্তলের বিষ্ণু-মূর্ত্তি ত্রিবিক্রম। ২। পিত্তলের ললিতাক্ষেপ-সংস্থিত বিষ্ণু-প্রহরণ ধারী বোধিসত্ত্ব-মূর্ত্তি। ৩। পিত্তলের ষড়হস্তবিশিষ্ট দণ্ডায়মান বোধিসত্ত্ব-মূর্ত্তি (মস্তকে নাগছত্র ও পৃষ্ঠে খোদিত-লিপি)।

প্রস্তর-মূর্ত্তি। ৪। দ্বাদশ-হস্ত অবলোকিতেশ্বর (উভয় পার্শ্বে দণ্ডায়মান বোধিসত্ত্ব-মূর্ত্তি উপরে সপ্তনাগ-ছত্র)। ৫। মুকুট-পরিহিত বুদ্ধ-মূর্ত্তি (ভূমি-স্পর্শমুদ্রা, চতুস্পার্শে বুদ্ধের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত জীবনের প্রধান ঘটনার চিত্র)। ৬। মঞ্জুশ্রীবোধিসত্ত্ব-মূর্ত্তি। ৭। কমলা। ৮। শিবের বিবাহ। ৯। পার্ব্বতী। ১০। লক্ষ্মণসেনের তাম্রশাসন। ১১। প্রথম চন্দ্রগুপ্তের সুবর্ণমুদ্রা। ১২। কৃষ্ণকীর্ত্তনের পুঁথি। ১৩। হ্যাল-হেডের ব্যাকরণ। ১৪। বত্রিশ সিংহাসন। ১৫। অন্নদামঙ্গল ১ম ও ২য় খণ্ড। ১৬। মিলার সাহেবের ব্যাকরণ। ১৭। কথোপকথন। ১৮। আদতালত - তিমিরনাশক। ১৯। সমাচার - দর্পণ ১২২৫ - ২৮।

খ) প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সিদ্ধান্তবারিধি মহাশয়ের প্রদর্শিত দ্রব্য। ১। প্রথম মহীপালের বাণগড় হইতে আবিষ্কৃত তাম্রশাসন। ২। পটিয়া হইতে আবিষ্কৃত শিবরাজের তাম্রশাসন। ৩। উৎকলের মাদলাপঞ্জী। ৪। (কাশ্মীরের) রাজ-তরঙ্গিণী (৩শত বর্ষের প্রচীন হস্তলিপি) ৫। সংস্কৃত কাশীখণ্ড (৯৩৪ শকে তালপত্রে লিখিত বাঙ্গালা পুঁথি)। ৬। আরবী শিলালিপি (মালদহ হইতে আবিষ্কৃত)। ৭। অট্টহাসের চামুণ্ডা মূর্ত্তি। ৮। দেবগ্রামের বিষ্ণুমূর্ত্তি। ৯। দেবগ্রামে প্রাপ্ত ভগ্ন-বিষ্ণুমূর্ত্তি। ১০। দেবগ্রামে প্রাপ্ত প্রস্তরস্তম্ভের উপরিভাগস্থ মূর্ত্তি যুক্ত শিলাখণ্ড। ১১। দেবগ্রামের প্রাচীন মাহেশ্বরী - মূর্ত্তিযুক্ত প্রস্তরফলক।

গ) শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয়ের প্রদর্শিত দ্রব্য। ১। বর্দ্ধমান জেলার সীতাহাটী গ্রামে আবিষ্কৃত বল্লালসেনের তাম্রশাসনের প্রতিলিপি। ২। বর্দ্ধমান জেলার আবিষ্কৃত স্কন্দগুপ্ত ও নরসিংহ গুপ্তের মুদ্রা। ৩। শুভাকর দেবের তাম্রশাসন। ৪। বিনীত তুঙ্গদেবের তাম্রশাসন। ৫। কয়াড় তুঙ্গদেবের তাম্রশাসন।

ঘ) প্রসূন সম্পাদক শ্রীযুক্ত জ্যোতিঃপ্রসাদ সিংহ মহাশয় কর্ত্তৃক প্রদর্শিত পুঁথি। ১। জয়দেবের গীত-গোবিন্দ। ২। বৃন্দাবন দাস-কৃত আনন্দ-লহরী। ৩। নরোত্তমদাস কৃত আনন্দ-লহরী। ৪। রায়শেখর-পদাবলী। ৫। বৃন্দাবনদাসকৃত ভক্তি-চিন্তামণি। ৬। রসায়ন (পুরাতন কবিরাজী পুস্তক)। ৭। গোবিন্দদাসকৃত পদাবলী। ৮।পদাবলী

লোচনদাস - কৃত।

ঙ) আদ্যের গম্ভীরার গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত মহাশয়ের সংগৃহীত পুঁথি। ১। কাঙ্গালী দাস লিখিত শ্রীচৈতন্য-ভাগবত। ২। নরোত্তম দাসের প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা। ৩। কবিবল্লভের রস-কদম্ব। ৪। নাড়ী-জ্ঞান। ৫। নরোত্তম দাসের নাম-সংকীর্ত্তন। ৬। লোচনামৃত ৭। যম-পাঁচালী ৮। কপিলা-মঙ্গল ৯। শ্রীবৃন্দাবন-রহস্য ১০।চণ্ডীর মঙ্গল। ১১। ঝাপড় দাস বৈরাগীর 'চরিত'। ১২। লক্ষ্মী-চরিত্র। ১৩। শঙ্করদাসের গুরুদক্ষিণা। ১৪। গুণরাজ খাঁর সূর্য্যের ব্রতকথা। ১৫। শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধের অনুবাদ। ১৬। মালতী-মাধব। ১৭। আদিখণ্ড শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ১৮। আদিখণ্ড শ্রীচৈতন্য-ভাগবত। ১৯। অদ্বৈত-কড়চা গ্রন্থ টীকা। ২০। পরাগলী মহাভারত নিত্যানন্দ ঘোষকৃত। ২১। সৌতিপর্ব্ব মহাভারত। ২২। ভরত পণ্ডিতের জয়-বিজয় চরিত। ২৩। দ্রব্য-গুণ। ২৪। শ্রীপদ্মপুরাণ যমগীত। ২৫। কৃত্তিবাসের রামায়ণ। ২৬। স্বরূপ দামোদরের কড়চা। ২৭। সুদাম চরিত। ২৮। লক্ষ্মীর ব্রত কথা। ২৯। রঘুনাথ পণ্ডিতের প্রেম-তরঙ্গিনী। ৩০। চৈতন্য-মঙ্গল। ৩১। কপিলা-মঙ্গল। ৩২। রাগ-লক্ষণ। ৩৩। গোবিন্দ-লীলামৃত। ৩৪। সামুদ্র-কড়চা। ৩৫। রাম-বিবাহ। ৩৬। লোচনকৃত বৈষ্ণব-তত্ত্ব। ৩৭ কৃষ্ণদাসকৃত আত্ম-জিজ্ঞাসা। ৩৮। দুর্ল্লভ শর্ম্মার সন্ন্যাস। ৩৯। ব্রহ্মসংহিতা ৪০। পথ্যাপথ্য-বিধি। ৪১। সরণ-দর্পণ। ৪২। হরিহরা-চার্য্যের সময়-প্রদীপ। ৪৩। শ্রীরাধার অষ্টোত্তরশত নাম। ৪৪। সংস্কৃত মহাভারত স্ত্রীপর্ব্ব। ৪৫। গোবিন্দদাসকৃত দুর্জ্জ য়মান। ৪৬। মণিহরণ-কথা। ৪৭। মাথুর-বর্ণন। ৪৮। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত মধ্যখণ্ড। ৪৯। গোবিন্দদাসের ব্যঙ্গ-কাহিনী। ৫০।শ্রীশ্যামচাঁদ দেবশর্ম্মাকৃত কামশাস্ত্র। ৫১। কবিকঙ্কণের অম্বিকা-মঙ্গল। ৫২। কর্ণ-পাঁচালী। ৫৩। শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাস। ৫৪। কাশীরাম দাসের মহাভারত। ৫৫। কাশীখণ্ড। ৫৬। পদ্মাসন-কড়চা। ৫৭। চৈতন্য-তত্ত্বসার। ৫৮। রস-কদম্ব। ৫৯। বৈষ্ণব-বন্দনা। ৬০। প্রেমভক্তি। ৬১। সত্য-নারায়ণ-কথা। ৬২। স্বরূপ-বর্ণন। ৬৩। গোপাল-বন্দনা। ৬৪। জগৎ জীবনের মানস-মঙ্গল। ৬৫। সপ্তমুঞ্জরী-আহ্বান। ৬৬। শ্যামামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দর। ৬৭। সিদ্ধান্ত-চন্দ্রোদয়। ৬৮। চোর-চক্রবর্ত্তী। ৬৯। মুকুন্দ ভারতী। ৭০। স্বর্গ-আরোহণ। ৭১। গুরুভক্তি-তত্ত্ব। ৭২। ভক্তি-চিন্তামণি। ৭৩। কৃত্তিবাসের জগন্নাথ-বন্দনা। ৭৪। ভাগবত-গীতা। ৭৫। হর-মেখলা। ৭৬। কালি-মাহাত্ম্য ইত্যাদি শতাধিক পুঁথি।

চ) বৰ্দ্ধমান-বড়বেলুন নিবাসী শ্রীযুক্ত পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক সংগৃহীত পুঁথি— ১। গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা। ২। নারদ-সংবাদ। ৩। কৃষ্ণ কর্ণামৃত। ৪। চৈতন্য-চরিতামৃত। ৫। লোচনদাসের সূত্র-মত। ৬। প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা। ৭। বংশীদাসের

ভজন-রত্নাবলী। ৮। জ্ঞানচন্দ্রিকা। ৯। ভট্টিকাব্য (মূল)। ১০। কাব্য প্রকাশ। ১১। দর্পণ-শুদ্ধি। ১২। সাহিত্য-দর্পণ। ১৩। অমরকোষ। ১৪। মুগ্ধবোধ। ১৫। মহাভারত-অশ্বমেধ হইতে মূষলপর্ব্ব। ১৬। দায়-ভাগ ১৭। সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ। ১৮। কবিকঙ্কণ-চণ্ডী। ১৯। ন্যায় (মূল)। ২০। কর্ম্ম-বিপাক। ২১। কাশীখণ্ড। ২২। আয়ুর্ব্বেদ। ২৩। শ্রীমদ্ভাগবত গীতা। ২৪। জ্যোতিষের গ্রন্থ ২ খানি। ২৫। মহাভারত-বনপর্ব্ব (মূল)। ২৬। মহাভারত-সভাপর্ব্ব। ২৭। হরিবংশ। ২৮। মহাভারত আদিপর্ব্ব। ২৯। মহাভারত-দ্রোণপর্ব্ব। ৩০। তন্ত্র (মূল)।

(উপরিউক্ত পুঁথিগুলির ৫ খানি তালপত্রে লিখিত)

প্রস্তর-মূর্ত্তি — ১। বিষ্ণু-মূর্ত্তি। ২। কূর্ম্ম-মূর্ত্তি

ছ) শ্রীযুক্ত কামিনীনাথ ও ভোলানাথ ব্রহ্মচারী মহাশয়দ্বয় কয়েকখানি পুঁথি, শ্রীগৌর দেবের হস্তাক্ষর ও ১টি বিষ্ণু-মূর্ত্তি প্রদর্শনীর জন্য দিয়াছিলেন।

জ) বর্দ্ধমানের ডাঃ শ্রীঅহিভূষণ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রদত্ত ১ টি প্রস্তরের ক্ষুদ্র বিষ্ণুমূর্ত্তি।

ঝ) শ্রীযুক্ত রাখালরাজ রায় কর্ত্তৃক প্রদর্শিত ৮০ টি বিবিধ মুদ্রা, ২ টি বৌদ্ধস্তূপ ও চৈতন্য। ঞ) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ বর্দ্ধমান শাখা কর্ত্তৃক প্রদর্শিত —

চিত্র — ১। খাজা আনোয়ারের সমাধি। ২। পীর-বহরামের সের আফগানের সমাধি।

ট) শ্রীযুক্ত রাখালরাজ রায় ও শিবদাস তেওয়ারী মহাশয় কর্ত্তৃক বর্দ্ধমান-দামোদর হইতে সংগৃহীত প্রস্তর মূর্ত্তি।

১। বিষ্ণু-মূর্ত্তি। ২। বরাহ-মূর্ত্তি। ৩। পার্ব্বতী-মূর্ত্তি সহচরীদ্বয় সমেত নিম্নাংশ। ৪। ৮ ফুট দীর্ঘ একটি অষ্টকোণাকার স্তম্ভ। ৫। দ্বারপালের উর্দ্ধাংশ।

ঠ) মণিরামবাটীর ভূম্যধিকারিণী শ্রীমতি প্রিয়ম্বদা দেবী কর্ত্তৃক প্রেরিত বুদ্ধমূর্ত্তির নিম্নাংশ

ড) পাতুন (মন্তেশ্বর) যোগাশ্রমের শ্রীযুক্ত ভবতারণ সাংখ্য -তন্ত্ররত্ন মহাশয় কর্ত্তৃক প্রদর্শিত —

১। অবলোকিতেশ্বর-মূর্ত্তি (ষড়ভুজ)। ২। কূর্ম্ম-মূর্ত্তি। ৩। বিষ্ণু-মূর্ত্তি।

ঢ) বর্দ্ধমানরাজ কর্ত্তৃক সংগৃহীত।

১। গণেশ-মূর্ত্তি। ২। বিষ্ণু-মূর্ত্তি। ৩। বিষ্ণু-মূর্ত্তি। ৪। ভগ্ন দ্বিভূজা দেবীমূর্ত্তি। ৫। ভগ্ন মূর্ত্তির পার্শ্বের সিংহ।

ণ) শ্রীমন্মথনাথ রায় এম্ আই এম্ ই মহাশয় কর্ত্তৃক প্রদর্শিত দ্রব্যের তালিকা ঃ—

১) নিচিতপুর কোলিয়ারির ষ্টীম-কয়লা
২) রঘুনাথবাটী সিম ষ্টীম-কয়লা
৩) রঘুনাথবাটী ডিসেরগড় সিম ষ্টীম-কয়লা
৪) গরোরিয়া ১০ ও ১১নং সিম ষ্টীম-কয়লা

৫) ঐ হার্ডকোক কয়লা
৬) নওপাড়া খাস কোলিয়ারির ষ্টীম কয়লা
৭) সাউথ ইষ্ট বাড়াবানি ষ্টীম কয়লা
৮) বেগুনিয়া ষ্টীম কয়লা
৯) ইক্‌রা কোলিয়ারির ১১, ১২, ১৩ ও ১৪ নং সিমের ষ্টীম কয়লা
১০) চৌরাশী কোলিয়ারির সাকতোড়িয়া ষ্টীম কয়লা
১১) ঐ ডিসের গড় সিম ষ্টীম কয়লা
১২) গোলক ডি ষ্টীম কয়লা
১৩) ঐ সফট্‌ কোক্‌
১৪) ঐ হার্ড কোক্‌
১৫) মাইকা (অভ্র) ছোট আম্বলা ও পচম্বা
১৬) বাড়াবানি ষ্টীম কয়লা
১৭) ডিসের গড় ঐ
১৮) চাঁচ-কোলিয়ারি ঐ
১৯) নিউডামরা কোলিয়ারি ঐ
২০) জিনাগড়া ষ্টীম কয়লা
২১) ঐ সফ্‌ট কোক
২২) চরণপুর ষ্টীম কয়লা
২৩) পোলিয়াটাড ষ্টীম কয়লা চরণপুর সীম
২৪) সাঁকতোড়িয়া ষ্টীম কোল
২৫) ছোট ধেমুয়া ঐ
২৬) রামগড় ঐ
২৭) বরাকর ফায়ার - ক্লে
২৮) ঐ টালি ও ইষ্টক
২৯) বারিরামপুরের লাল-মাটি
৩০) ঐ সাদা মাটি
৩১) বরাকরের পাথরের টালি
৩২) ঐ পাইপ ক্লে
৩৩) বেগুণিয়া হার্ড কোক্‌
৩৪) বেঙ্গল আয়রণ-ষ্টীল কোং'র পিগ আয়রণ
৩৫) ঐ আয়রণ ষ্টোন

৩৬) সেকেন্ড্রেরাও গ্লাস-ওয়ার্কের কাচের দ্রব্য
৩৭) বরাকরের সফট্ কোক
৩৮) বীরসিংহপুর কোল-কোম্পানীর ষ্টীম কোল
৩৯) ঐ সফ্‌ট্ কোক
৪০) ইকুইটেবল কোং'র বেরাডি কোলিয়ারী ৩নং পিটের মানচিত্র
৪১) ঐ কোং ডিসেরগড় কোলিয়'রির ম্যাপ ৪ খানা
৪২) *Analytical & consulting Chemists copy* ৩ খানা
৪৩) *Agricultural Lodger 1898 no 14*
৪৪) বোরিং যন্ত্রের নক্সা
৪৫) ভারতবর্ষের মানচিত্র - ইহাতে রেল-লাইন, কয়লা-ভূমি ও অপরা ধাতুর স্থান দেখান আছে।

ত। কাঞ্চনগরের প্রসিদ্ধ ছুরি-কাঁচি-নির্ম্মাতা শ্রীপ্রেমচাঁদ মিস্ত্রী কর্ত্তৃক প্রদর্শিত বিভিন্ন প্রকারের ছুরি ও কাঁচি।

থ। বর্দ্ধমান-বড়বাজারের বস্ত্র-বিক্রেতা শ্রীহংসেশ্বর দত্ত কর্ত্তৃক প্রদর্শিত বর্দ্ধমান নগর আলমগঞ্জ, তেজগঞ্জ প্রভৃতি পল্লীর তন্তুবায়কর্ত্তৃক প্রস্তুত তাঁতের ধূতি-শাড়ী প্রভৃতি।

দ। বর্দ্ধমান-রাজবাটী হইতে প্রদর্শিত দ্রব্যের তালিকা - স্বর্গীয কীর্ত্তিচন্দ বাহাদুরের আমলের (১) দুন্দুভি মায়কাঠি (২) ঢাল (৩) সাঁজোয়া (৪) পিত্তলের কামান (৫) লোহার গোলা (৬) তীর-কাঠি (৭) যুদ্ধক্ষেত্রের ভগ্নতীর (৮) কীরিচ (৯) কীর্ত্তিচাঁদ বাহাদুরের ব্যবহৃত কীরিচ (১০) কীর্ত্তিচন্দ বাহাদুর কর্ত্তৃক পরাজিত বিষ্ণুপুরের রাজা গোপাল সিংহের তরবারি। ইহার দুই পার্শ্বে দুই রাজার নাম লিখিত আছে। কীর্ত্তিচন্দ বাহাদুরের ব্যবহৃত (১১) তরবারি (১২) কীরিচ (১৩) খড়গ (১৪) পারসী অক্ষরে রাজা চিত্রসেনের নাম খোদিত ৩টি কামান উদ্যান- সম্মিলনীতে রাখা হইয়াছিল।

ধ। গর্ভণমেন্টের কৃষি-বিভাগ-কর্ত্তৃক প্রদর্শিত দ্রব্য ঃ—

যন্ত্র — ১) মেষ্টন-লাঙ্গল (২) হিন্দুস্থান-লাঙ্গল (৩) প্লানেট জুনিয়র হ্যাণ্ডহো (৪) ভুট্টা ছাড়াইবার কল (৫) ঘাসকাটা কল (৬) আকমাড়া কল (৭) গুড়প্রস্তুতের নতুন ধরণের কড়া (৮) জল তুলিবার কল (৯) ক্ষেত্রে ঔষধ-প্রয়োগের পিচকারী-বিশেষ

সার — (১) নাইট্রেট অব্ পটাশ (২) অস্থি-চূর্ণ (৩) রেড়ির খইল (৪) সরিষার খইল (৫) সালফেট অব্ এমোনিয়া (৬) সালফেট অব পটাশ (৭) সুপার ফসফেট (৮) সবুজ সারের জন্য ধৈঞ্চা, শণ ও পাটের বীজ।

বিবিধ — (১) বর্দ্ধমান-বিভাগের ৫০ প্রকারের ধান্য, (২) রেশম, (৩) কোন্ প্রণালী চাষে কোন্ অনুপাতে লাভ হয়, তাহার মাত্রার অনুলিপি *(chart)*, কৃষিবিষয়ক বহু

দ্রব্য সাধারণের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

ন। (১) কবিকঙ্কণের জনৈক বংশধর দামুন্যা-নিবাসী শ্রীঅমূল্যচরণ ভট্টাচার্য্য কবিকঙ্কণের মূল পুঁথি আনিয়াছিলেন (২) বর্দ্ধমানের উকীল শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায় এম্ এ্ মহাশয়ের একটি দুস্প্রাপ্য স্বর্ণমুদ্রা সভাক্ষেত্রে প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

"ঝ" পরিশিষ্ট

অষ্টম বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন-উপলক্ষে বর্দ্ধমান-রাজবাটীতে আমোদ প্রমোদ

১। ১৩২১, ২০শে চৈত্র শনিবার, অপরাহ্ণ ৫।। টা

(প্রাসাদের পশ্চিম-প্রাঙ্গণে উদ্যান-সম্মিলনীতে)

ক) বৈঠকি-গান — সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত রামলাল দত্ত

খ) বালকের গান ও বাজনা — গোপেশ্বর বাবুর ত্রয়োদশবর্ষীয় ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান্ সত্যকিঙ্কর ও নবমবর্ষীয় পুত্র শ্রীমান্ রমেশচন্দ্র গায়ক এবং বহারনগর-নিবাসী শ্রীমান পঞ্চানন পাল মৃদঙ্গ-বাদক।

গ) বাউলের গান

ঘ) কনসার্ট — বর্দ্ধমান মিনার্ভা- কনসার্ট-পার্টি

২। রাত্রি ৯টা হইতে ১২টা, রাজবাটীর রঙ্গ-মঞ্চে অভিনয়

ক) শিব-শক্তি ত্রি-চিত্র
চন্দ্রজিৎ মধ্যে মধ্যে জল-তরঙ্গ

খ) সাহিত্য-সভা-মণ্ডপে চণ্ডীর গান

৩। ২১ শে চৈত্র রবিবার সন্ধ্যা ৬।। টা হইতে ৮।। টা

ক) ইতিহাস-সভা-মণ্ডপে আলোক-চিত্র প্রদর্শন ও ব্যাখ্যা

খ) রাজবাটীর রঙ্গ-মঞ্চে চণ্ডীর গান

গ) রাত্রি ৯টা হইতে ১২টা, রাজবাটীর রঙ্গ-মঞ্চে অভিনয়
চাটুজ্যে-বাঁড়ুজ্যে (মেরি গোল্ড ক্লাব কর্ত্তৃক)
শিব-শক্তি
বরুণা

ঘ) সাহিত্য-সভা-মণ্ডপে কীর্ত্তন

৪। ২২শে চৈত্র সোমবার, রাত্রি ৯টা হইতে ১২টা

ক) রাজবাটীর রঙ্গ-মঞ্চে অভিনয় শ্রীকৃষ্ণ
নূরজাহানের নির্ব্বাচিত অঙ্ক কুঞ্জ ও দরদী

খ) রাত্রি ৭টা হইতে ১০টা সাহিত্য-সভা-মণ্ডপে কীর্ত্তন।

"ঞ" পরিশিষ্ট

আয় - ব্যয়

—জমা—

শ্রীমধুসূদন শরণ দেব মহান্ত মহারাজ	৩০০
মাননীয় মহারাজাধিরাজ বাহাদুর (কার্য্যালয়ের খরচের জন্য)	২০০
রাজা শ্রী বনবিহারী কপূর সাহেব	২৫০
সার শ্রী রাসবিহারী ঘোষ	২৫০
লালা শ্রী জ্যোতিঃপ্রকাশ নন্দে এবং ভ্রাতৃগণ	১৫০
জেলা-জজ শ্রী জি, এন রায় আই সি এস	১০০
রায় শ্রী নলিনাক্ষ বসু বাহাদুর	১০০
শ্রী দেবেন্দ্রনাথ মিত্র	১০০
রায় শ্রী বৈকুণ্ঠনাথ সেন বাহাদুর	৫০
রায় শ্রী ললিতমোহন সিংহ রায় বাহাদুর	৫০
শ্রী সৌরীন্দ্রমোহন সিংহ	৫০
শ্রী রাজেন্দ্রনাথ সিংহ সরস্বতী	৪৩
শ্রী দেবেন্দ্রনাথ সরকার	৩০
শ্রী বনোয়ারীলাল হাতী	৩০
কুমার শ্রী প্রমথনাথ মালিয়া	২৫
মাননীয় শ্রী নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়	২৫
শ্রী দেবেন্দ্রবিজয় বসু	২৫
শ্রী শশিভূষণ বসু	২৫
ডাঃ শ্রী এস কে সেন	২৫
শ্রী শ্রীহর্ষ মুখোপাধ্যায়	২৫
শ্রী ভামিনী রঞ্জন সেন	২৫
শ্রী হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায়	২৫
শ্রী শৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	২০
রায় শ্রী পুলিনবিহারীলাল হাণ্ডে বাহাদুর	২০
শ্রী আশুতোষ সেন	২০
শ্রী মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী	২০
শ্রী সনৎকুমার চৌধুরী	২০
শ্রী বনোয়ারীলাল চৌধুবী	১৫
৭৭ জন সদস্যের ১১ টাকা হইতে ৪ টাকা করিয়া চাঁদা	৪৭৭
২১৬ জন সদস্যের ৩ টাকা হিঃ চাঁদা	৬৪৮
৪৩ জনের ১ টাকা, ২ টাকা, করিয়া দান	৬৪
	৩২০৭

— খরচ —

মুদ্রণ	১০০০ /১৫
টেলিগ্রাম	৮।১০
ডাক-ব্যয়	১৭২।৶১০
ষ্টেশনারি	৭৮ ৸৶ ৫
অনুসন্ধান ও আলোক-চিত্র	১৫৪।/.
ট্রেণ ও গাড়ীভাড়া	৫৭। ১০
বেতন (কর্ম্মচারীর)	৪৩৸/ ৫
প্রদর্শনী	১০৫।/ ৫
প্রতিনিধিদের কুলিভাড়া	৪৫৲
বিবিধ	৯৭।। ৫
ছায়া-চিত্রের খরচ	১৫৪।।
	১৯১৭।।/ ৫

অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনীর পরও মহারাজাধিরাজ বিজয়চাঁদের সময়ে বর্ধমান রাজ মুদ্রণ যন্ত্রে 'পাক রাজেশ্বর' গ্রন্থখানির পুণর্মুদ্রিত হয়। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজাধিরাজ বিজয়চাঁদ মহ্তাব্ ইংল্যাণ্ড থেকে দেশে ফিরে আসার পর গ্রন্থটির তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। (রাঃ সঃ বাং সাঃ আবদুস সামাদ্ ,পৃঃ ১৬৫)।

রাজপৃষ্ঠপোষকতা প্রাপ্ত প্রখ্যাত পালাকার মতিলাল রায়ের পুত্র, ধর্মদাস রায় গঠিত কৃষ্ণযাত্রা পালা গান বর্ধমান রাজবাড়ীতে বাঁধা বন্দোবস্ত ছিল। তাঁর রচিত 'কুন্তীর শিব সাধনা' গীতাভিনয় পুস্তকটি তিনি মহারাজ বিজয়চাঁদ মহাতাব্‌কে উৎসর্গ করেন। সুতরাং দেখা যায়, মহারাজাধিরাজ বিজয়চাঁদ মহ্তাব্ সাহিত্যানুরাগী ছিলেন। শুধু তাই নয় তিনি সাহিত্যিকও ছিলেন। তা বোঝা যায় তাঁর রচিত ইংরাজী বাংলা কয়েক খানি গ্রন্থ থেকে। তিনি তৎকালে প্রকাশিত 'ভারতবর্ষ' নামক মাসিক পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে লিখেছেন।

তাঁর রচিত কয়েকখানি গ্রন্থ হল ঃ— গায়ত্রী, একাদশী, দ্বাদশী, আমার ইউরোপ ভ্রমণ, মানসলীলা,পঞ্চদশী, বিজন-বিজলী, কতিপয়পত্র, চন্দ্রজিৎ নাটক, বহু চিত্রসম্বলিত চন্দ্রশেখর, আবেগপূর্ণ ''আবেগ'', *Impressions, The diary of a European tour 1908* ও *Meditations* প্রভৃতি গ্রন্থগুলি উল্লেখযোগ্য।

দেবকীর্তি ঃ-মহারাজ বিজয়চাঁদ মহ্তাবের দেবকীর্তির বিশেষ পরিচয় না পাওয়া গেলেও অল্প যে পরিচয় পাওয়া যায় তা' অতুলনীয়। 'বিজয়ানন্দবিহার' তাঁর অপূর্ব কীর্তি – এখানে তিনি চতুর্ভুজ মহা মৃত্যুঞ্জয় শিব প্রতিষ্ঠা করেন।

বিজয়ানন্দ বিহার ঃ— কালের প্রবাহে হারিয়ে যাওয়া কত রাজ ঐশ্বর্য। ঐতিহ্য তবুও নিঃশব্দ অশ্রুপ্রপাতের মধ্যে আজও বর্ধমান মহারাজ বিজয়চাঁদ মহ্তাবের আধ্যাত্মিক চেতনার উত্তরণ, সীমার বাঁধনে বাঁধা পড়লেও এখনও কিছু 'মনখারাপ' করা মানুষ আছেন বলেই বেঁচে আছে , ঐতিহ্যের বিলুপ্ত ধ্বংসাবশেষ। তাই রাঢ় বর্ধমানে শতবর্ষের আবর্তন-বিবর্তনের মধ্য দিয়ে হয়েছে বহু পরিবর্তন, তবু নব নব রূপে আজও তা বিদ্যমান। কালের প্রবাহে শতবর্ষ উত্তীর্ণ হতে চলেছে, উত্থান, পতন ঘটেছে, তৎসত্ত্বেও কত কথা, কত ব্যথা,কত হাস্যোজ্জ্ব ল আনন্দ-মুখর দিন, কত অশ্রুসজল কাহিনী অন্তরে নিয়ে বিজয়ানন্দ বিহারে বিহার করছেন, মহারাজাধিরাজ বিজয়চাঁদ মহ্তাব্ প্রতিষ্ঠিত চতুর্ভুজ 'মহা-মৃত্যুঞ্জয়' ও 'বিজয়ানন্দেশ্বর শিবলিঙ্গ' কালের সাক্ষ্য বহন ক'রে।

আজও বাসন্তী কৃষ্ণা চতুর্দশীর ঘন তমসাচ্ছন্ন নিশায় ব্রতীদের অকুণ্ঠ ভক্তিধারায় পরিস্নাত হচ্ছেন ঐ 'মহামৃত্যুঞ্জয়' ও 'বিজয়ানন্দেশ্বর' শিবলিঙ্গ।

মহারাজাধিরাজ বিজয়চাঁদ মহ্‌তাব্‌ তাঁর আধ্যাত্মিক এবং বাস্তব জীবনের সাথে সমন্বয় রেখে ইংরাজীর ১৯০৫ সালে তিনি 'রমনার বাগ' নামক স্থানে প্রায় বারো ফুট এক সুউচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত আশ্রম নির্মাণ করেন। এই আশ্রমের নাম দেন 'বিজয়ানন্দ বিহার'। বর্তমান বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় অর্থাৎ গোলাপবাগের পূর্বদিকে এই রমনার বাগান। এই সুন্দর রমনীয় উদ্যানের ভিতরেই প্রতিষ্ঠিত 'বিজয়ানন্দ বিহার'। তবে এও শোনা যায় মহারাজা মহ্‌তাব্‌চাঁদ এক সময় ব্রাহ্ম ধর্মের প্রতি খুব অনুরক্ত হন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংস্পর্শেই তিনি ব্রাহ্ম ধর্মের প্রতি আসক্ত হয়েছিলেন। আশ্রম নির্মাণের পরিকল্পনা তাঁর ছিল। তবে 'বিজয়ানন্দ বিহার' মহারাজা বিজয়চাঁদেরই সৃষ্টি। তিনি এই সুউচ্চ প্রাচীরের ভেতরে শঙ্করাচার্য্যের মোহমুদ্‌গরের সমস্ত শ্লোক উৎকীর্ণ করেছিলেন।

মহারাজ বিজয়চাঁদ মহ্‌তাব্‌ ধর্মপরায়ণ – প্রতিভাবান, সাহিত্যিক, সঙ্গীতজ্ঞ, সর্বোপরি প্রজাবৎসল ছিলেন। ইংরাজী ও বাংলা সাহিত্যে তাঁর অসাধারণ জ্ঞান ছিল। মহারাজা বিজয়চাঁদ মহ্‌তাব্‌ই অষ্টম-বঙ্গীয়-সাহিত্য সম্মিলনের উদ্যোগী ছিলেন। এই রাঢ় বর্ধমানে অষ্টম-বঙ্গীয়-সাহিত্য সম্মিলনের অনুষ্ঠানে যে সমস্ত বিখ্যাত বিখ্যাত ব্যক্তিত্বের উপস্থিতি ছিল তা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। এই সম্মিলনের সভাপতি ছিলেন শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়। এই অনুষ্ঠান রাঢ় বর্ধমানের গোলাপবাগে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এর থেকেই প্রমাণিত যে মহারাজা বিজয়চাঁদ বঙ্গসাহিত্যকে খুব সমাদর করতেন। তিনি নিজেও একজন সাহিত্য প্রেমী ছিলেন। তাঁর সাহিত্যসৃষ্টি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। আঠারো বছর বয়সে তাঁর রচিত 'মনঃশিক্ষা' নামক গীতি-কাব্যে নিজেকে উদ্দেশ্য করে লিখেছিলেন জীবনের অসাড়তা। তাঁর কথায় 'ধূলিতে জীবন মিশে যায়, যখন সময় হয়। তবে মানুষকে কর্ম করতে হবে। কর্মের ভেতর দিয়ে মানুষকে এগিয়ে যেতে হবে। অবশেষে কর্মক্ষয়ে তার মুক্তি হবে'। আধ্যাত্মিক জীবনের কথা তাঁর লিখিত দু-তিনটি পুস্তকে দেখা গেলেও তিনি বাস্তব জীবনকে উপেক্ষা করেননি। প্রজার প্রতি তাঁর কর্তব্য আছে সে কথা তিনি সব সময় মনে রাখতেন।

মন্দিরের উত্তর গায়ে লাল পাথরের স্তম্ভের একদিকে মহারাজা বিজয়চাঁদ মহ্‌তাব্‌ তাঁর মনোমত শঙ্করাচার্য্যের শ্লোক উৎকীর্ণ করেছিলেন। স্তম্ভের অপর গাত্রে বাংলায় খোদিত আছে ঃ—

ওঁ নমঃ পরমাত্মনে

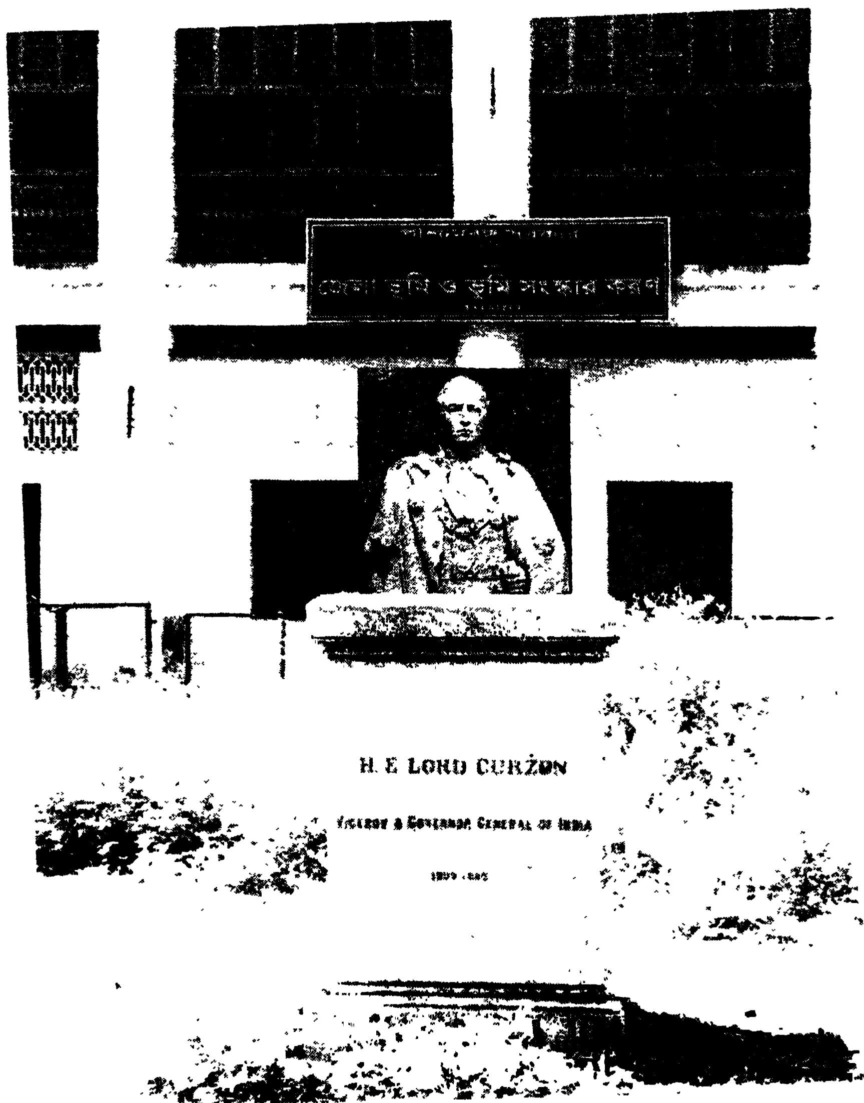
বর্ধমান রাজের রমনা উদ্যানের উত্ত



লক্ষ্মীনারায়ণ জীউ ঠাকুরবাড়ীতে মহারাজা বিজয়চাঁদ ব্রাহ্মণের পা ধোয়াচ্ছেন



লক্ষ্মীনারায়ণ জীউ ঠাকুরবাড়ীতে মহারাজ বিজয়চাঁদ



লর্ড কার্জনের স্ট্যাচু (জেলা ভূমি ও ভূমি সংস্কার করণ, রাজবাড়ী)
বর্তমানে মূর্তিটি অবলুপ্ত



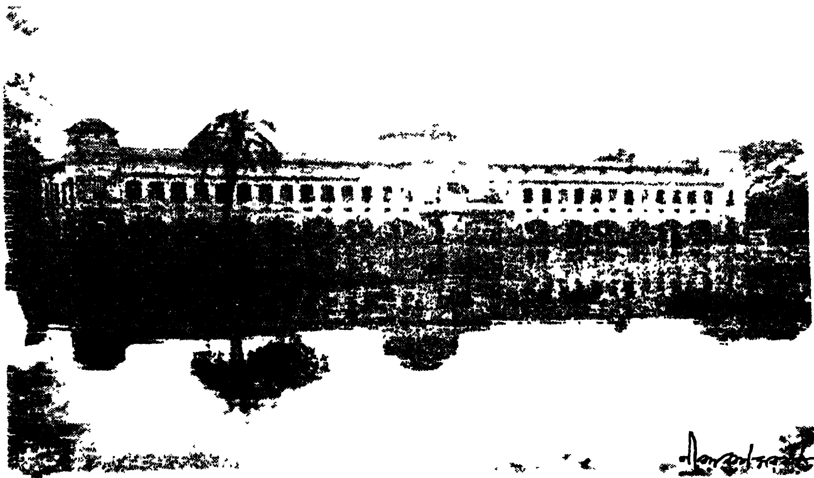
১৯৩৫ সালে বন্যা কবলিত গুরুদোয়ারা



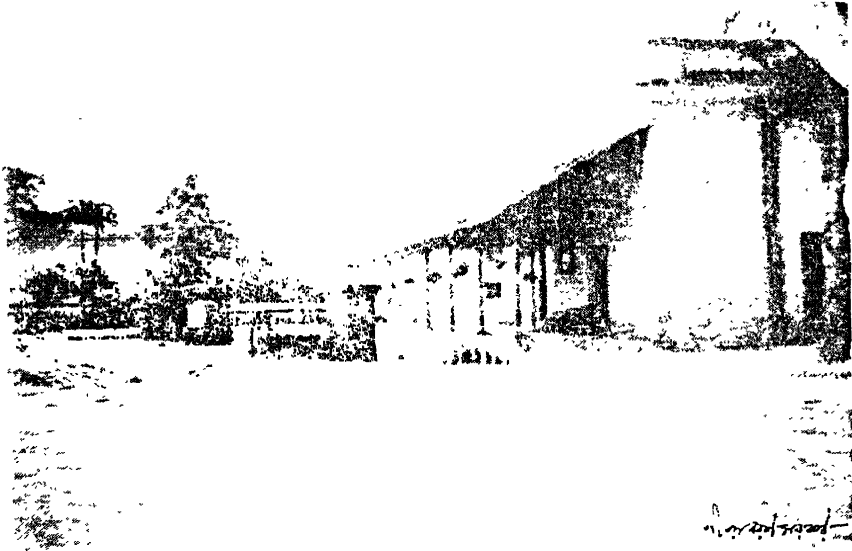
১৯৩৫ সালে বন্যা কবলিত বর্ধমান সিনেমা হল



১৯৩৫ সালে বন্যা কবলিত গুরুনানক ধর্মশালা



১৯৩৫ সালের বন্যায় বর্ধমান জজ্ কোর্টের দৃশ্য



১৯৩৫ সালে বন্যা কবলিত বর্ধমান রেলওয়ে রঙ্গমঞ্চের দৃশ্য



১৯৩৫ সালে বন্যা কবলিত বার লাইব্রেরীর দৃশ্য

রাংশে এই স্থান বর্ধমানধিপতি
মহারাজাধিরাজ বাহাদুর রাজশ্রী বিজয়
চাঁদ মহাতাব বঙ্গাব্দ ১৩১১ সালে
সংস্কার করিতে আরম্ভ করেন। পরন্তু
দেবী ইচ্ছায় সুদীর্ঘকাল কার্য্য বন্ধ
থাকে, পরে পুনরায় সন ১৩২০ সাল
হইতে ইহার নির্মাণ কার্য্য আরম্ভ হইয়া সন
১৩২২ সালের বৈশাখ মাসের মধ্যে
প্রধান প্রধান কাজগুলি সম্পন্ন হয়।
পরম পিতা বিশ্বেশ্বরের প্রীত্যর্থে উদ্যান
মধ্যস্থিত সরোবরের মুক্তি গিরি নাম প্রদান
পূর্বক তার সুপ্রতিষ্ঠিত কার্য্য ৪ঠা আষাঢ়
তারিখে সমাপনান্তে উহার উত্তরাংশে
একটি নূতন শিবালয় স্থাপন করত পূর্বভাগে
দুটি ও পশ্চিম দিকে দুইটি পুরাতন মন্দির
সংস্থাপিত করেন এবং উদ্যানের
দক্ষিণাংশে অর্জুন বিটপিমূলে
নিজ সাধনাসন সংস্থাপন করত
উদ্যানের অপরাপর অংশ দেবো
পবনের উপযোগী করেন। অনন্তর
নিজ আধ্যাত্মিক নাম শ্রীবিজয়া
নন্দ সংযোজনে এই স্থানকে বিজয়া
নন্দ বিহার-আখ্যা প্রদান করিয়া
ইহার দক্ষিণ বনের নাম প্রণব বন
ও পূর্ব্ব বনের নাম নির্ব্বাণ বন
নির্দেশ করত সদাশিবকে সহস্রবার
ধ্যান করিয়া এই সমগ্র দেবোপবন
ভগবান মহেশ্বরের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ
করিলেন। উত্তর মন্দিরে বিজয়া
নন্দের সাধনালভ্য বিজয়ানন্দেশ্বর
শিবের প্রতিষ্ঠা কার্য্য পূর্ব্ব দিকের দুইটি
মন্দিরে দক্ষিণা মূর্ত্তি শিব ও
মহাপ্রণবের সংস্থাপন এবং পশ্চিম
দিকের দুইটি মন্দিরে জগদ্‌গুরু

শ্রী শঙ্করাচার্য্য ও করণাবতার
সিদ্ধার্থ গৌতম বুদ্ধের প্রতিমূর্ত্তি
স্থাপন সন ১৩২২ সালের ১৩ই
জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবারে তৎ ক-
র্ত্তৃক সম্পাদিত হইল।
ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি।

এই শিলালিপি থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে মহারাজাধিরাজ বিজয়চাঁদ মহ্‌তাব্ ১৩১১ সালে রমনার উদ্যানের সংস্কার আরম্ভ করেন। প্রায় নয় বৎসরকাল কাজ বন্ধ থাকার পর পুনরায় ১৩২০ সালে এই বিহারের কাজ আরম্ভ হয় এবং ১৩২২ সালের বৈশাখ মাসের মধ্যে প্রধান কাজগুলি সম্পন্ন হয়। ঐ উদ্যান মধ্যস্থিত যে সরোবরটি রয়েছে উহার সুপ্রতিষ্ঠিত কার্য্য ৪ঠা আষাঢ় তারিখে সমাপ্ত করে ঐ সরোবরটি নাম দেন ''মুক্তিগিরি''। ''মুক্তিগিরির'' উত্তরাংশে আগ্রার ফতেপুরসিক্রির পরিকল্পনা অনুসারে তিনি লাল পাথরের শিব মন্দির স্থাপন করেন। সদাশিবকে সহস্রবার ধ্যান করিয়া এই সমগ্র দেবোপবন ভগবান মহেশ্বরের, উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিয়া বাংলা সন১৩২২ সালের ১৩ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার তাঁর সাধনালভ্য বিজয়ানন্দের শিব প্রতিষ্ঠা করেন। এই শিবলিঙ্গের বিশেষত্ব হচ্ছে কালো পাথরের গৌরীপট্টের উপরে প্রায় ১ ফুট ব্যাসের সাদা শিবলিঙ্গ, মাথায় বজ্র। ঐ মন্দিরের ভিতরে পেছনের দেওয়ালে সুন্দর কারুকার্য্য খচিত শ্বেতপাথরের উপর খোদাই করা 'ওঁ' চিহ্ন এবং জলের উপর পদ্ম কুঁড়ি, পদ্ম পাতা ও প্রস্ফুটিত পদ্মফুল খোদাই করা আছে। কি অপূর্ব্ব কারুকার্য্য। এই বিজয়ানন্দেশ্বর শিবের ঠিক সোজাসুজি এক সরল রেখায় অবস্থিত 'মুক্তিগিরির' ঠিক দক্ষিণপাড়ে মহারাজ বিজয়চাঁদের লাল পাথরের তৈরী সমাধি মন্দির। সামনেই জলের ফোয়ারা ছিল। বর্তমানে বিলুপ্ত। এই সমাধি মন্দিরের পশ্চিমে মহারাজ উদয়চাঁদ মহ্‌তাবের সমাধি বেদী। এই উদ্যানের দক্ষিণাংশে 'মুক্তিগিরির' দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে এক অর্জুন বিটপি তলে বাঁধানো জায়গায় মহারাজা বিজয়চাঁদ মহ্‌তাব্ সাধনার জন্য নিজ সাধনাসন নির্মাণ করেন। এই সাধনাসনটি খুব সুন্দর। 'মুক্তিগিরির' পূর্ব্বপাড়ে দুইটি পুরাতন মন্দির এবং পশ্চিমপাড়ে দুইটি পুরাতন মন্দির সংস্থাপন করেন। পশ্চিমপাড়ের দুটি মন্দিরই পূর্ব্বমূখী, একটি মন্দিরের ভিতরে শ্বেত পাথরের পদ্ম ফুল হাতে মহালক্ষ্মীর মূর্ত্তি। এই দুটি মন্দিরের একটিতে মহারাজ বিজয়চাঁদ স্থাপন করেছিলেন জগদ্‌গুরু শ্রীশঙ্করাচার্যের মূর্ত্তি। অপরটিতে সংস্থাপন করে ছিলেন করুণাবতার সিদ্ধার্থ গৌতম বুদ্ধের প্রতিমূর্ত্তি।

মুক্তিগিরির পূর্বপাড়ে যে এক জোড়া মন্দির আছে, তার একটি মন্দির দক্ষিণমুখী। ঐ মন্দিরে তিনি মহাপ্রণবের সংস্থাপন করেন। অপর মন্দিরটি উত্তরমুখী। এই মন্দির মহারাজ বিজয়চাঁদ প্রতিষ্ঠা করেন শ্বেত পাথরের "শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তি শিব"।

এই দুটি মন্দিরের ভিতরে দেওয়াল গাত্রে "মাণ্ডুক্যোপনিষৎ" থেকে বহু শ্লোক শ্বেত পাথরের উপর খোদাই করা আছে।

'বিজয়ানন্দেশ্বর' শিবের মন্দিরের উত্তরদিকে ঠিক নীচের অংশে বিজয়ানন্দেশ্বরের উদ্দেশ্যে প্রণাম মন্ত্র একটি শ্বেত পাথরে খোদিত আছে। উদ্যানের অপরাপর অংশ দেবোপবনের উপযোগী করে অনন্তর নিত্য আধ্যাত্মিক নাম শ্রীবিজয়ানন্দ সংযোজন করে ঐ স্থানকে 'বিজয়ানন্দ বিহার' আখ্যা প্রদান করেন এবং ইহার দক্ষিণ বনের নাম ' প্রণব বন' ও পূর্ব্ব বনের নাম 'নির্ব্বাণ বন' নাম দেন।

এই মন্দিবে প্রতি বছর ১৩ই জ্যৈষ্ঠ বিজয়ানন্দেশ্বর শিবের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হয় এবং মহারাজা বিজয়চাঁদ মহ্‌তাবের মৃত্যু বার্ষিকী মহা সমারোহে পালিত হয় প্রতি বছর রাধা অষ্টমী তিথিতে। ঐদিন খুব শুদ্ধাচারে পূজাপাঠ, গীতাপাঠ, চণ্ডীপাঠ করা হয়।

'বিজয়ানন্দ বিহারের' সবচেয়ে বিখ্যাত উৎসব শিবরাত্রি উৎসব। ঐদিন বহু ভক্ত সমাবেশ হয়। সারারাতব্যাপী পূজা-আর্চ্চা চলে। বহু ভক্তপ্রাণ নরনারী এ পূজায় অংশ গ্রহণ করেন এবং বিজয়ানন্দেশ্বর শিবের মাথায় জল ঢালেন। প্রতি বছর ঐ উৎসবে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে ডঃ প্রণয়চাঁদ মহ্‌তাব্ বা তাঁর অনুপস্থিতিতে যে কোন রাজবংশধর উপস্থিত থেকে বিজয়ানন্দেশ্বরের পূজায় অংশগ্রহণ করেন এবং উৎসব পরিচালনা করেন। ঠিক সন্ধ্যা নামার সাথে সাথে গোটা উদ্যানে সাজানো অসংখ্য মশাল এক সাথে জ্বলে উঠে পরিবেশকে একেবারে মনোরম করে দেয়। ভারী সুন্দর লাগে সেই দৃশ্য।

খান্নাজীঠাকুর বাড়ী ঃ– একটি উল্লেখযোগ্য দেবালয়। এই দেবালয়টি মহারাজ বিজয়চাদ তাঁর মাতামহ লক্ষ্মীনারায়ণ খান্নার নামে প্রতিষ্ঠা করান। এই মন্দিরের মূল বিগ্রহ হচ্ছেন নারায়ণশিলা, নর্মদা নদী থেকে সংগৃহীত, শিবের শিলাবিগ্রহের নাম নর্মদেশ্বরশিব এবং পিতলের রাধাকৃষ্ণ মূর্তি আছে। মন্দিরের প্রবেশদ্বারের উপরের শিলালিপিতে উৎকীর্ণ আছে ঃ–

"লছমী নারায়ণ খান্নাজীর প্রতিষ্ঠিত

শ্রীশ্রী লছমীনারায়ণ জীউ এবং শ্রীশ্রী নর্মদেশ্বর

শিব ঠাকুরের মন্দির বর্ধমানাধিপতি

মহারাজাধিরাজ বাহাদুর স্যার বিজয়চাঁদ মহ্‌তাব্,

জি. সি. আই .ই, কে. এস. আই .ও. এস.

কর্তৃক নির্মিত ও স্থাপিত।"

ভিত্তিপত্তন সন ১৩৩৮, ২৫ শে চৈত্র, প্রতিষ্ঠিত -সন ১৩৪০, ৩১ শে শ্রাবণ।

কালিকা মূর্তি ঃ— মহারাজ তেজচাঁদ ও মহিষী কমলকুমারী প্রতিষ্ঠিত অন্নপূর্ণাও রাজরাজেশ্বর শিব মন্দিরে একটি মহামূল্য কষ্টিপাথরে নির্মিত কালিকা মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন মহারাজাধিরাজ বিজয়চাঁদ মহ্‌তাব্।

শক্তিবিবিঠাকুর বাড়ী ঃ— পায়রাখানার দক্ষিণে অবস্থিত 'শক্তিবিবি' নামে দেবালয়টি মহারাজাধিরাজ বিজয়চাঁদ মহ্‌তাবের অর্থানুকুল্যে, সহোদরা শক্তিদেয়ী দেবীর প্রতিষ্ঠিত। শক্তিদেয়ী দেবীর কোন সন্তানাদি না থাকায় পুত্রতুল্য 'শক্তিদুলাল' নামে গোপালজীউ এবং শ্রীরাধারমন জীউ এই দুই বিগ্রহ ১৩৩৭ সালের ২২ শে বৈশাখ প্রতিষ্ঠা করেন।



১৯০৪ খৃষ্টাব্দে লর্ড কার্জনের বর্ধমান আগমন উপলক্ষ্যে বিজয়চাঁদ নির্মিত কার্জন গেট (বিজয় তোরণ)

বিজয়চাঁদ ও রাজনীতি

১৯০৫ খ্রীঃ। লর্ড কার্জনের বঙ্গ ভঙ্গের বিরুদ্ধে দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় সোচ্চার হয়ে উঠলেন। তাঁরা সাধারণ জনগণের মধ্যে, বঙ্গ ভঙ্গের ফলে যে বাঙ্গালীকে দুর্বল করে দেওয়া হচ্ছে এই ধারণা মনে জাগিয়ে তুলে বিরাট আন্দোলন গড়ার চেষ্টা করছেন। মহারাজা বিজয়চাঁদ, লর্ড কার্জন তথা ইংরেজদের সমর্থক হলেও তিনি চিন্তা করেছিলেন, আমাদের দেশের শিক্ষা, সমাজ ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক অবস্থা ভাল নয়। সুতরাং ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন এই মুহূর্তে ঠিক নয়। তাই তিনি ইউরোপীয় জীবনচর্চা, তাঁদের শিক্ষা, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য ১৯০৬ খ্রীঃ ১৭ ই এপ্রিল ইউরোপ যাত্রা করলেন। তিনি ছ'মাস ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানী, হল্যাণ্ড, ইটালী দেশগুলি ঘুরে দেশে ফিরলেন। তখনও কলকাতা ভারতের রাজধানী। সেখানেই অবস্থান করা অবশ্য প্রয়োজন। আলিপুর অঞ্চলে মহারাজ আফ্‌তাব্‌চাঁদ ও রাজা বনবিহারী কপূরের ক্রীত বহু জমি। সেখানে মহারাজ বিজয়চাঁদ মনোরম প্রাসাদ নির্মাণ করে নাম দিলেন 'বিজয় মঞ্জিল'।

১৯০৮ খ্রীঃ নভেম্বর মাসে গভর্ণর এন্‌ড্রু ফ্রেজার, মহারাজ বিজয়চাঁদকে এক্‌জিকিউটিভ্‌ কাউন্সিলের সভ্য মনোনীত করেন।

১৯০৯ খ্রীঃ মরলে-মিণ্টোর রিফর্ম অনুযায়ী এই বছর ভারতে প্রথম নির্বাচনহয়। অন্যান্য জমিদাররা নিজ নিজ এলাকায় নির্বাচিত হন। মহারাজা বিজয়চাঁদও অপ্রতিদ্বন্দ্বী ভাবে নির্বাচিত হন। ১৯১৪ খ্রীঃ তিনি কাউন্সিলে কলকাতার উন্নয়ণের জন্য *Calcutta Improvement Trust* বিলের উপস্থাপন করেন। কিন্তু ভোটে ভারতীয় সদস্যদের অনুপস্থিতির জন্য তা নাকচ হয়ে যায়। এই সময় লর্ড হার্ডিঞ্জ ভারতে এসেছেন এবং তিনি কার্জনের 'বঙ্গভঙ্গ' রদ করেন।

১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের নির্বাচনে, তিনি স্বতন্ত্রভাবে নির্বাচিত হয়েছিলেন। কোন রাজনৈতিক দলের সমর্থনে, অথবা সরাসরি কোন দলের প্রতিনিধি হয়ে দাঁড়ান নাই। তিনি নির্বাচিত হলেও উচিত ছিল কিছু নবীনদের নিয়ে দল গঠন করা।

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা মিউনিসিপ্যাল এ্যামেণ্ডমেন্ট বিল, যার উদ্দেশ্য ছিল 'ভেজাল' প্রতিরোধ বিষয়ে আলোচনা করা। এই ব্যাপারে মহারাজ বিজয়চাঁদই ছিলেন প্রবক্তা। গভর্ণমেন্ট ভেজাল নিরোধক আইন পাশ করেন ও ভেজালকারীর শাস্তি বিধান দেন।

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে, ভারতবর্ষের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লীতে স্থানান্তরিত হওয়ার

পূর্বে, সম্রাট পঞ্চম জর্জ ও রাণী মেরী কলিকাতা এসেছিলেন। সমগ্র বঙ্গদেশে রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে যে অস্থিরতা চলছিল, তা সুসংযত করার উদ্দেশ্যে। ব্রিটিশ সরকারের ধারণা, সম্রাটের আগমন ও তাঁর প্রবচনে গণ উত্তেজনা হয়তো প্রশমিত হবে। যাইহোক, তাঁদের অভ্যর্থনা ও পরিচর্যার ভার দেওয়া হলো বিজয়চাঁদকে এবং তাঁর সঙ্গে থাকবেন পাথুরিয়াঘাটার প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর। তা' ছাড়া এই সব কাজে সুষ্ঠুব্যবস্থাপনার যোগ্য ব্যক্তি হলেন বিজয়চাঁদ মহ্‌তাব্ এবং আস্থাভাজন-ও।

সম্রাট দম্পতির ভারত পরিদর্শনের পর ঐ বছরই ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লীতে নিয়ে যাওয়া হয়। ভারত সরকার প্রস্তাব দিলেন রেভিনিউ বোর্ড তুলে দিয়ে 'বেঙ্গল-এক্‌জিকিউটিভ কাউন্‌সিল' থাকবে, সাত জন বিভাগীয় কমিশনার থাকবেন, তাঁরাই হবেন বঙ্গীয় কাউন্‌সিলের সর্বময় কর্তা। তার ফলে, জমিদারদের ক্ষমতা হ্রাস হলো এবং কিয়ৎপরিমাণে ক্ষতিগ্রস্তও হতে হলো। তখন বাংলার সমস্ত জমিদার সম্মিলিত হয়ে মহারাজ বিজয়চাঁদকে মুখপাত্র করে ঐ ব্যবস্থার প্রতিবাদ করলেন। প্রতিবাদ হওয়ায়, সরকার তখন কিছুটা বেসরকারী ব্যক্তিদের হাতে ব্যবস্থার দায়িত্ব দিলেন। বেসরকারি কমিটিতে বিজয়চাঁদ মহ্‌তাব্ ছিলেন। কিন্তু আইনের প্যাঁচে ফল খুব একটা ভাল হলো না। সমস্যায় পড়লেন বিজয়চাঁদ মহ্‌তাব্। সেই সময় চাকরীর সন্ধানে বহু ভারতীয় কানাডা যাচ্ছিলেন। তাতে কানাডায় লোক সংকটের সমস্যা দেখা যায়। কানাডা সরকার নির্দেশ দিলেন, ভারত থেকে যে জাহাজ বা ষ্টীমার আসবে তা অন্য কোন বন্দর হয়ে এখানে আসতে পারবে না, তাদের সরাসরি কানাডার বন্দরে পৌঁছতে হবে। কানাডা সরকারের আইন মোতাবেক গুরুজিৎ সিং নামে এক পাঞ্জাবী ভদ্রলোক 'কামাকাটামারু' নামে জাপানের কাছে একটি ষ্টীমার ভাড়া করে ৬০০ যাত্রী নিয়ে কানাডা রওনা হন। জাহাজটি ভারতবর্ষ থেকে সরাসরি কানাডার 'ভাঙ্কুভার' বন্দরে উপনীত হয়। কিন্তু কোন যাত্রী ষ্টীমার থেকে নামার অনুমতি পান নাই। ৬ মাস ষ্টীমারে অপেক্ষা করে শেষে ভারতে ফিরে আসতে বাধ্য হয়। জাহাজটি কলকাতা থেকে ১৭, মাইল দক্ষিণে বজবজে নোঙর করে এবং সেখানেই যাত্রীদের নামিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু যাত্রীরা হাঙ্গামা শুরু করে দেন। এতে দাঙ্গা বাধার সূচনা হওয়ায় পুলিসী ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হতে হয়। এই সময় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলছিল। আর ঐ জাহাজের যাত্রীরা ছিলেন সকলেই শিখ ও জাঠ। তাঁরাই হলেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর স্তম্ভ স্বরূপ এবং ভারতে ব্রিটিশ সরকারের দক্ষিণ হস্ত। এই নিয়ে বিরাট সমস্যার উদ্ভব হয়। সমস্যা আন্তপ্রাদেশিক, আন্তকলোনিয় এবং ব্রিটিশ প্রজা সম্বন্ধীয় । সমস্যা সমাধানে এক তদন্তকারী কমিটি

গঠন করা হয়। এদিকে পুলিশ, হাঙ্গামাকারীদের আটক করে রেখেছে। সরকার, তখন তদন্ত কমিটির উপর এই সমস্যার তদন্তের সমস্ত দায়িত্ব দেন। ঐ কমিটির সদস্য হিসাবে তদন্ত করতে গিয়ে মহারাজ বিজয়চাঁদ চিন্তা করলেন, সমস্যা মূলত এই জাপানী জাহাজটিকে কেন্দ্র করে। তাঁর ধারণা, এই জাপানী জাহাজ 'কামাকাটামারু' যাতে ভারতীয়রা কানাডার ভাঙ্কুভার বন্দরে উপনীত হন। হয় তো সেই কারণেই যাত্রীদের নামার অনুমতি দেন নাই কানাডা সরকার।

হাঙ্গামা সৃষ্টির ব্যাপারে ভারতীয় সংবাদ পত্রের বক্তব্য,– উক্ত জাহাজের যাত্রীদের মধ্যে ২২ জন ভারতীয় ছিলেন কানাডা প্রবাসী, তাঁরাও সেখানে অবতরণ করতে পারেন নাই; একই কমনওয়েল্‌থে বসবাসকারী হয়েও তাঁদের ফিরে আসতে হয়।

ভারত সরকারের কাছে খবর ছিল, যাত্রীরা ফিরে এসে হাঙ্গামা বাধাতে পারে। সংবাদটি জানিয়েছিলেন স্টীমারের পদস্থ কর্মচারীগণ।

আর একটি অভিযোগ উঠেছিল, শিখদের মাথার চুল টানা নিয়ে। শিখ সম্প্রদায় কখনও মাথার চুল কাটেন না, তাঁদের ধর্মীয় নির্দেশ। পুলিশ নাকি তাঁদের মাথার চুল ধরে টানা-হ্যাচড়া করেছিল।

এ ছাড়াও ইউরোপীয়ানদের অভিযোগ ছিল,- আন্দোলনকারী বাঙ্গালীদের সঙ্গে শিখরা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে জার্মানিদের সঙ্গে যোগাযোগ করছে।

যাইহোক, বিজয়চাঁদ ছিলেন ব্রিটিশ সরকারের অত্যন্ত বিশ্বস্ত। সুতরাং তাঁর প্রদত্ত তদন্ত রিপোর্ট-ই ঠিক এবং যুক্তি যুক্ত হবে।

মহারাজা বিজয়চাঁদ অভিযোগগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুধাবন করে রিপোর্টে জানান, বজবজে নেমে যাত্রীরা কোন দাঙ্গা-হাঙ্গামা বলতে যা বোঝায়, সেরূপ কোন ঘটনা ঘটে নাই পুলিশও তাঁদের আটক করেন নাই। সামান্য গোলমাল হলেও তা পুলিশে সামাল দেয়, আটক করেন নাই।

ভারতীয় সংবাদ পত্রে প্রকাশিত, ২২ জন কানাডা-প্রবাসী ভারতীয় সেখানে ফিরে যেতে পারেন নাই।– বিজয়চাঁদ অনুসন্ধান করে জানতে পারেন সংবাদে প্রকাশিত তথ্য ভুল। বরং কানাডায় ফিরে যেতে তাঁদের কোন অসুবিধা হয় নাই।

জাহাজের পদস্থ অফিসররা সন্দেহ বশতঃ ভারত সরকারকে যে সংবাদ দিয়েছিলেন, তা ভ্রান্তি মূলক। ফিরে আসা যাত্রীদের মধ্যে ক্ষোভ হলেও মারাত্মক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় নাই। পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য পুলিশ শূন্যে গুলি নিক্ষেপ করেছিলেন।

বিজয়চাঁদ বিশেষ তদন্ত করে জানতে পারলেন পুলিশ যে শিখদের কেশ আকর্ষণ

করেছেন তা সর্বৈব মিথ্যা; তিনি শিখদের জিজ্ঞাসাবাদ করে এই ব্যাপার জানতে পারেন।

তিনি সর্বশেষ রিপোর্টে উল্লেখ করেন, কোন রাজনৈতিক আন্দোলনকারী বা বিপ্লবীর সঙ্গে শিখদের কোনরূপ যোগই ছিল না। কাজেই , শিখ ও বাঙ্গালী বিপ্লবীদের, সঙ্গে জার্মানীদের কোন যোগাযোগ বা ষড়যন্ত্র ছিল না।

জাপানী জাহাজ 'কামাকাটামারু' কে নিয়ে উক্ত সমস্যাগুলির যে উদ্ভব হয়েছিল, তা বিজয়চাঁদ বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে সমাধান করেন।

কারমাইকেল দেশে চলে গেছেন। বড়লাট হয়ে এসেছেন রোনাল্ড্সে। এই সময় কাউন্সিলের পদ শূন্য থাকায় রোনাল্ড্সে মহারাজ বিজয়চাঁদের নাম সুপারিশ করে ইংলণ্ডে পত্র দেন। কিন্তু কারমাইকেল ও হার্ডিঞ্জ তার বিরোধিতা করেন। শেষ পর্যন্ত রোনাল্ড্সের ইচ্ছা অনুসারে বিজয়চাঁদই কাউন্সিলের সদস্য মনোনীত হন। সেই সময় স্বদেশী আন্দোলনে দেশ উত্তাল। আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে অকথ্য পুলিশী নির্যাতন চলছে। তখন বিশিষ্ট নেতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং এ্যানিবেসান্ত পুলিশী নির্যাতনের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে সরকারকে অভিযোগ করেন। অভিযোগ পেয়ে সরকার বিজয়চাঁদকে তদন্তের ভার দেন। বিজয়চাঁদ কর্তৃপক্ষকে জানালেন, তিনি এককভাবে তদন্ত করলে দেশের লোকেরা তাঁকে ইংরেজ অনুগত বলে গণ্ডগোল বাধাবে। তাই কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করলেন, তাঁর সঙ্গে রাসবিহারী ঘোষ অথবা গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় যেন থাকেন। গভর্ণমেণ্ট বিজয়চাঁদের কথায় সম্মত হল। তখন তাঁদের সহযোগিতায় যথাযথ রিপোর্ট পেশ করেন। সরকার তদনুরূপ পুলিস বিভাগকে নির্দেশ দেন।

স্বদেশী আন্দোলনের দুটি দিক ছিল, একটি চরমপন্থী অপরটি নরমপন্থী। নরমপন্থীদের উদ্দেশ্য ছিল সরকারের নিকট 'আবেদন-নিবেদন' মাধ্যমে আলাপ আলোচনায় দেশের স্বাধীনতা অর্জন করা। বিজয়চাঁদ এই নরম পন্থীদের সমর্থক ছিলেন, তিনি মনে করতেন, চরমপন্থীদের আন্দোলনে দেশের জনগণের বিশেষ ক্ষতি হবে, দরিদ্র সাধারণ উৎপীড়িত হবেন। হিংসা ও হত্যার দ্বারা স্বাধীনতা অর্জন করা যায় না। তিনি বঙ্গের সমস্ত জমিদারকে জানিয়ে দেন যাতে সন্ত্রাসবাদীরা প্রজাদের উত্তেজিত করে ক্ষতি সাধন করতে না পারেন। সন্ত্রাসবাদীরা বিজয়চাঁদের এই বিরুদ্ধ মনোভাবের জন্য তাঁকে হত্যা করার হুমকি দিতেন।

এদিকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়েছে এবং শান্তিপ্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। গর্ভমেন্ট সমস্যায় পড়লেন, রাজনৈতিক-বন্দীদের মুক্তির ব্যাপারে। সরকার বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতাদের নিয়ে বৈঠক করেছেন; কিন্তু তাতে কোন ফল হয় নাই। শেষে মহারাজা বিজয়চাঁদকে, গভর্ণমেণ্ট সেই দায়িত্ব দিলেন। তিনি উভয় পক্ষের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনার পর যে

সিদ্ধান্তে আসেন তাতে রাজনৈতিক গোষ্ঠী ও সরকারপক্ষ উভয়েই তা মেনে নিলেন।

মহারাজ বিজয়চাঁদ কাউন্‌সিলের সদস্য থাকাকালীন দেশের ও দশের মঙ্গলজনক কাজের কথা চিন্তা করতেন। এই সময় কলকাতার সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদ শূন্য ছিল। তিনি, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে অনুরোধ জানিয়ে পত্র লেখেন, তিনি যেন উক্ত শূন্যপদের উপযুক্ত পণ্ডিতের নাম সুপারিশ করে পাঠান। আরও জানান মনোনীত ব্যক্তি নিয়োগপত্র পাওয়ার দুই-এক দিনের মধ্যেই যেন কাজে যোগ দিতে পারেন। এই পত্র পাওয়ার পর স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, পুনার একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ভাণ্ডকরকে সুপারিশ করে পাঠান। তাতে বিজয়চাঁদ জানান, বাংলায় তো অনেক বড় বড় পণ্ডিত আছেন কাজেই তাঁদের বাদ দিয়ে অন্য কোন দেশ থেকে পণ্ডিত নিয়োগ করলে বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হতে হবে। তখন বাংলার শীর্ষস্থানীয় প্রথিতযশা পণ্ডিত আশুতোষ শাস্ত্রী মহাশয়ের নাম কাউন্‌সিলে উপস্থাপিত করা হয়। শাস্ত্রী মহাশয়ই সংকৃত কলেজের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হন।

খিলাফত আন্দোলনের সময়, আন্দোলনের সমর্থনে কলকাতা মাদ্রাসার ছাত্ররা বিদ্যালয় যাওয়া বন্ধ করে দেয়। ব্যাপারটি কাউন্‌সিলের গোচরীভূত হলে বিজয়চাঁদ সরাসরি ছাত্রদের অভিভাবকদের পত্র দিয়ে জানান, তাঁরা ছেলেদের বিদ্যালয়ে পাঠাতে ইচ্ছুক কি না। ঘটনার উল্লেখ করে তিনি আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে এক পত্রে জানান, ছাত্রদের এই ধরণের বিশৃঙ্খলা বরদাস্ত করা যায় না। অভিভাবকরা চিঠি পাওয়া মাত্র সন্তানদের বিদ্যালয়ে পাঠিয়ে দেন।

ঢাকার নবাব হবিবুল্লাহ সাহেব লেখেন, তাঁর পিতার সঙ্গে মহারাজ বিজয়চাঁদের বন্ধুত্ব ও আন্তরিকতা ছিল গভীর। নবাব সাহেব অনুরোধ করেন, তাঁদের ও প্রজাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক মনোভাব যেন না থাকে, সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি বজায় রেখে চলেন। বিজয়চাঁদ কখনও সাম্প্রদায়িকতা ভাব মনে পোষণ করতেন না। প্রতিবার কোরবানি উৎসবে মুসলমান প্রজাদের উট উপহার দিতেন।

প্রেসিডেন্সি কলেজের সহ সভাপতি হিসাবে বিজয়চাঁদ, সামসুলহুদা নামক বিশিষ্ট শিক্ষিত ব্যক্তিকে নির্বাচিত করেন। এ বিষয়ে স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বিজয়চাঁদ্ মহ্‌তাবের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে, তিনি বলেছিলেন, জনগণের হিতার্থেই তিনি ঐরূপ করেছেন।

স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পরে অস্থায়ীভাবে "কিছুকাল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলার পদ পাবার পর 'টাইমস-অব্-ইণ্ডিয়া'র লণ্ডনস্থ প্রতিনিধি

একদিন বিজয়চাঁদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন।" (বর্ধমানের কথা- সুশীল কুমার সেন, পৃঃ-১০৮)। সাক্ষাৎকারে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালন আইন ত্রুটিপূর্ণ। তা ছাড়া ভাইসচ্যান্সেলারের কাজ কঠিন; সুষ্ঠুভাবে কর্মসম্পাদনে বিপত্তি বহু, তারপর সুনাম নেই। এই পর্যন্তই প্রতিনিধিকে বলেন। মহারাজ বিজয়চাঁদ, ভাইসচ্যান্সেলার এর কর্মে নিযুক্ত থাকা কালীন নিরীক্ষা করে দেখলেন এখানে নির্ধারিত আইন যা আছে তদনুরূপ কাজ তো হয় না, বরং স্বজন পোষণ নীতিই চলে। লর্ড লিটন যখন বিজয়চাঁদকে স্থায়ীভাবে ভাইসচ্যান্সেলারের পদে নিয়োগ করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তখন উক্ত কারণে তিনি তা অস্বীকার করেন। বিশ্ববিদ্যালয়-পরিচালন আইনের ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকায় তিনি উক্ত পদ গ্রহণ করেন নাই।

মহারাজ বঙ্গীয় কাউন্সিলে দীর্ঘদিন সদস্য থেকে সুনামের সঙ্গে ভাল কাজ করায়, ভারত সরকার তাঁকে দিল্লীতে ইম্পিরিয়াল কাউন্সিলের সদস্য পদ দেওয়ার জন্য চিন্তা করলে, রোনালড্‌সে তাঁর সুবিধার্থে বিজয়চাঁদকে বঙ্গীয় কাউন্সিল থেকে ছাড়তে চাইলেন না। ভারত সরকার তাঁকে উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত করতে ইচ্ছা করেন; বিহার ও উড়িষ্যার গভর্ণর পদ দিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু তদপেক্ষাও উচ্চ পদ 'ইণ্ডিয়ান কাউন্সিলের' সদস্য পদ। সুতরাং ভারত সরকার বিজয়চাঁদকে ইণ্ডিয়ান কাউন্সিলের সদস্য মনোনীত করেন ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে। তখন তিনিবেঙ্গল কাউন্সিলের পদে ইস্তফা দেন। রাজনৈতিক জীবনের এই তাঁর শেষ অধ্যায়।

মহারাজা বিজয়চাঁদ প্রথমবার ইউরোপ ভ্রমণ করে ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে দেশে ফিরে কলকাতায় অবস্থান করতে থাকেন। সেই সময় ইংরেজ ভাবাপন্ন কিছু ব্যারিষ্টার, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তারদের গঠিত 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান- এ্যাসোসিয়েশন' নামে একটি সংগঠন ছিল। উক্ত এ্যাসোসিয়েশনের সদস্যগণ, বিজয়চাঁদকে সদস্য হিসাবে গ্রহণ করার জন্য বার বার অনুরোধ জানান। শেষ পর্যন্ত মানবিকতার খাতিরে ইণ্ডিয়ান-এ্যাসোসিয়েশনের সদস্য পদ গ্রহণ করেন এবং কিছুদিনের মধ্যে সভার সভাপতি নির্বাচিত হন। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষগণ এই সভার সঙ্গে সব সময় আলোচনা করে কাজ করতেন। সভা, ইংরেজ শাসক গোষ্ঠীর সঙ্গে বিরোধিতা না করে, সদ্ভাব বজায় রেখে দেশের মঙ্গল জনক কাজ যাতে হয় সে সম্বন্ধে চিন্তা করতেন। বিজয়চাঁদ তাঁর রাজনৈতিক জীবনের শেষ পর্যন্ত 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের' সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

ইতিমধ্যে ১৯২৪ খ্রীঃ ৫ ই জুন, রাজা বনবিহারী কপূর কলকাতার আলিপুর প্রাসাদে পরলোক গমন করেন। মহারাণী (বিজয়চাঁদের পত্নী) সংসার ত্যাগ করে কাশীবাসী হন।

THE PALACE
BURDWAN

BIJAY MANZIL.
8 JUDGES' COURT ROAD,
ALIPORE.
CALCUTTA

2. 9. 35



বাংলা ১৩২০ সাল (ইং ১৯১৩ সালে) বন্যা কবলিত কার্জন গেট

১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে। মহারাজ বিজয়চাঁদ রাজনৈতিক জীবন থেকে এবং জমিদারী, জ্যেষ্ঠ পুত্র উদয়চাঁদকে ইনচার্য করে, 'কোর্ট অব্ ওয়ার্ড'কে ভার দেন। অতঃপর তিনি কনিষ্ঠ পুত্র অভয়চাঁদ, দুই কন্যা সুধারাণী ও ললিতারাণীকে নিয়ে ইংল্যাণ্ড রওনা হন । প্রায় দশ বছর ইংল্যাণ্ডে অবস্থান করার পর ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলকাতা ফিরে আসেন। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজা বিজয়চাঁদ বেশ অসুস্থ হয়ে পড়েন, লিভার, কিডনি ও গলব্লাডার নষ্ট হয়ে যায়, বহু চিকিৎসাতেও সুস্থ হতে পারেন নাই। ১৯৪১ খ্রীঃ ২৯ শে আগষ্ট ৬০ বছর বয়সে পার্থিব জীবনের সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে সাধনোচিত ধামে গমন করেন।

মহারাজাধিরাজ বিজয়চাঁদ মহ্‌তবের সন্তান-সন্ততি ঃ— মহারাজ বিজয়চাঁদ্ মহ্‌তবের জ্যেষ্ঠ সন্তান উদয়চাঁদ মহ্‌তাব্ ১৯০৫ খ্রীঃ ১৪ই জুলাই কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে কন্যা সুধারাণী, কনিষ্ঠা কন্যা ললিতারাণী ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে এবং সর্ব কনিষ্ঠ সন্তান অভয়চাঁদ মহ্‌তাব্ জন্মগ্রহণ করেন ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে।

শৈশব থেকে বাল্যে উপনীত হলেও মহারাজ বিজয়চাঁদের কোন সন্তান-সন্ততি রাজপ্রাসাদের বাইরে আসেন নাই। তাঁরা রাজপ্রাসাদ প্রাঙ্গণেই খেলাধূলা করতেন।

বন্যার্ত ত্রাণে মহারাজাধিরাজ বিজয়চাঁদ ঃ– ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে দামোদরের প্রবল বন্যায় শহরের উপরে হাঁটুজল দাঁড়িয়েছিল এমন কি জি-টি রোডের ওপরেও জল উঠে গিয়েছিল, কার্জনগেটের তলদেশ পর্যন্ত জলস্রোত বয়ে চলেছিল কার্জনগেটের সম্মুখে প্লাবনের আলোক চিত্রটি প্রদত্ত হলো। ঐ আলোক চিত্রটি তুলেছিলেন শিল্পী চন্দ্রনাথ মেহেরা। তৎপুত্র প্রেমকুমার মেহেরার নিকট হতে সংগৃহীত হয়েছে। মহারাজ বিজয়চাঁদ মহ্‌তাব্, চন্দ্রনাথ মেহেরাকে উক্ত আলোকচিত্রের কপি চেয়ে যে পত্র দিয়েছিলেন তারও প্রতিলিপি দেওয়া হলো।

এখানে বলা প্রয়োজন, প্লাবিত মানুষ, গবাদিপশু এবং বস্তু সমূহ উদ্ধার কাজে তিনি তাঁর হাতীদেরও ব্যবহার করেছিলেন। তাছাড়া বন্যার্তদের জন্য তাঁর শস্য ও ধান্যভাণ্ডার উন্মুক্ত রেখেছিলেন।

মহারাজাধিরাজ উদয়চাঁদ

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দ। জ্যেষ্ঠ মহারাজকুমার উদয়চাঁদ মহ্‌তাবের বয়স তখন ১২ বছর। এই সময় সরকার তরফ থেকে মহারাজাধিরাজ বিজয়চাঁদের কাছে পত্র এল, ২১ শে ডিসেম্বর, ১৯১৭ খ্রীঃ, সময় সকাল ৯ ঘটিকায় গভর্ণর অভিষেক উৎসবে কুমার উদয়চাঁদকে তাঁর বালক-সঙ্গী করতে ইচ্ছা করেন। মহারাজাধিরাজ বিজয়চাঁদ মহ্‌তাব, পুত্র উদয়চাঁদ সহ অভিষেক অনুষ্ঠানে যোগ দেন। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে উদয়চাঁদের এই প্রথম যোগাযোগ। দ্বাদশ বর্ষ বয়ক্রম কাল হ'তেই আত্মমর্যাদা বোধ ছিল ভীষণ। তিনি, পিতা মহারাজাধিরাজ বিজয়চাঁদ মহ্‌তাব্‌কে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করতেন। এই সময়ে পিতাকে লেখা একখানি পত্রে লিখেছিলেন ঃ আপনার উপদেশ মত, আপনার নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তি ছাড়া অপর কাহারও নিকট হতে কোন জিনিস গ্রহণ করতে বাধ্য হলে, আমি দাতার কাছে কেবল অনুগৃহীত হয়ে থাকব না, নিজেকে, আমার মহান পিতাকে ও সেইসঙ্গে আমাদের বিরাট রাজবংশকে তাঁদের চোখে ক্ষুদ্র ক'রে ফেলব বলে মনে করি।

মহারাজাধিরাজ বিজয়চাঁদ মহ্‌তাব্‌, জ্যেষ্ঠ পুত্র উদয়চাঁদকে, তাঁর বিশাল জমিদারী ও ভূসম্পত্তির উত্তরাধিকারী হিসাবে যথোপযুক্ত শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করেন; সেই সঙ্গে কঠোর নিয়মানুবর্তিতার প্রতি লক্ষ্য রাখেন। দশ বছর বয়সে মহারাজকুমার উদয়চাঁদ পিতাকে বলিষ্ঠ ভাবে বলেছিলেন ঃ আপনার উপদেশ আমি মনে রাখি এবং উপদেশ অনুসরণ করে চলি।

মহারাজকুমার উদয়চাঁদের চৌদ্দ বছর বয়সের একটি ঘটনা; মহারাজাধিরাজ বিজয়চাঁদের অনুপস্থিতিতে তাঁর আলমারী থেকে একখানি প্রয়োজনীয় বই উদয়চাঁদ নিয়েছিলেন। তাতে পিতা ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হন। তখন উদয়চাঁদ পিতার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন ও প্রতিজ্ঞা করেন, তিনি আর কখনও এরূপ অন্যায় কাজ করবেন না। এই ঘটনা তাঁর মনে দীর্ঘদিন কষ্ট দিয়েছিল।

মহারাজকুমার উদয়চাঁদের শিক্ষা রাজপ্রাসাদে গৃহশিক্ষকদের মাধ্যমেই চলতো। বিশিষ্ট পণ্ডিত ও অধ্যাপকগণ নিয়মিত রাজবাড়ীতে এসে পঠন-পাঠন করাতেন। এই ভাবেই পড়াশুনা করে ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে ২১ বছর বয়সে প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র হিসাবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি-এ পাশ করেন। মহারাজকুমার উদয়চাঁদই বর্ধমান রাজবংশের প্রথম স্নাতক। এই সময় থেকে দুই ভাই প্রত্তিদিন সকালে ঘোড়ায়

চ'ড়ে বেড়াতে বার হতেন। তারপর স্নানান্তে শিবপূজা করতেন; জলযোগের পর পাঠগৃহের বইপত্র ইত্যাদি গুছিয়ে রাখতেন। দুপুরে রাজকাছারীতে বসতেন; জমিদারীর কাগজপত্র আয়-ব্যয় সমস্ত হিসাব-নিকাস, নায়েব-গোমস্তাদের নিকট বুঝে নিতেন। বিকালে প্রাসাদের মধ্যে টেনিস কোর্টে লনটেনিস খেলতেন।

মহারাজাধিরাজ বিজয়চাঁদ মহ্‌তাব্ ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে উদয়চাঁদকে জমিদারীর ইন্‌চার্জ করে 'কোর্ট-অব-ওয়ার্ডের' হস্তে ভারার্পণ করে বিলাত যাত্রা করেন, পূর্বেই তা উল্লেখ করা হয়েছে। জমিদারীর দায়িত্ব নিয়ে মহারাজকুমার উদয়চাঁদ দেখলেন, ৩৭,০০,০০০/= (সাঁইত্রিশ লক্ষ টাকা) ঋণ হয়েছে। ঋণ হওয়ার কারণ হিসাবে জানা যায় কতকগুলি সুযোগ সন্ধানী লোক মহারাজাধিরাজ বিজয়চাঁদকে বঙ্গের সামন্তরাজা হিসাবে পরিগণিত করার ব্যাপারে বিভিন্ন কারণে ব্যয় বাবদ বারে বারে উক্ত টাকা গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তা সম্ভব হয় নাই। উদয়চাঁদ মহ্‌তাবের সম্মুখে ভীষণ সমস্যা। রাজকলেজের খরচ, উচ্চবিদ্যালয়ের খরচ, সি-এম-এস স্কুলের জন্য বরাদ্দ অনুদান, সংস্কৃত টোলের খরচ এ ছাড়া ফ্রেজার হাসপাতালের যাবতীয় খরচ, কানাই নাটশালার নিকট পালাফার্ম এর ব্যয় মহারাজাধিরাজই করতেন। তাছাড়া আছে জমিদারী পরিচালনার খরচ।

ধীশক্তি সম্পন্ন, ধীর, স্থির উদয়চাঁদ মহ্‌তাব্ এই কঠিন পরিস্থিতি বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে সমাধান করেন।

উদয়চাঁদ মহ্‌তাব্ সকল বিষয়ই, ইংলণ্ডে অবস্থান রত পিতা, মহারাজাধিরাজ বিজয়চাঁদ মহ্‌তাবের সঙ্গে যোগাযোগ করে কাজ কর্ম করতেন। মহারাজ বিলাত থেকেই পুত্রকে, সুযোগ্যা পাত্রী মনোনীত করে, নিজেকেই বিবাহের ব্যবস্থা করতে নির্দেশ দেন। পিতৃ নির্দেশে পঞ্জাবে এক শিখ পরিবারের মেয়ের খবর পান। কিন্তু ধর্মের গোঁরামির জন্য উক্ত কন্যাকে গ্রহণ করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। হায়দ্রাবাদে যে পাঞ্জাবী পরিবারের পাত্রীর সন্ধান পান, সেই পাত্রী, পিতার উপপত্নীর গর্ভজাতা। সুতরাং এই কন্যাটিও গ্রহণীয়া নয়। শেষে, ঘটক, অমৃতসরের সম্ভ্রান্ত রায়বাহাদুর পরিবারের বুদ্ধিমতী, সুরুচি সম্পন্না এক পাত্রীর খবর দেন। পাত্রীর পিতা রায়বাহাদুর দুনিচাঁদ মেহেরা, পাত্রীর নাম 'রাধারাণী'। অবশ্য উদয়চাঁদ মহ্‌তবের মাতার নামও রাধারাণী। ১৯২৯ খ্রীঃ ১৭ই জানুয়ারী অমৃতসরে বিনা পণে দুনিচাঁদ মেহেরার কন্যা রাধারাণীর পাণি গ্রহণ করেন। বিবাহ অনুষ্ঠানের পরেই সেইদিনই বিশেষ ট্রেণ যোগে বর্দ্ধমান রওনা হন, ১৯শে জানুয়ারী বর্দ্ধমান ষ্টেশনে পৌঁছান। নবদম্পতিকে হস্তী পৃষ্ঠে

শোভাযাত্রা করে প্রসাদে আসার ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু জঙ্গবাহাদুর ও রঙ্গবাহাদুর দুটি হস্তীই অসুস্থ থাকায় চার ঘোড়ার গাড়ীতে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা সহ গোলাপবাগ প্রাসাদে কয়েক দিন অবস্থান করে সেখানে আনন্দোৎসব প্রতিপালিত হলো। কৃষ্ণসায়রের পাড়ে আতসবাজি পোড়ানো হলো। পাঁচ শত বিশিষ্ট অতিথি সমাবেশে এই উৎসব প্রতিপালিত হয়। তারপর ২৫শে জানুয়ারী নবদম্পতি মোবারক মঞ্জিলে শুভগমন করেন।

কোর্ট-অব-ওয়ার্ডস্ ১৯৩০ খ্রীঃ ১৬ই জানুয়ারী মহারাজকুমার উদয়চাঁদ মহ্তাব্‌কে সমগ্র এস্টেটের অবৈতনিক প্রধান ম্যানেজার এবং একজন ডেপুটি কালেক্টর মনোরঞ্জন মৈত্রকে মাসিক বেতনে সহকারী নিয়োগ করেন। তিনি উপযুক্ত ও সুদক্ষ কর্মী ছিলেন।

উদয়চাঁদ মহ্তাবের কঠোর পরিশ্রম, বুদ্ধিমত্তায় ও দক্ষ পরিচালনায় ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসের মধ্যে ৩৭,০০,০০০ (সাঁইত্রিশ লক্ষ) টাকা ঋণ ও ৬৭,০০০ (সাতষট্টি হাজার) টাকা সুদ সহ সমস্ত দেনা পরিশোধ করেন এবং আগামী জানুয়ারী কিস্তি বাবদ অগ্রিম ১,৫০,৯০০ (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার নয়শত) টাকা জমা দেন। তাঁর কাজে, মনোরঞ্জন মৈত্র ছাড়াও উচ্চপর্যায়ের রাজ কর্মচারী রেবতী মোহন দত্ত, রাজেন সেন প্রভৃতির আন্তরিক সহায়তা ও নিষ্ঠা ছিল যথেষ্ট।

১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে গভর্ণমেণ্ট অব্ ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট অনুসারে প্রত্যেক প্রদেশে আইন-সভা গঠনের নির্দেশ দেন। তাতে সাধারণ, তপশীলী, মুসলমান প্রভৃতি সম্প্রদায়ের জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক আসন নির্ধারিত হয়। উদয়চাঁদ মহ্তাব্ সাধারণ আসনে পদপ্রার্থী হয়ে নির্বাচনে দাঁড়ান। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন গান্ধীবাদী কংগ্রেস কর্মী বিজয়কুমার ভট্টাচার্য্য। উদয়চাঁদ মহ্তাব্ প্রতিদ্বন্দ্বীতায় বিজয়কুমারকে পরাজিত করে আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই সভার সদস্য থাকার মেয়াদ; তারপর পুনর্নির্বাচন। কিন্তু ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়; পুনর্নির্বাচন আর হয় নাই, কাজেই উদয়চাঁদ মহ্তাব্ ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের সময়কাল পর্যন্ত সদস্য ছিলেন। স্বাধীনতার পর প্রথম পশ্চিমবঙ্গের অস্থায়ী স্পীকার নির্বাচিত হন।

১৯৩৬ খ্রীঃ প্রথম দিকে পুত্র কন্যা সহ মহারাজাধিরাজ বিজয়চাঁদ মহ্তাব্ দেশে ফিরলেন। তখন কোর্ট-অব্-ওয়ার্ড, তাঁকে তাঁর জমিদারী প্রত্যর্পণ করেন এবং বিচক্ষণতা ও কৃতিত্বের সঙ্গে রাজ্য পরিচালনা ও সুদসহ সমস্ত ঋণ পরিশোধ

করায় উদয়চাঁদ মহ্‌তাবের প্রতি অত্যন্ত খুশি ও প্রীত হয়ে তিনি নিজ হস্তে জমিদারী গ্রহণ করলেন না জ্যেষ্ঠ পুত্রকেই সব দায় দায়িত্ব ছেড়ে দিলেন। কনিষ্ঠ পুত্র অভয়চাঁদ মহ্‌তাব্‌কে তিনি অবৈতনিক ম্যানেজার নিযুক্ত করেন। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে উদয়চাঁদ মহ্‌তাব্‌ মহারাজাধিরাজ উপাধি প্রাপ্ত হন এবং সিংহাসনে উপবেশন করেন। ঐ বছরেই ২৯শে আগষ্ট মহারাজাধিরাজ বিজয়চাঁদের দেহাবসান হয়। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। এক্ষণে মহারাজাধিরাজ উদয়চাঁদ মহ্‌তাব্‌ পিতৃনির্মিত 'বিজয়ানন্দ বিহারে' তাঁর পিতার চিতাভস্ম সংরক্ষণ করে আগ্রার ফতেপুর সিক্রীর ধরণে লাল পাথরে স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করান। বলাবাহুল্য মহারাজা বিজয়চাঁদ ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে লালপাথর ও সৌধ নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ করে রেখেছিলেন। বিজয়ানন্দ বিহার আশ্রমের মধ্যে যে সব দেব-দেউল মহারাজাধিরাজ বিজয়চাঁদ মহ্‌তাব্‌ নির্মাণ করিয়েছেন তার সবই ঐ লাল পাথরে নির্মিত।

মহারাজাধিরাজ উদয়চাঁদ মহ্‌তাব্‌ রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হলেও পিতৃবিয়োগের দেড় বছর পর ১৯৪৩ খ্রীঃ ৮/৯ই মার্চ দুই দিন সিংহাসন প্রাপ্তির অনুষ্ঠান কর্ম প্রতিপালিত হয়।

কুমার অভয়চাঁদ 'বনাবাস' প্রাসাদেই থাকতেন। শেষে তিনি বাঙ্গালোর শহরে ছিলেন এবং সেখানেই তিনি ১৯৯৩ খ্রীঃ অক্টোবর মাসে পরলোক গমন করেন। মরদেহ বর্দ্ধমানে নিয়ে এসে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

মহারাজ উদয়চাঁদ মহ্‌তাবের অভিষেক অনুষ্ঠান ঃ— বর্দ্ধমানের শেষ রাজা মহারাজাধিরাজ উদয়চাঁদ মহ্‌তাব্‌ এর অভিষেক অনুষ্ঠান। শেষ রাজা বলার কারণ একটাই,- ভারত স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে যে সংবিধান তৈরী হয় তাতে জমিদারী প্রথা, রাজামহারাজা খেতাব বিলুপ্ত হয়। মহারাজাধিরাজ স্যার উদয়চাঁদ মহ্‌তাবের সময়েই দেশ স্বাধীন হয়। সেইজন্য তিনি শেষ রাজা।

রাজার বাসস্থান মহ্‌তাব্‌মঞ্জিল, এখানে, মাথায় সাড়ে ছ' ফুটের ওপর দীর্ঘ দেহী শান্ত সৌম্য উজ্জ্বল কান্তি উদয়চাঁদ, পরনে মণিমুক্তা খচিত শেরয়ানী, কোমরে সোনার কিং খাপে নিশিত তরবারি, নক্সা করা লাল মখমলের 'রোব-অব্‌-অনার' পশ্চাতে কাঁধ থেকে পৃষ্ঠদেশে আ-ভূমি প্রলম্বিত, বামহস্ত মুষ্টিতে ধৃত মুঘল ঢাল। পরিবেষ্টিত বিশিষ্ট ব্যক্তি বর্গ সহ শোভাযাত্রা ক'রে বিশাল দরবার কক্ষে উপনীত হলেন।

কক্ষে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে চেয়ারে আসীন বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বর্গ উঠে দাঁড়ালেন। মহারাজার জন্য নির্দিষ্ট স্বর্ণসিংহাসনে উপবেশন করলেন, তার দু'পাশে রক্ষিত দুটি রজত সিংহাসনের একটিতে বসেন যুবরাজ, মহারাজের জ্যেষ্ঠ পুত্র সদয়চাঁদ মহ্‌তাব্‌ অপরটিতে বসেন রাজভ্রাতা অভয়চাঁদ মহ্‌তাব্‌। মহারাণী ও রাজ বধূদের বসার জন্য ছিল বিশেষ আসন। দরবার কক্ষের প্রথম সারির চেয়ারগুলিতে মহারাজের অন্যান্য পুত্রগণ ও তাঁর একান্ত আত্মীয়বর্গ বসেন। দরবার হলের পাশে মার্বেল পাথরের তৈরী বহু ছিদ্র বিশিষ্ট একটি পর্দা ছিল। এই পর্দার অন্তরাল থেকে ছিদ্র দিয়ে রাজপুরবাসিনীরা অভিষেক পর্ব দেখেন। সভাকক্ষের উপস্থিত ব্যক্তিগণ কেহই ঐ পর্দার অন্তরালবর্তীনীদের দেখতে পেতেন না।

অভিষেক পর্বের সূচনা হয় বর্দ্ধমানের সম্ভ্রান্ত নাগরিকগণের প্রশস্তি বাণী, শুভেচ্ছা ও মানপত্র পাঠের মধ্য দিয়ে। তৎপরে সরকারী ও বিভিন্ন রাজন্যবর্গের শুভেচ্ছা বার্তা পাঠ সমাপ্ত হলে, রাজপুরোহিত, ব্রাহ্মণগণের বেদমন্ত্র পাঠের মধ্য দিয়ে রাজশিরে মুকুট পরান। অভিষেক পর্ব সমাপ্তির পর মহারাজাধিরাজ রাজবেশে সজ্জি ত, শিরে মুকুট, মহারাজাধিরাজ উদয়চাঁদ জয়ধ্বনির মধ্য দিয়ে দরবার কক্ষ থেকে নীচে নেমে আসেন। অগণিত দর্শকমণ্ডলীর অভিবাদন গ্রহণ করে, পদব্রজে রাজা ইষ্টদেবতা শ্রীশ্রী লক্ষ্মীনারায়ণ জীউ দেবতাকে প্রণাম নিবেদন করে যান। তারপর যান পীর খাজা খক্কর সাহেবের দরগায়। এই ভাবেই শেষ হয় প্রথম দিনের অভিষেক পর্ব। দ্বিতীয় দিনে শুধু অগণিত দরিদ্রদের অন্ন বস্ত্র দান করেন।

রাজমুকুটের কথা ঃ— বর্দ্ধমান রাজপরিবার পঞ্জাবের অধিবাসী। সুতরাং তাঁদের শিরস্ত্রাণ পাগড়ি। এই পাগড়ি পরিহিত, রাজা বনবিহারী কপূরের শ্বেত মর্মর নির্মিত আবক্ষ প্রতি মূর্তি আঞ্জামান কাছারির সম্মুখে বকুলতলায় পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু মহারাজা মহ্‌তাবচাঁদ এক নতুন ধরণের শিরস্ত্রাণ পরিকল্পনা করেন। এই শিরস্ত্রাণ বা মুকুটটির নামকরণ করেন 'বর্দ্ধমান ক্যাপ'। টুপীটির বৈশিষ্ট্য হলো। বাইরের দিকটি হিন্দুদের টুপীর মত এবং ভিতরের দিক মুসলিম কুল্লার ন্যায়। মুকুটে বহু হীরা খচিত ছিল। সর্বাপেক্ষা বড় হীরাটির ওজন ছিল ৮৩ ক্যারেট। এই হীরাটির নাম 'জাহাঙ্গীর ডায়মণ্ড'। হীরাটির গাত্রে পার্শী ভাষায় সম্রাট জাহাঙ্গীরের নাম লেখা ছিল। এই হীরকটি সম্রাট শাহ্‌জাহানের নির্মিত ময়ূরসিংহাসনে এক সময় শোভা পেত। (নিবন্ধ অলোক মোদক)

রাজমুকুটটি এখন আর বর্দ্ধমান সংগ্রহশালায় নাই। জমিদারী-রাজ প্রথা অবলুপ্তির



মহারাজাধিরাজ উদয়চাঁদ



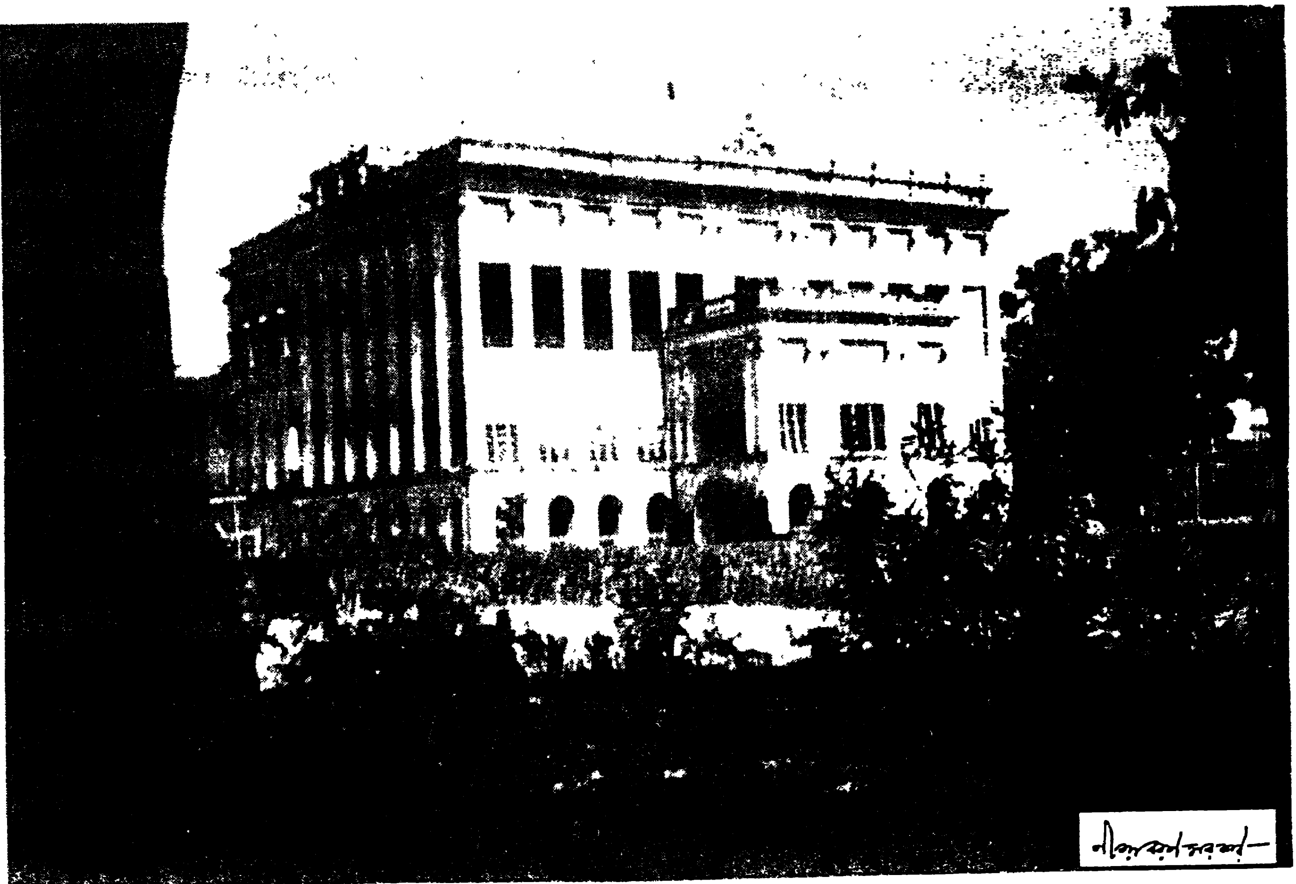
মহারাজা উদয়চাঁদ ও তাঁর স্ত্রী রাধরাণীদেবী এবং মহারাজকুমার অভয়চাঁদ ও তাঁর স্ত্রী চরণ কুমারী



মহারাজ কুমার অভয়চাঁদ



মহারাজাধিরাজ উদয়চাঁদ ও মহারাজ কুমার অভয়চাঁদ



মহাতাব মঞ্জিল

পর ভারত সরকারের শুল্ক-বিভাগ মুকুটটি নিয়ে গিয়ে তার সব হীরকই বিক্রী করে। তার বিক্রয় লব্ধ অর্থ ও ঐ বিভাগে জমা পড়ে। আর 'জাহাঙ্গীর ডায়মণ্ড' টি এখন লণ্ডণের 'জুবুডাক' এর কাছে আছে।

১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দ। স্বাধীন ভারতের নতুন সংবিধান পাশ হলো। তাতে দেশের সমস্ত রাজার রাজপ্রতীক *'Coat of Arms'*, নিজস্ব নিসান, এবং বংশানুক্রমিক রাজ উপাধি ব্যবহার করা নিষিদ্ধ হলো। তবে ১৯৫০ সালের পর জাত রাজপরিবারের অধস্তন বংশধররা কেহ উক্ত খেতাব বা উপাধি ব্যবহার করতে পারবেন না।

তারপর ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো। নির্বাচনে বর্দ্ধমান থেকে দাঁড়ালেন মহারাজাধিরাজ উদয়চাঁদ মহ্‌তাব্ তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বি, কমিউনিষ্ট নেতা বিনয় কৃষ্ণ চৌধুরী। এই নির্বাচনে মহারাজাধিরাজ পরাজিত হন। তিনি মানসিক দিক থেকে ভীষণ আঘাত পেয়েছিলেন।

মহারাজ উদয়চাঁদের সৌজন্যতা ঃ— ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বের ঘটনা। ১৯৪৭ খ্রীঃ ১৫ই আগষ্ট দেশ স্বাধীন হয়েছে। ১৯৪৮ খ্রীঃ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের প্রথম রাজ্যপাল রাজাগোপালাচারী এবং তাঁর পরবর্তী রাজ্যপাল কৈলাসনাথ কাটজু ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে বর্দ্ধমান আসেন। উভয় ক্ষেত্রেই মহারাজাধিরাজ উদয়চাঁদ মহ্‌তাব্ নিজে ষ্টেশনে গিয়ে তাঁদের অভ্যর্থনা জানান। মাননীয় অতিথিকে সুসজ্জি ত শ্রেষ্ঠ দুই ঘোড়ার রাজকীয় ফিটন গাড়ী করে, যাতে জনসাধারণ তাঁদের দেখতে পান সেই ভাবে, হাতী ও ঘোড়সওয়ার সহ বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা করে রাজপ্রাসাদে আনেন। মহারাণী অধিরাণী স্বয়ং তাঁদের 'মহ্‌তাব্ মঞ্জিলে' সম্বর্ধনা জানান। শহরের বহু অট্টালিকা আলোক মালায় সাজানো হয়েছিল দীপাবলী রজনীর অতিথি আপ্যায়ণে নাটক ও নৃত্য পরিবেশন করে; তারপর মহারাণী অধিরাণী বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা নৃত্যে অতিথিদের মনোরঞ্জন করে।

ঐ সব অতিথেদের ভোজসভার আয়োজন হয়েছিল মহারাজের সাজানো বাগান গোলাপবাগে।

প্রকৃত পক্ষে, অভ্যর্থনা, অতিথি আপ্যায়ণে ও সৌজন্যতায় মহারাজাধিরাজ উদয়চাঁদ ছিলেন তুলনা বিহীন। শুধু মহারাজ উদয়চাঁদ মহ্‌তাব্ই নন, তাঁর পূর্ববর্তী রাজগণের আতিথেয়তা যে কোন রাজন্যবর্গ অপেক্ষা কম ত নয়ই বরং তুলনায় অধিক।

পরবর্তীকালে ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে সাধারণ নির্বাচনে মহারাজাধিরাজ উদয়চাঁদ মহ্‌তাব্ মহিষী, রাধারাণী বিধান সভা আসনে দাঁড়ান। এবারেও প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন বিনয় কৃষ্ণ চৌধুরী।

এই নির্বাচনে বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরী পরাজিত হন। মহারাণী অধিরাণী রাধারাণী দেবী উপমন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিতা হয়েছিলেন। তিনি অধিক শ্রম জনিত ভীষণ অসুস্থ হয়ে ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হয়ে পড়েন।

মহারাজাধিরাজ উদয়চাঁদ মহতাবের অধস্তন বংশধর ঃ— মহারাজ উদয়চাঁদ ও মহারাণী রাধারাণী দেবীর জ্যেষ্ঠ সন্তান মহারাজাধিরাজ কুমার সদয়চাঁদ মহ্‌তাব্‌ ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। মধ্যমা কন্যা জ্যোৎস্নাদেবী ১৯৩৫ খ্রীঃ ভূমিষ্ঠ হন। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে দুই যমজ সন্তান করুণাদেবী ও মলয়চাঁদ; তাঁরা ১৫ মিনিটের ছোট বড়। সর্বকনিষ্ঠ পুত্র মহারাজকুমার প্রণয়চাদ্‌ মহ্‌তাব্‌ ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে পৃথিবীর আলোয় চোখ উন্মিলন করেন।

এঁরা বর্দ্ধমান রাজবংশের ১৭শ তম বংশধর। জন্মসূত্রেই এঁরা সকলেই 'মহারাজকুমার সাহেব' ও 'মহারাজকুমারী' খেতাবের অধিকারী। (তথ্য সূত্র অলোক মোদক)

মহারাজাধিরাজ উদয়চাঁদ মহ্‌তাব্‌ তাঁর পূর্বতন পঞ্চদশ পুরুষের প্রিয় বর্দ্ধমানকে শেষ বিদায় জানিয়ে যাওয়ার আগে তাঁর আবাসস্থল সুরম্য প্রাসাদ দান করে যান শিক্ষা কল্পে। ৩২৩ একর সম্পত্তি সমন্বিত সৌধে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে। রাজপ্রাসাদে, ১০ একর সম্পত্তিতে স্থাপিত হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনিক ভবন। প্রাসাদেরই অন্দরমহলে 'উদয়চাঁদ মহিলা মহাবিদ্যালয়' তোষাখানায় 'মহারাণী অধিরাণী বালিকা বিদ্যালয়', বালিকা বিদ্যালয়ের পশ্চিমে মহিলাকলেজ হোস্টেল, রাজকাছারী ঘরে হয়েছে সেটেলমেণ্ট অফিস। শ্রীশ্রী লক্ষ্মীনারায়ণ জীউ দেবালয় সংলগ্ন হাবেলীটুকু দেবদেবী সেবাইতের জন্য রেখে গেছেন। জীবদ্দশায় মহারাজ তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীসদয়চাঁদ মহ্‌তাবের সম্মতিক্রমে সর্ব কনিষ্ঠ পুত্র মহারাজকুমার প্রণয়চাঁদ মহতাব্‌কে দেব সেবার ভার অর্পণ করেন। তিনি একটি ট্রাস্ট কমিটি গঠন করে কমিটির নাম দেন 'মহ্‌তাব্‌ ট্রাস্ট কমিটি'।

রমনারবাগ-এর উত্তরাংশে রাজ্যসরকারের বনবিভাগ, পূর্বাংশে মৃগোদ্যান. পশ্চিমে 'বিজ্ঞান ভবন' দক্ষিণাংশে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রাবাস। যেখানে 'ডঃ মেঘনাদ সাহ তারামণ্ডল' নির্মিত হয়েছে সেই বিশাল পরিসর সম্পত্তিটি মহারাজের দান। কৃষ্ণসায়রকে কেন্দ্র করে যে 'পরিবেশ কানন' তৈরী হয়েছে সে-ও মহারাজের দান। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, অধ্যাপিকাদের জন্য আবাসন স্থানও মহারাজের দান।

১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে, মহারাজাধিরাজ উদয়চাঁদ মহ্‌তাব্‌ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের হাতে আরও অমূল্য সম্পদ তুলে দিয়েছিলেন, তা হলো, রাজপ্রাসাদস্থ মহারাজের গ্রন্থাগার। বহু মূল্যবান গ্রন্থরাজি এবং মহামনিষীদের পাণ্ডুলিপি ছিল এই গ্রন্থাগারে। তৎকালে মহীশূরের গ্রন্থাগারের পরেই ছিল বর্দ্ধমান মহারাজের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার। এই গ্রন্থাগারটি ছিল ভারতবর্ষের ব্যক্তিগত দ্বিতীয় বৃহত্তম গ্রন্থাগার। গ্রন্থাগারে বিভিন্ন ভাষার গ্রন্থ, ইংরাজী, উর্দু, বাংলা ছাড়া পার্শী ও সংস্কৃত ভাষায় এমন বই ছিল যা ভারতের অন্য কোথাও ছিল না। আর একখানি অতি অমূল্য ধর্মগ্রন্থ ছিল, যে'টি সম্রাট ঔরঙ্গজেব তাঁর নিজের হাতে লেখা কোরাণ, নিজের হাতে সেলাই করা লাল মখমলের আবরণে আবৃত তৎকালীন মহারাজকে উপহার দিয়েছিলেন। এই পবিত্র কোরাণটি অত্যন্ত সযত্নে বিশেষ স্থানে সংরক্ষিত ছিল।

সমস্ত আসবাবপত্র সহ বিপুল গ্রন্থসম্ভার বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করেন। এই সঙ্গে বহু আসবাবপত্র ও অন্যান্য মূল্যবান বস্তু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করতে অস্বীকার করায় মহারাজ সেইসব জিনিস নিলাম করার ব্যবস্থা করেন কিন্তু ডাঃ শৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও দুই-এক জন বিশিষ্ট ধনাঢ্য ব্যক্তি ছাড়া নিলামে কেহ আসেন নাই। কাজেই কলকাতার অক্সন হাউস অধিকাংশ জিনিসপত্র কিনে নেয়।

যাদুঘরে সংরক্ষণের নিমিত্ত বহু মূল্যবান সামগ্রীর মধ্যে অপূর্ব কারুকার্যময় মণিমুক্তা খচিত স্বর্ণ সিংহাসনটি এবং আরও দুটি রৌপ্য সিংহাসন সংরক্ষণের স্থান হলো না, সেগুলি গলিয়ে প্রাপ্ত সোনা রূপা কেন্দ্রীয় সরকারের খাজাঞ্চিখানায় জমা পড়ে। মহারাজের গুপ্ত ধনাগারে রক্ষিত (পূর্বে উল্লিখিত) ২১ লক্ষেরও বেশী কোম্পানি আমলের রৌপ্য মুদ্রা, ৪,৫০০ টি স্বর্ণ মুদ্রা, অর্ধমোহর ১২০ টি, সিকি মোহর ১,৪০০ টি, আকবরী মোহর ৩৫০ টি, কোম্পানি মোহর ৩৪০ টি, ইংলিশ গিনি ৯০ টি এবং অগুন্তি অর্ধগিনি, আর বহু বাংলা মোহর। এই সমস্তই কেন্দ্রীয় সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করেন। জানা যায় না, এগুলি অক্ষত আছে কি না। ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই উক্ত ব্যবস্থাদি সম্পন্ন ক'রে কলকাতায় 'বিজয়মঞ্জিল' প্রাসাদে গিয়ে বসবাস করেন, আর বর্দ্ধমান প্রাসাদে ফিরে আসেন নাই। ১৯৮৪ খ্রীঃ ১০ই অক্টোবর বর্দ্ধমান রাজবংশের শেষ রাজা মহারাজাধিরাজ উদয়চাঁদ মহ্‌তাব্‌ বাহাদুর ৭৯ বছর বয়সে ইহলীলা সংবরণ করেন। 'বিজয়ানন্দ বিহার'-এ তাঁর চিতাভস্ম সংরক্ষণ করে সমাধিসৌধ নির্মিত হয়।

মহারাজকুমার প্রণয়চাঁদ

মহারাজাধিরাজ উদয়চাঁদ মহতাবের ৬ সন্তান সন্ততির মধ্যে মহারাজকুমার প্রণয়চাঁদ্ মহ্তাব্ সর্ব কনিষ্ঠ। বর্দ্ধমানের রাঙামাটির সঙ্গে তাঁরই আছে আত্মিক টান। তিনি দেবসেবার কাজে সময় সময় বর্দ্ধমান আসেন, ২/৫ দিন থাকেন, লক্ষ্মীনারায়ণ জীউর ঠাকুর বাড়ীর জীর্ণ 'হাবেলী' অংশে।

তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা দার্জিলিং-এ, তারপর দেরাদুনের দুন স্কুলে,কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে *M.A.*ও ইতিহাসে ডক্টরেট করেন লণ্ডনের 'স্কুল অব্ ওরিয়েন্টাল এণ্ড আফ্রিকান স্টাডিজ' *(S.O.A.S)* থেকে। তারপর দেশে ফেরেন মহারাজকুমার ডঃ প্রণয়চাঁদ মহ্তাব্।

তিনি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় সেনেট, কাউন্সিল, বিশ্ববিদ্যালয় কোর্ট, বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার কমিটি, মিউজিয়াম কমিটি প্রভৃতির সদস্য, তা ছাড়া বর্ধমান রাজকলেজ, বাগাটি কলেজের পরিচালন সমিতির সদস্য এবং বর্ধমান ব্লাইণ্ড একাডেমিব সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

অল্প কথায় বর্দ্ধমান রাজপ্রাসাদ

বর্দ্ধমানে রাজবংশের প্রথম পুরুষ সঙ্গম রায় বর্দ্ধমান থেকে ৮/১০ কি.মি. দূরে রাইপুর বৈকুণ্ঠপুর গ্রামে বাসস্থান নির্মাণ করেন। তৎকালে ব্যবসা বাণিজ্য চলতো জলপথে। ভাগীরথী (গঙ্গা) ছিল নাব্য নদী। সুতরাং দাঁইহাটে ছিল 'বারদ্বারী' প্রাসাদ। বর্গী আক্রমণে ধ্বংস হয়। অম্বিকা কালনাতেও আছে রাজপ্রাসাদ। তারপর কাঞ্চনগরে নির্মিত হয় দ্বিতীয় 'বারদ্বারী' প্রাসাদ। পরে বর্তমান বর্দ্ধমান শহরে নির্মিত হয় যে প্রাসাদ তারই কথা এখানে আলোচ্য।

কাঞ্চনগরে অবস্থান কালেই মহ্তাব্চাঁদ চিন্তা করেন, এই অঞ্চল বর্দ্ধমান জনপদ থেকে দূরে অবস্থিত। সেইজন্য তিনি জনপদের মধ্যস্থলে বিরাট এলাকায় ১৮৪০ খ্রীঃ রাজ প্রাসাদ নির্মাণ করান। সমগ্র রাজপ্রাসাদ ইটালীয় স্থাপত্যের অনুকরণে নির্মিত এবং ইটালীয় স্থপতিরা মোটা মোটা সুউচ্চ স্তম্ভ দিয়ে গৃহ নির্মাণ করেন। স্তম্ভে ও গৃহের কারুকার্য এখনও যা বিদ্যমান তা বিস্ময় উদ্রেক করে। ত্রিতল উচ্চতা বিশিষ্ট প্রাসাদ, তার মাথার ওপর রোমান ঈগল। বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনিক ভবনের মাথায় শোভিত হয়ে আজও

শতাধিক বছরের প্রাচীন ঐতিহ্যকে অন্তরে পোষণ করে দাঁড়িয়ে আছে একটি ঈগল।

রাজবাড়ীর উত্তর ফটক, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশ পথ, সেই ফটক দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলে সামনে ৩০ ফুট উচ্চ দুর্গের মত প্রাচীর ছিল পূর্ব পশ্চিমে দীর্ঘায়ত। এখন যেখানে স্টেট ব্যাঙ্কের প্রধান গেট, সেখানে ছিল রাজ প্রাসাদে প্রবেশের প্রধান ফটক। এই ফটকটি উক্ত ফটকের তিনগুণ বড়। হাতীর পিঠে চ'ড়ে মহারাজরা এই ফটক দিয়েই ভিতরে প্রবেশ করতেন। ঐ ৩০ ফুট উঁচু প্রাচীরে ছিল, বার্মাসেগুণ কাঠের তৈরী বিশালাকার দরজা। তার ওপর ছিল পিতলের কারুকার্য করা ফলক বসানো। এইটিই রাজবাড়ী প্রবেশের মূল ফটক। রেলিং ঘেরা ফটক দিয়ে প্রবেশ করলে সারিবদ্ধ ৫টি মস্তক আচ্ছাদিত গম্বুজ ছিল। তার মধ্যে মহারাজা তিলকচাঁদ, মহারাজা মহ্তাব্চাঁদ, আফ্তাব্চাঁদ, ও মহারাজাধিরাজ বিজয়চাঁদ মহ্তাবের শ্বেতপাথরের আবক্ষ মূর্তি। প্রতিটি মূর্তির সামনে একটি করে মোঘল কামান ছিল; এগুলি সাজানো কামান নয়. কার্যরত কামান। এখন আর ওই দীর্ঘায়ত প্রাচীর নাই, মস্তক আচ্ছাদক গম্বুজের ২টি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকে প্রবেশ ক'রে ডান দিকে একটি, সম্মুখে ২টি অতীতের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চাকা লাগানো মোগল কামানগুলি ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে এস-ডি-ও সদরকে হস্তান্তরিত করা হয়েছে। এখন নজরুল-উদ্যান যার নাম দেওয়া হয়েছে, তখনও এই উদ্যান ছিল, তবে তার কোন নাম নির্দিষ্ট ছিল না। উদ্যানটির পশ্চিমে যে ত্রিতল অট্টালিকা দাঁড়িয়ে আছে সেইটি 'মহ্তাব্ মঞ্জিল', মহারাজ ও তাঁর একান্ত পরিবারের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। মহ্তাব্মঞ্জিলের প্রবেশ মুখে চারটি ব্রোঞ্জের মূর্তি ছিল, –২টি সশস্ত্র সৈনিক আর দুটি সিংহ-সিংহীর। সশস্ত্র সৈনিক মূর্তি দু'টি এখন কলকাতার বিড়লা-তারামণ্ডলে অপর দুটি মূর্তি 'গ্রাণ্ডহোটেলে'র শোভা বর্ধন করছে।

সমগ্র রাজ প্যালেসটি ইংরাজী 'টি' হরফের আকারে নির্মিত হয়েছিল। মহ্তাব্মঞ্জিল সংলগ্ন ছিল অনেকগুলি কক্ষ। মহ্তাব্মঞ্জিলটি ছিল তিনতলা; বাকী দোতলা। মহ্তাব্মঞ্জিলের সম্মুখে গাড়ী বারান্দা। তার সামনে দীর্ঘ শ্বেতপাথর বসানো প্যাসেজ। প্যাসেজের সম্মুখে, মূল্যবান আলবাস্টা মার্বেলের তৈরী মহারাজ মহ্তাব্চাঁদের আবক্ষ মূর্তি বসানো ছিল। প্যাসেজের দুপাশে সুসজ্জি ত বড় বড় ঘর বিশেষ বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়-স্বজনরা সাময়িক ভাবে থাকতে পারতেন। এই দীর্ঘ প্যাসেজ পেরিয়ে গেলে দেখতে পাওয়া যায় মেহগিনি কাঠের সিঁড়ি, নক্সা করা লোহার রেলিং সমন্বিত। আজ আর সেই জৌলুস নাই; কাঠের বার্ণিস বিবর্ণ, রেলিংগুলিও তদনুরূপ। ধুলোয় ধূসরিত সেই চেহারা, কোথাও ভেঙ্গে পড়েছে রেলিং। কাঠের সিঁড়ি সংলগ্ন দেওয়ালে সাজানো

ছিল মোগল ও মারাঠাদের অস্ত্র-শস্ত্র। এগুলিও সরকারী ভাবে তুলে দেওয়া হয়েছিল এস-ডি-ও সদরের হাতে (১৯৫৮ খ্রীঃ)। ওই সব ঐতিহাসিক উপাদান আজ কোথায়? জেলা প্রশাসন ও তা জানেন না।

ঐ কাঠের সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে দেওয়ালে প্রলম্বিত ছিল বিখ্যাত ইন্দো-ইউরোপীয়ান চিত্রকর *TILLY KETTLE* এর আঁকা বড় বড় তৈল চিত্র সুদৃশ্য নক্সা করা কাঠের (সোনালী রং) ফ্রেমে বাঁধানো, শোভা বর্ধন করতো; এখন আর নাই। তবুও ভাল যে সেগুলি এখন কলকাতায় ভিক্টোরিয়া স্মৃতিসৌধের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করেছে।

মহ্‌তাব্ মঞ্জিলের একতলায় মহারাজের একান্ত ব্যক্তিগত দুটি বিশাল সুদৃশ্য সুসজ্জি ত কক্ষ ছিল। একটি ঘরে থাকতো মিউজিক বক্স, 'বেঙ্গল স্কুল ফার্ণিচার এর তৈরী বেড ও কাঠের আসবাবপত্র। স্টাডিরুমে ছিল লেজারাসের তৈরী কেবিনেট (রোলটপ)। এরই সঙ্গে ছিল বৈঠকখানা ঘর, সেখানে ছিল সুন্দর দুটি আয়না, পাথরের টেবিল এবং লুইস সিক্সটিন্থ, ফ্রেঞ্চ ফার্ণিচার। পাশেই ছিল মহারাজের ডাইনিং রুম, সেখানে ছিল কাঠের গোল টেবিল, চর্মাচ্ছাদিত চেয়ার, বার্মা সেগুনের তৈরী শো-কেস। শো-কেসে ছিল রূপো, পোর্সেলিন ও বেলজিয়াম কাঁচের জিনিসপত্র।

মহ্‌তাব্‌মঞ্জিলের ত্রিতল ছিল মহারাণীর জন্য নির্দিষ্ট। তিনি সেখানে ছেলে মেয়েদের নিয়ে থাকতেন। এখানে বহু দামী আসবাবপত্র ছিল আরও ছিল ইংরাজ শাসক ওয়ারেণ হেস্টিংস এর আবাস ভবনের মূল্যবান ফার্ণিচারগুলি। ওয়ারেণ হেস্টংস যখন দেশে ফিরে যান তখন মহারাজা তাঁর কুটীরের ঐ সবগুলি নগদ মূল্যে কিনেছিলেন। এগুলি ছিল মহারাণীর শয়ন কক্ষে।

মহ্‌তাব্‌মঞ্জিলের ত্রিতল অংশের সঙ্গে যুক্ত, দ্বিতল প্যালেস ছিল। মহারাজের অফিস সংক্রান্ত কাজের জন ছিল একখানি যথোপযুক্ত সাজানো ঘর। দ্বিতল প্যালেসেই ছিল আর্টগ্যালারী, বিলিয়ার্ডরুম, ব্যাঙ্কোয়েটহল, গ্রন্থাগার, তাঁর নীচে নাচ ঘর ও দরবার হল।

আর্টগ্যালারীতে তখনকার দিনের বিশ্ববিখ্যাত চিত্রকর ড্যানিয়েল, হাড্‌সন, স্টাবস প্রমুখ শিল্পীদের আঁকা বহু তৈলচিত্র। তদানিন্তন কালে এক একটি ছবি লক্ষাধিক টাকা মূল্যে বিক্রয় হতো। এই সব তৈল চিত্রের কতকগুলি কলকাতায় ভিক্টোরিয়া স্মৃতিসৌধে রক্ষিত আছে। জি-আই-সি'র রিপোর্ট থেকে জানা যায় ঐ ছবির মূল্য পঁচিশ কোটি (২৫,০০,০০,০০০) টাকারও বেশী। আর্টগ্যালারী সংলগ্ন একটি সুবিশাল ঘরে ছিল কাংড়া, মুঘল ও রাজপুত ঘরানার বহু মূল্যবান চিত্র। এই চিত্রগুলি কাপড় বা ক্যানভাসে আঁকা নয়, হাতীর দাঁত থেকে আঁশের মত পাত্‌লা পাত্‌লা ছিলে তুলে ম্যাট তৈরী করে, তার ওপর অঙ্কিত।

আর্টগ্যালারীর পাশে ছিল বিলিয়ার্ড রুম। মহারাজা বন্ধুদের নিয়ে বিলিয়ার্ড খেলতেন এখানে। বিলিয়ার্ড টেবিলটি বর্দ্ধমানে ন'ই; চুঁচুড়া ক্লাবে আছে। এই ঘরেই ছিল ইন্দো-ইউরোপীয়ান চিত্রকর চীনারীর অঙ্কিত প্রতাপচাঁদের পূর্ণাবয়ব তৈল চিত্র। এই চিত্রটি এখন আমেরিকার নিউইয়র্কের আর্টগ্যালারীতে শোভা পাচ্ছে।

বহু মূল্যবান চিত্র মহারাজাধিরাজ উদয়চাঁদ মহ্তাব্ ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে আর্টগ্যালারীর নথিপত্র সহ বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করেন। বলা বাহুল্য, সেগুলিও অবহেলা অযত্নে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। গ্রন্থাগারের বই আসবাবপত্র ইত্যাদির কথা পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে।

ব্যাঙ্কেয়েট হলটি, গ্রন্থাগার ও আর্টগ্যালারীর 'পর অপেক্ষাকৃত ছোট 'টি' আকৃতি প্যালেসের শেষ কক্ষ। শ্বেত পাথরের মেঝে, তার ওপর শ্বেত মর্মরের সুদৃশ্য একটি লম্বা টেবিং ছিল। ১০ জন একসঙ্গে বসে খেতে পারতেন। বাংলায় এই ঘরকে বলা হতো 'থালঘর'।

আর্টগ্যালারীর পাশেই ছিল গ্রন্থাগার। গ্রন্থাগারের ফার্ণিচারগুলি ছিল দামী বার্মাসেগুনের তৈরী। গ্রন্থাগারে সংগৃহিত ছিল বহু ভাষার দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ, পার্শী ও সংস্কৃত ভাষায় রচিত এমন কতকগুলি গ্রন্থ ছিল যা ভারতবর্ষের কোন গ্রন্থাগারে ছিল না। ইংরাজী, বাংলা ভাষার বহু গ্রন্থ ছিল এখানে। মুদ্রিত পুস্তক ছাড়াও বহু মনীষীদের পাণ্ডুলিপি। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে সম্রাট ঔরঙ্গজেবের হাতে লেখা কোরাণ তৎকালীন মহারাজকে উপহার দিয়েছিলেন। দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থসংগ্রহ, মনীষীদের পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ ইত্যাদির দিক থেকে মহীশূরের মহারাজার পরেই বর্দ্ধমান মহারাজার গ্রন্থাগারের স্থান। এ'সমস্তই ১৯৫৯ খ্রীঃ মহারাজাধিরাজ উদয়চাঁদ মহ্তাব্ বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করে দেন।

ভি-আই-পিদের জন্যও ছিল বসবার ঘর। 'টি'- প্রাসাদের এখন যেখানে ভাইসচ্যান্সেলার এর অফিস, সেই হলটি তখন ছিল ভি-আই-পি দের বসবার জন্যে নির্দিষ্ট।

ভি-আই-পি হলের ঠিক দক্ষিণ দিকে, বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিয়ণ অফিস রুমের ঠিক ওপরের হলটি দরবার হল। বিশালাকার এই 'হল'; মার্বেল বসানো মেঝে, তার ওপর বিছানো মখমলের কার্পেট। এই হলের সিলিং-এ বিখ্যাত শিল্পী অঙ্কিত 'সিলিংফ্রেসকো' সিলিং থেকে মাথার ওপর ঝুলতো কতকগুলি বেলজিয়াম কাচের বড় বড় ঝাড়বাতি। মহারাজের বসার জন্য ছিল সোনার সিংহাসন। তার দু'পাশে ছিল দুটি রূপার সিংহাসন। সেখানে একটিতে বসতেন যুবরাজ, অন্যটিতে বসতেন অন্যপুত্র বা ভ্রাতা। ঐ সিংহাসনে বসেই হতো রাজার অভিষেক। সভা চলা কালীন রাজা ঐ স্বর্ণ সিংহাসনে বসতেন।

ঐ স্বর্ণ ও রৌপ্য সিংহাসনের নীচে সামনে থাকতো আত্মীয় স্বজদের জন্য চেয়ার। সম্ভ্রান্ত ও সভাসদদের জন্য থাকতো হলের দু'পাশে সারিবদ্ধ চেয়ার। দরবার হলের

পাশেই ছিল রাজবধূ ও মহারাণীর বসার বিশেষ ব্যবস্থা বহুছিদ্রযুক্ত মার্বেল পাথর নির্মিত আবরু পর্দা। তার অন্তরাল থেকে রাজ অন্তঃপুর-রমনীরা ছিদ্র দিয়ে অভিষেক ক্রিয়া ইত্যাদি দেখতেন; সভাস্থ কোন ব্যক্তি তাঁদের দেখতে পেতেন না।

গ্রন্থাগার, আর্টগ্যালারী, বিলিয়ার্ড রুমের নীচে 'ইউ' আকৃতির 'নাচঘর' ছিল এক তলায়। মহ্‌তাব্ মঞ্জিলের মূল ফটক পার হয়ে ভিতর পথেও সরাসরি নাচঘরে পৌঁছনো যেতো। নাচঘর এমন সজ্জি ত ছিল যে, সিনেমায় প্রদর্শিত রাজাবাদ্‌শাহ্‌দের নাচঘর অপেক্ষা কোন ক্রমেই ন্যূন নয়। এ ঘরে শোভা পেত বহু সৌখিন আসবাবপত্র; বিশালাকার বর্ণনাতীত সুন্দর ঝাড়বাতি। এখন আর এখানে নাই; গ্রাণ্ডহোটেলের সুবিশাল লবিতে দোদুল্যমান হ'য়ে, প্রতিফলিত আলোক, বিচ্ছুরিত ক'রে সৃষ্টি করছে বর্ণালির।

দিলারাম ঃ— বিশ্ববিদ্যালয়ের এখন যেটি মিউজিয়াম, সেই ঘরটি হল দিলরাম। দিলারাম-এর চারদিকে ছিল বিরাট উচুঁ প্রাচীর; প্রাচীরে ছিল হাজার হাজার পায়রার খোপ। এখানেই ছিল একটি পুকুর তাতে সুন্দর একটি সুইমিংপুল। পাশে ছিল টেনিসকোর্ট।

ইংলিশ গেষ্ট হাউস ঃ— 'দিলারামের' উত্তরপূর্বে যে বাংলো টাইপের গৃহ আছে, বর্তমানে ভাইসচ্যান্সেলারের বাংলো হয়েছে, সেই গৃহটি ছিল রাজ আমলে ইংলিশ গেষ্ট হাউস। নামেই বোঝা যায় ইংরেজ অতিথিদের জন্য নির্দিষ্ট।

মোবারক মঞ্জিল ঃ— বর্তমান যেখানে সেটেল্‌মেণ্ট অফিস অবস্থিত প্রসাদের সেই অংশটিই মোবারক মঞ্জিল। এখানেই ছিল মহারাজের আঞ্জুমান কাছারী। এখানে ম্যানেজার থেকে শুরু করে একাধিক উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের অফিস ছিল। নিরাপত্তার জন্য প্রহরীর ব্যবস্থা ছিল। প্রহরীদের বিভিন্ন বিভাগ ছিল। যেমন সোর্ডম্যান, বাইক (বর্শাধারী সৈন্য), সিপাহি (বন্দুকধারী), সওয়ার (ঘোড়ার পিঠে সৈনিক) মাহুত (হাতীর পিঠে সৈনিক)।

এখানে উল্লেখ্য, সওয়ারদের পর্যায়ক্রমে কর্মের জন্য পদোন্নতি হতো। হাবিলদার থেকে জমাদ্দার, সুবেদার তারপর সবশেষে সুপ্রিম কমাণ্ডর বা বক্সি পদে উন্নীত হতেন।

ঘোড়াদের জন্য ছিল উপযুক্ত ঘোড়াশালা এবং হাতীদের জন্য ছিল হাতীশালা তার পাশেই দুটি উট থাকতো। জমিদারী প্রথা বিলুপ্তির সময়ও মহারাজাধিরাজের 'দলবাহাদুর', একে লক্ষ্মৌ চিড়িয়াখানা, অন্য দুটি সাহাজাদী ও লীলাবতী, এদের পাঠানো হয় কলকাতার আলিপুর চিড়িয়াখানায়; এই তিনটি হাতী ছিল।

শেলখানা ঃ— এইটি ছিল বর্দ্ধমান মহারাজের অস্ত্রাগার। অস্ত্রাগারের প্রধানকে বলা হতো শিকলদার। জমিদারী বিলুপ্তির পর বর্দ্ধমান মহারাজাধিরাজ উদয়চাঁদ মহ্‌তাব্ সমস্ত অস্ত্র তৎকালীন মহকুমা শাসক (সদর) এর হাতে তুলে দেন।

রাজমহল ঃ— বর্তমানে যেটি উদয়চাঁদ মহিলা মহাবিদ্যালয় অবস্থিত সেই মহলটি রাজমহল। এখানে মহারাজের সন্তান-সন্ততি ছাড়া রাজ পরিবারের অন্যান্য আত্মীয় এমন কি যুবরাজ ও থাকতেন এই মহলে। এই মহলেই ছিল গুপ্তঘর বা রাজ ধনাগার। এখানে বিশালায়তন ৪টি চৌবাচ্চা সহ দুটি গুপ্তঘর ছিল। সংরক্ষিত বিভিন্ন সময়ের স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার কথা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে।

তোষাখানা ঃ— প্রাসাদের দক্ষিণাংশে এখন যেখানে মহারাণী অধিরাণী বালিকা বিদ্যালয় অবস্থিত এবং এই বিদ্যালয় সংলগ্ন উত্তর পশ্চিম অংশে মহিলা কলেজ ছাত্রী আবাস গঠিত হয়েছে সেই সমগ্র অংশটি ছিল 'তোষাখানা'। এখানে রক্ষিত থাকতো রন্ধনাদির তৈজসপত্র, সামিয়ানা, ত্রিপল ইত্যাদি যেগুলি বিবাহ, প্রভৃতি সকল প্রকার পারিবারিক উৎসবে ব্যবহৃত হতো। এই গুলি যে কেবল রাজপরিবারের কাজে ব্যবহৃত হতো তাই নয়, সাধারণেও প্রয়োজনে বিনা ভাড়ায় ব্যবহারের জন্য পেতেন।

মহ্‌তাব্‌চাঁদ যখন কাঞ্চনগর থেকে রাজবাড়ী মহ্‌তাব্ মঞ্জিল নির্মাণ করেন তখন তারই সঙ্গে সমগ্র রাজপ্রাসাদে একাধিক রম্যোদ্যান করেন। ঐ সব উদ্যানের স্থানে স্থানে ব্রোঞ্জ নির্মিত ঝর্ণা ও পাথর সমন্বয়ে তা হয়েছিল আকর্ষনীয় রাজপ্রাসাদ, আয়েস মহল, আয়না মহল, ছোটখণ্ড, বড়খণ্ড, দক্ষিণখণ্ড, দিলারাম, ইংলিশ গেষ্ট হাউস, রূপমহল, মোবারক মঞ্জিল, রাজমহল ইত্যাদি মহলে বিভক্ত ছিল। তন্মেধ্যে 'দক্ষিণখণ্ড' মহলের দ্বিতলের পশ্চিম দিকের একটি কক্ষে জননী প্রণবদেয়ী দেবীর কোল আলো করে ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে ১৯শে অক্টোবর বিজয়চাঁদ (বিজনবিহারী) পৃথিবীর আলোয় চোখ মেলেন।

এখানে উল্লেখ্য. রাজপ্রাসাদের দক্ষিণে যে 'দক্ষিণখণ্ড মহল', সেখানে মহারাজ মহ্‌তাব্‌চাঁদের একমাত্র কন্যা ধনদেয়ী দেবীর দত্তক পুত্র অবনীনাথ মেহেরা এখানেই মাতৃ সান্নিধ্যে বসবাস করতেন। পরে অবনীনাথ মেহেরার পরলোক গমনের পর, রাজবাড়ীর দক্ষিণ অঞ্চলে ময়ূরমহল-এলাকায় প্রবেশ মুখে 'অবনী ভবন' নির্মাণ ক'রে তৎপুত্রগণ ভোলানাথ মেহেরা, চন্দ্রনাথ মেহেরা, পৃথ্বীনাথ মেহেরা সপরিবারে বসবাস করে আসছেন।

পরিশিষ্ট

সময়ের চোরাস্রোতে বিলীন হয়ে যায় জনপদের গরিমা, কিন্তু বাংলার লোকসংস্কৃতির প্রভাব এবং ঐতিহ্যের পটভূমিতে আজও সেসব জনপদের অনেক ঘটনা বা ইতিহাসকে অস্বীকার করা যায় না। আঞ্চলিক জনজীবনের সেইসব কিংবদন্তীকে ঘিরে আজও মানুষের মনে অসংখ্য প্রশ্ন। তাই অতীত বর্ধমান শহরের প্রাণসঞ্চার হয়েছিল বর্ধমান রাজবাড়িকে কেন্দ্র করে। এই শহরের প্রাণচাঞ্চল্য, দেবসেবাকে অবলম্বন করে গতিময়রূপ নিয়েছিল জমিদারি উচ্ছেদের সময় পর্যন্ত। শুধু বর্ধমান শহরেই নয় কালনা, কাটোয়া প্রভৃতি শহরে এমনকি গ্রামগঞ্জে দেববিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে সাধারণ মানুষকে দেবসেবার মাধ্যমে মানব সেবায় উদ্বুদ্ধ করেছিলেন রানী ব্রজকিশোরী, কীর্তিচাঁদ, চিত্রসেন, তিলোকচাঁদ, বিষ্ণুকুমারী, তেজচাঁদ, বিজয়চাঁদ প্রমুখেরা। জমিদারি উচ্ছেদের ফলে সেই ধারা স্তব্ধ। বর্ধমান শহরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সর্বমঙ্গলা মন্দির থেকে শুরু করে লক্ষ্মীনারায়ণজীউর মন্দির, রাধাবল্লভজীউর মন্দির, অন্নপূর্ণা ও রাজরাজেশ্বরের মন্দির, শ্যামসুন্দর জীউর মন্দির, শক্তিবিবির ঠাকুরবাড়ি, মনোমোহিনী ঠাকুরবাড়ি, ঈশানেশ্বর শিবের মন্দির রাজরাজেশ্বর শিবমন্দির, বিজয়ানন্দবিহার, ১০৮ শিবমন্দির, সাধক কমলাকান্ত কালীবাড়ি, খান্নাজি ঠাকুরবাড়ি, শ্রীশ্রী ভুবনেশ্বরী দেবী ও সোনার কালীবাড়ী, বুধকালী ও নাগেশ্বর শিব, ভূকালী, কুঞ্জবিহারী ঠাকুরবাড়ি, উইল বাড়ি প্রভৃতি দেবীলয়গুলি হয় তাঁদের প্রতিষ্ঠিত দেবালয় নতুবা তাঁদের সাহায্যে পরিচালিত দেবালয়। আর এই দেবালয়গুলিকে উপলক্ষ করে ছিল অতীতের ধর্মীয় সাংস্কৃতিক সামাজিক অনুষ্ঠান এবং বিনোদনের ক্ষেত্র।

এককালে বর্ধমানকে বলা হত দ্বিতীয় বৃন্দাবন। রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র তাঁর বিদ্যাসুন্দর কাব্যে অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে বর্ধমান শহর সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন—

"দেখি পুরী বর্ধমান সুন্দর চৌদিকে চান
ধন্য গৌড় যে দেশে এ দেশ
রাজা বড় ভাগ্যধর কাছে নদ দামোদর
ভালো বটে জানিনু বিশেষ।"

অতীতে বর্ধমান শহর সারাবছর কিরূপ গতিশীল ছিল তার কিছু কিছু দৃষ্টান্ত এখানে তুলে ধরছি।

তখন বর্ধমান শহরে ১লা বৈশাখ নববর্ষ এবং ঐ দিনই নতুনখাতা মহরৎ। সারাবছর যাতে সুখে শান্তিতে আনন্দে কাটে এই কামনায় নগরাধিষ্ঠাত্রী জাগ্রতা দেবী সর্ব্বমঙ্গলার আহ্বান জানিয়ে মাকে পূজো দিয়ে নতুন বছরের শুরু। আষাঢ় মাসে 'রথযাত্রা' এবং তাকে উপলক্ষ্য করে বিরাট মেলা বসত রথতলায়, বিশাল একজোড়া কাঠের রথ ছিল। একটিকে বলা হত রাজার রথ আর অপরটিকে বলা হত রাণীর রথ। বিশাল প্রকাণ্ড মাঠে রথ টানা হত। হাতির পিঠে শ্রীশ্রী লক্ষ্মীনারায়ণ জীউর ও শ্রীশ্রী শ্যামসুন্দর জীউকে নিয়ে গিয়ে একরথে শ্রীশ্রী লক্ষ্মীনারায়ণ জীউ এবং অপর রথে শ্রী শ্রী শ্যামসুন্দর জীউকে চড়ানো হত। তারপর রাজ কর্তৃপক্ষ স্পর্শ করার পরে হাতি এবং জনসাধারণ শঙ্খ ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে আনন্দে জয়ধ্বনি করে রথ টানত। সকালে লক্ষ্মীনারায়ণ জীউর ঠাকুরবাড়িতে রূপোর রথ এবং পিতলের রথদুটিকে সুন্দর করে পরিষ্কার করে সাজিয়ে গুছিয়ে দেবমূর্তিগুলি রথোপরি স্থাপিত হতো। রথ প্রস্তুত – টানা হবে – শঙ্খ ঘণ্টাধ্বনি আরম্ভ হল। রূপোর রথ প্রথমে রাজকর্তৃপক্ষ স্পর্শ করে সামান্য টান দেবার পর জনসাধারণ রথ টানত। সকালে লক্ষ্মীনারায়ণ জীউর ঠাকুরবাড়িতে মেলা বসত। রথতলায় বিকালে মাঠ জুড়ে মেলা হত। মেলাতে কুটির শিল্পের নানা জিনিস বিক্রি হত। তারপর শ্রাবণ মাসে ঝুলন উৎসব, তখনকার দিনে মহন্তর অস্থ্যল এবং রাজার ঠাকুরবাড়ির ঝুলন ছিল অতি বিখ্যাত ও অত্যন্ত আকর্ষণীয়। শ্রাবণী পূর্ণিমার এই ঝুলন উৎসব। সেই সঙ্গে এক এক ঠাকুরবাড়িতে এক এক রকম যাত্রা, কোন ঠাকুরবাড়িতে 'মতি রায়ের' যাত্রা, কোন ঠাকুরবাড়িতে 'কৃষ্ণযাত্রা' ভাগবৎ পাঠ, রামায়ণ গান। গ্রাম থেকে আসা মানুষ খেয়ে-দেয়ে ঝুলন দেখতে আসত। আর সঙ্গে নিয়ে আসত মুড়ি বেঁধে। ঘুরে ঘুরে শহরের ঝুলন দেখার পর যে কোনও ঠাকুরবাড়িতে যাত্রা শুনতে বসে পড়ত। ভোরবেলা যাত্রাপালা শেষ হত। এইভাবে ঝুলনের পাঁচদিনই তারা ঝুলনের আনন্দ উপভোগ করে বাড়ি ফিরত।

শ্রাবণের ঝুলনের পরই ভাদ্র মাসে জন্মাষ্টমী উৎসব খুব ধুমধাম করে উদ্‌যাপিত হত। নন্দ উৎসবও খুব জাঁকজমকভাবে পালিত হত। প্রতি বৎসর নন্দ উৎসবের দিন মহারাজ শ্রীশ্রী লক্ষ্মীনারায়ণ জীউর ঠাকুরবাড়িতে মতিলাল রায়ের যাত্রা পালাগান শুনতেন। ঐ দিন বিভিন্ন দলের শ্রেষ্ঠ পালার কয়েকটি নির্বাচিত দৃশ্য অভিনীত হত। মহারাজ মহাতাবচাঁদ বিচার করে শ্রেষ্ঠ দলকে পুরস্কৃত করতেন। বর্ধমানে একে বলত নন্দোৎসবের 'বাধাই গান'।

তারপর আশ্বিন মাসে দুর্গোৎসব। এই দুর্গোৎসব রাজবাড়িতে খুব জাঁকজমব

ভাবে পালিত হত। এই দুর্গোৎসবের বিশেষত্ব হচ্ছে এখানে পটেশ্বরী দুর্গাপূজা হতো। এই পটেশ্বরী দুর্গাপূজা এখনও লক্ষ্মীনারায়ণ জীউর ঠাকুর বাড়িতে হয় তবে সেই জৌলুস আর নেই।

এরপরই রাস উৎসব, লক্ষ্মীনারায়ণ জীউর মন্দিরে প্রবেশ করলেই মন চলে যাবে অতীতের স্মৃতি বিজড়িত ধ্বংসপ্রাপ্ত রাসমঞ্চটির দিকে। যেটি শুধু অতীতের স্মৃতিটুকু বহন করে আছে। ঐ সুন্দর রাসমঞ্চটিতে রাসউৎসব মহা সমারোহে উদ্‌যাপিত হত কার্ত্তিক মাসে।

কৃষ্ণসায়রের উত্তরপাড়ে আড়াঘাট এবং দক্ষিণপাড়ে চাঁদনি ঘাট। এই ঘাট থেকে শীতকালে সরস্বতী পূজোর পরের দিন অর্থাৎ প্রতিমা বিসর্জনের পরে সন্ধ্যায় বর্ধমানে রাজার আতসবাজি পোড়ানোর প্রতিযোগিতা হত। দুই ঘাটে দুই দল থাকত। মহারাজা পারিষদের সাথে চাঁদনিতে বসে দলের আতসবাজির প্রতিযোগিতা দেখতেন। বর্ধমানবাসিরা কৃষ্ণসায়রের চারপাশে দাঁড়িয়ে এই আতসবাজি পোড়ানোর দৃশ্য উপভোগ করত। এত জনসমাগম হত যা অকল্পনীয় ছিল। রাজ জমিদারি বিলুপ্তির পর তা বন্ধ হয়ে গেছে। শীতকালে শহরবাসীদের আরও বড় আকর্ষণ ছিল উইলবাড়ির ছবি। প্রতি বৎসর শীতকালে সরস্বতী পূজার দিন থেকে উইলবাড়ির ছবি জনসাধারণের দেখার জন্য ব্যবস্থা করা হতো।

সারা বছর গোলাপবাগের চিড়িয়াখানা খোলা থাকত। এই চিড়িয়াখানায় ছিল দুর্লভ সব পশু-পাখির সমাবেশ। এখানে ছিল নানা দেশ থেকে সংগ্রহ করা বিচিত্র সব পশু-পাখির আবাসস্থল। এই চিড়িয়াখানায় বাঘ, ভাল্লুক, ময়ূর, হরিণ, চিতাবাঘ, নেকড়েবাঘ, কুমীর, ময়াল সাপ, সজারু, নানা রকম হনুমান, এ্যান্টলার প্রভৃতি সংগৃহীত ছিল। ঐ চিড়িয়াখানার কিছু কিছু অংশ এখনও জীর্ণ অবস্থায় দণ্ডায়মান। এখানে দিলখুসা প্যালেস ছিল যার কিছু অংশ জলাশয়ের উপর দণ্ডায়মান, গ্রীষ্মের শীতলতার জন্য। এখনও ভগ্ন অবস্থায় দৃশ্যমান।

এই গোলাপবাগেই ছিল ইংলণ্ডের মেজের অনুকরণে নির্মিত একটি গোলক ধাঁধাঁ। কাঁটাগাছের বেড়া দেওয়া পথ এমন ভাবে ঘুরে ঘুরে গেছে যে একবার ভিতরে ঢুকলে আর সহজে বেরনো যেত না। এতে ঢুকে কিছুক্ষণ ঘুরতে বেশ মজা লাগত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মহারাজা গোলাপবাগের চিড়িয়াখানার জন্তুগুলিকে আলিপুরের চিড়িয়াখানায় দান করেন।

এছাড়া প্রতিবছর পৌষসংক্রান্তি এবং উত্তরায়ণ অর্থাৎ ১লা মাঘ কাঠগোলাঘাট

এবং সদর ঘাটের ঘুড়ির মেলা হতো। এখনও মেলা হয় তবে সেইরকম জমজমাট ভাব আর দেখা যায় না। খুব ধুমধাম করে গোষ্ঠাষ্ঠমী উৎসব হতো। আর ফাঁকা জায়গায় বিশাল বিশাল গরুদের সাজানো হতো এবং পূজা করা হতো। রামনবমীতে তিনদিন চব্বিশপ্রহর উৎসব হতো। নানান জায়গার বহু খ্যাতনামা কীর্ত্তনীয়া কীর্ত্তন করতেন। খ্যাতনামা ব্যক্তিত্ব ভাগবৎ পাঠ করতেন। কি জমজমাট ছিল। কতলোক যে উৎসবে অংশগ্রহণ করতো তা বলাই বাহুল্য।

চৈত্র সংক্রান্তির দিন বর্ধমান শহরে রাণীসায়রের পশ্চিম দিকে চড়ক অনুষ্ঠান হতো এবং মেলাও বসত। এখন সব বন্ধ হয়ে গেছে। বর্ধমানে আর একটি অনুষ্ঠান হতো কৃষ্ণসায়রের নিকট ঝাপানতলায় আশ্বিন মাসের ১লা - মনসা পূজা উপলক্ষ্যে বাঁশের মাচার উপর দাঁড়িয়ে বিষধর সাপের খেলা। কোন অনুষ্ঠান দেখার জন্য দর্শনী দিতে হতো না। সকলের জন্যই উন্মুক্ত ছিল। এর ফলে বর্ধমান বাসীরা বহু খ্যাতনামা ব্যক্তিত্বের দর্শন লাভের সুযোগ পেতো।

কৃষ্ণসায়রের পূর্বদিকে কামান ছিল। প্রভাত হওয়ার জানান্ হত প্রতিদিন ভোর পাঁচটায় কামানের তোপ দেগে। আর দিনের কাজ শুরু হয়ে যেতো। সব দেবালয়ের দ্বার খুলে যেত এবং দেব সেবার কাজ শুরু হয়ে যেতো। এরপর সারাদিন কর্মচাঞ্চল্যের মধ্যে কেটে সন্ধ্যা নামর সাথে সাথে সারাদিনের ক্লান্তির অবসান। আবার রাত্রি ন'টায় তোপধ্বনি হতো। দেবমন্দিরের দ্বার বন্ধ হয়ে যেত। রবিবার ও ছুটির দিনে বেলা ১টায় তোপধ্বনি হতো কারণ তখন ঘড়ির প্রচলন ছিল না। এই তখনকার বর্ধমান শহরের জীবন যাত্রা।

সারা বছর চলত এইরকম গতিময় জীবনযাত্রা। মানুষের মধ্যে আনন্দ উচ্ছ্বাস, হাসি হুল্লোড়, ভাবভালোবাসা আদানপ্রদান সবই ছিল অকৃত্রিম। সেই সমস্ত দিন হারিয়ে গেছে। পড়ে আছে শুধু হিংসা, দ্বেষ, প্রতিযোগিতা, কৃত্রিমতা, সমালোচনা। কারুর মুখে একটু হাসি নেই। সবাইকার মুখ গোমড়া। আর এই গোমড়াভাব কাটাবার জন্য বর্তমানে গড়ে উঠেছে 'লাফিং ক্লাব' বা 'হাসির সংঘ'। কি আজব ব্যাপার প্রাকৃতিক হাসির আর স্থান নেই হাসবার জন্যও আবার কৃত্রিমতা অবলম্বন করতে হচ্ছে। এই তো আমাদের বর্তমান প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা। নানা সামাজিক উৎসবের বৈচিত্রতার অফুরন্ত আলাপ একদিন এই নগর বর্ধমানকে মুখরিত করে রাখতো। কি অফুরন্ত শক্তি, কি অপূর্ব তার প্রাণ প্রাচুর্য্য। সারা বৎসরের এই সব উৎসব প্রাঙ্গনে উজ্জীবিত হয়ে উঠত বর্ধমান শহর তথা এতদঞ্চলের গ্রামবাসীগণ সেখানে আজও পড়ে আছে কত যুগসন্ধিক্ষণের ইতিহাস। তাই অব্যক্ত ব্যথার মাঝে মন এখানে বলে উঠবে —"কথা কও এ অনাদি অতীত বর্ধমান..........।"

গ্রন্থসূত্র

১। Bengal District Gazetters, Burdwan, 1910---J.C.K. Peterson.
২। রাজবংশানুচরিত — রাখালদাস মুখোপাধ্যায়।
৩। অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন (স্মরণিকা) ১৩২১
৪। বর্ধমানের ইতিহাস — বলাই দেবশর্মা
৫। বর্ধমান পরিচিতি — অনুকূলচন্দ্র সেন ও নারায়ণ চৌধুরী।
৬। বর্ধমানের পুরাকথা — নগেন্দ্রনাথ বসু।
৭। বাংলার ইতিহাস — রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।
৮। বিশ্বকোষ — সঃ নগেন্দ্রনাথ বসু।
৯। বর্ধমান ঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতি — (১ম, ২য়, ৩য় খণ্ড) — যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী।
১০। বঙ্গভূষণ — রাজকৃষ্ণরায়।
১১। শিবায়ন — রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্র।
১২। ধর্মপূরাণ — যাদব রাম নাথ।
১৩। Calcutta Review ---- 1910 & 1872
১৪। History of Aurangzib ---- Vol 5. --- Sir Jadu Nath Sarkar
১৫। History of Bengal ---- Vol.11, - - Sir Jadu Nath Sarkar
১৬। ক্ষিতীশ বংশবলী চবিতম
১৭। Narrative of the Govt. of Bengal ---- Francis Gladwin 1788
১৮। The History of Bengal ---- C. Stewart
১৯। Riyazee -S-Salatin
২০। ধর্ম্মমঙ্গল — ঘনরাম চক্রবর্তী।
২১। সত্যনারায়ণ রসসিন্দু — ঘনরাম চক্রবর্তী।
২২। চণ্ডীমঙ্গল — অকিঞ্চন চক্রবর্তী।
২৩। ধর্মমঙ্গল — নরসিংহ বসু।
২৪। নগর বর্ধমানের দেবদেবী ---- নীরদ বরণ সরকার।
২৫। প্রাচীন বর্ধমানের সংস্কৃতি ও ধর্মীয় চেতনা --- ঐ
২৬। বিস্মৃত রাঢ়ের বিলুপ্ত কথন — ঐ।
২৭। দেবী সর্ব্বমঙ্গলা উপাখ্যান — ঐ।
২৮। বর্ধমান ১০৮ শিবমন্দির --- ঐ।

২৯। আপন অন্তঃর্লোকে রাঢ়ের প্রাসঙ্গিকতা — ঐ।
৩০। রাঢ় বর্ধমানের সাধক কবি কমলাকান্তের জীবনী ও পদাবলী — ঐ।
৩১। চণ্ডীমঙ্গল — মাণিক দত্ত।
৩২। ধর্ম্মমঙ্গল — মাণিক গাঙ্গুলী।
৩৩। বিদ্যাসুন্দর — ভারতচন্দ্র
৩৪। Fifth report from the Select Committee of the East India Company.
৩৫। চিত্রচম্পু — বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার।
৩৬। চন্দ্রাভিষেক — ঐ।
৩৭। রসপুর রায়বংশের ইতিকথা
৩৮। গোলাম হোসেন শলিমের বিবরণ
৩৯। মহারাষ্ট্র পুরাণ — গঙ্গারাম দত্ত।
৪০। রূপরামের ধর্মমঙ্গল — আচার্য্য সুকুমার সেন সম্পাদিত।
৪১। History of India --- Smith
৪২। History of India --- Dr. R.C. Mazumder.
৪৩। History of ancient Bengal ---- Dr R.C. Mazumder
৪৪। গৌড়বঙ্গ সংস্কৃতি ১৯০২ — হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।
৪৫। বর্ধমান রাজ --- আব্দুল গণিখান।
৪৬। হজরত পীর বাহারাম ও বর্ধমানের নূরজাহান — আব্দুল গণিখান।
৪৭। Mughal Empire ---- Iswari Prasad
৪৮। Ain-i-Akbari ---- Prof. Blockman.
৪৯। Tujuk i-Jahangir --- Rogers & Beveridge.
৫০। Unpublished Records of Government of Bengal ---- Rev. Long
৫১। বর্ধমান রাজবংশ — গোষ্ঠ বিহারীলাল হাণ্ডে।
৫২। বর্ধমান জেলার পুরাকীর্তি ও সংস্কৃতি — বর্ধমান জেলা পরিষদ।
৫৩। ষোড়শ শতাব্দীতে বাংলার নব জাগরণে বর্ধমান — ডঃ হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য্য।
৫৪। বর্ধমান সম্মিলনী হীরকজয়ন্তী স্মরনিকা, ১৯৭৪।
৫৫। জাল প্রতাপচাঁদ — সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী সম্পাদিত।
৫৬। বর্ধমান পবিক্রমা — সুধীর চন্দ্র দাঁ।
৫৭। Selections from records of the Government of India
৫৮। The [illegible] between the Nabab Meer Mohomed Kossim Khan and the Company
৫৯। [illegible] রাজেশ্বর — বিশ্বেশ্বর তর্কালঙ্কার।
৬০। আনন্দ বাজার পত্রিকা — ১৫ই জানুয়ারী, ২০০৪ প্রতিবেদন। রাণা সেনগুপ্ত।